পদ্যানুবাদ ও ব্যাখ্যা।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

"গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে চোত্তমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানমুপাশ্রিত্য ত্রীন্ লোকান্ পালয়াম্যহম্॥
গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ।
অর্দ্ধমাত্রাক্ষরা নিত্যা সানির্ব্বাচ্যপদাত্মিকা॥"

গীতামাহাত্ম্যম্—৭—৮

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা

শ্রীদেবেন্দ্র বিজয় বসু-

প্রণীত

পদ্যানুবাদ ও ব্যাখ্যা সমেত।

পঞ্চম ভাগ।

তৃতীয় ষট্‌ক—প্রথম খণ্ড,

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

প্রিণ্টার—শ্রীযোগেশচন্দ্র অধিকারী।

মেট্‌কাফ প্রেস্‌,

৭৯ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্‌—কলিকাতা।

প্রকাশক—শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার বসু,

দীনধাম, ৬ নং দীনবন্ধু লেন,—কলিকাতা।

[মূল্য,—১॥০, ভাল বাঁধাই ২৲ টাকা।

"সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥
সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥"

(গীতা, ১৩।২৭-২৮।)

বিজ্ঞাপন।

গীতার পঞ্চম ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে গীতার
শাদশ অধ্যায় মাত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে যাহা
জ্ঞানার্থ, তাহাই বিবৃত হইয়াছে; ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ,
ন-অজ্ঞান, জ্ঞেয় ব্রহ্ম, এবং প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব, এই অধ্যায়ে
ত হইয়াছে। এ সকল তত্ত্ব অতি দুর্জ্ঞেয়; উপনিষদ,
ান্তদর্শন ও সাংখ্যদর্শন বিশেষভাবে না জানিলে এ
ল তত্ত্ব বুঝা যায় না। ব্যাখ্যায় এই সকল মূল তত্ত্ব, উপনিষদ
উক্ত দর্শনের সহিত আলোচনা করিয়া, বুঝিতে চেষ্টা
রিয়াছি। এজন্য এ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা বিস্তৃত হইয়াছে।
ায় যে তত্ত্বজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা না বুঝিলে গীতার্থ
কৃতরূপে জানা যায় না। যাহাতে সে অর্থ জানা যায়, তাহার
বিশেষ যত্ন করিয়াছি। ইতি—

ডিঃ $\frac{১০}{১০৭}$
দেবধাম, বারাণসী
পঞ্চমী ১৩২৩ সাল,

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১।২।১১

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বিষয়-ব্যবচ্ছেদক সূচী।

জ্ঞান ও অজ্ঞান-তত্ত্ব—

জ্ঞেয় ব্রহ্ম—

বিষয়	শ্লোকাঙ্ক	পত্রাঙ্ক ।

প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব—

শুদ্ধিপত্র।

পত্র	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	১৯	অধ্যায়	অধ্যায়
৪	৯০		
১৬	২২	দর্শনের	দর্শনে
৫৫	১৭	পরমার্থিক	পারমার্থিক
৭৬	১১	Logvs	Logos
১৭৫	৯	শব্দদ্বারা তাঁহাকে নির্দ্দেশ	শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ
১৭৬	২৫	sproximity	Proximity
১৮৪	২১	ধর্ম্মের	ব্রহ্মের
২৮৪	১০	প্রকৃতি	আকৃতি
২৯০	৬	অতিয়	অনন্ত
৩৮৭	১	যথার্থ	যাথার্থ্য
৩৮৮	১৮	হইবেনই	হইবেই
৩৯১	২২	জীবের	জীবের
৩৯৪	৪	Nougr	Noughr
৩৯৬	২৪	পুনষ	পুরুষ
৪০১	২৫	মেনব্রাঁসে	মেলব্রাঁসে
৪০৫	১১	নগবাদির	নগরাদির
৪১৭	৩	অজ্ঞ	অজ্ঞাত
৪২৮	২০	due	sum
৪৩৮	২০	মূল্যতত্ত্ব	মূলতত্ত্ব
৪৬৯	২৪	পুরুষতত্ত্ব	অক্ষর-পুরুষতত্ত্ব

৪৭০	৪	ব্যষ্টিভত্বক্ষেত্ররূপ	ব্যষ্টিক্ষেত্ররূপ
৪৭৮	১৯	জ্ঞয়	জ্ঞেয়
৪৮৫	১৮	ষোগে	যোগে
৪৮৮	২০	অজ্ঞানযুক্ত	অজ্ঞানমুক্ত
৫০৭	১৮	ক্ষয়	ক্ষর
৫০৮	২	স্মৃতি	শ্রুতি
৫০৮	৪	কোন	কেন
৫১৩	১২	লিঙ্গবৎ	লিঙ্গম্
৫২১	২১	পরিচ্ছিন্ন	অপরিচ্ছিন্ন
৫২১	২১	অংশ	অংশী
৫২২	১৪	এই	বা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রয়োদশ অধ্যায়—

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-যোগঃ।

"ভক্তানামহমুদ্ধর্ত্তা সংসারাদিত্যবাদি যৎ।
ত্রয়োদশেঽথ তৎসিদ্ধৌ তত্ত্বজ্ঞানমুদীর্য্যতে॥
বিবিক্তৌ যেন তত্ত্বেন মিশ্রপ্রকৃতিপূরুষৌ।
তং বন্দে পরমানন্দং নন্দনন্দনমীশ্বরম্॥"

গীতার এই ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত শেষ ছয় অধ্যায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই অংশে জ্ঞানের যাহা পরম জ্ঞেয়, যাহা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানার্থ, তাহা বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব, প্রকৃতি-পুরুষ বিবেকতত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞান বিবৃত হইয়াছে। গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে—আত্মতত্ত্ব এবং সেই তত্ত্বলাভের জন্য যে বিভিন্ন সাধনা, তাহার তত্ত্ব অর্থাৎ কর্ম্মযোগ, কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ, জ্ঞানযোগ ও ধ্যানযোগ বিবৃত হইয়াছে। মধ্যের ছয় অধ্যায়ে—ঈশ্বরতত্ত্ব এবং ভক্তিমার্গে সাধনা-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। আর এই শেষ ছয় অধ্যায়ে—জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব, জীব

জগৎ ও ঈশ্বর তত্ত্ব, এবং ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। জ্ঞানের যাহা চরম সীমা—যাহা প্রকৃত বেদান্ত—তাহা এইরূপে বিস্তারিত হইয়াছে। কোন কোন ব্যাখ্যাকারের মতে গীতা—"তত্ত্বমসি" এই বেদান্তোক্ত মহাবাক্যের ব্যাখ্যামাত্র। তন্মধ্যে প্রথম ছয় অধ্যায় 'ত্বম্' পদার্থ বা আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, মধ্যের ছয় অধ্যায়ে 'তৎ' পদার্থ বা ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, এবং শেষ ছয় অধ্যায়ে "অসি" অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরে সম্বন্ধ তত্ত্ব বুঝান হইয়াছে। সুতরাং গীতার এই শেষ ছয় অধ্যায় নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এই শেষ ছয় অধ্যায় সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণের অভিপ্রায় এস্থলে উল্লিখিত হইল।—

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"সপ্তম অধ্যায়ে ঈশ্বরের দুই প্রকৃতি উক্ত হইয়াছে। একটি ত্রিগুণাত্মিকা অষ্টপ্রকারে ভিন্না সংসারহেতু অন্য অপরা, আর একটি জীবভূতা ক্ষেত্রজ্ঞ-লক্ষণা ঈশ্বরাত্মিকা পরাপ্রকৃতি। এই দুই প্রকৃতি দ্বারা ঈশ্বর জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ের কারণ হন। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-লক্ষণ প্রকৃতি দ্বয়ের নিরূপণ দ্বারা, সেই দুই প্রকৃতিযুক্ত ঈশ্বরের তত্ত্ব নির্দ্ধারণার্থ এই ক্ষেত্রাধ্যায় আরম্ভ করা হইয়াছে। পূর্ব্বাধ্যায়ে ১৩শ হইতে ২০শ শ্লোকে তত্ত্বজ্ঞানী সন্ন্যাসীদিগের নিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে। তাঁহারা কিরূপ তত্ত্বজ্ঞানে যুক্ত থাকিয়া উক্তরূপ ধর্ম্মাচরণ দ্বারা ভগবানের প্রিয় হন, এক্ষণে তাহা নির্দ্ধারণার্থ এই অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে।"

আনন্দগিরি বলিয়াছেন,—

"প্রথম ও মধ্যম ছয় অধ্যায়ে ত্বং ও তৎ পদার্থ উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে বেদান্ত-বাক্যনিষ্ঠ সম্যক্‌জ্ঞান-প্রধান অন্তিম ছয় অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে।"

রামানুজ বলিয়াছেন,—

"যে জীবাত্মা ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইবে, তাহার যথাযথস্বরূপজ্ঞান, পরম প্রাপ্য পরব্রহ্ম বাসুদেবকে পাইবার উপায়,—ভক্তিরূপ উপাসনার অঙ্গ।

এই যথাযথ স্বরূপজ্ঞান জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ রূপ নিষ্ঠাদ্বয় দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। প্রথম ছয় অধ্যায়ে সেই যথাযথ স্বরূপজ্ঞান উক্ত হইয়াছে। মধ্য ছয় অধ্যায়ে, প্রথমতঃ পরম প্রাপ্য ভগবানের যথার্থ তত্ত্ব ও তাঁহার মাহাত্ম্য জ্ঞানের উল্লেখ করিয়া, ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক ভক্তিযোগ নিষ্ঠা প্রতিপাদিত হইয়াছে। যাঁহারা নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যাপেক্ষী এবং আত্মকৈবল্য-মাত্রাপেক্ষী, তাঁহাদিগেরও পক্ষে ভক্তিযোগ যে তদুপযোগী সাধন, ইহাও উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে প্রকৃতি-পুরুষ ও তৎসংসর্গ রূপ প্রপঞ্চ ও ঈশ্বরের যথার্থ তত্ত্ব, কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তির স্বরূপ এবং উহাদিগের উপাসনা প্রকার, যাহা প্রথম ও মধ্যের ছয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, তাহাই অন্তিম ছয় অধ্যায়ে শোধিত হইয়াছে। এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে দেহ ও আত্মার স্বরূপ, দেহ যথার্থতঃ কি; উপযুক্তরূপে তাহার প্রদর্শন, দেহবিমুক্ত আত্মাকে কি প্রকারে পাওয়া যায়—তাহার উপায়, এবং যে আত্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে ও যাহার স্বরূপ জ্ঞানগোচর হইয়াছে, উপযুক্তরূপে তাহার প্রদর্শন, তথাবিধ আত্মার আচৎ (বা জড়) সম্বন্ধ হেতু, তদনন্তর বিবেকানু-সন্ধানের প্রকার উক্ত হইয়াছে।”

শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন,—

“সংসার হইতে ভক্তগণের উদ্ধার কর্ত্তা আমি,—এই যে ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, তাহার সিদ্ধির জন্য ত্রয়োদশে তত্ত্বজ্ঞান উল্লিখিত হইয়াছে। সেই সকল ব্যক্তিকে আমি অচিরে সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করি,—ভগবান্ পূর্ব্বে এ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞান বিনা সংসার হইতে উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। এজন্য এই তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ জন্য প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক অধ্যায় আরম্ভ করা হইয়াছে। সপ্তম অধ্যায়ে পরা ও অপরা প্রকৃতির কথা উক্ত হইয়াছে। তাহার যথার্থ তত্ত্ব না জানিয়া জীবভাবা-পন্ন চিদংশের সংসার-গতি হয়। যে প্রকৃতিদ্বয় যোগে ঈশ্বর জীবগণের উপভোগার্থ সৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপারে প্রবৃত্ত হন, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ পদবাচ্য

সেই প্রকৃতিদ্বয়কে পরস্পর হইতে বিভক্ত করিয়া তত্ত্বতঃ নিরূপণজন্য এ অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে।”

বলদেব বলিয়াছেন,—

“নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা জীব সম্পর্কে যে জ্ঞান সাধিত হয়, সেই জ্ঞান পরাত্ম-জ্ঞানের উপযোগী। এজন্য প্রথম ছয় অধ্যায়ে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। মধ্যের ছয় অধ্যায়ে প্রথমে ভগবানের মহিমা উল্লেখ করিয়া ভক্তিমার্গে পরমাত্মার উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে। জ্ঞানাদি অবিমিশ্র সেই উপাসনা, ভগবদ্বশ্যতাসাধক বলিয়া, ভগবান্‌কে পাইবার হেতু। সেই উপাসনা যখন একান্তিগণের ভাবের সহিত মিশ্রিত হয়, তখন উক্ত জ্ঞানাদি অবি-মিশ্র হইয়া ভগবান্‌কে পাইবার যোগ্য হয়। যোগ ও জ্ঞানের সহিত সংসৃষ্ট সেই উপাসনা তাঁহার ঐশ্বর্য্যপ্রধান রূপের উপলব্ধি, ও জীবের মুক্তির কারণ হয়, ইহা কথিত হইয়াছে। এই শেষ ছয় অধ্যায়ে প্রকৃতি ও পুরুষ ও তৎসংযোগোৎপন্ন জগৎ ও জগতের ঈশ্বরের স্বরূপ এবং কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির স্বরূপ বিবক্ষিত হইয়াছে। জ্ঞানের নির্ম্মলতাসাধন জন্য এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে দেহ, জীব ও পরমেশ্বরের স্বরূপ বিবেচনীয়। দেহাদি হইতে জীবাত্মা পৃথক্ হইলেও জীব যখন দেহের সহিত সম্বদ্ধ, তখন তাহাকে কি প্রকারে সেই পৃথক্ ভাবের অনুসন্ধান করিতে হইবে তাহাও এ অধ্যায়ে বিবেচ্য।”

নীলকণ্ঠ বলেন,—

“ব্যবহার দশায় জীব ঈশ্বরে যে ভেদ, তাহার নিরসন জন্য এই শেষ ছয় অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে।”

হনুমান বলিয়াছেন,—

“ভূমি অপ্ প্রভৃতি অষ্টবিধ অপরা প্রকৃতি ঈশ্বরের শক্তিরূপা, ইহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর ঈশ্বরের স্বরূপভূতা ও জীবভূতা যে পরা-প্রকৃতি, ইহাও পূর্ব্বে সপ্তম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। সেই প্রকৃতিদ্বয়-

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ রূপ, তাহা ঈশ্বরেরই স্বরূপ, তাহারই যথাবৎ অববোধার্থ এই অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে।”

বল্লভ-সম্প্রদায় মতে,—

“প্রপঞ্চাদি সর্ব্ব স্বরূপ জ্ঞানের অভাবে ভক্তি কিরূপে হইবে? এইজন্য জ্ঞানের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।”

মধুসূদন বলিয়াছেন,—

“প্রথম ছয় অধ্যায়ে ‘ত্বং’ পদার্থ উক্ত হইয়াছে, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ‘তৎ’ পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে। শেষ ছয় অধ্যায়ে সেই বাক্যার্থনিষ্ঠ সম্যক্ জ্ঞান প্রধানতঃ উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ পূর্ব্বে ব'ল ছেন, ‘তাহাদিগকে আমি মৃত্যুসংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ করি।’ আত্ম জ্ঞান ব্যতীত সে মুক্তি সম্ভব হয় না। অতএব যেরূপ আত্মজ্ঞান দ্বারা মৃত্যুসংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তাহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা অদ্বিতীয় পরমাত্মার সহিত জীবের অভেদ ভাব জ্ঞানের বিষয়ীভূত করা যায়। সেই ভেদ—ভ্রম বা অবিদ্যামূলক, তাহাই সকল অনর্থের মূল। তাহা হইতেই সংসারী জীব প্রতিক্ষেত্রে ভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়। অবিদ্যা আত্মার ধর্ম্ম নহে। এজন্য সেই অবিদ্যাহেতু জীবের —পরমেশ্বরের সহিত ঐক্যের বাধা হয় না। যখন অবিদ্যা দূর হয়, তখন ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ প্রতি ক্ষেত্র হইতে আপনাকে ভিন্ন, এবং সর্ব্ব ক্ষেত্রে তিনি একই ক্ষেত্রজ্ঞ ইহা জানিতে পারেন। এই জ্ঞানেই মৃত্যুসংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। এজন্য এই অধ্যায়ে এই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞজ্ঞান বা প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে।”

কেশবাচার্য্য বলিয়াছেন,—

“প্রত্যগাত্মার যাথাত্ম্য, এবং সপরিকর জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ-লক্ষণ নিষ্ঠাদ্বয়, যাহা পরমেশ্বরপ্রাপ্তির অসাধারণ উপায় ভক্তিযোগের অঙ্গীভূত তাহা প্রথম ষট্কে নিরূপিত হইয়াছে। সেই পরম প্রাপ্য

ভগবানের যাথাত্ম্যতত্ত্ব ও তাঁহার মাহাত্ম্য ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানসহকারে তাঁহাতে যে অনন্য ভক্তিযোগ,—তাহা মধ্যম ষট্‌কে নিরূপিত হইয়াছে। ইদানীং উক্ত দুই ষট্‌কে উল্লিখিত প্রকৃতি পুরুষ ও পরমাত্মার স্বরূপ স্বভাব সম্বন্ধ যাথাত্ম্য বিবেক এবং তাহার অধিকারী নির্ণয়ার্থ দেবাসুর সম্পদ্ বিভাগ, শ্রদ্ধা আহার, যজ্ঞ তপঃ দান ত্যাগ, কর্ত্তা বুদ্ধি প্রভৃতির গুণভেদ হেতু ত্রিবিধ বিভাগ, দৈবী সম্পদাশ্রিত সাত্ত্বিক অনন্যভক্তি জ্ঞান বৈরাগ্য সম্পন্ন লোকদের পরাভক্তিদ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি লক্ষণ ও নিরতিশয় অনন্ত ফল নিরূপণার্থ এই শেষ ষট্‌ক আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বে "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ' এই বাক্য দ্বারা ভগবান্ স্বভক্তগণের উদ্ধার কর্ত্তা ইহা বলিয়াছেন। সেই উদ্ধারের উপায়সমাধানার্থ প্রকৃতি পুরুষ-বিবেক প্রদশনার্থ এই ত্রয়োদশ অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে।"

শঙ্করানন্দ বলিয়াছেন,—

মুমুক্ষুগণের সত্ত্বশুদ্ধির জন্য ঈশ্বরোপাসনা অবশ্য কর্ত্তব্য। মন্দ অতিমন্দ ইত্যাদিরূপ বুদ্ধিভেদ হেতু, উপাসকগণের উপাসনা ভেদ হয়, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। যাঁহাদের চিত্ত পরিশুদ্ধ, বিদেহমুক্তির জন্য তাঁহাদের অক্ষর-উপাসনা কর্ত্তব্য, ইহা সূচনা করিবার জন্য, শ্রবণাদি উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট সাধন প্রতিপাদিত হইয়াছে। তদনন্তর ব্রহ্মাত্মৈকত্ব বিজ্ঞান দ্বারা যাঁহারা অনাত্মবন্ধন বিনির্মুক্ত হইয়াছেন, যাঁহারা জীবন্মুক্ত ব্রহ্মবিদ্ সর্ব্বভূতের অদ্বেষ্টা ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত সাধক, তাঁহাদের যেরূপ সাধনা অনুষ্ঠেয়, তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে। ইদানীং মোক্ষার্থকামী জিজ্ঞাসুর কিরূপে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব বিজ্ঞান হয়, ব্রহ্ম কি, আত্মা কি, অনাত্মা কি, অনাত্মকৃত বন্ধন কিরূপ, কিরূপে জ্ঞানের দ্বারা সে বন্ধন নিবৃত্ত হয়, জ্ঞান কি, জ্ঞানসাধন কি, কিরূপে বা জীবন্মুক্তি হয়,—এই আকাঙ্ক্ষায় ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ; অনাত্মা-আত্মা বা প্রকৃতি-পুরুষ বিবেচন বিবিক্ত আত্মার ব্রহ্মৈকত্ব এবং বিবিক্ত ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বৈলক্ষণ্য-জ্ঞান

দৃঢ় করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ বিবেচন, প্রকৃতির বন্ধকত্ব, অধ্যাসহেতু আত্মার বন্ধন, আত্মার অদ্বিতীয়ত্ব ইত্যাদি প্রতিপাদন জন্য এই ত্রয়োদশ অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে।”

অতএব সকল ব্যাখ্যাকারগণই স্বীকার করেন যে, এই শেষ ছয় অধ্যায়ে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান বিবৃত হইয়াছে। এক অর্থে প্রথম ও মধ্যম ছয় অধ্যায় তাহার উপক্রমণিকা মাত্র। যাহা হউক, গীতার এই তৃতীয় ষট্‌ক সম্যক্ বুঝিতে পারা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শন সামঞ্জস্য পূর্ব্বক প্রকৃত বেদান্ত জ্ঞান এই ষট্‌কে উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব সাংখ্যদর্শন, বেদান্তদর্শন এবং উপনিষদ্ বিশেষরূপে আয়ত্ত করিতে না পারিলে, এই ষট্‌ক বুঝিতে পারা যাইবে না। ইহাতে অতি সংক্ষেপে মূলতত্ত্ব সকল বিবৃত হইয়াছে। অতি কঠিন দুর্ব্বোধ্য দার্শনিক তত্ত্ব, দর্শন শাস্ত্রে বিশেষরূপে প্রবেশ ব্যতীত আয়ত্ত করা যায় না।

যাঁহারা মনে করেন যে, গীতা প্রধানতঃ ভক্তিশাস্ত্র, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, দ্বাদশ অধ্যায়ই গীতার শেষ, গীতার দ্বিতীয় ষট্‌কেই গীতার প্রধান প্রতিপাদ্য ঈশ্বরতত্ত্ব ও ভক্তিযোগ বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং গীতার তৃতীয় ষট্‌ক তত প্রয়োজনীয় নহে। তাহাতে যে জ্ঞান জ্ঞেয় প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে, তাহা ভক্তিসাধনেরই অঙ্গ মাত্র। কেহ কেহ আরও বলেন যে, এই শেষ ছয় অধ্যায় সম্ভবতঃ প্রক্ষিপ্ত। এই মত নিতান্ত অসঙ্গত ও অগ্রাহ্য। শঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার অনুবর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণ এই ষট্‌ককেই গীতার সার বলিয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণও এই তৃতীয় ষট্‌কের প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছেন। গীতোক্ত জ্ঞানযোগ—এই তৃতীয় ষট্‌কেই বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, গীতার প্রথমে ‘আত্ম’তত্ত্ব ও আত্মবিজ্ঞান লাভের উপায় যে কর্ম্মযোগ, কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ ও ধ্যানযোগ তাহা বিবৃত হইয়াছে, এবং গীতার দ্বিতীয় ষট্‌কে সর্ব্বাত্মা সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরতত্ত্ব ও সেই তত্ত্বজ্ঞান

বিজ্ঞান সহিত লাভের প্রধান সাধন যে ভক্তিযোগ, তাহা বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত যাহা প্রকৃত জ্ঞানযোগ, যাহা মূলতত্ত্ব—তাহা বিবৃত হয় নাই। ব্রহ্মতত্ত্ব, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব, প্রকৃতিপুরুষতত্ত্ব, পুরুষোত্তমতত্ত্ব, ক্ষর ও অক্ষর পুরুষতত্ত্ব, ত্রিগুণতত্ত্ব, সংসারতত্ত্ব, সংসার মুক্তিতত্ত্ব, এবং যে জ্ঞান দ্বারা এই সকল তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন হয়, সেই জ্ঞানতত্ত্ব—পূর্ব্বে গীতায় বিবৃত হয় নাই। এ সকল মূলতত্ত্ব যে শাস্ত্রে বিবৃত না থাকে, সে শাস্ত্র অসম্পূর্ণ। গীতা প্রধান মোক্ষশাস্ত্র। গীতার মূলসূত্র বা মূল প্রতিপাদ্য বিষয় পরম ব্রহ্মতত্ত্ব, এবং সেই ব্রহ্মস্বরূপ লাভপূর্ব্বক মুক্তির উপায় বা সাধন—কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞানযোগ। ইহাই গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রথম আত্মজ্ঞানলাভ না হইলে, তাহার মধ্য দিয়া ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব বা নির্গুণ অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। এজন্য প্রথম ষট্‌কে আত্মতত্ত্ব এবং আত্ম জ্ঞান লাভের প্রধান সাধন কর্ম্মযোগ প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে। সেই আত্মজ্ঞান লাভ হইলে, তাহার পরিণামে যে পরমাত্মতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান' ভক্তিযোগ সাধন দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহা দ্বিতীয় ষট্‌কে বিবৃত হইয়াছে। সেই আত্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব উক্তরূপ সাধন দ্বারা লাভ করিলে, যে জ্ঞান সিদ্ধ হয়, ও সেই জ্ঞানে 'জ্ঞেয়' যাহা সেই পরম ব্রহ্মতত্ত্ব, ও তদন্তর্গত ঈশ্বরতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও জগৎতত্ত্ব এবং তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধতত্ত্ব—এক কথায় যে জ্ঞান মুক্তির উপায়, সেই জ্ঞান এই তৃতীয় ষট্‌কে বিবৃত হইয়াছে। এই জ্ঞানই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান, ইহাই দর্শনশাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। জর্ম্মাণ দার্শনিকশ্রেষ্ঠ ক্যাণ্ট্ পরম জ্ঞানের এই প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়কে Ideals of Reason বলিয়াছেন। অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি গ্রন্থের উপসংহারে উক্ত হইয়াছে,—

"জীবতত্ত্বং জগত্তত্ত্বমীশতত্ত্বং তৃতীয়কম্।
স্থিতৈবৈকাদশতন্ত্রেষু তত্ত্বদ্‌যুক্ত্যা নিরূপিতং॥

পশ্চাদ্ বেদান্ত সদ্‌যুক্ত্যা অদ্বৈতশ্রুতিমানতঃ।
অদ্বয়ং ব্রহ্ম সংসিদ্ধং দ্বৈতস্যাবসরঃ কুতঃ॥"

অর্থাৎ যে দ্বাদশ প্রকার তন্ত্র বা দর্শন শাস্ত্র (ছয় আস্তিক দর্শন ও ছয় নাস্তিক দর্শন) আছে, তন্মধ্যে (বেদান্ত ব্যতীত) একাদশ প্রকার তন্ত্রে নিজ নিজ অভিমত যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবতত্ত্ব জগত্তত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব—এই তিন তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। পশ্চাৎ বেদান্ত দর্শন সদ্‌যুক্তি ও অদ্বৈত শ্রুতি প্রমাণ হইতে (উক্ত তিন তত্ত্বের সমন্বয়পূর্ব্বক) অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব সম্যক্ প্রকারে সিদ্ধান্ত হইয়াছে। অতঃপর আর দ্বৈত মতের অবসর নাই।"

অতএব জীবতত্ত্ব জগত্তত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণই সকল দর্শনশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। তাহার সমন্বয়পূর্ব্বক অদ্বয় পরম ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণই দর্শনশাস্ত্রের চরম লক্ষ্য। তাহাই বেদান্ত,—তাহাতেই জ্ঞানের পরিসমাপ্তি। গীতার তৃতীয় ষট্‌কে—এই পরম (Transendental) জ্ঞান—ও সেই জ্ঞানের জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব ও তদন্তর্গত উক্ত জীবতত্ত্ব সংসারতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। এই জন্য এই তৃতীয় ষট্‌ক গীতার সার। ইহা বাদ দিলে গীতার গীতাত্ব থাকে না।

অর্জ্জুন উবাচ।

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্‌বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব॥ (ক)

হে কেশব! কিবা হয় প্রকৃতি পুরুষ,
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ কিবা, জ্ঞান জ্ঞেয় আর,—
জানিতে এ সব আমি করি অভিলাষ। (ক)

(ক) এই শ্লোক গীতায় প্রক্ষিপ্ত। শঙ্করাচার্য্য রামানুজ প্রভৃতি কোন ব্যাখ্যাকারই ইহা গ্রহণ করেন নাই। যাহা কর্ত্তৃক এই শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তিনি অদূরদর্শী। তিনি বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন যে, দ্বাদশ অধ্যায় শেষ হইলে, গীতার বর্ণনীয় বিষয় শেষ হইল। সুতরাং ভগবান্ স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া আর ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব, প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয় তত্ত্ব বুঝাইতে আরম্ভ করিতে পারেন না। অতএব এ সম্বন্ধে অর্জ্জুনের প্রশ্ন উপলক্ষেই ভগবানের এই তত্ত্বোপদেশ আরম্ভ হইয়াছে মনে করিতে হইবে। এ কারণ তিনি অর্জ্জুনের মুখে এই প্রশ্ন সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

কিন্তু পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিলে জানা যায় যে, মধ্যের ছয় অধ্যায়ের প্রথমে সপ্তম অধ্যায়ে পরমাত্মাকে আশ্রয় পূর্ব্বক যোগযুক্ত হইলে তাঁহার যে সমগ্রস্বরূপ জানা যায়, সেই সমগ্রস্বরূপ বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে। সেই স্থলে পরমেশ্বরের দুইরূপ প্রকৃতির কথা, এবং তাঁহার স্বরূপের কথা ভগবান্ বলিতে আরম্ভ করেন। সেই প্রসঙ্গ মধ্যেই অর্জ্জুন প্রশ্ন করেন, এবং তাহার উত্তরে ভগবান্ অষ্টম অধ্যায়ে অধ্যাত্মাদি ব্রহ্মতত্ত্ব অব্যক্ত তত্ত্ব ও দুইরূপ গতিতত্ত্ব বর্ণনা করেন। পুনরায় নবম অধ্যায়ে ভগবান্ পরমেশ্বরের স্বরূপ তত্ত্ব বা বিজ্ঞান সহিত ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান বিবৃত করিতে আরম্ভ করেন তাহা শেষ হইতে না হইতে অর্জ্জুনের প্রশ্নে ভগবান্ দশম ও একাদশ অধ্যায়ে, ঈশ্বরের বিভূতি যোগ বর্ণনা করেন, এবং অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করান। পুনর্ব্বার অর্জ্জুনের প্রশ্নে, দ্বাদশ অধ্যায়ে, দুইরূপ উপাসনা প্রণালী ও তাহাদের পার্থক্য এবং শ্রেষ্ঠভক্তের লক্ষণ বর্ণন করেন। এজন্য সপ্তম অধ্যায়ে ও নবম অধ্যায়ে ভগবান্ যে আপনার সমগ্র স্বরূপের বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান বিবৃত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সে প্রসঙ্গ শেষ হয় নাই।

ভগবান্ যে সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ—সে তত্ত্ব পূর্ব্বে উক্ত হয় নাই। তিনি যে

ঈশ্বররূপে, সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত সকলের নিয়ন্তা, পরম পুরুষ পরমাত্মারূপে সর্ব্বদেহে অধিষ্ঠিত, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হয় নাই। তাঁহার যে পরম রূপ পরম অক্ষর ব্রহ্ম—তাহা অষ্টম অধ্যায়ে উল্লিখিত হইলেও সে তত্ত্ব—সে ব্রহ্মতত্ত্ব পূর্ব্বে বিবৃত হয় নাই। এই সকল তত্ত্ব জানিতে হইলে, যেরূপ জ্ঞান লাভ করিতে হয় বা যেরূপ অধিকারী হইতে হয়, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হয় নাই। পূর্ব্বে যে সপ্তম অধ্যায়ে তাঁহার দুইরূপ প্রকৃতির কথা ভগবান্ বলিয়াছেন, সেই প্রকৃতি তত্ত্বও পূর্ব্বে বিবৃত হয় নাই এবং যে দেহীর ও দেহের কথা পূর্ব্ব দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইঙ্গিত আছে, সেই দেহী বা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের কথা ও দেহ বা ক্ষেত্ররূপ প্রকৃতির কথা পূর্ব্বে বিস্তারিত হয় নাই। ভগবান যে সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ, তাহা জানিতে হইলে যে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপ—যে প্রকৃতি ও পুরুষতত্ত্ব জানা প্রয়োজন, তাহা পূর্ব্বে বিশেষ ভাবে বিবৃত হয় নাই। এ সকল তত্ত্ব না জানিলে সমগ্র পরমেশ্বর তত্ত্ব জানা যায় না। পরমেশ্বরই—'সর্ব্ব' তিনিই সর্ব্বাত্মা। তাঁহাকে 'সমগ্র' ভাবে যথাসম্ভব সম্পূর্ণরূপে জানিতে হইলে, এ সকল তত্ত্ব অবশ্য জানিতে হয়। পূর্ব্বে এ সকল তত্ত্ব বিবৃত হয় নাই। এজন্য ভগবান্ সেই তত্ত্ব ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে বিবৃত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রকৃতি-পুরুষ, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান জ্ঞেয়—এ সকলই পরমেশ্বরের বিভিন্নভাব, সগুণ রূপে তিনি এই সকল ভাবে জগদবস্থায় অভিব্যক্ত (manifest) হন। তাঁহার সমগ্রস্বরূপ বিজ্ঞান সহিত জানিতে হইলে, এ সকলের তত্ত্ব জানা নিতান্ত প্রয়োজন। নতুবা পূর্ণ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। সে জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকে। এজন্য ভগবান্ এই তত্ত্ব বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই জন্য অর্জ্জুনের কোন প্রশ্নের আবশ্যক নাই। বোধ হয়, এ প্রশ্ন করিবার অধিকারও অর্জ্জুনের ছিল না।

এই অধ্যায়ে যে সকল তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে

সাংখ্যজ্ঞান প্রসঙ্গে তাহার কতক উল্লেখ আছে। দেহ হইতে দেহী ভিন্ন ও বিরুদ্ধ ধর্ম্মবিশিষ্ট, সর্ব্ব দেহে দেহী এক, এ সকল কথার আভাস সে স্থলে দেওয়া আছে মাত্র। তাহা এ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে ব্যাখ্যায় যে সকল তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা এস্থলে দ্রষ্টব্য।

—:০:—

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্‌যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞইতি তদ্বিদঃ ॥ ১

—:*:—

শ্রীভগবান্‌।

এই যে শরীর ইহা হয় হে কৌন্তেয়!
'ক্ষেত্র' নামে অভিহিত ; যে জানে ইহারে
তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ কহে তত্ত্ববিদ্‌গণ। ১

(১) এই শরীর...ক্ষেত্র—প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা—এই প্রকৃতি সকল প্রকার কার্য্য,কারণ ও বিষয়রূপে পরিণত হইয়া থাকে, এবং জীবের ভোগ ও অপবর্গ সিদ্ধির জন্য দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি আকারে সংহত হয়। সেই সংঘাতই এই শরীর। এই শরীরকেই ক্ষেত্র বলা যায়। যাহা দ্বারা ক্ষত হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়, অথবা যাহার ক্ষয় বা ক্ষরণ হয়, কিংবা যাহাতে বীজ বপন করিলে ফল লাভ হয়, তাহা ক্ষেত্র। এই দেহে কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ হয়, এইজন্য এ দেহকে ক্ষেত্র বলা যায় (শঙ্কর)। আমি দেব, আমি মনুষ্য, আমি স্থূল, আমি কৃশ, ইত্যাত্মক, ভোক্তার সমান অধিকরণ দ্বারা প্রতীয়মান, ভোক্তার আত্মার

অর্থান্তর্ভূত তাহার যে ভোগক্ষেত্র বা ভোগায়তন, সেই শরীরই ক্ষেত্র (রামানুজ)। সংসার-প্ররোহভূমি হেতু ভোগায়তন শরীরই ক্ষেত্র (স্বামী)। ভোক্তা জীবের ভোগ্য সুখদুঃখাদি প্ররোহ-কারণ হেতু এই ইন্দ্রিয়প্রাণাদিযুক্ত শরীরই ক্ষেত্র, (বলদেব)।

যাহারা অজ্ঞানী, তাহারা আমি জীব, আমি দেব, আমি মানুষ, আমি কৃশ বা স্থূল—ইত্যাদিরূপে দেহাত্মবাদী বা দেহ ও আত্মার অভেদবাদী। তাঁহারা জ্ঞানী—তাহারা শরীরকে আত্মার ভোগায়তন বলিয়া জানেন। (বলদেব)। শ্রীভাগবতে আছে,—

"অদন্তি চৈকং ফলমস্য গৃধ্রা
গ্রামে চরা একমরণ্যবাসাঃ।
হংসা য একং বহুরূপমিজ্যৈঃ
মায়াময়ং বেদ স বেদ বেদম্॥"

(শ্রীবলদেব উদ্ধৃত বচন)।

ক্ষেত্র,—অর্থাৎ সর্ব্ব-উৎপত্তি স্থান, জ্ঞানাদির প্ররোহ স্থান (বল্লভ)। কর্ত্তা ও ভোক্তা জীবাত্মার স্বস্ব শুভাশুভ কর্ম্মে ভোগ ও উৎপত্তি স্থান (কেশব)।

শরীর—যাহা ভোক্তা আত্মা হইতে পৃথক (বিলক্ষণ) প্রতীয়মান হয় (শীর্য্যতে) তাহাই শরীর (কেশব)। ইহাকে 'ইদং' বলা হইয়াছে, কারণ এ শরীর দ্রষ্টার 'দৃষ্ট', দ্রষ্টা আত্মা হইতে পৃথক্ (গিরি)।

এই প্রত্যক্ষ অনুভূয়মান শরীর দ্বারা পুরুষ রাগদ্বেষাদিযুক্ত হইয়া ক্ষয়শীল হয়—বা ক্ষর স্বভাবযুক্ত হয়, ইহাই আবার, পুরুষের সংসার সম্বন্ধ হেতু, যে দুঃখরূপ ক্ষত হয়, তাহা হইতে ত্রাণের কারণ হয়. ইহা—অর্থাৎ এই শরীর সর্ব্বদা দীপশিখাবৎ স্বয়ং ক্ষীণ হয়, ইহা সুখদুঃখাদি ফলোৎপাদনে ক্ষেত্রবৎ আচরণ করে, এই জন্য বিদ্বানেরা ইহাকে ক্ষেত্র বলেন (শঙ্করানন্দ)।

যাহা হউক, এই শরীরকে—অর্থাৎ প্রাকৃত তত্ত্ব হইতে সংহত দেহকে 'ক্ষেত্র' নামে অভিহিত করিবার নানা হেতু থাকিলেও, ইহার প্রধান হেতু এই যে, ইহা জীবত্বের উৎপত্তি ও বিকাশ স্থান। বৃক্ষবীজ যেমন ভূমিতে পতিত না হইলে—বৃক্ষে পরিণত হইতে পারে না, জীববীজও সেইরূপ প্রকৃতি গর্ভে উপ্ত না হইলে জীবত্বের বিকাশ হয় না। পরে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ভগবান্ বলিয়াছেন যে,—

'মম যোনি র্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥" (গীতা, ১৪।৩)

ভগবানের অংশ—আত্মা রূপ অংশ—জীবলোকে জীবভূত হয় (গীতা, ১৫।৭)। তাহাই জীববীজ। ভগবান্ সেই জীববীজ—মহদ্‌ যোনি বা প্রকৃতির গর্ভে নিষেক করেন। তাহা হইতেই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয়। অতএব প্রকৃতিই জীবযোনি, তাহা ক্ষেত্র। শঙ্করানন্দ বলিয়াছেন, প্রকৃতি এবং প্রাকৃত দৃশ্যজাত সমুদায়ই ক্ষেত্র। উপনিষদ্ হইতেও এই অর্থ পাওয়া যায়।

ক্ষেত্র সম্বন্ধে উপনিষদে আছে—

"যো যোনিং যোনিমাধিতিষ্ঠতি একো
বিশ্বানি রূপাণি যোনীশ্চ সর্ব্বাঃ।
* * *
একৈক জালং বহুধা বিকুর্ব্বন্
অস্মিন্ ক্ষেত্রে সংচরত্যেষ দেবঃ॥"
(ইতি শ্বেতাশ্বতর উপঃ, ৫।২-৩)।

সুতরাং ক্ষেত্র অর্থে যোনি বা উৎপত্তি স্থান। যাহা হউক, এস্থলে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন জীব-শরীরকে ক্ষেত্র বলা হইয়াছে। শরীরই আমাদের কর্ম্মও ভোগাদির উৎপত্তি ও বিকাশ-স্থান। ইহার সাহায্যেই আমরা পুণ্যাদি অর্জ্জন করিয়া দেবাদির পদ ভোগ করি, ও পরিণামে

মুক্তি লাভ করিতে পারি। এই শরীর আমাদের পাপপুণ্যাদি কর্ম্ম ও তাহার ফল সঞ্চয় স্থান বলিয়াও ক্ষেত্র বলা যায়। শ্রুতিতে অন্যত্র আছে—

"ক্ষেত্রং ক্ষেত্রং বৈ মায়ৈষা সম্পদ্যতে।" (নৃসিংহ পূর্ব্বতাপনীয় উপনিষদ, ৫।১)।

এই ক্ষেত্রের স্বরূপ পরে, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

অভিহিত—ক্ষেত্র তত্ত্বজ্ঞগণের দ্বারা অভিহিত (বলদেব)।

ক্ষেত্রজ্ঞ—এই শরীর রূপ ক্ষেত্রকে জিনি জানেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। পাদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত এই শরীরকে যিনি নিজ জ্ঞানের বিষয় করিয়াছেন, অর্থাৎ স্বাভাবিক কিংবা উপদেশ জনিত অনুভবের বিষয় করিয়া থাকেন, দেহ হইতে পৃথক্ ভাবে সেই দেহবেত্তাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে (শঙ্কর)। এই শরীর বা ক্ষেত্রকে 'আমি জানিতেছি' এইরূপ যিনি জানেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ (রামানুজ)। এই শরীর বা ক্ষেত্রকে যিনি 'আমি বা আমার' বলিয়া মনে করেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। ভূমিতে ক্ষেত্রপতি যেমন কৃষিকর্ম্ম দ্বারা তাহার ফল ভোগ করে, শরীর হইতে সেইরূপ ফল ভোগ যিনি করেন তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ (স্বামী, মধু)। এই শরীরকে, 'আমি দেব' 'আমি মনুষ্য' 'আমি স্থূল' 'আমি কৃশ' এই জ্ঞানে অজ্ঞানীরা কখন আপনা হইতে পৃথক মনে করিতে পারে না। যে জ্ঞানী অশনাদির ন্যায় শরীরকে আপনা হইতে ভিন্ন এবং আত্মার ভোগ মোক্ষ সাধন বলিয়া জানেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। যে শরীরাত্মবাদী সে ক্ষেত্রজ্ঞ নহে, তাহার ক্ষেত্র হইতে ভিন্ন ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান হয় নাই (বলদেব)। এই ক্ষেত্রকে যথার্থরূপে যিনি জানেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ (বল্লভ)। স্বাভাবিক 'আমি মানুষ' ইত্যাদি জ্ঞান ঔপদেশিক। দেহ দৃশ্য বলিয়া দ্রষ্টা আমি দেহ নহি, এই বিভাগ পূর্ব্বক, দেহকে আত্মা হইতে অতিরিক্তরূপে জ্ঞান পারমার্থিক (গিরি)। ক্ষেত্রকে আত্মা হইতে পৃথক্‌রূপে যিনি জানেন (কেশব)। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে।

প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতি গুণেশঃ।" (৬।১৬)—

অর্থাৎ ঈশ্বর প্রধান বা জগতের উপাদানভূত মূল প্রকৃতি ও ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবাত্মা, এ উভয়ের পতি, এবং গুণত্রয়ের নিয়ন্তা।

স্মৃতিতে আছে—

"ক্ষেত্রাণি হি শরীরাণি বীজঞ্চাপি শুভাশুভে।
তানি বেত্তি স যোগাত্মা ততঃ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে॥"

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেহ ও দেহীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে এবং দেহী যে দেহ হইতে ভিন্ন, এবং দেহের ধর্ম্ম দেহীতে নাই, তাহাও উক্ত হইয়াছে। দেহের অবস্থান্তর আছে, জন্ম জরা মৃত্যু আছে, দেহীর তাহা নাই। দেহী অবিনাশী, তাহা দ্বারা এই সমুদায় ব্যাপ্ত, দেহী অব্যয়, অপ্রমেয়, ষড়ভাব-বিকার-রহিত, অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ, অব্যক্ত. অচিন্ত্য, অবিকারী, অচ্ছেদ্য, অক্লেদ্য, অদাহ্য, অশোষ্য, সর্ব্বদেহে এই দেহী নিত্য, অবধ্য,—ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। এই দেহী ক্ষেত্রজ্ঞ, আর এ দেহ ক্ষেত্র, ইহা এই অধ্যায়ে এস্থলে উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেহীর স্বরূপ উক্ত হইয়াছে, দেহের স্বরূপ উক্ত হয় নাই। এই অধ্যায়ে সেই দেহী কে, এবং দেহের স্বরূপ কি, তাহা সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। এই দেহের তত্ত্ব যে সাংখ্যদর্শন অনুযায়ী, তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত হইয়াছে। দেহীর স্বরূপ পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে বলিয়া এস্থলে আর পুনরুক্ত হয় নাই। তবে দেহীর প্রকৃত তত্ত্ব যাহা,—দেহী যে ক্ষেত্রজ্ঞ এবং সর্ব্বদেহে ভগবান্ই যে ক্ষেত্রজ্ঞ, ইহাই কেবল এ স্থানে বিশেষ ভাবে বিবৃত হইয়াছে। সাংখ্য দর্শনের 'বহু' পুরুষবাদ প্রতিষ্ঠিত। সাংখ্যদর্শনে আছে.—

"জন্মাদি ব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম।" (১।১৪৭)।

কিন্তু গীতা অনুসারে, জীব ভূত বা প্রাণী—ক্ষরপুরুষ রূপে বা প্রতি দেহে ভিন্ন ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে ভগবানের অংশ-স্বরূপে বহু হইলেও, সর্ব্বক্ষেত্রে

পরমেশ্বর সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে, অন্তর্য্যামিরূপে, নিয়ন্তৃরূপে অবস্থিত। পুরুষ একই তত্ত্ব। অতএব প্রতি ক্ষেত্রে স্বক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষর পুরুষরূপে ভিন্ন হইলেও, পরমার্থতঃ যে সর্ব্বক্ষেত্রের পরম ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ একই, তিনিই যে অবিভক্ত হইয়াও সংসার দশায় বিভক্তের ন্যায়, প্রতিক্ষেত্রে ভিন্ন ক্ষর পুরুষের ন্যায়—বা ভিন্ন ক্ষেত্রজ্ঞের ন্যায় ব্যবহারিক ভাবে প্রতীয়মান হন, তাহা এস্থলে উপদিষ্ট হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনের বহুপুরুষ-বাদের সহিত বেদান্ত দর্শনের দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের এইরূপে সামঞ্জস্য হইয়াছে। ইহা পরের শ্লোকের ব্যাখ্যায় প্রদর্শিত হইবে।

গীতা অনুসারে দেহাভিমানী জীবাত্মা—ক্ষর পুরুষ। কিন্তু পুরুষ স্বরূপতঃ অক্ষর, দেহাতিরিক্ত ('শরীরাদি-ব্যতিরিক্ত অসৌ পুমান্'—ইতি সাংখ্যদর্শন, ১।১৩৭) কেবল দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ জ্ঞানযুক্ত 'জ্ঞ'-স্বরূপ জ্ঞেয় ক্ষেত্রের জ্ঞাতা—দ্রষ্টা। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ—কূটস্থ অক্ষর পুরুষ। আর সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা, সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বশরীরস্থিত পরমেশ্বর সর্ব্বদেহের এক ক্ষেত্রজ্ঞ পরমপুরুষ। এ তত্ত্ব পরে (১৫।১৬-১৮ শ্লোকে) উল্লিখিত হইয়াছে। পুরুষের এই তিন ভাব না বুঝিলে পরবর্ত্তী শ্লোক বুঝা যাইবে না। সাংখ্য দর্শনে বহু বদ্ধ, সিদ্ধ ও মুক্ত পুরুষের কথা আছে। কিন্তু নিত্য পরম পুরুষের কথা—সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের কথা—সাংখ্যদর্শনে নাই। পাতঞ্জল-দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি যে সর্ব্বক্ষেত্রে একই ক্ষেত্রজ্ঞ, তাহা কোথাও উক্ত হয় নাই।

এই শ্লোকোক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেক ব্যাখ্যাকারের মতে ইনি দেহাভিমানী জীব—ক্ষর পুরুষ। কিন্তু বলদেব প্রভৃতির মতে যিনি ক্ষেত্রকে জানেন, অর্থাৎ ক্ষেত্রের বা দেহের স্বরূপ জানেন, এবং আপনাকে সেই ক্ষেত্র হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। তিনি অক্ষর পুরুষ। ইনি ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হইয়াও তাহার
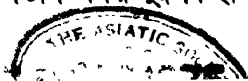
জ্ঞাতা মাত্র। দেহস্থ হইলেও কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বের অভিমান তাঁহার নাই। তিনি কর্ম্ম করেন না, কর্ম্মের ফল ভোগও করেন না। তিনি 'জ্ঞ'-স্বরূপ, দ্রষ্টা মাত্র।

কিন্তু সেই দ্রষ্টা পুরুষই সাংখ্যমতে জ্ঞান হেতু প্রকৃতিতে বদ্ধ হইয়া জীব ভাবাপন্ন হন, আপনাকে কর্ত্তা ভোক্তা শরীরী মনে করেন। সাংখ্য-মতে যে পুরুষ স্বরূপতঃ মুক্তশুদ্ধবুদ্ধস্বভাব, তিনিই অজ্ঞানবশে আপনাকে বদ্ধ পাপবিদ্ধ ও অজ্ঞানী মনে করেন। অতএব সাংখ্যমতে (বদ্ধ) ক্ষর পুরুষই স্বরূপতঃঅক্ষর পুরুষ। গীতায় দেহাভিমানী পুরুষকে 'দেহী' এবং দেহাভিমানশূন্য পুরুষকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করিলেও, দেহাভিমানী জীবও, দেহকে আমার বলিয়া অভিমান থাকায় যে আংশিকভাবে ক্ষেত্রজ্ঞ—ইহা বলিতেই হইবে।

এস্থলে উক্ত হইয়াছে যে, যিনি এই ক্ষেত্রের বেত্তা তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ; ক্ষেত্রবিৎই ক্ষেত্রজ্ঞ। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বিদ্ ধাতুর সাধারণ অর্থ জানা। কিন্তু ইহার বিশেষ অর্থ আছে। বিদ্ ধাতুর অর্থ অনুভব করা। বেদন, বেদনা—বিদ্ ধাতু হইতে এই অর্থে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই অর্থে যিনি শরীরযুক্ত বা শরীরবিশিষ্ট হইয়া, আপনাকে দেহী বা শরীরিরূপে অনুভব করেন, সেই ক্ষেত্রবেত্তাই এই ক্ষেত্রজ্ঞ। তিনি অবিদ্যাবশে আপনার সহিত ক্ষেত্রের তাদাত্ম্য বোধ করিতে পারেন। তিনি দেহাত্ম-জ্ঞানী হইতে পারেন, অথবা জ্ঞান লাভে আপনাকে শরীর বা ক্ষেত্র হইতে অতিরিক্ত তত্ত্বরূপে ধারণা করিতে পারেন। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন যে, তিনি যে অবস্থায়ই থাকুন, তিনি ক্ষেত্রের বেত্তা—এবং এজন্য ক্ষেত্রজ্ঞ। অতএব যিনি জ্ঞানলাভ করিয়া আপনাকে ক্ষেত্র হইতে পৃথক্‌রূপে জানিয়াছেন, তিনিই যে কেবল ক্ষেত্রজ্ঞ তাহা বলা যায় না। সাধারণ অর্থে দেহরূপ পুরে অবস্থিত পুরুষমাত্রেই ক্ষেত্রজ্ঞ। দেহ-বদ্ধ পুরুষ ও দেহাভিমান-মুক্ত পুরুষ উভয়েই ক্ষেত্রজ্ঞ।

ইংরাজী দর্শনের ভাষায় যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, তিনি Subject বা জ্ঞাতা 'অহম্'। আর তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুভূত বিষয় বা ইদম্ (Immediate object of perception) তাঁহার শরীর। এই শরীরকে অবলম্বন করিয়াই তাহার বেত্তারূপে ক্ষেত্রজ্ঞ আপনাকে 'অহং' ভাবে জানিতে পারেন। শরীররূপ পুরে অবস্থিত বলিয়া তিনি পুরুষ। সাংখ্যদর্শন অনুসারে এই দেহের বেত্তা ক্ষেত্রজ্ঞই যে পুরুষ, তাহা উক্ত হইয়াছে।

সে তত্ত্ব জ্ঞানীরা—(তদ্‌বিদঃ) ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞবিৎ পণ্ডিতগণ, যাঁহারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞকে পৃথক্‌ভাবে জানেন (শঙ্কর)। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিবেকজ্ঞানী (স্বামী)। ইঁহারা প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞান-সম্পন্ন সাংখ্য পণ্ডিত।

সাংখ্য দর্শন অনুসারে প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞান হইতেই মুক্তি হয়। সে জ্ঞান সহজে তত্ত্বতঃ লাভ করা যায় না। তাহা বিশেষ সাধনাসাধ্য। অতএব ইহা বলা যাইতে পারে যে, এই শ্লোকে সংক্ষেপে সাংখ্য জ্ঞান উক্ত হইয়াছে।

কেশবাচার্য্য বলিয়াছেন,—প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞান দর্শনার্থ এই ত্রয়োদশ অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বে ভগবান্ (৭ম অধ্যায় ৪।৫ শ্লোকে) আপনার পরা ও অপরা এই দুই প্রকার শক্তিরূপা প্রকৃতির কথা বলিয়াছেন। সেই অপরা প্রকৃতিই শরীর, আর পরা প্রকৃতি আত্মা বা জীবাত্মা, তাহাই ক্ষেত্রজ্ঞ। বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ ক্ষেত্রজ্ঞকে পরা প্রকৃতি বলেন। এ অর্থ সঙ্গত নহে। ক্ষেত্রজ্ঞ—পুরুষ সর্ব্বাবস্থায় পুরুষ। সর্ব্বাবস্থায় পুরুষ সর্ব্বরূপ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। এ তত্ত্ব যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম ॥ ২

আরও তুমি হে ভারত! সকল ক্ষেত্রেতে
ক্ষেত্রজ্ঞ আমাকে জান। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের
জ্ঞান যাহা তাই জ্ঞান,—আমার এ মত ॥ ২

(২) সকল ক্ষেত্রেতে ক্ষেত্রজ্ঞ আমাকে জান—পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান যথেষ্ট নহে। যে ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা যে আমি অর্থাৎ অসংসারী পরমেশ্বর, তাহাও তুমি জান। যাহা ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত অনেক শরীরে নানা উপাধি দ্বারা বিভক্ত বলিয়া প্রতীয়মান, তাহা বাস্তবক সকল প্রকার উপাধির সহিত অসংস্পৃষ্ট; সুতরাং উপাধিকৃত ভেদ-বিরহিত। এবং সৎ বা অসৎ এরূপ কোন শব্দজনিত প্রতীতির অবিষয় (শঙ্কর)। দেব-মনুষ্যাদি সর্ব্বক্ষেত্রে একাস্ত বেদিতা ক্ষেত্রজ্ঞ যে মদাত্মক বা আমার স্বরূপ, ইহা জানিও। মূল শ্লোকে 'অপিচ' (আরও) এই শব্দ আছে অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ যে আমি—ইহাও জানিও। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ—এক বিশেষণ স্বভাব। তাহা সমানাধিকরণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট। এজন্য উভয়ে পৃথক নহে। আর ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ আমারই বিশেষণ, আমারই সামান্য অধিকরণ রূপে নির্দ্দিষ্ট। ক্ষেত্রজ্ঞ—বদ্ধ ও মুক্ত। বদ্ধাবস্থায় 'ক্ষর'-শব্দ-নির্দ্দিষ্ট এবং 'অক্ষর' শব্দ দ্বারা মুক্তাবস্থা নির্দ্দিষ্ট। এই উভয় ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে ভিন্ন পরব্রহ্ম বাসুদেব—উত্তম পুরুষ। উভয় ক্ষেত্রজ্ঞই ভগবদাত্মস্বভাব (রামানুজ)। পূর্ব্ব শ্লোকে সংসারী ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ উক্ত হইয়াছে। তাঁহার পারমার্থিক অসংসারী স্বরূপ কি, তাহা এ শ্লোকে উক্ত হইল। সংসারী জীব বস্তুতঃ পারমার্থিক অসংসারি-স্বরূপ সর্ব্বক্ষেত্রানুগত আমিই—ইহা তুমি জান। 'তত্ত্বমসি' এই শ্রুত্যুপলক্ষিত চিদংশে জীব আমারই রূপ। আদরার্থে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, (স্বামী)। এস্থলে দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে বিলক্ষণ স্বপ্রকাশ ক্ষেত্রজ্ঞের পারমার্থিক তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে।

এস্থলে ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের সহিত অসংসারী পরমাত্মার ঐক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। সর্ব্বক্ষেত্রে যে এক ক্ষেত্রজ্ঞ স্বপ্রকাশ চৈতন্য স্বরূপ নিত্য বিভু, তাহাতে অবিদ্যারোপিত কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি সংসারধর্ম্ম সমুদায় মিথ্যা। সেই অবিদ্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকেই সেই অসংসারী অদ্বিতীয় আনন্দস্বরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জান। ক্ষেত্র মায়া-কল্পিত—মিথ্যা, ক্ষেত্রজ্ঞই পরমার্থ সত্য (মধু)। জীবাত্মা যে ক্ষেত্রজ্ঞ, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। পরমাত্মাও যে ক্ষেত্রজ্ঞ এস্থলে তাহা উক্ত হইল। জীব স্বীয় স্বীয় শরীর বা ক্ষেত্রকে নিজ নিজ ভোগ ও মোক্ষ সাধন বলিয়া জানে; এজন্য তাহারা ক্ষেত্রজ্ঞ। আর আমি সর্ব্বেশ্বর, একাই সেই সকলকে জানিয়া তাহাদিগকে নিয়মিত করি, ভরণ করি। রাজা যেমন সকল প্রজার ক্ষেত্র জানেন, সেইরূপ সর্ব্বেশ্বর সকল ক্ষেত্র জানেন। তাই তিনিও ক্ষেত্রজ্ঞ (বলদেব)। আমাকে অর্থাৎ আমারই অংশকে সর্ব্বক্ষেত্রে রসানুভব জন্য আমার স্বরূপে স্থিত বলিয়া জানিও (বল্লভ)।

পূর্ব্ব শ্লোকে পরস্পর সংসৃষ্ট শরীর ও আত্মা বা প্রকৃতি ও পুরুষ অর্থাৎ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞবিবেক প্রদর্শিত হইয়াছে। এ স্থলে তাহাদের সহিত ভগবানের যে সম্বন্ধ, তাহা উক্ত হইতেছে। পূর্ব্বে সাধারণ ভাবে ভগবানের সহিত সমুদায় জগতের সম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ, বিভাগপূর্ব্বক তাহার সহিত ভগবানের সম্বন্ধ উক্ত হয় নাই। পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে ঈশ্বরের সহিত জগতের ভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে। তিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত, অথচ অবস্থিত নহেন ইত্যাদি বাক্য তাহার প্রমাণ। পূর্ব্বে উপাস্য উপাসক-ভেদও উক্ত হইয়াছে। অতএব পরা প্রকৃতিভূত জীব বা পুরুষ ইত্যাদি শব্দদ্বারা অভিধেয় ক্ষেত্রজ্ঞ উপাসক, আর পরমেশ্বর তাহার উপাস্য,—এই ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। এস্থলে আবার সেই ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের সহিত ঈশ্বরের অভেদ বা তাদাত্ম্য প্রতিপাদিত হইতেছে। এইজন্য ভগবান্ বলিতেছেন সর্ব্বক্ষেত্রে

বা দেব-মনুষ্যাদি সর্ব্বশরীরে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞরূপে জান,—মদাত্মকত্ব হেতু আমা হইতে অভিন্নরূপে জান। এই শ্লোকে 'চ' শব্দ দ্বারা এই ভেদবাদ ও অভেদবাদ সমন্বিত হইয়াছে (কেশব)।

ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষেত্রে বা শরীরে যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ—অর্থাৎ সেই সেই ক্ষেত্র, তাহার ধর্ম্ম, তাহার কর্ম্ম ও তাহার অবস্থা প্রভৃতির যিনি জ্ঞাতা, তিনি একও পরিপূর্ণ হইয়াও যেমন ঘটাদির দ্বারা আকাশ ভিন্ন হয়, সেইরূপ স্বয়ং অবিদ্যা দ্বারা আত্মাতে কল্পিত সেই সেই রূপাদি দ্বারা এবং সুখ দুঃখাদি প্রত্যয় দ্বারা বিভক্তের ন্যায় হন ; প্রতি শরীরে 'আমি' রূপ অহং প্রত্যয়ের বিষয়রূপে স্থিত হন, সর্ব্ব প্রত্যয়সমষ্টি প্রত্যগাত্মরূপে সর্ব্বক্ষেত্রের দ্বারা সম্যগ্ বিভক্তবৎ হইয়াও তত্তৎ উপাধি ধর্ম্ম ও কর্ম্মাদি দ্বারা অস্পৃষ্ট থাকেন,—সেই সেই শব্দ প্রত্যয়ের অগোচর থাকেন। তিনি নিরাকার নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, কূটস্থ, অসঙ্গ, চিৎরূপ আত্মা। আমাকে সেই সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা-রূপে জানিও। আমিই সেই সর্ব্বশ্রুতি-প্রসিদ্ধ সত্য-জ্ঞানাদি লক্ষণ। নির্ব্বিশেষ পরম ব্রহ্ম। সর্ব্ব-ক্ষেত্রে 'অহং' প্রত্যয়রূপে স্থিত আত্মাই ব্রহ্ম (শঙ্করানন্দ)।

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান···তাই জ্ঞান—যেহেতু ঈশ্বরই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপ ও এই দুইয়ের যথার্থ স্বরূপ ব্যতিরেকে অন্য কোন জ্ঞানের বিষয় নাই, সেই হেতু এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান, অর্থাৎ যে জ্ঞানে এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারা যায়, সেই জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান (শঙ্কর)। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বৈলক্ষণ্য জ্ঞানই মোক্ষহেতু বলিয়া যথার্থ জ্ঞান। যে জ্ঞান মোক্ষের হেতু, তাহাই বিদ্যা বা প্রকৃত জ্ঞান। শাস্ত্রে আছে, "তৎ কর্ম্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা চ মুক্তয়ে।" (স্বামী)।

এই ক্ষেত্র মায়াকল্পিত—মিথ্যা, এবং ক্ষেত্রজ্ঞই পরমার্থ সত্য—এইরূপ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই অবিদ্যাবিরোধী প্রকাশরূপ, মোক্ষহেতু। তাহাই যথার্থ জ্ঞান। অন্য জ্ঞান—অজ্ঞান (মধু)। ক্ষেত্রের সহিত উভয়

ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই উভয়ের জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান (বলদেব)। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ লীলার্থ আমারই অংশ এই জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান। ইহার বিপরীত যে জ্ঞান, অর্থাৎ দেহাদি কর্ম্মাদি জন্য জ্ঞান আর এইরূপ জ্ঞানবান্ জীবের যে ক্ষেত্রজ্ঞত্ব জ্ঞান, তাহা মিথ্যা জ্ঞান (বল্লভ)। এই প্রকার যে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান তাহাই যথার্থ জ্ঞান, ইহা সর্ব্বজ্ঞ বেদান্তকৃৎ বেদবিৎ সর্ব্বেশ্বর আমার সম্মত (কেশব)।

এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান কি আর ক্ষেত্রজ্ঞ কাহাকে বলে, তাহা এস্থলে বিশেষ ভাবে আমাদের বুঝিতে হইবে। এই জ্ঞানই গীতার মূল সূত্র। ইহা না বুঝিলে গীতার্থ বুঝা যায় না। ব্যাখ্যাকারগণ ইহা বিশেষভাবে—বিভিন্নরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এই সকল বিভিন্ন-ব্যাখ্যা হইতে বুঝা যায় যে,যাঁহারা জীবব্রহ্মে একত্ব-বাদী,তাঁহারা তদনুসারে জীবকে ও ঈশ্বরকে অভেদভাবে ক্ষেত্রজ্ঞ বলেন। যাঁহারা ভেদাভেদ-বাদী, তাঁহারা ক্ষেত্রজ্ঞ জীব ও ঈশ্বরে ভেদ ও অভেদ সিদ্ধান্ত করেন। আর যাঁহারা ভেদ-বাদী ও বহুজীব-বাদী, তাঁহারা পরমেশ্বরকে অন্তর্য্যামী নিয়ন্ত বলিয়া তাঁহাকে সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ বলেন। তাঁহাদের মতে সকল দেহের জ্ঞাতৃত্ব ও নিয়ন্তৃত্ব এক পরমাত্মাতেই সম্ভবে; এজন্য তিনি সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ। জীব কেবল নিজ শরীর সম্বন্ধে ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে পারে। জীবজ্ঞান পরিচ্ছিন্ন। এজন্য জীব সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ নহেন। জীব ভোক্তা প্রকৃত জ্ঞাতা নহে। পরমেশ্বরই জ্ঞাতার জ্ঞাতা, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বদ্রষ্টা এবং সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞ।

শ্রুতি প্রমাণ হইতে আমরা প্রতিক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মা ও সর্ব্ব-ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মা পরমেশ্বরতত্ত্ব জানিতে পারি।

শ্রুতিঅনুসারে দুই পুরুষ শরীরে বাস করেন। একজন দ্রষ্টা আর একজন ভোক্তা। যিনি দ্রষ্টা তিনি ঈশ্বর—আর যিনি ভোক্তা—তিনি ক্ষরপুরুষ—জীবাত্মা। যখন ভোক্তা দ্রষ্টাকে দেখিতে পায়, তখন তাহার

মুক্তি হয়। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তের একবিংশ ঋকে ও মুণ্ডক উপনিষদের ৩।১।১ মন্ত্রে আছে,—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যং পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি
অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥"

মুণ্ডক উপনিষদে (৩।১।২ মন্ত্রে) আছে,—

"সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো
হনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ-
মস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥"

দেহস্থিত এই দুই জন মধ্যে একজন ক্ষর পুরুষ, জীব। আর একজন উত্তম পুরুষ, ঈশ্বর। ইহাই গীতা ও উপনিষদের সিদ্ধান্ত, এতদনুসারে প্রথম শ্লোকোক্ত 'ক্ষেত্রজ্ঞ'—জীব। আর এই শ্লোকোক্ত 'ক্ষেত্রজ্ঞ'—ঈশ্বর। শ্রুতি অনুসারে দেহ মধ্যে স্থিত দুই তত্ত্ব,—ভোক্তা (জীব) ও দ্রষ্টা (ঈশ্বর)। এই দেহস্থ দ্রষ্টা ক্ষেত্রজ্ঞই নিয়ন্তা, অন্তর্য্যামী পরম পুরুষ পরমেশ্বর। শ্রুতি অনুসারে তিনিই প্রেরয়িতা।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে,—

"ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ
ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ॥" (১।১০)

"ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরয়িতারঞ্চ মত্বা
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ॥" (১।১২)

গীতাতেও উক্ত হইয়াছে—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ (১৮।১৬)

এই রূপে শ্রুতি ও গীতা হইতে এই দুইরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব জানিতে পারা যায়। এই দুই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ। জীব ও ঈশ্বর সংসার-দশায় ভিন্ন হইলেও পরমার্থতঃ ভিন্ন নহে। জীব পরমেশ্বরের অংশ হইলেও এবং সংসার-দশায় এই অংশ-অংশী ভেদ থাকিলেও স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই।

গীতা হইতে আমরা এই অর্থে অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈত-বাদের, অথবা অভেদবাদ ভেদাভেদবাদ ও ভেদবাদের সামঞ্জস্য দেখিতে পাই এবং শ্রুতি প্রমাণ সমন্বয় পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেও আমরা এই তত্ত্ব জানিতে পারি। সে যাহা হউক, বিভিন্নবাদিগণ এই দুই শ্লোক অবলম্বন করিয়া যেরূপে স্ব স্ব মত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা আমাদের এস্থলে বুঝিতে হইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মতে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং বলদেব প্রভৃতি দ্বৈতবাদী বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ প্রায়শঃ রামানুজকে অনুসরণ করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ প্রভৃতি যাহা বলিয়াছেন, তাহা এস্থলে সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

শঙ্করাচার্য্য বলেন—

"যদি সকল দেহেই এক ঈশ্বর বিদ্যমান, তিনি ভিন্ন অন্য কোন ভোক্তা নাই—ইহা সিদ্ধান্ত হয়, তবে ঈশ্বরই সংসারী জীব হইয়া পড়েন, অথবা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোন ভোক্তা না থাকায় সংসারের অভাব হয়। তাহা হইলে বন্ধমোক্ষ, এবং মোক্ষ-প্রতিপাদক শাস্ত্র ব্যর্থ হয় এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত বিরোধ হয়। কারণ সুখ দুঃখ ও তৎসাধন সংসার প্রত্যক্ষসিদ্ধ। আর জগতের বৈষম্য দেখিয়া, যে এই বিচিত্র সংসারের কারণ ধর্ম্মাধর্ম্ম, এইরূপ অনুমান হয়, তাহাও ব্যুৎপন্ন হয় না। জীবাত্মা ও ঈশ্বর একই বস্তু হইলে এ সকল উপপন্ন হয় না।

"এ আপত্তি হইতে পারে না। জ্ঞান ও অজ্ঞান এবং তাহাদের ফলের

প্রভেদ স্বীকার করিলে ইহা উপপন্ন হইতে পারে। শাস্ত্রে এই জ্ঞান ও অজ্ঞান বা বিদ্যা ও অবিদ্যা এবং ইহাদের ফল যে পরস্পর বিভিন্ন তাহা বিবৃত হইয়াছে। জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান সহিত তাহার কার্য্য বিনাশ করিবার উপদেশও শাস্ত্রে আছে। জ্ঞানে শ্রেয় (মোক্ষ) লাভ হয়, জ্ঞানে আত্মাকে জানিলে মরণ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, জ্ঞানে ভয় দূর হয়, ব্রহ্মকে জানিলে ব্রহ্মই হয়, আত্মবিৎ সর্ব্বস্বরূপ হয়, ইত্যাদি বহু শ্রুতি আছে। স্মৃতিতে ইহার বহু উপদেশ আছে। যুক্তি দ্বারাও ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

"যদি ইহাই সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে, যে জীব সে বাস্তবিক ঈশ্বর হইলেও, অবিদ্যা-কল্পিত যে সকল উপাধি, তাহাদেরই ভেদজন্য যেন সে সংসারী হইয়া থাকে। এই অবিদ্যাবশে আত্মাকে লোকে দেহাদিরূপে বুঝিয়া থাকে। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি প্রভৃতি অনাত্মবস্তুতে যে আত্মভাব আরোপিত হয়, আত্মা বলিয়া যে ভ্রম হয়, তাহা অবিদ্যার কার্য্য। জরা মৃত্যু, সুখ দুঃখ মোহ অবিদ্যার কার্য্য,—আত্মার ধর্ম্ম নহে। শরীর জ্ঞেয়, আত্মা জ্ঞাতা। জ্ঞেয়ের ধর্ম্ম 'জ্ঞাতা'য় এবং জ্ঞাতার ধর্ম্ম 'জ্ঞেয়ে' আরোপিত করা অবিদ্যার কার্য্য। জ্ঞানরূপ আত্মাতে কোন হেয় বা উপাদেয় কার্য্য থাকিতে পারে না। সুখদুঃখাদি অবিদ্যার কার্য্য, তাহা আত্মার ধর্ম্ম হইতে পারে না। দেহের কোন ধর্ম্ম আত্মার হইতে পারে না।

"সেইরূপ কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব এই দুই প্রকার সংসার—জ্ঞেয় বা জড় বস্তুরই ধর্ম্ম, তাহা আত্মার ধর্ম্ম নহে। অবিদ্যার দ্বারা এই ধর্ম্ম জ্ঞাতা আত্মাতে আরোপিত হয়। সুতরাং এই আরোপিত সংসার থাকায়, আত্মা কিছুতেই দূষিত হইতে পারে না। অজ্ঞ ব্যক্তি আকাশে ভূতলের মলিনতা আরোপ করিলে, তাহাতে আকাশ মলিন হয় না তাহা হইলে সকল দেহে সেই একমাত্র জ্ঞাতা ঈশ্বরেরও বাস্তবিক কোন প্রকার সংসারিত্ব থাকিতে পারে না। অবিদ্যা দ্বারা আরোপিত ধর্ম্মে কাহারও উপকার বা অপকার হয় না। স্থাণুতে (শুষ্ক বৃক্ষস্কন্ধে) অন্ধ

কারে ভ্রম বশতঃ পুরুষের ধর্ম্ম আরোপিত হইল, সে স্থাণু প্রকৃত সেই পুরুষ-ধর্ম্মযুক্ত হয় না।

"কেহ কেহ বলেন জন্ম মরণাদি দেহের ধর্ম্ম বটে, কিন্তু সুখ-দুঃখাদি যখন 'জ্ঞেয়', তখন তাহা 'জ্ঞাতা' আত্মার ধর্ম্ম। ইহা হইতে পারে না। সুখিত্ব দুঃখিত্ব যখন 'জ্ঞেয়', তখন তাহা জ্ঞেয় বস্তুরই ধর্ম্ম, জ্ঞাতা আত্মার ধর্ম্ম নহে। কেহ বলেন যে, যখন ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বরে অবিদ্যা রহিয়াছে, তখন সংসারিত্বও থাকিবে। তাহাও ঠিক নহে। কারণ অবিদ্যাও তামস—তাহা জড়ের ধর্ম্ম। উহা আত্মার আরোপিত ধর্ম্ম, বাস্তবিক ধর্ম্ম নহে। অবিদ্যা বাস্তবিক জ্ঞাতার ধর্ম্ম হইলে, এবং ঈশ্বরই ক্ষেত্রজ্ঞ হইলে, ঈশ্বরের সংসারিত্ব হইতে পারিত। তাহা নহে। বিপরীত জ্ঞানের কারণ—ইন্দ্রিয়ের দোষ। এই জ্ঞানের কারণ ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম। বিপরীত গ্রহণ, সংশয় ও অগ্রহণ, এই তিন প্রকার অবিদ্যাই কোন না কোন করণের (ইন্দ্রিয়ের) ধর্ম্ম। উহা জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞের ধর্ম্ম হইতে পারে না। সুখ দুঃখাদি যাহা কিছু জ্ঞেয়, তাহা জ্ঞাতা আত্মার ধর্ম্ম হইতে পারে না। যাহা জ্ঞেয় তাহা কখন আপনার দ্বারা জ্ঞেয় হইতে পারে না, তাহারা নিজের প্রকাশের জন্য আত্মব্যতিরিক্ত প্রকাশের অপেক্ষা করিয়া থাকে। জ্ঞাতা স্বপ্রকাশ, নিজের প্রকাশ জন্য অন্য কাহারও বা কিছুরই অপেক্ষা রাখে না। এজন্য কৈবল্যে ইন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধ দূর হইলে, আত্মাতে আর কোন প্রকার অবিদ্যা থাকে না,—সুখ দুঃখ থাকে না, কোন পদার্থের সহিত সংযোগ বা বিয়োগ ভাব থাকে না। এ সকল আত্মার ধর্ম্ম হইলে কখন বিনষ্ট হইতে পারিত না। * * * এই সকল যুক্তি দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের ঈশ্বর স্বভাব সর্ব্বদাই সিদ্ধ হইতেছে।

"এখন আপত্তি হইতে পারে যে, যদি বাস্তবিক সংসার ও সংসারী জীব কেহ না থাকে, তবে বন্ধ মোক্ষের ব্যবস্থাপক শাস্ত্র সকলই নিরর্থক। ইহার উত্তর এই যে, যাঁহারা আত্মার অমরত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন,

তাঁহারাই শাস্ত্রের এই নিরর্থকত্ব দোষ মানিয়াছেন। ইঁহাদের মতে মুক্ত আত্মার সম্বন্ধে সংসার ও সংসার-ব্যবহার নিরর্থক। সেইরূপ যাঁহারা জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ঐক্য স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতেও বিধি নিষেধ শাস্ত্র নিরর্থক। দ্বৈতবাদীদের মতে শাস্ত্র বদ্ধাবস্থায় সার্থক, মুক্তাবস্থায় নিরর্থক। কারণ, তাঁহাদের মতে আত্মায় মুক্ত ও বদ্ধাবস্থা—এই দুইটি যথার্থতত্ত্ব। কিন্তু আত্মার বদ্ধ ও মুক্ত এই দুই পরস্পর বিরোধী ভাব যুগপৎ বা পরম্পপাক্রমে কিছুতেই হইতে পারে না। বদ্ধ ভাব পারমার্থিক মিথ্যা বলিলে, পরমার্থতঃ অদ্বৈতবাদ আসিয়া পড়ে এবং বন্ধমোক্ষাদি শাস্ত্রও, নিরর্থক হয়।

আরও এক কথা। যদি আত্মার এই বদ্ধ ও মুক্ত এই দুই অবস্থা স্বীকার করিতে হয়; তবে তাহাদের কোন্‌টি আদি? যদি বদ্ধাবস্থাকে পূর্ব্বসিদ্ধ বা অনাদি, এবং মুক্ত হইলে তাহার অন্ত হয় বলা যায়—তবে যাহা অনাদি তাহার অন্ত আছে—এরূপ কল্পনা করিতে হয়। সেইরূপ যে মুক্তাবস্থা এইরূপে লাভ হয় তাহা ও আদিমত্তী অথচ অন্তহীন এইরূপ কল্পনা করিতে হয়। এ প্রকার কল্পনা প্রমাণ-বিরুদ্ধ। এই দোষ পরিহারার্থ যদি বলা যায় যে বন্ধমোক্ষাবস্থা পারমার্থিক নহে, তবে দ্বৈতবাদীর মতেও বন্ধমোক্ষাদি শাস্ত্রের অনর্থকত্ব অপরিহার্য্য হয়।

"যাহা হউক, শাস্ত্র একেবারে নিরর্থক নহে। যাহারা অনাত্মজ্ঞ, তাহাদের পক্ষে শাস্ত্র সার্থক। কারণ তাহাদের অবিদ্যা বশে, কার্য্য ও কারণে আত্মদৃষ্টি থাকে। তাহারা লৌকিক ও শাস্ত্রীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকে। বিদ্বানের পক্ষে কিন্তু শাস্ত্র নিরর্থক। কার্য্য ও কারণ সঙ্ঘাতে যাহার আত্মবোধ আছে, সেই বিধি নিষেধ শাস্ত্রের অধিকারী। এই সব সাধারণ লোকের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বোধ থাকে,—শাস্ত্রীয় ব্যবহার কালেও থাকে। শাস্ত্র অনুযায়ী প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কালেও আত্মা হইতে

দেহের পৃথকত্ব জ্ঞান সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত কার্য্য ও কারণে আত্মাভিমান সম্ভব হয়।

"আপত্তি হইতে পারে যে, বিদ্বান্ লোকই শাস্ত্রীয় ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়, ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হয়, অথচ তাহাদের দেহ হইতে আত্মার পার্থক্য বোধ থাকে। সুতরাং পৃথকত্ব বোধ হইলেই যে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হইতে পারে না, এ সিদ্ধান্ত প্রামাণিক নহে। এ আপত্তিও সঙ্গত নহে। কারণ, এ পৃথকত্ব জ্ঞানের পূর্ব্বেই কার্য্য ও কারণে আত্মাভিমান ও তাহার ফলে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সম্ভব। সে জ্ঞান হইলে ইহা সম্ভব হয় না।

"বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও প্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ করিলে, কালক্রমে চিত্তনিরুদ্ধ হইলে, কার্য্য ও কারণ হইতে আত্মার পৃথকত্ব জ্ঞান হয়। তাহার পূর্ব্বে হয় না। এজন্য অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে শাস্ত্র সার্থক। যাহারা কেবল স্থূলদেহাত্মবাদী,—। দেহান্তে আত্মার অস্তিত্ব মানে না, বিধি নিষেধ শাস্ত্র তাহাদের পক্ষে নিরর্থক। যাহাদের স্থূলদেহে আত্মদৃষ্টি নাই, অথচ পারলৌকিক আত্মসত্বায় বিশ্বাস আছে, অর্থাৎ যাহার সূক্ষ্ম পারলৌকিক দেহে আত্মদৃষ্টি আছে, সেই শাস্ত্রোক্ত বিধি নিষেধের অধিকারী। অন্য দিকে যাহার জীবেশ্বরে অভেদ জ্ঞান হইয়াছে, তাহার শাস্ত্রের বিধি নিষেধ নিরর্থক। (এস্থলে জড়বাদী ও ব্রহ্মবাদী অর্থাৎ জীবব্রহ্মে অভেদবাদী উভয়ের পক্ষেই শাস্ত্র নিরর্থক, ইহা উক্ত হইয়াছে)।

"যদি বলা যায় যে, যে বিবেকী, সে শাস্ত্র অনুসরণ না করিলে, তাহার দৃষ্টান্তে যে অবিবেকী সেও শাস্ত্র অনুসরণ করিবে না, যথেচ্ছা ব্যবহার করিবে। তাহা নহে। এই সকল অবিবেকী লোক রাগ-দ্বেষ-চালিত, প্রবৃত্তিবশে কর্ম্মে রত। ('স্বভাবস্তু' প্রবর্ত্ততে—ইতি গীতা)। কাহারও উপদেশ বা দৃষ্টান্তের ইহারা অনুবর্ত্তী হইতে পারেনা। আর এরূপ বিবেকীর সংখ্যাও অতি অল্প। কদাচিৎ কেহ বিবেকী হন। সুতরাং

সাধারণ লোক শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের অনুবর্ত্তী লোকেরই অনুসরণ করিতে পারে।

"ক্ষেত্রজ্ঞ নিজস্বরূপে সর্ব্বদা এক। সংসার অবিদ্যা-কার্য্য। সংসার ক্ষেত্রজ্ঞের সহিত সম্বদ্ধ হইতে পারে না,—মিথ্যাজ্ঞান পরমার্থ বস্তুকে দূষিত করিতে পারে না। যে বিদ্বান্ সে আত্মার অবিকারস্বভাব অনুভব করিয়া থাকে। কোন কার্য্যফলে তাহার আকাঙ্ক্ষা থাকে না, কোন কার্য্যে প্রবৃত্তি থাকে না। সুতরাং তাহার সকল প্রকার দেহ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া আপনিই উপরত হয়। ইহাই নিবৃত্তির অবস্থা।

"এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যেমন 'আমি এই' 'ইহা আমার' এই প্রকার ভ্রমে সংসারী জীব পতিত, পণ্ডিতগণও সেই ভ্রমে পতিত। এই ভ্রম কেন হয়? ইহার কারণ সেই সকল পণ্ডিত দেহাত্মদৃষ্টিযুক্ত। যদি তাহারা ক্ষেত্রজ্ঞকে অবিক্রিয় বলিয়া জানিত, তবে কখনই তাহাদের ভোগ ও ভোগ সাধন কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা থাকিত না।

"সুতরাং ক্ষেত্রজ্ঞ নিজ স্বরূপে সর্ব্বদা এক। তাঁহার সহিত অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য সংসারের সম্বন্ধ নাই। সেই ক্ষেত্রজ্ঞ এবং পরমাত্মা। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন, 'আমাকেই সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও।'

"অনেকে এস্থলে অর্থ করিতে পারেন যে, ক্ষেত্রজ্ঞই বাস্তবিক ঈশ্বর, ক্ষেত্র ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, এবং ক্ষেত্র সেই ঈশ্বরেরই জ্ঞানের বিষয়। আমি কিন্তু সুখী দুঃখী—সংসারবদ্ধ জীব। আমি আমার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ হইলেও, আমি সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর নহি। সংসাররূপ দুঃখের উপশম আমারই কর্ত্তব্য। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এ উভয়ের জ্ঞান ও ধ্যান দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার স্বরূপে অবস্থান করিব। এই প্রকার যে বুঝে বা বুঝায়, এবং এইরূপে যে বন্ধ ও মোক্ষ শাস্ত্রের সার্থকতা সিদ্ধান্ত করিতে চাহে, সে সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ হইলেও মূঢ়ের ন্যায় উপেক্ষণীয়।

"অতএব ঈশ্বর ক্ষেত্রজ্ঞ হইলে, তিনি সংসারী জীব হইয়া পড়েন—আর ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বরে সংসারের অভাব হইয়া পড়ে—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না। বিদ্যা ও অবিদ্যার বৈলক্ষণ্য স্বীকার করিলে, এ আপত্তি নিরস্ত হয়। অবিদ্যার দ্বারা যে দোষ পরিকল্পিত, তাহা দ্বারা বাস্তবিক বস্তু কিছুতেই দূষিত হয় না। মরীচিকার জলে মরুভূমি পঙ্কিল হয় না।

"সংসার ও সংসারী বস্তু—উভয়ই অবিদ্যাকল্পিত। তাহাদের বাস্তব সত্তা নাই। যদি বলা যায় যে, অবিদ্যা সম্বন্ধেই ক্ষেত্রজ্ঞের সংসারিত্ব এবং দুঃখিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম হয়,—তাহাও ঠিক নহে। কেন না, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, যাহা জ্ঞেয় বা জ্ঞানের বিষয়, তাহা ক্ষেত্রের ধর্ম্ম, ক্ষেত্রজ্ঞের ধর্ম্ম হইতে পারে না। আর যদি এই সকল ধর্ম্ম জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞের হইত, তবে তাহা কখন জ্ঞেয় হইতে পারিত না। যাহা কিছু 'জ্ঞেয়' তাহাই ক্ষেত্র। ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞাতা হইতে পারে, কখন 'জ্ঞেয়' হইতে পারে না। অবিদ্যা হেতু যদি দুঃখিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম ক্ষেত্রজ্ঞের হইত, তাহা হইলেও উহা জ্ঞেয় বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হইত না। যাহা কিছু জ্ঞেয়, তাহা ক্ষেত্র। যে জ্ঞাতা সে ক্ষেত্রজ্ঞ,—ইহাই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তবে অবিদ্যা বা তাহার কার্য্য বা অবিদ্যার ধর্ম্ম—যাহা কেবল জ্ঞেয়, তাহা ক্ষেত্রজ্ঞের হইতেই পারে না।

"প্রশ্ন হইতে পারে যে, তবে অবিদ্যা কাহার? এই প্রশ্ন নিরর্থক। জ্ঞাতার জ্ঞেয়ভূত অবিদ্যার সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ, কোন প্রকারে বুঝিবার যোগ্যতা নাই। অবিদ্যা কাহারও জ্ঞানের বিষয়রূপে অবশ্য প্রকাশিত হইবে। অবিদ্যা ও অবিদ্যার সহিত জ্ঞাতার সম্বন্ধ—ইহাদের গৃহীতাও—জ্ঞাতা, তাহাকে যে জ্ঞানে প্রকাশ করা যায়, সেই জ্ঞানেরও সম্ভাবনা থাকে। এরূপ কল্পনা ঠিক নহে। তাহাতে অনবস্থ দোষ হয়। যদি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর সহিত সম্বন্ধ জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা হইলে সেই

জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া, আর একজন জ্ঞাতা কল্পনা করিতে হয়। সেই জ্ঞাতার সহিত জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ—জ্ঞানের বিষয় হইলে, তাহার আশ্রয় বলিয়া আর একটি জ্ঞাতা কল্পনা করিতে হয়। এইরূপ ভাবে জ্ঞাতৃত্ব কল্পনার শেষ পাওয়া যায় না; সুতরাং অনবস্থ দোষ হয়। যদি অবিদ্যা কেবল জ্ঞেয়ই হয়, জ্ঞাতার সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকে, তবে জ্ঞাতা কেবল জ্ঞাতাই হইবে, জ্ঞেয় হইতে পারিবে না। সুতরাং অবিদ্যা ও তৎকার্য্য দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা কোন প্রকারে দূষিত হইতে পারে না।

"যদি বলা যায় যে, অবিদ্যা ক্ষেত্রের ধর্ম্ম, তাহা হইলে আত্মাকে দোষযুক্ত ক্ষেত্রের জ্ঞাতা বলিতে হয়। তাহাও বলা যায় না। আত্মা স্বয়ং বিজ্ঞান স্বরূপ, অবিকারী। ক্ষেত্র-বিজ্ঞাতারূপ ধর্ম্মও সেই বিজ্ঞানস্বভাব আত্মাতে আরোপিত মাত্র। বাস্তবিক আত্মা বিজ্ঞাতা নহে—উহা বিজ্ঞান স্বরূপ মাত্র। যেমন উষ্ণতা বহ্নির স্বভাব বলিয়া তাপ ক্রিয়া তাহাতে আরোপিত, সেইরূপ আত্মা বিজ্ঞানস্বভাব বলিয়া বিজ্ঞাতৃত্ব আত্মাতে আরোপিত।

"ভগবান্ও গীতাতে দেখাইয়াছেন যে, আত্মাতে ক্রিয়াকারক ও ফল-স্বরূপতার অভাব স্বতঃসিদ্ধ। অবিদ্যাবশে তাহা আত্মাতে আরোপিত হয়। "য এনং বেত্তি হন্তারং" "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ" "নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং" ইত্যাদি স্থলে ইহা দেখান হইয়াছে। যাহা হউক, আত্মাতে ক্রিয়া কারক ও ফল এই ত্রিবিধ উপাধির যদি ঐকান্তিক অভাব হইল, এবং এই সকল যদি অবিদ্যা নিবন্ধন আত্মাতে আরোপিত ইহা সিদ্ধান্ত হইল, তাহা হইলে, কর্ম্ম সকল অবিদ্বানেরই কর্ত্তব্য—হইয়া দাঁড়াইল, বিদ্বানের পক্ষে আর কোন প্রকার কর্ম্ম কর্ত্তব্য থাকিতেছে না। অজ্ঞানীরই কর্ম্মে অধিকার (গীতা ১৮।১১ শ্লোক) জ্ঞানের যোগ পরনিষ্ঠা, যাহাতে ব্রহ্মত্ব লাভ হয় তাহা নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি সে অবস্থায় কর্ম্ম থাকে না (গীতা ১৮।৫০ শ্লোক)।"

এক্ষণে রামানুজ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে। তিনি বলিয়াছেন,—

"ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) বদ্ধ ও মুক্ত। বদ্ধ জীব—ক্ষর পুরুষ আর মুক্ত জীব অক্ষর পুরুষ। পরব্রহ্ম বাসুদেব উত্তম পুরুষ। তিনি ক্ষর ও অক্ষর পুরুষের অতীত (গীতা ১৫।১৬-১৮)। পৃথিব্যাদি সংঘাতরূপ এ জগৎ ভগবানের শরীর, এজন্য তাহা ভগবদাত্মক—ভগবৎস্বভাব।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় ব্রাহ্মণে, সপ্তম অধ্যায়ে (৩-২৩ মন্ত্রে) আছে,—

"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীং অন্তরো যময়তি এষ ত আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ।"

"যঃ অপ্‌সু......অগ্নৌ...অন্তরীক্ষে...বায়ৌ...দিবি...আদিত্যে...দিক্ষু ...চন্দ্রতারকে...আকাশে...তমসি...তেজসি তিষ্ঠন্...এষ ত আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ।" ইতি অধিদৈবতম্।

"অথাধিভূতম্। যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুঃ, যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরং, যং সর্ব্বাণি ভূতানি অন্তরো যময়তি, এষ ত আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ।"

"অথ অধ্যাত্মম্। যঃ প্রাণে...বাচি...চক্ষুষি...শ্রোত্রে...মনসি...ত্বচি ...বিজ্ঞানে...রেতসি তিষ্ঠন্...এষ ত আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ॥"

"অদৃষ্টো দ্রষ্টা, অশ্রুতং শ্রোতা, অমতো মন্তা, অবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা, নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা, নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা, নান্যোঽতোঽস্তি মন্তা, নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতা এষ ত আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতোঽতোঽন্যদার্ত্তম্।"

"অতএব ভগবান্ অন্তর্য্যামী বলিয়া সর্ব্ব-ক্ষেত্রজ্ঞদিগের অবস্থান, তাঁহার সমান অধিকরণ রূপে ব্যপদিষ্ট হইয়াছে। তিনি সর্ব্বক্ষেত্রে সমুদায় ক্ষেত্রজ্ঞগণের ন্যায় ক্ষেত্রজ্ঞ, ইহা এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

গীতাতেও আছে—

"অহম্ আত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।" (১০।২০)

"ন তদস্তি বিনা যৎ স্যাৎ ময়া ভূতং চরাচরম্।" (১০।৩৯)।

বিষ্টভ্যাহং ইদং কৃৎস্নং একাংশেন স্থিতো জগৎ। (১০।৪২)

"অতএব জগতের অগ্রে, পশ্চাতে ও মধ্যে সর্ব্বত্র সমান ভাবে ভগবানের সমান অধিকরণে অধিষ্ঠান উপদিষ্ট হইয়াছে।

"এ স্থলে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিবেক বিষয় উক্ত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে উভয়েই ভগবানের স্বরূপ ভগবানাত্মক বিষয়, তাহা উক্ত হইয়াছে, এবং ইহাই যে উপাদেয় জ্ঞান—ইহা কথিত হইয়াছে।

"কেহ কেহ বলেন যে,'এ স্থলে 'ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি' এই উপদেশ দ্বারা সমান অধিকরণতা হেতু একত্বই উপদিষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বরই অজ্ঞান হেতু ক্ষেত্রজ্ঞের (জীবের) ন্যায় হন। এই অজ্ঞান-নিবৃত্তি জন্যই এই একত্বোপদেশ। ভগবানের এই উপদেশ দ্বারা, রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের ন্যায়, ক্ষেত্রজ্ঞত্ব-ভ্রমও নিরাস হয়।' ইঁহাদের প্রতি জিজ্ঞাস্য এই যে, এই উপদেষ্টা ভগবান্ পরমেশ্বর বাসুদেব কি আত্মযাথাত্ম্য সাক্ষাৎপূর্ব্বক অজ্ঞান নিবৃত্ত করিয়াছেন, কি করেন নাই? যদি তাঁহার অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া থাকে, তবে নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র-স্বরূপ আত্মাতে, অনাত্ম-স্বরূপের অধ্যাস অসম্ভব, এবং অর্জ্জুন প্রভৃতি ভেদ দর্শন, এবং তাহার প্রতি উপদেশ ব্যাপারও অসম্ভব। আর যদি তাঁহার আত্মসাক্ষাৎকার না হইয়া থাকে, ও অজ্ঞান নিবৃত্ত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে, নিজে অজ্ঞানী হওয়ায় তাঁহার আত্মা সম্বন্ধে উপদেশও সম্ভব হয় না। কেন না, জ্ঞানী তত্ত্বদর্শীই জ্ঞান উপদেশ দিবার অধিকারী (গীতা, ৪।৩৪)। অতএব ইঁহাদের যে মত, তাহা ভ্রান্ত তাহা অনাকুলিত শ্রুতি স্মৃতি ইতিহাস পুরাণ ও সদাচার-বিরোধী। ইহা স্ববাক্য-বিরোধী,—স্ববচন স্থাপনের বৃথা আয়াস মাত্র। ইহা অজ্ঞানীদের দ্বারা জগৎমোহনজল্প প্রবর্ত্তিত মাত্র। ইহা অগ্রাহ্য।

"অতএব প্রকৃত তত্ত্ব কি? স্বরূপতত্ত্বজ্ঞানিগণের মতে, মূলতত্ত্ব তিন :—(১) অচিৎ বস্তু সকল—ইহারা ভোগ্য, (২) চিৎবস্তু সকল—ইহারা ভোক্তা, আর (৩) পরব্রহ্ম (পরমেশ্বর)—ইনি প্রেরয়িতা মহেশ্বর। এ সম্বন্ধে বহু শ্রুতি আছে। যথা—

"যস্মান্ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ
তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ।" (শ্বেতাশ্বতর উপঃ, ৪।৯)।

"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ ॥" (শ্বেতঃ উপঃ,৪।১০)।

"ক্ষরঃ প্রধানং অমৃতাক্ষরং হরঃ
ক্ষরাত্মানাবীশতে দেবঃ একঃ।" (শ্বেতঃ উপঃ, ১।১০)

"স কারণং করণাধিপাধিপো
ন চাস্য কশ্চিৎ জনিতা ন চাধিপঃ।" (শ্বেতঃ উপঃ, ৬।৯)

"প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতির্গুণেশঃ
সংসার-মোক্ষঃ স্থিতিবন্ধ-হেতুঃ।" (শ্বেতঃ উপঃ, ৬।১৬)

"জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবেতোবীশানীশৌ।" (শ্বেতঃ উপঃ, ১।৯)

"নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।" (কঠঃ উপঃ, ৫.১৩)

"ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরয়িতারঞ্চ মত্বা
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ।" (শ্বেতঃ উপঃ, ১।১২)

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমান-বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদত্তি
অনশ্নন্নন্যোঽভিচকাশীতি ॥" (ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।২১)

"অজাং একাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাম্।

অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগাং অজোঽন্যঃ।" (শ্বেতঃ উপঃ, ৪।৭)

"সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো-
ঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশং
অস্য মহিমামিতি বীতশোকঃ।" (মুণ্ডক উপঃ, ৩.১২)

"গৌরনাদ্যন্তবতী সা জনিত্রী ভূতভাবিনী।" (চুলিকা, ৪।৩।৭)

গীতাতেও এই তত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে। যথা—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়ং ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥" (৭।৪-৫)।

"সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাস্তৌ বিসৃজাম্যহম্॥
প্রকৃতিং স্বাং অবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামং ইমং কৃৎস্নং অবশং প্রকৃতের্ব্বশাৎ॥" (৯।৭-৮)

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগৎ বিপরিবর্ত্ততে॥" (৯।১০)

"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।" (১৩।১৯)

"মম যোনির্ম্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥" (১৪।৩)

"এই শেষ শ্লোক হইতে জানা যায় যে, সমস্ত জগতের যোনিভূত মহৎ ব্রহ্মই ভগবানের প্রকৃতি। তাহা সূক্ষ্মভূত—অচিৎবস্তু। তাহাতেই ভগবান্ চেতনাখ্য গর্ভ সংযোগ করেন। ভগবানের সেই সঙ্কল্পকৃত চিদ-চিৎ-সংসর্গেই দেবাদি স্থাবরান্ত অচিৎমিশ্রিত সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয়।

শ্রুতিতেও অধিভূতাদি সূক্ষ্ম বস্তু সকল যে ব্রহ্ম, ইহাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদ্ এতদ্ব্রহ্ম নামরূপং অন্নং চ জায়তে॥"

(মুণ্ডক উপঃ, ১।১।৯)।

"অর্থাৎ যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিদ্, যাঁহার তপ জ্ঞানময়, তাঁহা হইতে সেই ব্রহ্ম (বা মহত্তত্ত্ব বা হিরণ্যগর্ভ) নামরূপ ও অন্ন উৎপন্ন হয়।

"অতএব ভোক্তা ও ভোগ্যরূপে সর্ব্বাবস্থায় অবস্থিত চিৎ ও অচিৎ বস্তু পরম পুরুষেরই শরীর, এবং তাহাদের নিয়ন্তাস্বরূপে তাহা হইতে অপৃথক্‌ভাবে পরমেশ্বর স্থিত। এ জন্য তিনি তাহাদের আত্মা। "যঃ পৃথিব্যাস্তিষ্ঠন্" ইত্যাদি (পূর্ব্বোদ্ধৃত) শ্রুতিতে ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বাবস্থায় অবস্থিত চিৎ ও অচিৎ বস্তু পরমেশ্বরেরই শরীর। এজন্য সেই শরীরযুক্ত পরম পুরুষ কার্য্যাবস্থা ও কারণাবস্থাযুক্ত জগৎরূপে অবস্থিত। ভগবান্‌ই কার্য্যাবস্থা ও কারণাবস্থাযুক্ত জগৎরূপ। শ্রুতিতেও ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। "সদেব...সত্ত্বেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ং... তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" (ছান্দোগ্য ৬।২।২-৩)। "সন্মূলং সোম্য ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠা এতদাত্ম্যং ইদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি..." (ছান্দোগ্য ৬।৮।৬...)। ইত্যাদি শ্রুতি ইহার প্রতিপাদক। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (১।২।৬) আছে,—

"স অকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি। স তপো অতপ্যত স তপস্তপ্‌ত্বা ইদং সর্ব্বং অসৃজত। যদিদং কিঞ্চ তৎ সৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ। 'তৎ' অনুপ্রবিশ্য সচ্চত্যচ্চ অভবৎ।..."

"চিৎ অচিৎ বস্তু হইতে পৃথক্ পরম পুরুষের স্বরূপ-বিবেক জন্যও এইরূপ অনেক শ্রুতি আছে। অতএব কার্য্যাবস্থা ও কারণাবস্থাযুক্ত স্থূল সূক্ষ্ম চিৎ অচিৎ ইহারা পরম পুরুষেরই শরীর। কার্য্য হইতে কারণ

ভিন্ন নহে। এজন্য কারণ-বিজ্ঞানের দ্বারাই সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয়। কার্য্য কারণাবস্থা সমান অধিকরণ-বিশিষ্ট। পরমাত্মা কারণাবস্থা-বাচক। অতএব স্থূল সূক্ষ্ম চিদচিৎ কার্য্যকারণ সকলই ব্রহ্ম।

"জগতের উপাদান-কারণ ব্রহ্ম। উপাদানরূপে সংসৃষ্ট থাকিলেও এবং চিদচিৎ বস্তুর উপাদান হইয়াও, চিদচিৎ বস্তু হইতে ব্রহ্মের স্বভাব পৃথক্ থাকে, সংমিশ্রিত হয় না। যেমন শুক্ল, নীল, পীতাদি বিভিন্ন বর্ণের সূত্র দ্বারা প্রস্তুত বস্ত্রে এই বিভিন্ন বর্ণের মিশ্রণ হয় না—পার্থক্য থাকে, সেইরূপ ব্রহ্ম কারণ অবস্থায় যেমন, কার্য্যাবস্থায়ও তেমনই সর্ব্বত্র পৃথক্ (অসঙ্কর) থাকেন। ব্রহ্ম চিদচিৎ বস্তু সকলের উপাদান হইলেও জগতের কার্য্যাবস্থায় ভোক্তৃত্ব, ভোগ্যত্ব ও নিয়ন্তৃত্ব পরস্পর পৃথক্ ও অসংসৃষ্ট (অসঙ্কর) থাকে। পরম পুরুষ কারণ ও কার্য্য, তিনি সমুদায় সর্ব্বাবস্থায় অবস্থিত চিৎ অচিৎ বস্তু সমুদায় তাঁহার শরীর। ইহাই পারমার্থিক তত্ত্ব। এই চিৎ (ভোক্তা), অচিৎ (ভোগ্য) ও পরমেশ্বর (প্রেরয়িতা)-পরস্পরের বিশেষ স্বভাবভেদ ও স্বরূপগত ভেদ আছে। অতএব পরব্রহ্ম কার্য্যমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও, তাঁহার স্বরূপের অন্যথা-ভাব হয় না, বিকৃতি হয় না। স্থূলাবস্থায় নামরূপে বিভক্ত চিৎ অচিৎ বস্তু আত্মস্বরূপে অবস্থান করে না। তাহা কার্য্যরূপেই উপপন্ন হয়। অবস্থান্তর-প্রাপ্তিতেই কার্য্যত্ব।

"তবে ব্রহ্ম নির্গুণ—ইহার অর্থ কি? পরব্রহ্মে হেয়গুণের সম্বন্ধ নাই। শ্রুতিতে আছে—

"এষ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরঃ বিশোকঃ বিমৃত্যুঃ বিজিঘৎসঃ অপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ।"— (ছান্দোগ্য উপঃ, ৮।১।৫)। অতএব শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, পরব্রহ্ম অনন্ত গুণের আকর। তাঁহাতে যে গুণের নিষেধ হইয়াছে, তাহা হেয়গুণের নিষেধ মাত্র।

"কাহারও মতে ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ। তিনি জ্ঞাতা নহেন। এ মত ঠিক্ নহে। ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, অনন্ত কল্যাণগুণের আকর। পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশ হেতু জ্ঞানস্বরূপ। অথচ তিনি সর্ব্বজ্ঞ—সর্ব্ববিদ্।

শ্রুতিতে আছে—

"পরাস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।" (শ্বেতাশ্বতর, ৬।৮)

"অরে বিজ্ঞাতারং কেন বিজানীয়াৎ।" (বৃহদারণ্যক ২।৪।১৪)

ইহা দ্বারা পরব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হয়। শ্রুতিতে যে "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম" (তৈত্তিরীয় উপঃ ২।১।১) ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্বারা জ্ঞানের ঐক্য নিরূপণার্থ তাঁহাকে জ্ঞানস্বরূপ বলা হইয়াছে মাত্র।

শ্রুতিতে আরও আছে যে—

"স অকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়।" (তৈত্তিরীয়, ২।৬।১)

"স ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়...।" (ছান্দোগ্য, ৬।২।৩)

"আত্মনি বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতং ভবতি...।"
(মুণ্ডক ১।১।১৯, বৃহদারণ্যক, ৪।৫।৬)।

"তস্য বা এতস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্
ঋগ্বেদঃ সামবেদঃ ..ইত্যাদি।" (বৃহদারণ্যক, ২।৪।১০)।

"ব্রহ্মই বস্তু সকল সংকল্প করিয়া, তাহা সৃষ্টি করিয়া, এবং তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ('তৎ সৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ'—ইতি শ্রুতিঃ) বিবিধরূপে স্থিত। চরাচররূপে তিনিই নানা প্রকারে অবস্থিত। এজন্য প্রত্যেক বস্তুই ব্রহ্মাত্মক। নানা বস্তু ভিন্ন ভাবে নানাত্ব দর্শন—সেই জন্য শ্রুতিতে প্রতিসিদ্ধ হইয়াছে। (বৃহদারণ্যক উপনিষদে ৪।৪।১৯) আছে,—

"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি। ন ইহ নানাস্তি কিঞ্চন। যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তৎ ইতর ইতরং পশ্যতি যত্র তু অস্য সর্ব্বম্ আত্মৈব অভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ...ইতি।"

"অতএব 'বহু স্যাং প্রজায়েয়' এই শ্রুতিসিদ্ধ ব্রহ্মের স্বয়ং কল্পকৃত নানা নামরূপের দ্বারা যে নানা প্রকারত্ব—তাহা নিষিদ্ধ হয় নাই। যখন সমুদায়ই আত্মা এই প্রতীতি হয়, তখন এই নানাত্ব দর্শন নিষিদ্ধ হইয়াছে মাত্র। অতএব যাঁহারা (যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা) ব্রহ্মের চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর —এই ত্রিবিধ স্বরূপ ভেদ অঙ্গীকার করেন, এবং কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতের সহিত শ্রুতির কোন বিরোধ নাই। শ্রুতি দ্বারাই এই মত স্থাপিত হয়। অন্য দিকে ব্রহ্মাজ্ঞানবাদ, উপাধিগত ব্রহ্মভেদবাদ যুক্তিযুক্ত নহে, এবং তাহা শ্রুতির বিরোধী। তাহার কোন ভিত্তি নাই।"

ইহাই রামানুজের সিদ্ধান্ত। দ্বৈতবাদী বলদেবও রামানুজকে অনুসরণ করিয়া, এবং রামানুজের উদ্ধৃত পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি-বচন অবলম্বন করিয়া অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি দ্বৈতবাদ বা ভেদবাদ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এজন্য তিনি ভেদবাদ-প্রতিপাদক শ্রুতি-স্মৃতিবাক্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন। এ স্থলে তাহার বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। তিনি বলেন—"প্রকৃতি ভোগ্য, জীব ভোক্তা, আর ঈশ্বর নিয়ন্তা। ইঁহাদের পরস্পর সম্বন্ধ থাকিলেও একের ধর্ম্ম অন্যের হইতে পারে না। পটে চিত্র-সম্বন্ধ থাকিলেও, যেমন পটের ধর্ম্ম চিত্রে, এবং চিত্রের ধর্ম্ম পটে সংক্রামিত হয় না, সেইরূপ জীব, প্রকৃতি ও ঈশ্বর ইঁহাদের কাহারও ধর্ম্ম অন্যে সংক্রামিত হয় না। যাহারা একাত্মবাদী, তাহাদের মতে—ভগবান্ যে 'সর্ব্বক্ষেত্রে আত্মাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও' বলিয়াছেন, তাহা সমান অধিকরণ-প্রতীতিমূলক। অবিদ্যা হেতুই পরমেশ্বরের ক্ষেত্রজ্ঞ-ভাব হয়। রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের ন্যায় ইহা ভ্রান্তি মাত্র। ইহা নিবৃত্তি জন্য ভগবান্ উপদেশ দিয়াছেন যে, 'আমাকে সর্ব্বদেহে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও, আমা ভিন্ন আর কেহ ক্ষেত্রজ্ঞ আছে, ইহা বুঝিও না।' কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে।"

কেশবাচার্য্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা ভেদাভেদ বাদ স্থাপন জন্য এ শ্লোকের যেরূপ অর্থ করিয়াছেন ও যে বিচার করিয়াছেন, তাহা এস্থলে সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল।—

"পূর্ব্ব শ্লোকে পরস্পর সংসৃষ্ট শরীরাত্মভূত প্রকৃতি-পুরুষের ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে বিবেক প্রদর্শিত হইয়াছে। এ শ্লোকে এ উভয়ের সহিত পরমেশ্বরের সম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে নবম অধ্যায়ে "একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সামান্যভাবে সর্ব্ব জগতের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ প্রকার উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ পূর্ব্বক তাহা উক্ত হয় নাই। ইদানীং সেই ক্ষেত্রজ্ঞের স্বতাদাত্ম্য কথিত হইতেছে।

"পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে,—

"অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।"

"ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।"

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।

মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি... ... ..."

"ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।"

ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সমুদায় জগতের ভগবান্ হইতে পৃথক ভাবে, স্থিতি ও প্রবৃত্তির অভাব হেতু, ভগবান্ হইতে অভিন্নত্ব উক্ত হইয়াছে। অন্যদিকে,—

"ন চাহং তেষবস্থিতঃ।"

"ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।"

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।"

ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সর্ব্ব জগতের ভগবান্ হইতে ভিন্নত্ব উক্ত হইয়াছে। সেই হেতু অর্জ্জুন বলিয়াছেন—

"সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ"

আরও পূর্ব্বাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—

"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে।
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ॥"

ইহা দ্বারাও পরাপ্রকৃতিভূত জীবপুরুষাদিশব্দাভিধেয় ক্ষেত্রজ্ঞের ধ্যাতৃত্ব উপাসকত্ব উদ্ধার্য্যত্ব দ্বারা প্রতীত কেবল ভিন্নত্ব উক্ত হইয়াছে। তাহা প্রতিষেধ জন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে, দেবমনুষ্যতির্য্যগাদি সর্ব্বক্ষেত্রে তাঁহাকেই ক্ষেত্রজ্ঞরূপে জানিতে হইবে। অর্থাৎ সেই সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বরাত্মকত্ব হেতু ভগবান্ হইতে অভিন্নরূপে জানিতে হইবে। এই শ্লোকে 'চ' শব্দ দ্বারা পরমাত্মা হইতে জীবাত্মার বৈলক্ষণ্যও সূচিত হইয়াছে। এইরূপে অভেদ ও ভেদ সমুচ্চয় হইয়াছে। "শ্রুতি হইতেও ইহা জানা যায়।

শ্রুতিতে আছে—

"এতদাত্মমিদং সর্ব্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।"
"অয়মাত্মা ব্রহ্ম, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"
"তজ্জলান্ ইতি।"
"অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোষি যদা আত্মানং বেদাহং ব্রহ্মাস্মি ইতি।"

ইত্যাদি বাক্য ভগবানের সর্ব্বাত্মকত্ব দ্বারা সর্ব্ব সামানাধিকরণ্য-বাচক। সেইরূপ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—

"সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুঃ
ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥
বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব॥

একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপং বহিশ্চ ॥”

!ত্যাদি বাক্য ভগবানের সর্ব্বরূপত্ব সত্ত্বেও সর্ব্ববৈলক্ষণ্য বোধক।

“এই অর্থে এস্থলে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞকে তাদাত্ম্যরূপে পরমেশ্বর হইতে নপৃথক্ ভাবে জানিতে হইবে। ইহাই জ্ঞান। ইহার অন্যথা জ্ঞান— নজ্ঞান। ইহাই সর্ব্বজ্ঞ বেদান্তকৃৎ বেদবিৎ সর্ব্বেশ্বরের অভিমত।

(এক্ষণে অভেদবাদ ও ভেদবাদের দোষ আলোচিত হইতেছে)। 'কেহ (অর্থাৎ অদ্বৈতবাদিগণ) এই শ্লোকের এই অর্থ করেন যে, সমানাধি- রণ নির্দ্দেশ দ্বারা এস্থলে পরমাত্মাই অবিদ্যা উপাধি বশে পরিচ্ছিন্ন ইয়া, যেন সংসারী ক্ষেত্রজ্ঞ হয়েন ও সেই অবিদ্যা উপাধি ত্যাগে শুদ্ধ সংসারী পরমাত্মা স্বরূপ লাভ করেন, ইহা বুঝিতে হইবে। তাই গবান্ বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর আমাকেই সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ পে জানিও।

'কিন্তু এ অর্থ অসৎ। এ অর্থ সর্ব্ব-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। ক্ষেত্রজ্ঞ সকলের হ্মস্বরূপে ঐক্য শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না।

“শ্রুতিতে আছে,—

“নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।”

“জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ।”

“দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি
অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥”

“প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতির্গুণেশঃ।”

“অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।”

'সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্য ঈশানঃ।"
"একো বশী সর্ব্বেশঃ কৃষ্ণ ইড্যঃ
অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্।"
"য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরো
যমাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরম্,
এষ তে আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ।"

ব্রহ্ম সূত্রে (বেদান্ত দর্শনে) আছে,—

"ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ।"
"ভেদব্যপদেশাচ্চ।"
"অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ।"
'কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশাচ্চ।'
'পত্যাদিশব্দেভ্যঃ।'
'অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ।'

"এইরূপ ইতিহাস ও পুরাণে ভেদবিষয়ক বাক্য আছে। যথা—

"ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিঃ সত্ত্বং তেজো বলং ধৃতিঃ।
বাসুদেবাত্মকান্যাহুঃ ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞ এব চ॥
"সসুরাসুরগন্ধর্ব্বং সযক্ষোরগরাক্ষসাম্।
জগদ্বশে বর্ত্ততেঽদঃ কৃষ্ণস্য সচরাচরম্॥
"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা চেতনাখ্যা তথাঽপরা।
অজ্ঞো জন্তুরনীশশ্চ স্বাত্মনঃ সুখদুঃখয়োঃ।
ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা শ্বভ্রমেব বা॥
"দাসভূতাঃ স্বতঃ সর্ব্বে হ্যাত্মনঃ পরমাত্মনঃ।
নান্যথা লক্ষণং তেষাং বন্ধে মোক্ষে চ বিদ্যতে।
তত্র যঃ পরমাত্মা তু স নিত্যো নির্গুণঃ স্মৃতঃ।
ন লিপ্যতে ফলৈশ্চাপি পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥

কর্ম্মাত্মাত্বপরো যোঽসৌ মোক্ষবন্ধৈঃ স যুজ্যতে।
স সপ্তদশকেনাপি রাশিনা যুজ্যতে পুনঃ॥
তবান্তরাত্মা মম চ যে চান্যে দেহিসংস্থিতাঃ।
সর্ব্বেষাং সাক্ষিভূতোঽসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ ক্বচিৎ॥"

"গীতাতেও আছে,—

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।"

এই সকল বাক্য অদ্বৈতবাদের বা অভেদবাদের বাধক। অতএব এই বাদে নাস্তিকত্ব দোষ দুর্ব্বার হইয়া পড়ে।

আর এই দোষ কেবল ভেদবাদিমতেও সমান। সেই মতেও অভেদ-প্রতিপাদক শাস্ত্র-বাক্যের বাধা হয়। অতএব ভেদবাদ বা অভেদবাদ, ইহাদের একবিধ বাদপ্রতিপাদক বাক্যের বাধ ব্যতীত কেবল ভেদবাদ বা কেবল অভেদবাদ সিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ কেবল ভেদবাদে অভেদ-প্রতিপাদক বাক্যের বাধ হয়, আর কেবল অভেদবাদে ভেদপ্রতি-পাদক বাক্যের বাধ বা বিরোধ হয়।

"বলিতে পারা যায় যে, 'আমি ঈশ্বর নহি' ইত্যাদি প্রতীতিসিদ্ধ প্রত্যক্ষ ভেদ বিষয়ে আকাঙ্ক্ষার বা বাক্যার্থ জ্ঞানের হেতুর অভাব না থাকায়, ভেদবাক্য সকলের বাধপ্রসঙ্গ হয় না। অন্যথা ব্রহ্মাভেদ-প্রতিপাদক সহস্র সহস্র বাক্যের বিরোধ হইত। কিন্তু তাহা বলা যায় না। জীবেশ্বর ভেদের প্রত্যক্ষত্ব অভাব হেতু ও ভেদপ্রত্যক্ষের প্রতিযোগী প্রত্যক্ষত্বের অধীনত্ব হেতু, তাহা বলা যায় না। জীব ও ঈশ্বরের অতীন্দ্রিয়ত্ব হেতু এই প্রত্যক্ষত্ব অসম্ভব। 'আমি ঈশ্বর নহি' ইত্যাদি প্রতীতিতেও 'শাস্ত্রোক্ত

সর্ব্বজ্ঞত্ব অচিন্ত্যশক্তিত্ব স্বতন্ত্রত্ব সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব জগৎ-জন্মাদিকারণত্ব প্রভৃতি ঈশ্বরত্ব-প্রয়োজক ধর্ম্ম সকলের আত্মাতে অসম্ভব হেতুও আত্মার অল্পজ্ঞত্ব অল্পশক্তিত্ব ঈশ্বরনিয়ম্যত্ব ও ঈশ্বরের অধীনত্ব জ্ঞান হইতে—উক্ত প্রতীতির যাথার্থ্য সিদ্ধ হয়। (অর্থাৎ 'আমি ঈশ্বর নহি' এই প্রতীতি শাস্ত্রজ্ঞানমূলক, ইহা প্রত্যক্ষগম্য নহে)।

"অবিদ্যাত্মক উপাধিপরিচ্ছেদের অপেক্ষায়, ঈশ্বরত্ব সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বশক্তিমত্ব ও ঈশিতব্যত্ব এবং অল্পশক্তিমত্ত্ব অল্পজ্ঞত্ব প্রভৃতি ব্যবহার, বিদ্যাদ্বারা সর্ব্ব উপাধিরূপ দূর হইলে, পরমার্থতঃ, উপপন্ন হয় না,—ইহাও বলা যায় না। পরমাত্মা ব্রহ্মের সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতভেদশূন্যত্ব, একত্ব, অসঙ্গত্ব, স্বয়ংপ্রকাশত্ব অভ্যুপগম্য। আবার তাঁহারই উপাধিবশ্যত্ব পরিচ্ছিন্নত্ব অজ্ঞত্ব অল্পজ্ঞত্ব ইত্যাদি কল্পনার অত্যন্ত বিরোধ হয়। 'আমার মাতা বন্ধ্যা'—এইরূপ বাদের ন্যায় তাহার ব্যাঘাত হয়। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-মণ্ডলে অন্ধকারবৎ, স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ আত্মাতে অবিদ্যার অবচ্ছেদ হয়, এরূপ বাদ উন্মত্তপ্রলাপ মাত্র।

'অপিচ, অবিদ্যাসম্বন্ধ সহেতুক না নির্হেতুক? তাহা সহেতুক হইতে পারে না, কারণ তাহা অপ্রসিদ্ধ। অবিদ্যা ও ব্রহ্ম হইতে অপর কোন তৃতীয় পদার্থ সে সম্বন্ধের কারণ হইতে পারে না। আর সে সম্বন্ধ অহেতুকও হইতে পারে না। অবিদ্যা যদি বিনা হেতুতে স্বয়ংই আত্মাতে সম্বদ্ধ হয় বলা যায়, তবে একেরই উপাধির বশ্যতায় তাহার নিবর্ত্তক চেতনান্তর না থাকায়, কথনও সে উপাধির নিবৃত্তি হইতে পারে না, মোক্ষও হইতে পারে না। যদি বলা যায় যে, স্বসামর্থ্যের দ্বারাই অবিদ্যা নিবারিত হয়, তাহা অন্য কারণের অপেক্ষা রাখে না,—তাহাও সঙ্গত হয় না। যদি এরূপ হইত, তবে স্বয়ং প্রকাশ স্বতন্ত্র সমর্থ (আত্মার) অবিদ্যা সম্বন্ধেরও যোগ্যতা থাকিত না।

"অপিচ, অবিদ্যার স্বরূপ ব্রহ্ম (বা আত্মা) জানেন কি না? যদি

জানেন, তবে তিনি সর্ব্বজ্ঞ স্বতন্ত্র হইয়াও কেন কুকুর শূকর তির্য্যক্ কীটাদি যোনি ও তজ্জন্য দুঃখহেতুভূত অবিদ্যাস্বরূপ জানিয়া, তাহাতে যুক্ত হইবেন? যদি তিনি না জানেন, তাহা হইলে অজ্ঞতা হেতু তাঁহার ব্রহ্মত্বের হানি হয়। অতএব সর্ব্বপ্রকারেই ব্রহ্মে অবিদ্যার যোগবাদ উপপন্ন হয় না। যদি বল যে, অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য মিথ্যাজ্ঞান মাত্র, তাহা পরমার্থ বস্তুকে দূষিত করিতে পারে না,—যেমন মরীচিকার জল মরুভূমিকে পঙ্কিল করিতে পারে না, সেইরূপ অবিদ্যাও ক্ষেত্রজ্ঞের কিছুই করিতে পারে না,—ইহাও সঙ্গত নহে। যদি অবিদ্যার দোষ-কারিত্বই না থাকে, তবে তাহা নিবৃত্তির জন্য উপায় সমুদায়ই ব্যর্থ হয়। আর বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থা এবং তদ্বিষয়ক শাস্ত্রও অনর্থক হয়। অতএব ব্রহ্মে অবিদ্যা সম্বন্ধবাদ গ্রাহ্য নহে। সেই অবিদ্যাকৃত জীবেশ্বর বিভাগ সিদ্ধান্ত পূর্ব্বক যে ভ্রান্ত পণ্ডিতগণ জগতের ব্যামোহ উৎপাদন করেন, তাঁহারা শ্রেয়ঃ প্রার্থীর দ্বারা উপেক্ষণীয়।

"সে যাহা হউক, সর্ব্ব-ব্রহ্ম অভেদ প্রতিপাদক (শাস্ত্র) বাক্য সকলের বিরোধও শঙ্কনীয় নহে। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ প্রকৃতি-পুরুষ ক্ষর-অক্ষর ইত্যাদি শব্দ দ্বারা অভিধেয় জড়-চেতনাত্মক সমুদায়ের ব্রহ্মাত্মকত্ব ব্রহ্মব্যাপ্যত্ব ব্রহ্মাধীনত্বাদি হেতু দ্বারা ও ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মত্ব সর্ব্বব্যাপকত্ব স্বতন্ত্রত্বাদি হেতু দ্বারা যে অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাতেই সেই সকল অভেদপ্রতি-পাদক বাক্যের সার্থকতা। নিম্নোক্ত শাস্ত্র বাক্য ইহার পোষক।—

"অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং…সর্ব্বাত্মা।"

"যচ্চ কিঞ্চিজ্জগত্যস্মিন্ দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎসর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ।"

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়-স্থিতঃ।"

"ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিঃ সত্ত্বং তেজোবলং ধৃতিঃ।
বাসুদেবাত্মকান্যাহুঃ ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞ এব চ॥"

"যোঽয়ং তবাগতো দেব! সমীপে দেবতাগণঃ ।
স ত্বমেব জগৎস্রষ্টা যতঃ সর্ব্বগতো ভবান্ ॥"
"সর্ব্বগত্বাদনন্তত্বাৎ স এবাহমবস্থিতঃ।"
"সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ।"
"সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্য ঈশানঃ আত্মা হি
পরমঃ স্বতন্ত্রঃ অধিগুণঃ জীবোঽল্পশক্তিরস্বতন্ত্রোঽবরঃ।"
"সত্বং স্বাতন্ত্র্যমুদ্দিষ্টং তচ্চ কৃষ্ণে ন চাপরে।
অস্বাতন্ত্র্যাৎ তদন্যেষাং সত্বং বিদ্ধি ভাবতঃ ॥
কিমনেন জগন্নাথ সর্ব্বং ত্বদ্বশগং জগৎ।"

"এইরূপ শ্রুতি স্মৃতি ইতিহাস পুরাণাদি বাক্য দ্বারা জানা যায় যে, যে বস্তুর স্থিতি ও প্রবৃত্তি যাহার আয়ত্ত, তাহার সহিত তাহার অভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রাণেন্দ্রিয় সংবাদে আছে,—

"ন বৈ বাচো ন চক্ষুংষি ন মন ইত্যাচক্ষতে প্রাণ ইত্যেব আচক্ষতে ইতি।"

"আরও ভেদ-ব্যপদেশ হেতু, এবং ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ ও পরমাত্মার স্বরূপ ও স্বভাবের বৈলক্ষণ্য প্রতিপাদন হেতু এইরূপ মুখ্যার্থই উপপন্ন হয়। "সর্ব্বং তং পরাদদয়োঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ নান্যতোঽস্তি দ্রষ্টা দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি", এই শ্রুতি দ্বারা যে ভেদের নিষেধ উপদিষ্ট হইয়াছে—যে পরমাত্মা হইতে অপর স্বতন্ত্রত্ব অবচ্ছিন্ন বস্তুর নিষেধ হইয়াছে, তাহা দ্বারাও এই অর্থই উপপন্ন হয়। এইরূপ অর্থে আর কোন বাক্যের বিরোধ থাকে না। অতএব ভেদবিষয়ক ও অভেদ বিষয়ক বাক্য সকলের যে পরস্পর বাধ্যবাধকতা (একের দ্বারা যে অপরের বাধ হয়), তাহা বলা যায় না। কেন না তাহা তুল্যবলযুক্ত (সমভাবেই প্রামাণ্য)।

"এই তাৎপর্য্য অবলম্বন করিয়াই ভগবান্ সূত্রকার (বেদান্ত সূত্রকার বাদরায়ণ) পরস্পর বিরুদ্ধার্থক ভেদবাক্য ও অভেদবাক্য সকলের

পরস্পর অবিরোধ দ্বারা সমন্বয় প্রকার প্রদর্শনার্থ ও ব্রহ্মের সহিত চেতন অচেতন সকলের ভেদাভেদ সম্বন্ধের নির্দ্দোষত্ব খ্যাপন জন্য তদ্‌যোজক সূত্র সকল প্রণয়ন করিয়াছেন। (অংশো নানাত্বব্যপদেশাৎ ইত্যাদি সূত্র দ্রষ্টব্য)। শ্রুতিতেও এইরূপ ঘটক বা যোজক বাক্য আছে। যথা—"একঃ সন্ বহুধা বিচচার, একো দেবো বহুধা বহূন্ প্রবিষ্টঃ, ত্বমেকোঽসি বহুধা বহূন্ প্রবিষ্টঃ"...ইত্যাদি। এইরূপ যোজক (ভেদাভেদ যোজক) বাক্য স্মৃতি পুরাণাদিতেও পাওয়া যায়। যথা,—

"একত্বে সতি নানাত্বং নানাত্বে সতি চৈকতা।
অচিন্ত্যং ব্রহ্মণো রূপং কস্তদ্‌বেদিতুমর্হতি ॥"

(ইতি মনু)।

"জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতো মুখম ॥"

(ইতি ভগবদ্‌বাক্য)।

"ওঁ নমো বাসুদেবায় তস্মৈ ভগবতে সদা।
ব্যতিরিক্তং ন যস্যাস্তি ব্যতিরিক্তোঽখিলস্য যঃ ॥
নিত্যানিত্যপ্রপঞ্চাত্মন্ নিষ্প্রপঞ্চমনাশ্রিত।
একানেক নমস্তুভ্যং বাসুদেবাদিকারণ ॥
যঃ স্থূলসূক্ষ্মঃ প্রকটঃ প্রকাশঃ
যঃ সর্ব্বভূতঃ ন চ সর্ব্বভূতঃ
বিশ্বং যতশ্চৈতদ্বিশ্বহেতুঃ ॥"

(ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদ বাক্য)

"পৃথগ্‌ভূতৈকভূতায় ভূতভূতাত্মনে নমঃ।"

(ইতি বিষ্ণুপুরাণে ধ্রুববাক্য)।

"অনেকমেকং বহুধা বদন্তি
শ্রুতিস্মৃতিন্যায়নিবিষ্টচিত্তাঃ।

আহুর্যমাত্মানমজং পুরাণং
দ্রষ্টুং তমীশং বয়মুত্থতাঃ স্ম ॥”
(ইতি হরিবংশ)।

“ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো
যতো জগৎ স্থাননিরোধসম্ভবঃ।
তদ্ধি স্বয়ং বেদ ভবাংস্তথাঽপি বৈ
প্রাদেশমাত্রং ভবতঃ প্রদর্শিতম্॥
(ইতি শ্রীভাগবতে প্রথম খণ্ডে নারদ বাক্য)।

“সোঽয়ং তেঽভিহিতস্তাত ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
সমাসেন হরের্নান্যদন্যস্মাৎ সদসচ্চ যৎ॥”
(ইতি শ্রীভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে ব্রহ্মবাক্য)।

“অতএব সর্ব্ব শ্রুতিস্মৃতি ইতিহাস পুরাণাদি বাক্যের অনিরুদ্ধ ও ভগবান্ সূত্রকারের সম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্মের সহিত চিদচিৎ সমুদায়ের স্বাভাবিক ভেদাভেদ সম্বন্ধ। ইহাই সৎসম্প্রদায়গণের উপাদেয়। কেবল ভেদ বা কেবল অভেদ শাস্ত্রবিরুদ্ধ হেতু ও ভ্রান্তি বশে পরিগৃহীত হেতু তাহা উপেক্ষণীয়।

(এক্ষণে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আলোচিত হইতেছে।) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মতে এ স্থলে অর্থ এই যে, দেবমনুষ্যাদি ক্ষেত্রে, বেত্তৃরূপে একাকার ক্ষেত্রজ্ঞ আমাকেই জানিও, অর্থাৎ মদাত্মক জানিও। এ শ্লোকে যে ‘চ’ ‘অপি’ শব্দ আছে, তাহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, আর যাহা ক্ষেত্র তাহাও যে আমি (পরমেশ্বর) তাহাও জানিও। যেমন ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এক বিশেষণ-স্বভাব হেতু তাহাদের অপৃথক্ত্ব সিদ্ধ হয়, ও তাহারা সমানাধিকরণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়, সেইরূপ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ আমারই (পরমেশ্বরের) বিশেষণ স্বভাব হেতু আমা হইতে অপৃথক্— ইহা সিদ্ধ হয়, ও আমার সহিত সমানাধিকরণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়। বদ্ধ মোক্ষ উভয়

অবস্থাযুক্ত ক্ষর ও অক্ষর শব্দ নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে অন্য বা ভিন্ন অর্থে পরম ব্রহ্ম বাসুদেব "উত্তম পুরুষ" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। যাহা পৃথিব্যাদি সঙ্ঘাতরূপ, তাহা ভগবানের শরীররূপে এক-স্বভাব হেতু যে ভগবানাত্মক, তাহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যান্তরো যং পৃথিবীং ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি স তে আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃতঃ," ইত্যাদি হইতে "য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরো যময়তি স তে আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃতঃ"—এই পর্য্যন্ত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, অন্তর্য্যামিরূপে সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞগণের মধ্যে ভগবানের অবস্থান, তাঁহার সহিত সমানাধিকরণত্ব দ্বারা ব্যপদিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ সমানাধিকরণত্ব প্রতিপাদ্য। ইহা অচিৎ বস্তু সকলের ভোগ্যত্ব চিদ্‌বস্তু সকলের ভোক্তৃত্ব ও পরব্রহ্মের ঈশিত্ব দ্বারা ও তাহাদের স্বরূপ স্বভাব বিবেক দ্বারা প্রতিপাদ্য।

"হন্তাঽহমিমাস্তিস্রো দেবতা, অনেন জীবেন আত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি, তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ, তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চ অভবৎ, বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং সত্যং চানৃতং চ অভবৎ"—ইতি শ্রুতিঃ। অতএব 'স্ব'আত্মকজীবানুপ্রবেশ দ্বারা ও নামরূপ ব্যাকরণ বচন দ্বারা সমুদায় বাচক শব্দ অচিৎ-জীব-বিশিষ্ট পরমাত্ম-বাচক। কারণাবস্থ পরমাত্মবাচক শব্দের সহিত কার্য্যবাচক শব্দের সমানাধিকরণত্বই মুখ্যবৃত্তি বা সার সিদ্ধান্ত। অতএব স্থূল সূক্ষ্ম চিদচিৎ প্রকার ব্রহ্মই কার্য্য ও কারণ। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ইহাই অঙ্গীকার পূর্ব্বক বা ভোক্তৃভোগ্য নিয়ন্তৃভূত চিদচিৎ ব্রহ্মের স্বরূপ স্বভাবভেদ অঙ্গীকার পূর্ব্বক ধর্ম্মসাঙ্কর্য্য নিবারণ করেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মতে, বিশেষণ—বিশিষ্ট বস্তুর একদেশ মাত্র; এজন্য এ উভয়ের অভেদ ব্যবহার মুখ্য, ও বিশেষণ বিশেষ্য উভয়ের স্বরূপ স্বভাব ভেদ হেতু ভেদব্যবহারও মুখ্য;—এই অর্থে সর্ব্ব বাক্যের অবিরোধ সিদ্ধ হয়। এই রূপে ভেদাভেদ ব্যবহার মুখ্যরূপে অঙ্গীকার

করায়, এ সম্বন্ধে ভেদাভেদবাদের সহিত বিশিষ্টাদ্বৈত বাদের বিরোধ হয় না। ভেদাভেদবাদ যে শ্রুতি স্মৃতি সূত্র প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহা বিশিষ্ট দ্বৈতবাদেও উক্ত হইয়াছে।

"কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মতে ব্রহ্ম চিদচিৎ বিশিষ্ট। ইহা অসম্ভব। চিৎ ও অচিৎ—ইহাদের বিশেষণত্ব উপপন্ন হয় না। বিশেষণ যে ইতর ব্যাবর্ত্তক (বিরোধী বিশেষণের বাধক) তাহা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত। এই লক্ষণের সহিত চিৎ অচিৎ ইহাদের সমন্বয় হয় না। (অর্থাৎ চিৎ ও তাহার বিপরীত অর্থযুক্ত অচিৎ—এই উভয় একেরই বিশেষণ হইতে পারে না)। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মতে চিৎ অচিৎ ও ঈশ্বর এই তিন তত্ত্ব ব্যতীত অন্য বস্তু অঙ্গীকৃত হয় নাই। আরও, যেমন শৃঙ্গলকম্বলাদি গোলক্ষণ দ্বারা মহিষাদি হইতে গো-কে পৃথক্ করা যায়, সেইরূপ বিশেষণ রূপে অভিমত চিদচিৎ পদার্থ দ্বারা কি কোন বস্তু ব্যাবর্ত্তিত বা পৃথক্ ভাবে জানা যায়? ব্রহ্ম ব্যতীত ত অপর কোন বস্তু নাই। শ্রুতিতে আছে, "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" শ্রুতি হইতে ব্রহ্মের একত্ব অবধারণ হয়। ব্রহ্ম হইতে চেতন ও অচেতনকে পৃথক্‌রূপে স্বীকার না করায় ব্যাবর্ত্তকত্ব (পৃথক্‌ত্ব) রূপ বিশেষণও অসম্ভব হয়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মতে (ব্যাবর্ত্ত্য) পৃথক্‌কৃত ভাব কিছুতেই সিদ্ধ হয় না, এবং পৃথক্‌কারক (ব্যাবর্ত্তক) কিছুই সিদ্ধ হয় না। অতএব চিদচিৎ এ উভয়ের পৃথক্ কারকত্ব অভাবে বিশেষণত্বও সিদ্ধ হয় না। বিশেষণত্ব সিদ্ধ না হইলে, তদ্‌বিশিষ্টত্বও উপপন্ন হয় না।

"আরও চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মের বিশেষণ, এ সিদ্ধান্ত শ্রুতি স্মৃতি বা সূত্র প্রমাণের বিরুদ্ধ। অতএব যেমন মায়াবাদিগণের সিদ্ধান্ত শাস্ত্রেও অনুভব বিরুদ্ধ ও ব্রহ্মে অবিদ্যার অধ্যাস অঙ্গীকার উপপন্ন হয় না, সেইরূপ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও অগ্রাহ্য, ইহা সম্প্রদায় বিশেষের স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধির জন্য অঙ্গীকৃত হইয়াছে মাত্র।

"অতএব ভেদাভেদবাদ (বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ) অনুযায়ী উক্তরূপ অর্থই উপাদেয়।"

এইরূপে এই দুই শ্লোকে উক্ত প্রতি শরীরের বা ক্ষেত্রের বেত্তা ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মা এবং সর্ব্বক্ষেত্রে এক ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মা পরমেশ্বর—এই দুই প্রকার ক্ষেত্রজ্ঞের পরস্পর সম্বন্ধ, বিভিন্ন মতাবলম্বী ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্নভাবে স্বস্ব মতানুসারে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ স্থলে গীতায় সে সম্বন্ধ কি প্রকার, তাহা স্পষ্ট উক্ত হয় নাই। এ স্থলে এই মাত্র বলা হইয়াছে যে, এই শরীর বা ক্ষেত্র হইতে ভিন্ন তাহার বেত্তাই ক্ষেত্রজ্ঞ, আর সর্ব্বক্ষেত্রে ভগবানই ক্ষেত্রজ্ঞ। এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানই পরমার্থ-জ্ঞান। এই ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান লাভের জন্য এই দুই প্রকার ক্ষেত্রজ্ঞ মধ্যে কোন প্রভেদ আছে কি না, তাহা জানিবার আকাঙ্ক্ষা অবশ্যম্ভাবী। তাই এস্থলে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ স্ব স্ব মত অনুসারে এই সম্বন্ধ বিশেষ ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা দেখিয়াছি। গীতার এস্থলে এই সম্বন্ধ তত্ত্ব স্পষ্ট উক্ত না হওয়ায় এইরূপ বিভিন্ন মতের স্থান আছে।

এই সকল বিভিন্ন মত এস্থলে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করা আবশ্যক। অদ্বৈতবাদ অনুসারে জীব-ব্রহ্মের অভেদবাদ প্রতিষ্ঠিত। বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ অনুসারে জীব-ব্রহ্মে ভেদাভেদবাদ স্থাপিত। আর দ্বৈতবাদ অনুসারে জীব-ব্রহ্মে ভেদবাদ গৃহীত। সকল বাদকেই শ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

শ্রুত্যুক্ত মহাবাক্য—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", "তত্ত্বমসি," "সোঽহং", "অহং ব্রহ্মাস্মি," প্রভৃতি হইতে অভেদবাদই সিদ্ধান্ত আপাততঃ মনে হয় বটে, কিন্তু ভেদাভেদবাদ এমন কি ভেদবাদও এই সকল মহাবাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্নবাদ অনুসারে এই সকল মহাবাক্যের অর্থ ভিন্ন। এস্থলে তাহা উল্লেখের প্রয়োজন নাই। ইহা ব্যতীত শ্রুতিতে এবং স্মৃতি

পুরাণাদি শাস্ত্রে জীব ব্রহ্মে অভেদ-প্রতিপাদক ও ভেদ-প্রতিপাদক—উভয় রূপ অনেক বাক্য আছে। অভেদবাদী আচার্য্যগণ অভেদ প্রতিপাদক শাস্ত্রবাক্যই প্রধানতঃ গ্রহণ করিয়াছেন। সেইরূপ ভেদবাদিগণ ভেদপ্রতিপাদক শাস্ত্র বাক্য প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়াছেন। ভেদাভেদবাদে ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে এই উভয় প্রকার পরস্পর বিরোধী বাক্যের (thesis এবং antithesis এর) সমন্বয় (Synthesis) চেষ্টা হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত, ব্রহ্মের অর্থ সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মই পরমতত্ত্ব—একমেবাদ্বিতীয়ম্‌। ব্রহ্ম নির্গুণ নিরুপাধিক 'তৎ' শব্দ বাচ্য, ও সেইরূপ সগুণ সোপাধিক 'সঃ' শব্দ বাচ্য। ব্রহ্ম নির্গুণ ও সগুণ, নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ, নিরুপাধিক ও সোপাধিক।

শ্রুতিতে নির্গুণ ব্রহ্মপ্রতিপাদক ও সগুণ ব্রহ্মপ্রতিপাদক অনেক বাক্য আছে। শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য নির্গুণ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শ্রুতি মাত্র অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বলিয়াছি। রামানুজ প্রভৃতি সগুণ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য অবলম্বন করিয়া স্বমত স্থাপন করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য সগুণ ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতিকে গ্রহণ করেন নাই। মায়াহেতুই ব্রহ্ম সগুণরূপে প্রতীয়মান হন। ব্রহ্মে ঈশ্বর ভাব মায়িক—তাহা ব্যাবহারিক ভাবে সত্য হইলেও পারমার্থিক সত্য নহে। সেই রূপ জীব ও জগৎ মায়িক—তাহাদেরও ব্যাবহারিক সত্তা ব্যতীত পারমার্থিক সত্তা নাই। শঙ্কর সগুণ ব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্রুতিকে অবিদ্যা-কল্পিত বলিয়াছেন। এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া শঙ্কর সগুণব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতি গুলি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অন্য দিকে রামানুজ কেশব ও দ্বৈতমতাবলম্বী পণ্ডিতগণ কেবল সগুণ ব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে নির্গুণ ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতির অর্থ ভিন্ন। নির্গুণ অর্থে সমুদায় হেয়গুণ-বিরহিত। অতএব

সগুণ ব্রহ্মই পরম তত্ত্ব,—তিনিই পরব্রহ্ম পরমেশ্বর বাসুদেব। তিনিই সমস্ত হেয়গুণবিহীন বলিয়া নির্গুণ। অথবা মুক্ত জীবই অক্ষর বা নির্গুণ ব্রহ্ম। আত্মাই ব্রহ্ম। তিনি পরম ব্রহ্ম নহেন। কারণ, পরম ব্রহ্ম সগুণ।

শঙ্করাচার্য্যের মতে নির্গুণ (Transcedent Impersonal) ব্রহ্মই পারমার্থিক সত্য। তিনি জ্ঞান স্বরূপ (Absolute Reason)। সেই জ্ঞান নির্ব্বিশেষ,—তাহা জ্ঞাতৃজ্ঞেয় রূপে বিভক্ত হয় না (not differentiated into absolute Subject and absolute Object)। সে জ্ঞান আত্মজ্ঞান ও (Absolute Ego) নহে। সে জ্ঞানে—'আমি'(subject) বহু (object) হইব—এ কল্পনা আসিতে পারে না এবং তাহা নাম (name) ও রূপ (form) দ্বারা বহু (Object) হইয়া,তাহাদের মধ্যে জ্ঞাতৃরূপে (Subject রূপে) অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে না। সে জ্ঞান নিষ্ক্রিয়। যে জ্ঞান ক্রিয়াকালে বিকাশ জন্য তাহার স্বাভাবিক নিয়মে পরস্পর বিরোধী ধর্ম্মের বিকাশ ও তাহাদের সামঞ্জস্য দ্বারা ক্রম-বিবর্ত্তিত হইতে থাকে (Proceeds through the logical necessity of the law of contradiction and identity)—ব্রহ্মজ্ঞান সেরূপ নহে। ব্রহ্ম-জ্ঞান নির্ব্বিকার, অনির্দ্দেশ্য, অনির্ব্বার্য্য নির্ব্বিশেষ। যে জ্ঞান মায়াবশে সীমাবদ্ধ হয়, পরিচ্ছিন্ন হয়, (limited হয়) অজ্ঞানযুক্ত হয়, যাহা এই মায়া দ্বারা জ্ঞাতৃজ্ঞেয় এই দ্বৈত-ভাবে বিভক্ত হয়, যাহা দেশকাল নিমিত্ত দ্বারা উপাধিযুক্ত হয়, যে জ্ঞানে ভেদ দৃষ্টি হয়—ব্যক্তিভাব (Principium Individuationis) হয়, তাহা পরমব্রহ্মজ্ঞান নহে। তাহা পরিচ্ছিন্ন অজ্ঞান আবরণ যুক্ত। এই ব্রহ্ম-জ্ঞানকে পাশ্চাত্যদার্শনিক পণ্ডিতগণ মধ্যে কেহ Absolute,Transcendental বা Impersonal Reason, কেহ বা The Unconscious বলিয়াছেন। এই যে সীমাবদ্ধ মায়া বা অবিদ্যা দূষিত জ্ঞান (Reason bound by its logical law of contradiction and identity) ইহা জীব-

জ্ঞান। এই অজ্ঞান হেতুই জীবের জীবত্ব, তাহার ব্রহ্মস্বরূপ অপ্রকাশিত।* এ অজ্ঞান কাহার ও কোথা হইতে আসে, তাহা শঙ্কর বলেন নাই, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। কেহ কেহ বলেন, ইহা ব্রহ্ম জ্ঞানেরই বিকাশাবস্থার ধর্ম্ম। জ্ঞান তাহার বিরোধী অজ্ঞানকে বিকাশ পূর্ব্বক তৎসহ মিলিত না হইলে, জ্ঞানের ক্রিয়া হয় না। ইহাই মায়া। এই মায়া হেতু নির্গুণ জ্ঞানস্বভাব ব্রহ্মের সগুণ ভাব হয়, তাঁহাতে জীব ও জগৎ এই মায়া দ্বারা বিবর্ত্তিত হয়। তাহা হইতে ব্রহ্মে ঈশ্বর ভাব হয়। ব্রহ্মের এই সগুণ ঈশ্বর ভাব সেইজন্য পারমার্থিক সত্য নহে,—জীবের জীবভাবও পারমার্থিক সত্য নহে। জীব ব্রহ্মই বটে। কেবল অবিদ্যা জন্য ভ্রম হেতু তাহার এই জীবত্ব বোধ,—তাহার কর্ত্তা, ভোক্তা ও জ্ঞাতা ভাব হয়। কর্ত্তা ও ভোক্তা ভাব যেমন অবিদ্যাবশে তাহাতে আরোপিত, জ্ঞাতা ভাব-'ক্ষেত্রজ্ঞ' ভাবও তাহাতে আরোপিত। এই মায়াবশেই ব্রহ্মে সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞতাভাবও আরোপিত। কেন না প্রকৃত জ্ঞানস্বরূপ যাহা, তাহা নিষ্ক্রিয়, সে জ্ঞান অজ্ঞান মিশ্রিত হয় না, তাহাতে জ্ঞাতা ভাব আসে না, তাহার কোন জ্ঞেয় থাকে না।

শঙ্করাচার্য্য কতকটা এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া পরমার্থ অদ্বৈত-তত্ত্ব স্থাপন করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, নির্ব্বিশেষে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে যদি মায়া হেতু জ্ঞাতা-জ্ঞেয় ভেদ হয়, স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও অবশ্য বলিতে হইবে যে, যাহা জ্ঞাতা তাহা কখন জ্ঞেয় হইতে পারে না। সমস্ত জ্ঞেয় হইতে পৃথক করিয়াই জ্ঞাতা আপনাকে জানিতে পারে, বা জ্ঞাতৃস্বরূপ লাভ করে। সেই জ্ঞাতার জ্ঞাতা স্বতন্ত্র কেহ থাকিতে পারে না। অর্থাৎ জ্ঞাতা কাহারও জ্ঞেয় হইতে পারে না।

---

* সপেন্‌হর বলিয়াছেন—If the veil of Maya, the *principium Individuationis* is lifted, the man no longer distinguishes between himself and others, he recognises in all beings his own inmost true Self Schaupenheaur's World as Will and Idea, Sec. 65.

শঙ্করের-যুক্তি প্রণালী অতি উপাদেয়, এবং এজন্য ইহা প্রকৃত দার্শনিক পণ্ডিতগণের নিকট বিশেষ আদৃত। কিন্তু কেবল আমাদের নিজের জ্ঞান-প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, আমাদের বৃত্তি-জ্ঞানের ধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিয়া, তর্ক যুক্তি বা বিচার দ্বারা, পরম ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। এজন্য ব্রহ্মকে জানিতে হইলে, প্রধানতঃ ব্রহ্মপ্রাতপাদক শ্রুতির উপরই নির্ভর করিতে হয় এবং গীতা যদি ভগবানের বাক্য বলিয়া বিশ্বাস হয়, তবে তাহার উপরও নির্ভর করিতে হয়। পরম ব্রহ্ম আমাদের সীমাবদ্ধ দেশকালনিমিত্তপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে জ্ঞেয় নহেন। তাই শ্রুতি ব্রহ্মকে অবাচ্য—অচিন্ত্য—অজ্ঞেয়—অনির্দ্দেশ্য—অপ্রমেয় বলিয়াছেন, এবং 'নেতি নেতি,' নিষেধমুখে তাঁহাকে ইঙ্গিতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদের জ্ঞান যতই বিকাশিত হউক,—যতই অজ্ঞানমুক্ত হউক, তাহা দ্বারা ব্রহ্মকে পরিচ্ছিন্ন করা যায় না—সীমাবদ্ধ করা যায় না। অনন্ত ব্রহ্মকে আমাদের এই জ্ঞানের গণ্ডীর মধ্যে কখন আনা যায় না। তিনি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভাবের অতীত। তাঁহার স্বরূপ অচিন্ত্য। পরমাত্মার যাহা ঐশ্বরীয় যোগ, তাহাও মানুষে ধারণা করিতে পারে না। তিনি সবিশেষ নির্ব্বিশেষ সগুণ-নিগুর্ণ ভূতস্থ হইয়াও ভূতস্থ নহেন, বিশ্বস্থ (Immanent) হইয়াও বিশ্বাতীত (Transcendent)। তাঁহাতে ঐশ্বরীয় যোগ হেতু কিরূপে এই সকল পরস্পর বিরোধী ধর্ম্মের গুণের বা ভাবের সমাবেশ হইতে পারে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই পরস্পর বিরোধী ভাব কিরূপে সেই অনন্ত জ্ঞানস্বরূপে অভিব্যক্ত হইতে পারে, তাহা আমরা কোনরূপ যুক্তি দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে বা বুদ্ধিতে ধারণা করিতে পারি না। শাস্ত্র যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেই শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, পরব্রহ্মে নিগুর্ণ ও সগুণ—এ উভয়ভাব একীভূত। তিনি নির্ব্বিশেষ রূপে জ্ঞানের চিন্তার ও ধারণার অতীত হইলেও সবিশেষ রূপে তিনি জ্ঞেয় হইতে পারেন। নিগুর্ণ পরম

ব্রহ্মকে সৎ বা অসৎ বলা যায় না, তাহা অনির্বাচ্য, তাহা কোন বাক্য দ্বারা ধারণা করা যায় না। শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্ম সগুণভাবে যেমন অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপ, তেমনই তিনি অনন্ত শক্তিস্বরূপ। শঙ্করাচার্য্য যাহাকে মায়া বলিয়াছেন, তাহা শঙ্করের মতেই ব্রহ্মশক্তি। শক্তি নিত্য—এক অনন্ত অক্ষয়। তাহার দুই রূপ—এক নিষ্ক্রিয় কারণ (potential) রূপ, আর এক সক্রিয়—কার্য্য (kinetic) রূপ। শঙ্করই বলিয়াছেন, কারণের অন্তর্ভূত শক্তি, আর শক্তির অন্তর্ভূত কার্য্য। এই ব্রহ্ম-শক্তি মায়া এক অর্থে প্রকৃতি রূপেই জগৎকারণ। ব্রহ্মশক্তিই ক্ষেত্রজ্ঞ জীবরূপে ও ক্ষেত্র জড় সংঘাত রূপে কার্য্যাবস্থায় অভিব্যক্ত। এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগে বা এই জ্ঞাতা-জ্ঞেয় সম্বন্ধ দ্বারা এ জগৎ বিধৃত। একই তত্ত্বে এই বিভাগ ও সংযোগ বা সম্বন্ধ সত্য হইলে, এই জীব জড়ময় জগৎ সত্য, ইহা পারমার্থিক সত্য,—ইহা অজ্ঞান-প্রসূত বা মিথ্যা নহে। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"...সন্মূলাঃ সোম্য ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠা..." "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি...।" (ছান্দোগ্য, ৬।৮।৬-৭)। আর এ সম্বন্ধ বা সংযোগ যদি মিথ্যা—অজ্ঞান বা মায়াপ্রসূত হয়, যদি ব্রহ্মে কোনরূপ ভেদ কল্পনা অসম্ভব হয়, তবে অবশ্য ইহাকে মায়িক মিথ্যা বলিতে হয়। কিন্তু শ্রুতি অনুসারে, যাহা 'মায়া', তাহা নানা স্থানে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইলেও, তাহা যে পরব্রহ্মের পরাশক্তি, তাহা বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বলিয়াছেন,—

"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥"

সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, এই পরাশক্তি হেতু ব্রহ্মই সগুণ শক্তিমান্ হন। শক্তি ও তৎকার্য্য দ্বারা তিনি জ্ঞেয় হন। তাঁহার জ্ঞান-বল-ক্রিয়াত্মিকা শক্তি চরাচর জগৎরূপে অভিব্যক্ত হয় বলিয়া, তিনি জগৎ সম্বন্ধে তটস্থ লক্ষণ দ্বারা জ্ঞেয় হন। চিৎ-স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানে জগৎরূপ

কল্পনা (thought) সৎস্বরূপ তাঁহারই ক্রিয়াত্মিকা শক্তি দ্বারা ব্যাকৃত বা অভিব্যক্ত হয়,—তাঁহারই সত্তায় সত্তাযুক্ত (being) হয়। একারণ তিনি জগৎ সম্বন্ধে সগুণ রূপে অভিব্যক্ত হন। তিনিই জীব জগৎ ও ঈশ্বর বা ভোক্তা ভোগ্য ও প্রেরয়িতা রূপেই জ্ঞেয় হন। একই পরম তত্ত্ব অনন্ত জ্ঞানবলক্রিয়াশক্তিমান্ বলিয়া, সেই একে এই অনন্ত ভেদ আমরা জ্ঞানে ধারণা করিতে পারি।

কিন্তু শঙ্কর শ্রুতির উপদিষ্ট সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব যুক্তি দ্বারা বা বিচারপূর্ব্বক স্বীকার করিতে পারেন নাই। তিনি একেই পরস্পর বিরোধী ধর্ম্মের গুণের ও ভাবের সমাবেশ বা সমন্বয় করিতে পারেন নাই বলিয়া, তিনি সগুণ ব্রহ্মতত্ত্বকে মায়িক বা পারমার্থিক মিথ্যা সিদ্ধান্ত করিয়া, কেবল নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বকে পারমার্থিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এবং মায়াবাদ স্থাপন করিয়াছেন। শঙ্কর নিত্য বিজ্ঞানবাদী। তিনি যে ব্রহ্মতত্ত্ব স্বাকার করিয়াছেন, তাহা নির্ব্বিশেষ জ্ঞানস্বরূপ—নিত্যবোধ-স্বরূপ। সুতরাং সেই ব্রহ্মে যে শক্তি—যে মায়াখ্য পরাশক্তি, তাহা কেবল জ্ঞানাত্মিকা। এজন্য মায়া হেতু তাঁহাতে যে বহু কল্পনা হয়, যে জ্ঞাতা-জ্ঞেয় ভেদ হয়, তাহা কেবল সেই জ্ঞানেই বিবৃত হয়। তাহা সৎরূপে পরিণত হয় না। তাই এ জগৎ পরমার্থতঃ মায়িক বা অসৎ। এইজন্য ব্রহ্মে বাস্তবিক কোন ভেদ নাই। ইহাই সংক্ষেপে শঙ্করের সিদ্ধান্ত। কিন্তু ইহাই যে চরম সিদ্ধান্ত, তাহা বলা যায় না। তিনি ব্রহ্মে চিৎ বা জ্ঞান মাত্র দেখিয়াছেন, কিন্তু 'সৎ' বা সৎশক্তির—অনন্তবল ক্রিয়াত্মিকা শক্তির দিক্ লক্ষ্য করেন নাই। তিনি ব্রহ্মের সৎরূপ স্বীকার করিলেও তাহার 'ভাবের' দিক্‌টা স্বীকার করেন নাই। 'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ' (গীতা, ২।১৬)। এই তত্ত্ব, এবং 'সৎ' হইতেই যে ভাবের অভিব্যক্তি হয়, সৎস্বরূপের যে 'প্রভব' হয়, তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই। তিনি যে উপায় অবলম্বন করিয়া

সত্যের বা পরম তত্ত্বের সন্ধান করিয়াছেন, সেই উপায়ও চরম উপায় নহে। সত্যার্থ লাভের জন্য তাঁহার নির্দ্দিষ্ট 'জ্ঞান'-পথ সীমাবদ্ধ —সঙ্কীর্ণ। যোগজ অনুভূতি দ্বারা—ভাবসমন্বিত ভজনা দ্বারা সে জ্ঞানপথে অগ্রসর হইতে হয়। জ্ঞান বিজ্ঞান সহিত লাভ করিতে হইলে, যে দিব্য যোগদৃষ্টি আবশ্যক, তাহা লাভ করিতে হয়। শঙ্কর বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ব্যাসাদি ঋষির ন্যায় তাঁহার যোগদৃষ্টি ছিল না। নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া, বিচারপূর্ব্বক শঙ্করাচার্য্য যে অভেদবাদ স্থাপন করিয়াছেন এবং তাহার জন্য যে সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব মায়িক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা এই সকল কারণে দ্বৈতবাদী বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন না। ইহারা শ্রুতি প্রমাণের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করিয়াছেন।

অন্য দিকে রামানুজ প্রভৃতি এই সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব স্বীকার করিলেও তাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব স্বীকার করেন নাই। তাহারা নির্গুণ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শ্রুতি সকলের অপ্রাসঙ্গিক অর্থ করিয়া স্ব-স্ব মত স্থাপন করিয়াছেন। রামানুজ কেবল সগুণব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতি বাক্যের উপরই নির্ভর করিয়াছেন। সুতরাং তিনিও শঙ্করের ন্যায় একদেশদর্শী। শ্রুতি অনুসারে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম, সেই এক পরব্রহ্মেরই বিভিন্ন ভাবমাত্র। তিনিই জগদতীত, সর্ব্বাতীত, নির্গুণ,—আবার তিনিই অক্ষর, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই জগৎ ও জীবরূপ ও জগৎকারণরূপ। তাঁহারই জ্ঞান—কল্পনা বা ঈক্ষণ জগতের নিমিত্ত কারণ। তাঁহারই মায়া বা শক্তিরূপা প্রকৃতি জগতের উপাদান কারণ। তাঁহা হইতেই ক্ষেত্রজ্ঞ জীব ও জ্ঞেয় জড় ক্ষেত্রের অভিব্যক্তি। তাহা বিশ্বমায়া হেতু ব্রহ্মে বিবর্ত্তিত মাত্র নহে, তাহা অনন্ত শক্তি হেতু ব্রহ্মে অভিব্যক্ত। ব্রহ্ম—ঈশ্বর অন্তর্য্যামী নিয়ন্তা সর্ব্বাত্ম-স্বরূপ সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট। অতএব পরব্রহ্ম তত্ত্ব কেবল নির্গুণ নহে, কেবল সগুণও নহে। তিনি নির্ব্বিশেষ,

নিরুপাধিক ও অনির্দ্দেশ্য; তিনিই আবার সগুণ ও সোপাধিক। তিনিই অক্ষর আর তিনিই ভোক্তা ভোগ্য ও প্রেরয়িতা এই ত্রিবিধ ভাবে জ্ঞেয়। ইহাই পরমতত্ত্ব, ইহাই শ্রুতির সার উপদেশ। এই পরম তত্ত্ব বুদ্ধি দ্বারা তর্কযুক্তি দ্বারা আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। সুতরাং সাধনা দ্বারা অজ্ঞানজ তমঃ পরিহার পূর্ব্বক, যোগদৃষ্টি লাভ করিয়া, ভাবের দিক্ হইতে সাধনা করিয়া, পরমাত্মার রূপা লাভপূর্ব্বক, তাহা আমাদের দেখিতে চেষ্টা করিতে হইবে। এই তত্ত্ব নবম ও একাদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে বিবৃত হইয়াছে।

যাহা হউক, গীতা বুঝিতে হইলে, আমাদের এই সাধনা পথ অবলম্বন করিতে হইবে। কেবল যুক্তি তর্ক দ্বারা কোন বিশেষ 'বাদ' অবলম্বন করিয়া তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত নহে। গীতা দ্বারা অদ্বৈতবাদ বা দ্বৈতবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ—কোন বিশেষ মত স্থাপন করিতে চেষ্টা করাও উচিত নহে। এমন কি, গীতা বুঝিতে হইলে শ্রুতিও অবলম্বন করিবার তত প্রয়োজন মনে হয় না।

গীতামাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে—

"গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্ম-বিনিঃসৃতা॥

গীতা শ্রীভগবানের বাক্য, গীতা উপনিষদ্ গীতা শ্রেষ্ঠ Revelation। গীতা অন্ততঃ শ্রুতির ন্যায় প্রামাণ্য। উপনিষদে মূলতত্ত্ব নানা স্থানে নানাভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু গীতায় উপনিষদের সেই সকল উপদেশ (disconnected aphorisms of the Upanishads'—*Schaupenhauer*), এবং অন্য মূল জ্ঞাতব্য তত্ত্ব শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে সমুদায় সমন্বয় পূর্ব্বক উপদিষ্ট হইয়াছে। এজন্য গীতা উপনিষদের সার। পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রাখিয়া গীতার প্রত্যেক শ্লোকের অর্থ করিতে হয়, ও ধ্যানপূর্ব্বক প্রত্যেক শ্লোক বুঝিতে হয়। শ্রুতি-বাক্য গীতা বুঝিবার

সহায় অবশ্য; কিন্তু যদি কোন শ্রুতি-বাক্যের সহিত গীতার কোন বাক্যের বিরোধ মনে হয়, তবে গীতাকেই প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু কোথাও এরূপ বিরোধ নাই। গীতা ও শ্রুতি সমন্বয়পূর্ব্বক অর্থ করিলে, অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রভৃতির বিরোধ থাকে না। এ সমুদায় বাদের প্রকৃত সামঞ্জস্য হয়। পরম তত্ত্ব এ বাদ-বিবাদের অতীত। শাস্ত্র সমন্বয় দ্বারা ("তৎ তু সমন্বয়াৎ") ইহাই সিদ্ধান্ত হয়। তবে এ সমন্বয়ের মূলসূত্র সহজে পাওয়া যায় না। বাদরায়ণ ব্যাস উত্তরমীমাংসায় যে সমন্বয় প্রণালী দেখাইয়াছেন, তাহা সহজে আমাদের বোধগম্য হয় না।

এক্ষণে গীতার পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া এই দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ বিচারপূর্ব্বক সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব। পরমেশ্বর সগুণ ব্রহ্ম। ব্রহ্মের এ সগুণ ভাব, এই পুরুষোত্তমভাব নির্গুণ অব্যক্ত অক্ষর ভাবের ন্যায় পরম ভাব। তাহা সকল ক্ষর ভাবের অতীত। নিরুপাধিক ব্রহ্মে এই সোপাধিক সগুণ ভাবের অভিব্যক্তি হয়। তাই অব্যক্ত অব্যয়, পরম অক্ষর ভাব পরম পুরুষ ভাবের পরম ধাম—তাহা পরম গতি। এই সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর পুরুষোত্তম ভাব নির্গুণ ভাবের ন্যায় নিত্য-সনাতন, তাহা পারমার্থিক সত্য—তাহা মায়িক বা কাল্পনিক নহে। পরমেশ্বরের দুই প্রকৃতি, এক পরাপ্রকৃতি—জীবভূত; আর এক অষ্টধা অপরা প্রকৃতি—বুদ্ধি অহঙ্কার মন ও পঞ্চসূক্ষ্ম ভূত (তন্মাত্র) ও তাহাদের বিকারজাত জীবদেহ ও অপর জড় বর্গ। ভগবানের পরাপ্রকৃতি প্রাণ ও এই অপরা জড় প্রকৃতি নামরূপ দ্বারা ব্যাকৃত হইয়া ভগবান্ হইতে আত্মা-রূপ বীজ গ্রহণ করিয়া সর্ব্বভূতের যোনি বা কারণ হয়। এই আত্মস্বরূপে জীব ক্ষেত্রজ্ঞ, তাহা ভগবানেরই অংশ, তাহা ভগবান্ হইতে বস্তুতঃ পৃথক্ নহে। ক্ষেত্রজ্ঞ এক অবিভক্ত হইয়াও ক্ষেত্রভেদে পৃথক্ বা বিভক্তের ন্যায় স্থিত। আর সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞ ভগবানই

সর্ব্বভূতাশয়স্থিত পরমাত্মা (গীতা ১০।২০)। কিন্তু এই জীবাত্মভাব ভূতাশয় বা ক্ষেত্র দ্বারা বদ্ধ। ক্ষেত্রের সংযোগে অভিব্যক্ত এই জীবভাব গুণময়ী মায়া দ্বারা সীমাবদ্ধ। এজন্য তাহাকে ভগবানেরই জ্ঞান ও শক্তির অংশ বলা যায়।

এই ক্ষেত্র—যাহা সর্ব্বভূতযোনি, তাহা এই পরা ও অপরা প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত। আর যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, তিনি পুরুষ। পুরুষ ত্রিবিধ। ভগবান্ই উত্তম পুরুষ। জীব ক্ষর পুরুষ। এই পুরুষ-প্রকৃতি অনাদি। ভগবান্ এই প্রকৃতিকে "আমার" বলিয়াছেন, এই প্রকৃতি স্বতন্ত্রতত্ত্ব নহে। ভগবান্ই প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা—নিয়ন্তা। ভগবানের অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি (অব্যক্ত) সচরাচর জগৎ সৃষ্টি করেন। স্ব-প্রকৃতিকে অবষ্টম্ভন পূর্ব্বক ভগবান্ পুনঃ পুনঃ জগৎ বিসর্জ্জন করেন। অতএব এই অর্থে প্রকৃতি ভগবান্ হইতে অভিন্ন। তাহা বাস্তব। প্রকৃতি বা প্রকৃষ্ট কর্ম্ম-শক্তি পরমেশ্বরেরই পরাশক্তি—স্বাভাবিকী বল-ক্রিয়াত্মিকা শক্তি। গীতা অনুসারে এই প্রকৃতি ও মায়া কিছু ভিন্নতত্ত্ব। মায়া—গীতা অনুসারে দৈবী মায়া ভগবানেরই আত্মমায়া বা যোগমায়া। ভগবান্ এই মায়া দ্বারা সমাবৃত। এই মায়ার ত্রিগুণময়ী ভাবের দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মা, বদ্ধ হয়। আমরা পূর্ব্বে এই মায়াতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। মায়া ভগবানের আত্মশক্তি, তাঁহার স্বাভাবিকী জ্ঞানাত্মিকা শক্তি। এই প্রকৃতিও এক অর্থে ভগবানের আত্মশক্তি, কিন্তু ইহা তাঁহার স্বাভাভিকী বলক্রিয়াত্মিকা কর্ম্ম-শক্তি। এজন্য মায়া তাঁহার এই প্রকৃতি বা প্রকৃতিজাত ক্ষেত্র হইতে ভিন্ন। প্রকৃতি দ্বারা ক্ষেত্র সৃষ্ট হয়। মায়া ক্ষেত্রজ্ঞকে ক্ষেত্রবদ্ধ করে মাত্র। গীতা অনুসারে মুক্তাবস্থায় ব্রহ্মভাব বা ঈশ্বরভাব সিদ্ধ হইলে, জীবাত্মার ও পরমাত্মার ভেদ থাকে না, জীবাত্মা ক্ষেত্রমুক্ত হইয়া স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ক্ষেত্রবদ্ধ অবস্থায় এই ভেদ থাকে। এইরূপে ভেদাভেদ বাদ বুঝিলে, ইহাতে সর্ব্ববাদ সমন্বিত

হইবে। ইহা দ্বারা একই পরম ব্রহ্ম-তত্ত্বের সগুণ ও নিগুর্ণ ভাব সবিশেষ ও নির্বিশেষ ভাব কতকটা বুঝিতে পারা যাইবে। সে ভেদ দূর করিবার জন্য—সে ক্ষেত্রের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য—ত্রিগুণাতীত হইবার জন্য, গীতোক্ত সাধনার প্রয়োজন জানা যাইবে। এইরূপে গীতার ভেদাভেদবাদ অঙ্গীকৃত হইয়াছে।

নির্ব্বিশেষ নিগুর্ণ পরম ব্রহ্ম এই মায়াশক্তিমান্ বলিয়া সগুণ পরমেশ্বর হন, এবং একাংশে এ জগৎকে ধারণ করেন, ইহা গীতাতে বিশেষ ভাবে বিবৃত হইয়াছে।

ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে,—

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।" (গীতা ১০। ৪২)

অতএব এই জড়জীবময় জগৎ পরমেশ্বরের এক আংশিক ভাব মাত্র। ইহা তাঁহার আত্মবিভূতি,—তাঁহার আত্মস্বরূপেরই বিশেষ অভিব্যক্তি। এই বিভূতিভাবেই তিনি বিশ্ব জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত (গীতা ১০। ১৩)। এই বিশ্ব জগৎ পরমেশ্বরেরই বিরাট দেহে অবস্থিত। অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইবার সময় ভগবান্ বলিয়াছিলেন,—

"ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যৎ দ্রষ্টুমিচ্ছসি॥" (গীতা ১১। ৭)।

অর্জ্জুনও বিশ্বরূপ দেখিবার সময় বলিয়াছিলেন,—

"পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্।" (গীতা ১১। ১৫)।

অতএব এই সচরাচর জগৎ সমুদায় ক্ষেত্র এবং সমুদায় ক্ষেত্রজ্ঞ জীব—ভগবানের বিরাট দেহে অবস্থিত, সমুদায়ই তাঁহার বিভূতি। এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, জড় ও জীবজগৎ পরমেশ্বরের শরীরের মধ্যে তাঁহার আত্মার ভাবের মধ্যে অবস্থিত হইলেও, তাঁহার শরীর বলা যায় না এবং ভগবান্ যে এই শরীরবিশিষ্ট, তাহাও বলা যায় না।

তাহারা ভগবানের বিরাট শরীরের অন্তঃস্থ মাত্র। একাদশ অধ্যায় হইতে আমরা ইহা জানিতে পারি।

সে যাহা হউক, ইহা হইতে বলা যায় যে, সমষ্টি ভাব ক্ষেত্র বা "ইদং শরীরং" ভগবানের এই বিরাট দেহ এবং ইহার বেত্তা ক্ষেত্রজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্। কিন্তু ব্যষ্টি ভাবে এই ক্ষেত্র বা শরীর জীবদেহ ও তাহার বেত্তা সেই ক্ষেত্রজ্ঞ—জীব। এ উভয়ই ভগবানের বিরাট শরীরের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাহারা পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন হইয়াও ভিন্ন নহে। অতএব এই ভাবেও গীতার প্রতিষ্ঠিত ভেদাভেদবাদ এবং অভেদবাদ ও ভেদবাদ কিরূপে সামঞ্জস্য হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে।

এস্থলে আরও এক কথা বুঝিতে হইবে। আমরা ইহা হইতে জানিতে পারি যে, এই বিশ্বজগৎকে দুই ভাগে বিভাগ করা যায়—এক ক্ষেত্র আর এক ক্ষেত্রজ্ঞ। সমষ্টি ভাবে ক্ষেত্র এক, ক্ষেত্রজ্ঞও এক। কিন্তু ব্যষ্টি ভাবে ক্ষেত্র বহু, ও প্রতি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞও বহু। ক্ষেত্রজ্ঞ জীব আর ক্ষেত্র জড। ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্রের বেত্তা—জ্ঞাতা, আর জড় ক্ষেত্র বেদ্য—জ্ঞেয়।

এক অর্থে জীব জ্ঞাতৃরূপে তাহার জ্ঞেয় জগৎ ধারণ করে। জ্ঞাতা না থাকিলে জ্ঞেয় থাকিতে পারে না। Subject না থাকিলে Object থাকে না। কিন্তু জীব পরিচ্ছিন্ন জ্ঞাতা। সে তাহার পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে জ্ঞেয় যে জগৎ, তাহাই ধারণ করে। প্রকৃত জ্ঞাতা তিনি, যিনি সর্ব্বজ্ঞ—সমুদায় যাঁহার জ্ঞেয়। তিনি পরমেশ্বর। তিনিই স্বীয় মায়াশক্তি হেতু সীমাবদ্ধ বা পরিচ্ছিন্ন হইয়া—একই তিনি বহু হইয়া, বহু জীবাত্মভাবে ক্ষেত্রজ্ঞ ও বহু ক্ষেত্র ভাবে বিভক্তের ন্যায় হইয়া, প্রত্যেক জীবাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ ভাবে স্বক্ষেত্রে অভিব্যক্ত বুত্তিজ্ঞানের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া অল্পজ্ঞ হন। তিনি সর্ব্ব-ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ হইয়াও এইরূপে প্রতি ক্ষেত্রে ভিন্নের ন্যায় পৃথক্ ভাবে ক্ষেত্রজ্ঞ হন। পরমেশ্বর তাঁহার যে বীজ তাঁহার পরা ও অপরা প্রকৃতি অর্থাৎ মহৎব্রহ্ম রূপ যোনিতে বা ক্ষেত্রে নিষেক করেন বা আত্মভাবে

তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হন, তাহাই জীবাত্মা। সেই জীবাত্মার সন্নিধিতে প্রতি ক্ষেত্রে জীবভাবের বিকাশ হয়। প্রতি জীবে যে পরিচ্ছিন্ন জ্ঞাতৃভাব—তাহা ক্ষেত্রে প্রতিবিম্বিত পরমাত্মার পরম জ্ঞাতৃভাবের অংশ বা ক্ষেত্রদ্বারা পরিচ্ছিন্ন রূপ মাত্র। পরম জ্ঞাতা পরমেশ্বর Absolute Subject, আর জীব প্রতিক্ষেত্রে (চিত্তে) প্রতিবিম্বিত Phenomenal Subject। তাই পরম জ্ঞাতা সর্ব্বজ্ঞ (Subject of all objects). আর জীব অল্পজ্ঞ। তাই জীব তাহার নিজ শরীরে অপরোক্ষভাবে জ্ঞাতা, আর পর-শরীরে পরোক্ষ ভাবে জ্ঞাতা হইতে পারেন। এইজন্য প্রত্যেক জীব নিজ শরীরেরই বেত্তা—ক্ষেত্রজ্ঞ। তাহার এই ক্ষেত্রজ্ঞানও সীমাবদ্ধ, নিজ শরীরে আবদ্ধ, দেশকালনিমিত্ত সীমাবদ্ধ বা উপাধিযুক্ত। পরমেশ্বর পরম জ্ঞাতা (Absolute subject) স্বরূপ—সর্ব্বজ্ঞ, এজন্য তিনি সর্ব্ব শরীরে বা সর্ব্বক্ষেত্রেই জ্ঞাতা—সমানরূপে জ্ঞাতা। তিনি সে জন্য সকলের অন্তর্য্যামী, সকলের নিয়ন্তা। অতএব পরমেশ্বরই সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ। আর জীবরূপে প্রতিক্ষেত্রে প্রতিবিম্বিত, সুতরাং পরিচ্ছিন্ন জ্ঞাতৃস্বরূপে তিনিই সেই ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ। তিনি অবিভক্ত হইয়াও সর্ব্বভূতে বিভক্তের ন্যায় স্থিত হন।

জীবের আত্মশরীর অপরোক্ষ ভাবে তাহার জ্ঞেয়। অন্য শরীর বা অন্য জড় সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান পরোক্ষ। অন্য শরীরে অনুপ্রবিষ্ট না হইলে (বা যোগবলে পরকায় প্রবেশ সিদ্ধি না হইলে), সেই অন্য শরীর সম্বন্ধে তাহার অপরোক্ষ জ্ঞান হইতেই পারে না। জীবের জ্ঞান নিজ ক্ষেত্রে প্রধানতঃ বদ্ধ বলিয়া, সে অপরের শরীরের জ্ঞাতা বা ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে পারে না। নিজ উপাধি দ্বারা জীব-জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন বলিয়া, তাহার পক্ষে অপরোক্ষভাবে 'জ্ঞেয়'—কেবল তাহার নিজ শরীর এবং শরীরে অনুভূত সুখ দুঃখ কর্ত্তৃত্বাদি। ইন্দ্রিয় দ্বারে যে অনুভূতি হয়, মাত্রাস্পর্শ জনিত যে জ্ঞান হয়, তাহা হইতে কল্পনা করিয়া সে সেই

অনুভূতির বাহ্য কারণ স্থির করে, এবং তাহা বাহ্য 'ইদং'রূপে প্রত্যক্ষ করে। এইরূপে বাহ্য বিষয় তাহার জ্ঞেয় হয়। সুতরাং এই জ্ঞান পরোক্ষ ও উপাধিযুক্ত। তাহা দ্বারা সে বাহ্য বিষয়ের স্বরূপ অপরোক্ষ ভাবে জানিতে পারে না। জ্ঞাতা জীব যখন তাহার নিজ জ্ঞানের ক্রিয়া দ্বারা তাহার স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করে, তখন সে আপনার জ্ঞানকে এইরূপ সীমাবদ্ধ পরিচ্ছিন্ন উপাধিযুক্ত বলিয়া বুঝিতে পারে,—তাহা যে তাহার বাহ্য 'জ্ঞেয়' দ্বারা, এবং দেশকালনিমিত্ত উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, তাহা সে বুঝিতে পারে। তাহার সে জ্ঞান সসীম, তাহা জীবকে ব্যক্তিত্ব গণ্ডীর মধ্যে (Principium individuationis) সঙ্কীর্ণ করিয়া দেয়। তাহার জ্ঞান সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ, এ ধারণা হইলে, সে সেই সীমাকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করে। যাহা কিছু সসীম, তাহা অসীম আধারে স্থিত,—সসীম জ্ঞান,—অসীম অনন্ত জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টিত ও তাহা হইতে অভিব্যক্ত, ইহা তখন সে অনুভব করে। যিনি এই অসীম অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন পরম জ্ঞান স্বরূপ তিনিই পরমেশ্বর। সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর সর্ব্বজীবের অন্তরে ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে অবস্থিত, তাঁহা হইতেই জীবভাব জীবজ্ঞান প্রতিক্ষেত্রে অভিব্যক্ত, প্রতি ক্ষেত্রের বেত্তা ক্ষেত্রজ্ঞ ভাব তাঁহা হইতেই বিকাশিত, ইহা এইরূপে আমাদের জ্ঞান অনুভব করিতে পারে। সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের অসীম জ্ঞান সর্ব্ব সসীম জ্ঞানকে ব্যাপিয়া, সর্ব্বক্ষেত্রকে ও সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞকে ব্যাপিয়া অবস্থিত,—ইহা জ্ঞানী এইরূপে ধারণা করিতে পারেন।

আমরা বলিয়াছি যে, জীব তাহার নিজ শরীরের বেত্তা—অপরোক্ষভাবে জ্ঞাতা। কিন্তু আমরা নিজেও আমাদের দেহের সম্পূর্ণ জ্ঞাতা নহি। আমরা দেহকে 'আমার' বলিয়া কখন বা 'আমি' বলিয়া বোধ করি বটে, কিন্তু কখন সম্পূর্ণ দেহকে জানিতে পারি না। দেহ কিরূপে সৃষ্ট হয়, পরিপুষ্ট বর্দ্ধিত বা রক্ষিত হয়, তাহা জানি না। এই যে অতি

আশ্চর্য্য অদ্ভুত দেহ যন্ত্র, ইহার সৃষ্টি ও রক্ষার কৌশল যে অতি অদ্ভুত তাহার তত্ত্বও আমরা বুঝি না। এই দেহের সৃষ্টি বা রক্ষা সম্বন্ধে আমাদে প্রকৃত কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। আমরা নিজে আমাদের দেহের সামা অংশও গড়িতে পারি না, একটি চুলও আমাদের গড়িবার সাধ্য নাই যে প্রাণশক্তি এই শরীরকে রক্ষা করে, ধারণ করে ও পোষণ করে তাহার কার্য্য আমরা বুঝি না। প্রাণরূপে ব্রহ্মই এ শরীরের স্রষ্ট পাতা ও রক্ষিতা শ্রুতিতে আছে—

য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।"

(কঠোপনিষদ্‌. ৫।৮)

অতএব সেই পরমেশ্বরই আমাদের এই শরীরকে স্বীয়প্রকৃতি দ্বারা প্রকৃতিকে নিয়মিত করিয়া, আমাদের কর্ম্মফলানুযায়ী বাসনা অনুসারে নির্ম্মাণ করেন ও রক্ষা করেন। তিনিই এ শরীরের প্রকৃত জ্ঞাতা- ক্ষেত্রজ্ঞ। আমরা আমাদের শরীরকে প্রকৃতরূপে জানি না। আমরা নিজ ক্ষেত্রেরও প্রকৃত ক্ষেত্রজ্ঞ বা নিয়ন্তা নহি। সেই শরীরও আমাদের সম্পূ জ্ঞেয় নহে। তবে 'এ শরীর আমার' বা 'আমি এ শরীর' বলিয়া যে অজ্ঞা হেতু অভিমান হয়, তাহা হইতেই আমরা আমাদের নিজ ক্ষেত্রের বে ক্ষেত্রজ্ঞ হই। আমরা প্রকৃত ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে পারি না। এ শরীর ব ক্ষেত্র যে আমার, এ মূল অজ্ঞান দূর করিবার জন্যই শাস্ত্রে সর্ব্বত্র উপদে আছে। "অশরীরো বাব সন্তঃ প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশত"—ইতি শ্রুতি অতএব আত্মা অশরীরী,—এই জ্ঞানই পারমার্থিক। শরীরে আত্মাধ্যাস ন থাকিলে, তাহা আমার জ্ঞেয়, এ জ্ঞানও থাকে না। তখন আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ হন না। তখন জ্ঞানের ক্ষেত্রজ্ঞরূপ এ পরিচ্ছেদ দূর হয়। সুতরাং জী স্বরূপতঃ এই ক্ষেত্রজ্ঞ নহেন। পরমেশ্বরই সর্ব্বশরীরে প্রকৃত ক্ষেত্রজ্ঞ। ে অনন্ত জ্ঞান—অনন্ত শক্তি সমস্ত জগৎকে নিয়মিত করেন, শাসন করেন,

নি সমস্ত জীব জড়ময় জগৎকে শরীর (organised body) করিয়া, াহাতে আত্মা-রূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পরম পুরুষ পরমেশ্বর হন, সেই নন্ত জ্ঞান অনন্ত শক্তিই পরিচ্ছিন্ন জ্ঞাতা ভোক্তা কর্ত্তা জীবভাব কাশের জন্য এবং শরীর সৃষ্টি করিয়া তাহা ধারণ রক্ষণ ও পোষণ রেন,—আমাদের কর্ম্মফল দিতে, আমাদের অনাদিকাল প্রবৃত্ত বাসনা রিতার্থ করিতে, আমাদের শরীর সৃষ্টি করেন, এবং রক্ষা করেন। তিনিই প্রতিক্ষেত্রে জীবভাবের বিকাশ করেন। তিনিই প্রকৃত সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ। সেই অনন্ত জ্ঞানস্বরূপে সর্ব্ব পরিচ্ছিন্ন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভাব একীভূত। তিনি পরম জ্ঞাতা বলিয়াই সমুদায় জ্ঞেয় বস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

এই ভাবে ভগবান্ যে সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ তাহা জানিতে হয়। ইহা জানিতে পারিলে, প্রতিক্ষেত্রে জীবভাব যে পরমাত্মা পরমেশ্বর হইতে অভিব্যক্ত, তাঁহার সত্তায় সত্ত্বযুক্ত, তাঁহার সচ্চিদানন্দময়ত্ব হেতু জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তা এই ত্রিবিধ ভাবযুক্ত, আর পরিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রজ্ঞরূপও যে সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের স্বরূপ,—এবং ভগবান্ যে সর্ব্বদা আমাদের সন্নিহিত আমাদের অন্তরস্থিত, তিনি যে আমাদের স্থিতি রক্ষা ও পালন জন্য সর্ব্বদা নিয়ন্তা হইয়া, অন্তর্য্যামী হইয়া, আমাদের অন্তরে পরম জ্ঞাতা হইয়া, সর্ব্বদা বিরাজিত, তিনি যে অন্তরে বাহিরে, নিকটে দূরে, সর্ব্বদা অবস্থিত,—তাঁহাতে স্থিত বলিয়াই যে শরীরী আমরা জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তা চেতন জীব হইয়াছি,—ক্ষেত্রজ্ঞ হইয়াছি, আর তিনিও যে সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বাতীত হইয়াও আত্মা-স্বরূপে আমাদের এই জীবভাবের সহিত আমাদের অনুগ্রহার্থ যেন বদ্ধ হইয়া 'জীবাত্মা' হইয়া, অবিভক্ত তিনি বিভক্তের ন্যায় হইয়াছেন,—ক্ষেত্রে জীবভাবের প্রতিবিম্ব স্বয়ং প্রতিগ্রহণ করিয়া আমাদের স্বরূপ হইয়াছেন,—এক কথায় তিনিই যে আমি, আমার যে একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই—'সোঽহং'—তাহা ধারণা করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারি, কৃতার্থ হইতে পারি।

এইরূপে আমরা ক্ষেত্রজ্ঞ জীবে ও সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বরে—পরস্পর সম্বন্ধ ধারণা করিতে পারি। এক অর্থে সে সম্বন্ধ অচিন্ত্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ স্থাপন করিয়াছেন। এ সম্বন্ধ যে কেবল অভেদ সম্বন্ধ,—তাহা বলা যায় না, আবার যে কেবল ভেদ সম্বন্ধ,—ইহাও বলা যায় না। সেইরূপ এ ভেদাভেদ সম্বন্ধও আমাদের জ্ঞানে ধারণা করা যায় না। যিনি বুদ্ধি দ্বারা বিচারপূর্ব্বক কেবল অভেদবাদ বা কেবল ভেদবাদ এমনকি ভেদাভেদবাদ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি যে সফল হইয়াছেন তাহা বলা যায় না। শঙ্করাচার্য্য কেবল অভেদ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে গিয়া পরমার্থতঃ অভেদ ও ব্যবহারিক ভাবে ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে জীবাত্মা পরমার্থতঃ কেবল জ্ঞাতৃস্বরূপ। তাহার কর্ত্তা ও ভোক্তা ভাব মায়িক,—ক্ষেত্রে অধ্যাসমূলক। তাঁহার মতে জ্ঞাতা একই—বহু জ্ঞাতা থাকিতে পারে না। কারণ, তাহাতে মূল জ্ঞানের পরিচ্ছেদ হয়। জ্ঞান—একই। তাহা স্বরূপতঃ নিত্য, অপৌরুষেয়, অখণ্ড। তাহা পরমার্থতঃ জ্ঞাতা-জ্ঞেয় এই দ্বৈতভাবের অতীত। সুতরাং জ্ঞানে 'জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়' এই দ্বৈতের কারণ—মায়া। এই মায়া হেতুই জ্ঞানে জ্ঞাতা-জ্ঞেয় ভেদ হয়—বহু জ্ঞাতা ও বহু জ্ঞেয় কল্পিত হয়। তাহা পারমার্থিক সত্য নহে। আরও, এই যে জ্ঞাতৃ ভেদ—তাহাও এজন্য পারমার্থিক নহে। জ্ঞাতার জ্ঞাতাও সম্ভব নহে, এজন্য ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের জ্ঞাতা কোন ঈশ্বরও স্বীকার করা যায় না সুতরাং জীবে ঈশ্বরে বা জীবে জীবে পরমার্থতঃ কোন ভেদ নাই। এই অর্থে শঙ্কর তাঁহার অভেদবাদ ও অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে জ্ঞানের স্বপ্নাবস্থায় জ্ঞাতা জ্ঞেয় ভেদ ও অসংখ্য জ্ঞেয় বস্তুর অনুভব যেমন কাল্পনিক বা মিথ্যা, সেইরূপ জ্ঞানের জাগ্রদবস্থায়ও এই ভেদ কাল্পনিক বা মিথ্যা। জ্ঞানের স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রদবস্থা একই প্রকার। তবে প্রভেদ এই যে, জাগ্রদবস্থায় এই ভেদ-ব্যবহার থাকে, কিন্তু স্বপ্না-

স্থায় ভেদ ব্যবহার জাগ্রদবস্থায় থাকে না। সেইরূপ মুক্তিতেও জাগ্রদবস্থার ভেদ ব্যবহার থাকে না। অতএব অভেদ মধ্যে যে ভেদ —তাহা মায়িক বা কাল্পনিক—তাহা ব্যবহারিক মাত্র। কিন্তু এ পারমার্থিক এবং ব্যবহারিক ভেদ আমরা বুঝিতে পারি না। এ যুক্তিও আমাদের হৃদয়গ্রাহী হয় না। গীতায় এ ভেদ স্বীকৃত হয় নাই। গীতাতে পরম অক্ষর সৎস্বরূপের ক্ষর ভাব ও অব্যয় পরম সনাতন পুরুষ ভাব স্বীকৃত হইয়াছে।

রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অনুসারে, এবং এক অর্থে বল্লভাচার্য্যের বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ অনুসারে,সগুণ ব্রহ্মের অচিন্ত্য মায়াশক্তি মাত্র স্বীকৃত। সেই অনন্ত অচিন্ত্য শক্তি হেতু ব্রহ্ম নিত্য সগুণ। তাঁহার এ সগুণভাব নিত্য —পারমার্থিক সত্য। এই মায়াশক্তি হেতু ব্রহ্মজ্ঞানে যেরূপ বহু হইবার কল্পনা হয়, তাহা সৎরূপে বিবর্ত্তিত হয়। তাঁহাতে Thought is Being। তাঁহাতে এই "বহু হইবার" কল্পনা হইতে প্রতিষ্ঠিত তিন ভাব—চিৎ, চিদচিৎ ও অচিৎ নিত্য সিদ্ধ। চিৎ—জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বর; চিদচিৎ—জীব, আর অচিৎ—জড়। চিদচিৎ জীব ও অচিৎ জড় ভগবানেরই বিভূতি—তাঁহারই শরীর। তিনি এই চিদচিৎ ও অচিৎ বিশিষ্ট। ব্রহ্মে চিৎ ও অচিৎ ভেদ এইজন্য নিত্য। উভয়ে পরস্পরে বিরুদ্ধধর্ম্মী হইলেও একই ব্রহ্মে এই দুই পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের বিকাশ, তাঁহার অচিন্ত্য মায়া-শক্তি হেতু সম্ভব হয়। আরও চিদচিৎ জীব—চিদংশে বা চিৎস্বরূপে পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন, কিন্তু অচিদংশে ভিন্ন। এইরূপে ভেদাভেদ বাদ সিদ্ধ হয়। কিন্তু ইহাতেও এই ভেদাভেদ আমাদের বোধগম্য হয় না। ব্রহ্ম কিরূপে বিশিষ্ট হন এবং বিশিষ্টত্বহেতু তাঁহার নির্গুণ নির্ব্বিশেষ স্বরূপের হানি হয় কিনা, তাহা আমরা জ্ঞানে ধারণা করিতে পারি না। এজন্য রামানুজ প্রভৃতি অধিকাংশ বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ এই নির্গুণ নির্ব্বিশেষ গীতোক্ত উক্ত অক্ষর পরমভাব স্বীকার করেন নাই। শ্রুতিতে ও গীতায় এই

উপদেশ কেবল যুক্তি তর্ক দ্বারা আমরা সিদ্ধান্ত করিতে যাইলে, এইরূপে আমাদের অনেক গোলযোগে পড়িতে হয়।

নিম্বার্কাচার্য্যের ভেদাভেদবাদ, এস্থলে কেশবাচার্য্য যেরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু কেশবাচার্য্যের ব্যাখ্যায় নিম্বার্কাচার্য্যের সবিশেষ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদের বড় আভাস পাওয়া যায় না। তিনি নিম্বার্কের ভেদাভেদবাদ বুঝাইয়াছেন। এ মতে জীব-ঈশ্বরে ভেদ নিত্যসিদ্ধ। অংশ-অংশী ভাবে ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাবে, নিয়ামক-নিয়ন্তৃভাবে পরতন্ত্র-স্বতন্ত্রভাবে—ইত্যাদি প্রকারে এ ভেদ নিত্যসিদ্ধ। কিন্তু অংশীর সহিত অংশের, ব্যাপকের সহিত ব্যাপ্যের নিয়ন্তার সহিত নিয়ামকের ও স্বতন্ত্র বস্তুর সহিত তদধীন বা তৎপরতন্ত্র বস্তু সমুদায়ের প্রকৃতপক্ষে ভেদও নাই। অংশীর স্বভাব ও ধর্ম্ম অংশেই অভিব্যক্ত হয়। স্বতন্ত্র নিয়ন্তার সহিত তৎপরতন্ত্র নিয়ম্যের পার্থক্য থাকে না। এইরূপে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরে ও অল্পজ্ঞ জীবে ভেদাভেদ সিদ্ধ হয়। কিন্তু এ অর্থেও ভেদাভেদবাদ ধারণা করা যায় না। ইহাতে দ্বৈতবাদেরই ছায়া পড়ে। আরও যাহা এক—নিষ্কল নিরংশ পূর্ণ তত্ত্ব, তাহা কিরূপে বহু অংশে বিভক্ত হইয়াও নিরংশ থাকেন ও সর্ব্ব অংশের নিয়ন্তা থাকেন, তাহা আমাদের জ্ঞানে ধারণা হয় না। আর এইরূপ ভেদাভেদবাদ বা ভেদবাদ বেদান্তের ‘সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম’ ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ ইত্যাদি অভেদ প্রতিপাদক বাক্যের বিরোধী বোধ হয়। গীতা হইতেও এ বাদ স্থাপিত হয় নাই। যদি জীব-ব্রহ্মে বা জীব-ঈশ্বরে ভেদ নিত্যসিদ্ধ হইত, যদি মুক্তিতেও এ ভেদ দূর হইবার সম্ভাবনা না থাকিত, তবে গীতার ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি বা ঈশ্বরভাব প্রাপ্তি সম্বন্ধে উপদেশ বৃথা হইত। * গীতায় যে সর্ব্বভূতে একভাব

---

* গীতায় ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি সম্বন্ধে—৫।২৪, ৬।২৭, ১৪।২৬, ১৮।৫৩ শ্লোক, এবং স্বভাব ঈশ্বরভাব প্রাপ্তি সম্বন্ধে—৪।১০, ৮।৫, ১৩।১৮, ১৪।১৯ প্রভৃতি শ্লোক দ্রষ্টব্য।

দর্শনের এবং সর্ব্বভূতে ব্রহ্মভাব বা সমত্ব দর্শনের উপদেশ আছে, তাহা ব্যর্থ হইত।

অন্য দিকে, যদি শঙ্করের অভেদবাদ গ্রহণ করা যায়, তবে বিধিনিষেধ শাস্ত্র সমুদায়ও ব্যর্থ হয়। শঙ্কর এই আপত্তির যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা সঙ্গত মনে হয় না। গীতাতেও নানারূপ সাধনার উপদেশ আছে। গীতায় জীবাত্মার ব্রহ্মভাব বা ঈশ্বরভাব লাভ করিবার জন্য কর্ম্মযোগ, ধ্যানযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগরূপ বিভিন্ন সাধনার উপদেশ আছে। কিন্তু শঙ্করের মত গ্রহণ করিলে, এ সকল ব্যর্থ হয়। যখন জীবাত্মার ব্রহ্মভাব নিত্য সিদ্ধ—জীবাত্মা যখন নিত্য শুদ্ধমুক্তবুদ্ধস্বভাব, তখন তাঁহার স্ব-ভাব লাভের জন্য কোন সাধনার প্রয়োজন হয় না। তবে অজ্ঞান বা অবিদ্যা হেতু যে বদ্ধভাব বা সংসারিভাব হয়, তাহা দূর করিবার জন্য জ্ঞানদ্বারা সেই অজ্ঞানকে দূর করিতে হয়, এই মাত্র প্রয়োজন। ইহাই শঙ্করের সিদ্ধান্ত। সুতরাং এ মতে গীতার সকল প্রকার সাধনার উপদেশ ব্যর্থ হয়। জীবাত্মার বা প্রতিক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞের সহিত সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মার পরমার্থতঃ অভেদ থাকিলেও সংসার-দশায় এবং পরা মুক্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এ ভেদভাব বাস্তবিক সত্য, ইহা সিদ্ধান্ত না করিলে, সে ভেদ দূর করিবার জন্য গীতোক্ত সাধনার সার্থকতা থাকে না।

অতএব কেবল অভেদবাদ বা কেবল ভেদবাদ ধারণা করা যায় না। উক্ত ভেদাভেদবাদও আমরা ধারণা করিতে পারি না। এই ভেদাভেদ-বাদও আমাদের অচিন্ত্য। এক অদ্বয় তত্ত্ব কিরূপে কেন বহু হন—বা বহুর ন্যায় হন, কেন নানাবিধ ভাবে অভিব্যক্ত হন, তাহা আমরা বুঝি না। ভগবান্ বলিয়াছেন, আমার এ 'প্রভব'—দেবমানব বা মানুষ কেহই জানে না। (গীতা ১০।২)।

সুতরাং যুক্তি ও বিচার দ্বারা কোন বাদ স্থাপন করিতে চেষ্টা করা বৃথা। গীতায় যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, গীতা সমন্বয়পূর্ব্বক, ও তাহার

সহিত শ্রুতি প্রভৃতি সমন্বয় পূর্ব্বক তাহার অর্থ বুঝিতে হইবে, এবং গীতোক্ত সাধনা দ্বারা সিদ্ধ হইয়া চিত্ত নির্ম্মল করিয়া ও যোগদৃষ্টি লাভ পূর্ব্বক সেই তত্ত্ব বিজ্ঞান সহিত জানিতে হইবে ও তাহা অনুভব করিতে হইবে। তবে আমরা সেই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব। এ জ্ঞান লাভের পূর্ব্বে গীতা ও শ্রুতি প্রভৃতি শাস্ত্র সমন্বয় পূর্ব্বক প্রথমে এ শ্লোকের অর্থ বুঝিতে হইবে।

এক্ষণে আরও এক কথা বুঝিতে হইবে। এস্থলে উক্ত হইয়াছে যে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ এ উভয়ের জ্ঞানই জ্ঞান। এক অর্থে ইহা ব্যতীত জ্ঞানের বিষয় আর কিছুই নাই। জ্ঞান যে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়রূপে ভিন্ন হয়, সেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিলেই জ্ঞানের চরিতার্থতা হয়। যাহা জ্ঞেয় 'ইদং' সে সমুদায়ই সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে এস্থলে ক্ষেত্র নামে অভিহিত। আর যাহা জ্ঞাতা—তাহা 'ক্ষেত্রজ্ঞ' নামে অভিহিত। ক্ষেত্রজ্ঞকে প্রতি ব্যষ্টি ক্ষেত্রে স্থিত 'আত্মা'রূপে দেহী পুরুষরূপে, এবং সমষ্টি ক্ষেত্রে অন্তর্য্যামী নিয়ন্তা ঈশ্বর পরমাত্মারূপে জানিতে হয়। ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞাতাকে প্রতিক্ষেত্রে পরিচ্ছিন্ন 'অহং' ও সর্ব্বক্ষেত্রে সমষ্টিভাবে অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বক্ষেত্রে 'অহং' রূপে জানিতে হয়।

এই প্রতি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞকে ক্ষেত্রমধ্যে পৃথক্ ভাবে—ক্ষেত্র হইতে পৃথক্ করিয়া জানিতে হয়, এবং সেই জ্ঞান হইতে সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান হয়। এইরূপে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান হইলে, এ উভয়ের সমন্বয়ে এ উভয়কে একীভূত করিয়া, তবে পরম ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারা যায়,—যাঁহাতে 'সর্ব্বং খল্বিদং' এবং সর্ব্বং 'অহং' ভাব একীভূত, সেই পরম তত্ত্ব জানিতে পারা যায়। যাহাকে জানিতে হয়—তাহা 'জ্ঞেয়', তাহার সম্বন্ধে 'জিজ্ঞাসা' হয়। —ক্ষেত্র অবশ্য এইরূপে 'জ্ঞেয়'। কিন্তু জ্ঞাতা যিনি, তিনি জ্ঞেয় হন কি? শঙ্কর বলিয়াছেন যে, জ্ঞাতা কখন জ্ঞেয় হন না। এই তত্ত্ব সহজে ধারণা হয় না। 'জ্ঞেয়' যাহা, তাহা জ্ঞাতা নহে, অথচ গীতায় পরম ব্রহ্মকে জ্ঞেয় বলা হইয়াছে, ঈশ্বরকে বিজ্ঞান সহিত জানিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

ঈশ্বর—'বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ' (গীতায় ১১।৩৮), ব্রহ্ম 'জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং' (গীতায় ১৩।১৭)। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, ব্রহ্ম জ্ঞাতার জ্ঞাতা। সে তত্ত্ব কিরূপে জ্ঞেয় হইবে, বা জিজ্ঞাসার বিষয় হইবে, ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। 'জ্ঞাতা' ও 'জ্ঞেয়' এ উভয় তত্ত্ব—যে ভূমিতে একীভূত, সে ভূমি না লাভ করিলে, ইহা অনুভব করা যায় না। এস্থলে এই মাত্র বলা যায় যে, জ্ঞাতার জ্ঞাতৃভাবের মধ্যে—তাহার 'আত্ম-প্রত্যয়' মধ্যে ব্রহ্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব অভিব্যক্ত হয় বলিয়া তাহা 'জ্ঞেয়' বলা যায়। তাহা জ্ঞেয় 'ইদং' নহে। জ্ঞাতৃভাব জ্ঞেয় সম্বন্ধে অপরোক্ষভাবে জ্ঞানের মধ্যেই অনুভূত হয়। এই অর্থে 'জ্ঞাতা' জ্ঞেয় হন। এই অর্থে ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন, ঈশ্বরতত্ত্বও জ্ঞানের বিষয় হয়, এবং তাহা জানিবার উপদেশ সার্থক হয়। কিন্তু তাহা বাহ্য বিষয়জ্ঞানের ন্যায় জ্ঞেয় নহে। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই জ্ঞানের অন্তর্ভূত হয়। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন যে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই জ্ঞান। এই ত্রয়োদশ হইতে শেষ অধ্যায় পর্য্যন্ত গীতায় এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। বলিয়াছি ত, ক্ষেত্রই প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন সাংখ্যোক্ত ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব। পরে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে ইহা বিবৃত হইয়াছে। তাহাই সমষ্টিভাবে ও ব্যষ্টিভাবে শরীর বা ক্ষেত্র। এই প্রকৃতি-তত্ত্ব প্রকৃতিজ ত্রিগুণ তত্ত্ব—সমুদায়ই এই তৃতীয় ষট্‌কে বিবৃত হইয়াছে। আর ক্ষেত্রজ্ঞ বা ত্রিবিধ পুরুষতত্ত্ব—সমুদয়ও এই ষট্‌কে বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহাই সমষ্টিভাবে সমগ্র ব্রহ্মতত্ত্ব বা তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন।

সুতরাং এই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে যাহা সূত্ররূপে উক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ এই তৃতীয় ষট্‌কে বিস্তারিত হইয়াছে। এই ষট্‌কে যত অগ্রসর হওয়া যাইবে, ততই এই দুই শ্লোকের অর্থ প্রতিভাত ও পরিস্ফুট হইতে থাকিবে,—ততই আমাদের ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান লাভ হইবে। এস্থলে তাহার আভাসমাত্র পাইলেই যথেষ্ট হইবে।

এই দুই শ্লোক হইতে আমাদের এইমাত্র জানিতে হইবে যে, প্রকৃত জ্ঞান লাভের জন্য আমাদের "ক্ষেত্র" কি, তাহা জানা নিতান্ত প্রয়োজন, এবং সেই ক্ষেত্রের বেত্তা 'ক্ষেত্রজ্ঞ' ও সর্ব্বক্ষেত্রের বেত্তা 'ক্ষেত্রজ্ঞ' কে, তাহা জানা নিতান্ত প্রয়োজন। সংক্ষেপতঃ এই শরীরই ক্ষেত্র, এই শরীরের বেত্তা যিনি, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, আর সর্ব্বক্ষেত্রে বা এই চরাচর জগতে সমষ্টিভাবে বেত্তা বা ক্ষেত্রজ্ঞ যিনি, তিনি পরমাত্মা পরমেশ্বর। জ্ঞানযোগে এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-জ্ঞান-সিদ্ধি হয়। এই জ্ঞানই পরমার্থ জ্ঞান—মুক্তি-হেতু।

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥ ৩

সে ক্ষেত্র যা', যে প্রকার, যে বিকারযুত
যা' হ'তে, যা' হয় আর,—সে ক্ষেত্রজ্ঞ পুনঃ—
যাহা, যে প্রভাবযুত,—শুন সংক্ষেপেতে॥ ৩

৩। সে ক্ষেত্র যা'—পূর্ব্বে 'ইদং শরীরং' এই বাক্যের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট যে ক্ষেত্র, সেই ক্ষেত্র যেরূপ (শঙ্কর)। সেই জ্ঞাতব্য ক্ষেত্র যেরূপে যে ভাবে—জ্ঞেয় (গিরি)। সেই ক্ষেত্র যে দ্রব্য (রামানুজ, কেশব, বলদেব), বা যদাত্মক (হনু)। যে শরীরের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহা স্বরূপতঃ যে জড় দৃশ্য পরিচ্ছিন্ন ইত্যাদি স্বভাবযুক্ত (স্বামী, মধু)। যদিও চতুর্বিংশতি তত্ত্বে বিভক্ত যে মূল প্রকৃতি, তাহাই ক্ষেত্র, ইহাই এস্থলে অভিপ্রেত, তথাপি দেহরূপে পরিণত ইহাতে 'অহং' এইরূপ অবিবেক হয়। সেই অবিবেক দূর করিবার জন্য এই দেহ সম্বন্ধে উপদেশ, (স্বামী)।

যে প্রকার—(যাদৃক্)—ইহা স্বকীয় ধর্ম্মের দ্বারা যাদৃশ প্রতীয়মান হয় (শঙ্কর)। জন্মাদি তাহার ধর্ম্ম যেরূপ (গিরি)। ধর্ম্মতঃ যে প্রকার (কেশব)। যে আশ্রয়ভূত (রামানুজ, বলদেব)। যেরূপ ইচ্ছাদি ধর্ম্মযুক্ত (স্বামী, মধু)।

যে বিকারযুত—(যদ্বিকারি)—যাহা ইহার বিকার (শঙ্কর)। যে সকল কার্য্য ইহা হইতে উৎপন্ন হয়, সেই কার্য্যের কারণরূপ (গিরি, রামানুজ)। যে ইন্দ্রিয়াদি বিকারযুক্ত (স্বামী)। ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা যে বিকারযুক্ত (মধু)। যে সকল বিকার দ্বারা যুক্ত (কেশব)।

যা' হতে, যা' হয়—(যতশ্চ যৎ)—যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, ও যে কার্য্য উৎপাদন করে (শঙ্কর, মধু)। যাহা হইতে ইহা উৎপন্ন, ও যে প্রয়োজনে উৎপন্ন (রামানুজ, বলদেব)। যেরূপ প্রকৃতি-পুরুষ-যোগে উৎপন্ন ও যে প্রকার স্থাবর-জঙ্গমাদি-ভেদে ভিন্ন (স্বামী, মধু, কেশব)।

সে ক্ষেত্রজ্ঞ পুনঃ—(স চ)—আর যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, তিনি (শঙ্কর, রামানুজ, গিরি, স্বামী)। আর সেই ক্ষেত্রের ন্যায় যে ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞাতব্য, যাহা চক্ষুঃ প্রভৃতি উপাধিকৃত দৃষ্টি প্রভৃতি শক্তিবলে জ্ঞাতব্য হইয়াছে (গিরি)। সেই জীব ও পরমেশ-লক্ষণ ক্ষেত্রজ্ঞ (বলদেব)। পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ (কেশব)।

যাহা—(যঃ) স্বরূপতঃ যাহা (রামানুজ, স্বামী)। যে স্বপ্রকাশ চৈতন্য আনন্দ-স্বভাব (মধু)। যে স্বরূপ (কেশব)।

যে প্রভাবযুত—যে উপাধিকৃত শক্তিযুক্ত (শঙ্কর, মধু)। অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যযোগে যে প্রভাব-সম্পন্ন (স্বামী)। যে শক্তিযুক্ত (বলদেব)। সূক্ষ্ম হইয়াও ব্যাপক, ইত্যাদিরূপ অচিন্ত্য প্রভাবযুক্ত (বল্লভ)। যে প্রভাব দ্বারা ইহা জ্ঞাতব্য (গিরি)। ইহার যে সকল প্রভাব (কেশব)।

শুন সংক্ষেপেতে—সেই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের যথার্থ তত্ত্ব সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর (শঙ্কর)।

এই ক্ষেত্র কি, তাহার ধর্ম্ম কি, তাহার বিকার কি, তাহার কারণ কি, ও তাহার কার্য্য কি,—এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ যাহা ও যেরূপ প্রভাব-যুক্ত, তাহাই ভগবান্ সংক্ষেপে অর্জ্জুনকে শ্রবণ করাইতেছেন। সংক্ষেপে শ্রবণ করাইবার কারণ পরবর্ত্তী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। সংক্ষেপ হইলেও সমগ্র তৃতীয় ষট্‌কে তাহা বিস্তারিত হইয়াছে। এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, এ শ্লোকে একই ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ ও প্রভাবের কথা উক্ত হইয়াছে। এখানে ক্ষেত্রজ্ঞের কোন ভেদ উক্ত হয় নাই।

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪

ঋষিগণ দ্বারা ইহা গীত বহুরূপে,—
বিবিধ পৃথক্ ছন্দে, আরও কতরূপ—
যুক্তিযুক্ত সুনিশ্চিত ব্রহ্মসূত্রপদে ॥ ৪

৪। ঋষিগণ—বশিষ্ঠাদি (শঙ্কর, স্বামী)। আপ্ত ঋষিগণ (গিরি)। পরাশরাদি (রামানুজ, বলদেব, কেশব)।

গীত—নিরূপিত (স্বামী, কেশব)। কথিত (শঙ্কর)।

বহুরূপে—(বহুধা)—যোগশাস্ত্রে ধ্যান-ধারণাদির বিষয় 'বিরাট' ইত্যাদি স্বরূপে নানা প্রকারে (স্বামী, মধু)। ধর্ম্ম-শাস্ত্রে নানা প্রকারে, (মধু)। বহুপ্রকারে (কেশব)। রামানুজ ও বলদেব এই গীতের কিঞ্চিৎ 'পরাশরস্মৃতি" হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—

"অহং ত্বঞ্চ তথান্যে চ ভূতৈরুহ্যাম পার্থিব।
গুণপ্রবাহপতিতো ভূতবর্গোঽপি যাত্যয়ম্॥

কর্ম্মবশ্যা গুণা হ্যেতে সত্ত্বাদ্যাঃ পৃথিবীপতে।
অবিদ্যাসঞ্চিতং কর্ম্ম তচ্চাশেষেষু জন্তুষু॥
আত্মা শুদ্ধোঽক্ষরঃ শান্তো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
তথা পিণ্ডঃ পৃথক্ পুংসঃ শিরআস্যাদি-লক্ষণঃ॥
ততোঽহমিতি কুত্রৈতাং সংজ্ঞাং রাজন্ করোম্যহম্॥

*   *   *   *

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিং সত্ত্বং তেজোবলং ধৃতিঃ।
বাসুদেবাত্মকান্যাহুঃ ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ॥" ইত্যাদি

ইহা—এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের প্রকৃত স্বরূপ (শঙ্কর)। শঙ্কর বলিয়াছেন যে, শ্রোতার বুদ্ধি-প্ররোচনের জন্য এইরূপে এই ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্বের প্রশংসা এস্থলে করা হইয়াছে। স্বামী প্রভৃতি বলেন, যে তত্ত্ব অন্যত্র বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাই সংক্ষেপে একত্র এস্থলে সংগৃহীত হইয়াছে, ইহাই এরূপ বলিবার অভিপ্রায়।

বিবিধ পৃথক্ ছন্দে—ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব—বেদের এই সংহিতায় নানা প্রকারে বিভিন্ন পৃথক্ ভাবে এই তত্ত্ব এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-স্বরূপ বিবেকতঃ বর্ণিত হইয়াছে (স্বামী)। বিবিধ অর্থাৎ নানা-প্রকারে, পৃথক্ অর্থাৎ বিবেকতঃ (অর্থাৎ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ পূর্ব্বক), (শঙ্কর)। নানা প্রকার বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত বেদে (গিরি)। নিত্যনৈমিত্তিক কাম্যকর্ম্মাদি-বিষয়ক বেদ দ্বারা নানা পূজনীয় দেবতা-রূপে গীত (স্বামী)। বিবিধ নিত্যনৈমিত্তিক কাম্যকর্ম্মাদি-বিষয়ক ঋক্ প্রভৃতি মন্ত্রে এবং 'ব্রাহ্মণে' পৃথক্ ভাবে গীত (মধু)। বেদে বিবিধ কর্ম্মজ্ঞান উপাসনা নানারূপে, এবং অধিকারি-ভেদে পৃথক্ ভাবে গীত (বল্লভ)।

রামানুজ, কেশব ও বলদেব, ইহার এই দৃষ্টান্ত দিয়াছেন,—

"তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাৎ বায়ুঃ,

বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেঃ আপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী, পৃথিব্যা ওষধয়ঃ, ওষধিভ্যোঽন্নং, অন্নাৎ পুরুষঃ। স বা এষ পুরুষঃ অন্নরসময়ঃ।"

(কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ২।১।১)

এইরূপে অন্নরসময় পুরুষের, বা সেই শরীরাভিমানী পুরুষের কথা উক্ত হইয়াছে। পরে তাহা হইতে ভিন্ন প্রাণময় কোষ, প্রাণময় কোষ হইতে ভিন্ন মনোময় কোষ, মনোময় কোষ হইতে ভিন্ন বিজ্ঞানময় কোষ—ইহা উক্ত হইয়াছে। আর বিজ্ঞানময় কোষ যে বিজ্ঞানাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ, তাহা কথিত হইয়াছে। পরে "তস্মাদ্বা এতস্মাৎ মনোময়াৎ অন্যোঽন্তরো আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ'—এই বাক্য দ্বারা এই ক্ষেত্রজ্ঞ-স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে, এবং এই বিজ্ঞানময় শরীর-অভিমানী ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ হইতে ভিন্ন আনন্দময় কোষ-অভিমানী অন্তরাত্মা যে ক্ষেত্রজ্ঞেরও অন্তরাত্মা বা শান্ত পরমাত্মা, তাহা অভিহিত হইয়াছে, (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ব্রহ্মানন্দবল্লী দ্রষ্টব্য)। এইরূপে ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব বেদে ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে, অথবা ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ পৃথক্ ভাবে, তাহাদের ব্রহ্মাত্মস্বরূপ সুস্পষ্ট গীত হইয়াছে।

ব্রহ্মসূত্রপদে—ব্রহ্মের স্বরূপপ্রকাশক যে সকল মহাবাক্য আছে, ঐ সকল বাক্যের সাহায্যে ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়। এজন্য এগুলিকে পদও বলা যায়। "আত্মা ইতি এব উপাসীত"—ইত্যাদি বেদান্তবাক্য সমূহই ব্রহ্মসূত্রপদ (শঙ্কর, গিরি)। যাহাতে ব্রহ্ম সূত্রিত বা প্রতিপাদিত হন, সেই সকল বাক্য ব্রহ্মসূত্র। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি"...ইত্যাদি—তটস্থ-লক্ষণপর উপনিষদ্বাক্য সকল—যাহাতে সাক্ষাদ্ভাবে ব্রহ্ম প্রতিপাদিত, তাহাই ব্রহ্মসূত্রপদ। উপনিষদ্বাক্য ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ-জ্ঞাপকও বটে। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"—ইহা ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ-প্রতিপাদক পদ। ইহাই ব্রহ্মসূত্রপদ। অথবা

ব্রহ্মসূত্রপদই বেদান্ত-দর্শন। 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'—ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র-পদ। (স্বামী, মধু)।

ব্রহ্ম-প্রতিপাদক সূত্রাখ্য পদ বা বাক্যই শারীরক সূত্র বা বেদান্ত-দর্শন। বেদান্ত-দর্শনে—"ন বিয়দ শ্রুতেঃ" প্রভৃতি সূত্রে ক্ষেত্রের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, 'ন আত্মা শ্রুতেনিত্যত্বাচ্চ'—ইত্যাদি সূত্রে জীবস্বরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে,—"পরাৎ তু তৎশ্রুতেঃ"—ইত্যাদি সূত্রে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর-স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে (রামানুজ, বলদেব, কেশব, বল্লভ)। কেশবাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"যে অল্পাক্ষর বাক্যে ব্রহ্ম সূত্রিত বা বেষ্টিত হন, তাহা ব্রহ্মসূত্রপদ। বেদেই এই সকল ব্রহ্মসূত্রপদ আছে,—তাহাতে স্বরূপ গুণ বিভূতি সহিত ব্রহ্মতত্ত্ব সূত্রিত হইয়াছে। সূত্রের লক্ষণ এই,—

"স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ বিশ্বতোমুখম্।
অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ॥"

অথবা ব্রহ্মসূত্র অর্থে শারীরক মীমাংসা-সূত্র। তাহাতে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-স্বরূপ যাথাত্ম্য প্রতিপাদিত হইয়াছে।

"আপত্তি হইতে পারে যে, ব্রহ্মপ্রতিপাদক পদ কিরূপে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-প্রতিপাদক পদ হইতে পারে? আর যাহাতে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাকেই বা কিরূপে ব্রহ্মসূত্রপদ বলা যায়? ইহার উত্তর এই যে, ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপণের অসাধারণ হেতু,—ব্রহ্মের জগৎ জন্মাদির উপাদানত্ব, জগতের নিয়ন্তৃত্ব, প্রবর্ত্তকত্ব, স্বতন্ত্রত্ব, ব্যাপকত্ব, অনুগ্রাহকত্ব ইত্যাদি ধর্ম্মের নিরূপণ। ব্রহ্ম-উপাদেয়ত্ব তৎ-নিয়ম্যত্ব, তৎপ্রবর্ত্তকত্ব, তৎ-তন্ত্রত্ব, তদ্ব্যাপ্যত্ব, তদনুগ্রাহ্যত্ব ইত্যাদি ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-স্বরূপ নিরূপণ বিনা ইহা উপপন্ন হয় না। অতএব ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-প্রতিপাদন দ্বারা ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হন। এই জন্য ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-প্রতিপাদক পদও ব্রহ্মপ্রতিপাদক। বেদান্ত-দর্শনে "ন বিয়দ শ্রুতে" ইত্যাদি পদ

দ্বারা কার্য্য-কারণ ভাবে ক্ষেত্র-নির্ণয় হইয়াছে ও "নাত্মাশ্রুতে-নিত্যত্বাচ্চ" ইত্যাদি সূত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ নির্ণীত হইয়াছে।*

যুক্তিযুক্ত, সুনিশ্চিত—(হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ)—এই সকল ব্রহ্মসূত্রপদ যুক্তিযুক্ত, এবং ইহা দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহাতে সংশয় থাকে না,—সে জ্ঞান নিশ্চয়াত্মক, (শঙ্কর)। তাহা হেতুযুক্ত, ও নির্ণয়াত্মক (রামানুজ)।

ইহাই সূত্রের লক্ষণ। সূত্র অজ্ঞাত অর্থের বোধক, এজন্য ইহা হেতুমৎ। ইহাতে নিশ্চিত অর্থ অবধারিত হয়, এজন্য ইহা সুনিশ্চিত পদ (কেশব)।

এ সম্বন্ধে উপনিষদ্‌বাক্য যে যুক্তিযুক্ত, তাহার দৃষ্টান্ত এই :—'স দেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ,...কথমসতঃ সজ্জায়েত। কো হ্যেবান্যাৎ, কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ এষ হ্যেব আনন্দ যাতি"...ইত্যাদি। আর তাহা যে বিনিশ্চিত, অর্থাৎ উপক্রম উপসংহারে একবাক্য হেতু অসন্দিগ্ধভাবে অর্থপ্রতিপাদক, তাহাও সে স্থলে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে (স্বামী, কেশব, মধু)। বেদান্ত-দর্শনেও "ঈক্ষতে নাশব্দং" "আনন্দময়োভ্যাসাৎ" ইত্যাদি যুক্তিযুক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব নিশ্চিতরূপে প্রতিপাদক সূত্রপদও আছে, (স্বামী)। বিনিশ্চিত—অর্থাৎ নিঃসন্দিগ্ধ স্বানুভবপ্রতিপাদক (বল্লভ)।

শ্লোকার্থ।—এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব, পূর্ব্বে এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা শেষে বিবৃত হইয়াছে। এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্বই সমগ্র তত্ত্ব (গীতা ১৩।২৬)। ভোক্তা (ক্ষেত্রজ্ঞ জীব) ভোগ্য (জড় ক্ষেত্র) এবং প্রেরয়িতা (সর্ব্ব-ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর)—ইহাই যে ত্রিবিধ ব্রহ্ম, তাহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (১।১২) উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই জ্ঞান (গীতা, ১৩।২)। উক্ত শ্লোকে এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। ইহা বহুরূপে নানাপ্রকারে বিস্তারিত ভাবে

কোথায় বিবৃত হইয়াছে, তাহা এই শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে। কোথায় এই তত্ত্ব বিস্তারিত ভাবে বিবৃত হইয়াছে, তাহা এই শ্লোকের অর্থ হইতে জানা যায়। সমুদায় ব্যাখ্যাকারগণ বলেন যে, এই তত্ত্ব (১) ঋষিগণ দ্বারা, (২) বিবিধ ছন্দ দ্বারা এবং (৩) ব্রহ্মসূত্রপদ দ্বারা বহুরূপে গীত হইয়াছে। মধুসূদন বলিয়াছেন, ঋষিগণ দ্বারা—ধর্ম্ম-শাস্ত্রে, ছন্দ দ্বারা অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডপ্রতিপাদক বেদসংহিতা ও ব্রাহ্মণ দ্বারা, এবং ব্রহ্মসূত্রপদ দ্বারা—অর্থাৎ উপনিষদ বা জ্ঞানকাণ্ড-প্রতিপাদক বেদান্ত অথবা বেদান্ত-দর্শন দ্বারা ইহা বিবৃত হইয়াছে।

কিন্তু ইহার আর এক অর্থ হইতে পারে। ঋষিগণই এ তত্ত্ব নানা-রূপে প্রচার করিয়াছেন। ছন্দ ও ব্রহ্মসূত্রপদ দ্বারাই তাঁহারা এই পরমার্থ-তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। এ শ্লোকে, ঋষিগণ কর্ত্তা আর ছন্দ ও ব্রহ্মসূত্রপদ করণ মাত্র। ইহাই সঙ্গত অর্থ। ঋষি, ছন্দ ও ব্রহ্মসূত্রপদ সমানাধিকরণ নহে, আর ঋষিগণের উক্তি ছন্দ ও ব্রহ্মসূত্রপদ ব্যতীত আর কোথাও পাওয়া যায় না। ঋষিগণ ত্রিকালদর্শী। তাঁহারা অতীত-অনাগত-দ্রষ্টা (যাস্ক)। তাঁহারাই বেদমন্ত্র-দ্রষ্টা। তাঁহারাই আপ্ত। তাঁহাদের বাক্যই প্রামাণ্য।

এই অর্থে, এক আপত্তি হইতে পারে যে, বেদ বা ছন্দ ত অপৌরুষেয়। বেদ—শ্রুতি। তাহা পরম্পরাগত। সুতরাং বেদ ত ঋষি-বাক্য নহে। কিন্তু ইহা বলা যায় না। বেদ অপৌরুষেয় হইলেও বেদ-মন্ত্রের যাঁহারা দ্রষ্টা, তাঁহারাই ঋষি। ঋগ্বেদে প্রতি সূক্তের দ্রষ্টা ঋষির নাম আছে। ঋগ্বেদের প্রধান মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি সাত জন। তাঁহাদিগকে সপ্তর্ষি বলে। ঋগ্বেদে মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষির সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ তিন শত উনত্রিশ জন। তন্মধ্যে সপ্তর্ষিগণই প্রধান। উক্ত সপ্তর্ষিগণের নাম,—বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, গোতম, জমদগ্নি, অত্রি ও কশ্যপ। অন্য ঋষিগণের মধ্যে, এস্থলে গৃৎসমদ, মেধাতিথি, অগস্ত্য, দীর্ঘতমা প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

অতএব যাঁহারা বেদমন্ত্র-দ্রষ্টা, তাঁহারাই ঋষি। বেদ অপৌরুষেয় সত্য,—তাহা নিঃশ্বসিতবৎ সৃষ্টিকালে হিরণ্যগর্ভ বা মহাভূত হইতে স্বতঃ প্রকাশিত। যে বিদ্যা বা যে জ্ঞান নিত্য, যাহা সত্য, যাহার মূলে এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত, যে শব্দব্রহ্ম (Word) এই জগৎরূপে—যে Thought এই Being রূপে অভিব্যক্ত,—তাহাই বেদ। ব্রহ্মের বহু হইবার ঈক্ষণ হইতে যে জগতের কল্পনা,—তাহা নাম রূপের দ্বারা ব্যাকৃত হয়। (তৈত্তিরীয় উপঃ ২।৬।১ দ্রষ্টব্য)। মূল বেদ সেই ব্রহ্মজ্ঞানে জগৎরূপে অভিব্যক্তির বা বিকাশের তত্ত্ব-প্রকাশক। ব্রহ্মজ্ঞান যেরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া জীবজড়ময় জগৎ প্রকাশ করে, সেই জ্ঞান বাক্য বা শব্দ দ্বারাই ব্যক্ত হয়। বাক্য বা শব্দ দ্বারা জ্ঞান যেরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া জগৎরূপ হয়, যাহা logical development of the Logvs, তাহাই বেদ। বেদ ব্রহ্মেই অভিব্যক্ত, সুতরাং নিত্য—অপৌরুষেয়, তাহা কোন পুরুষের সৃষ্ট নহে। কিন্তু সেই সকল নিত্য সত্য, যাহা হিরণ্যগর্ভের মধ্যে নিহিত, তাহা যথা-কালে ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ দ্বারাই প্রকাশিত হয়। যিনি ত্রিকালদর্শী ঋষি, তিনিই এই সকল সত্য দর্শন করেন—অন্তরে যোগদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেন, এবং তাহা লোকহিতার্থ প্রচার করেন। আমাদের ঋষিগণ যে সত্য এইরূপে দর্শন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই আমাদের বেদ। এই জন্য নিরুক্ত অনুসারে ঋষির অর্থ বেদমন্ত্র-দ্রষ্টা। তাঁহারা সত্য দর্শন—করেন বা আবিষ্কার করেন (discover করেন) মাত্র, তাঁহারা তাহার সৃষ্টি (invent) করেন না। সত্য নিত্য—তাহার সৃষ্টি নাই।

ঋষিগণ যে মন্ত্র দর্শন করিয়াছেন,তাহাই আমাদের বেদরূপে সংগৃহীত। বেদের মূলমন্ত্রগুলি ঋক্। কতকগুলি মন্ত্র মিলিয়া এক এক সূক্ত। এই সূক্ত গুলি ঋগ্বেদরূপে সংগৃহীত। তাহার যে অংশ গীত হয়, তাহা সামবেদ। তাহার যে অংশ যজ্ঞে বিনিয়োগ হয়, প্রধানতঃ তাহাই—যজুর্ব্বেদ। ইহাই ত্রয়ী। বেদের দুই অংশ—সংহিতা, এবং ব্রাহ্মণ। সংহিতা অংশকেই ছন্দ

বলে। তাহাই বেদের মন্ত্র-ভাগ। 'ব্রাহ্মণের' শেষ অংশ 'আরণ্যক'। আরণ্যকের শেষ অংশ উপনিষদ্। এ সকলই শ্রুতি—বেদের অন্তর্গত, কিন্তু ইহারা "ছন্দ নহে"। বেদাঙ্গ—শিক্ষা, কল্পসূত্র প্রভৃতিও বেদের অন্তর্গত। তাহা শ্রুতিও নহে। বেদের সংহিতা অংশ প্রধানতঃ শ্রুতি হইলেও, ব্রাহ্মণ অংশকেও শ্রুতি বলে। সকল শ্রুতিরই দ্রষ্টা ঋষিগণ। অতএব ঋষিগণ যে সত্য দর্শন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা বহু অতীতকাল হইতে গুরুপরম্পরাক্রমে শ্রুত হইয়া শিষ্যগণ লাভ করিয়া আসিতেছিলেন,—তাহাই শ্রুতি। বেদব্যাস ইহার যে অংশ সংগ্রহ করিয়া চারি বেদরূপে বিভক্ত করিয়াছিলেন, তাহাই বেদ-সংহিতা। তাহা বেদের মন্ত্রভাগ। তাহাই ছন্দ। আর শ্রুতির অপর অংশমধ্যে যাহা ব্রহ্মপ্রতিপাদক জ্ঞানকাণ্ডাত্মক, তাহা ব্রহ্মসূত্রপদ বা উপনিষদ্। ঋষিগণই বিবিধ ছন্দে ও ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্লোকে ও উপনিষদ্ বা বেদান্তবাক্যে এ তত্ত্ব প্রচার করেন। সেই ছন্দে এবং প্রাচীন শ্লোকে বা উপনিষদে এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব নানাপ্রকারে প্রচারিত হইয়াছে।

অতএব এস্থলে সঙ্কলিতার্থ এই যে, এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব,—যাহা ব্রহ্ম-তত্ত্বের অন্তর্গত, তাহা ঋষিগণ পূর্ব্বে বিস্তারিতভাবে, নানাপ্রকারে বেদ-সংহিতায় ও বহু ব্রহ্মসূত্রপদে বিবৃত করিয়াছেন।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, বেদে ত বহু দেবতার স্তুতি আছে মাত্র, তাহাতে ঈশ্বরতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব বা জগত্তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ কোথাও নাই। ঋগ্বেদে বহু দেবতার স্তুতি আছে সত্য, কিন্তু সকল দেবতাই যে সেই "এক" আত্মার বিভূতি, সেই এক আত্মারই যে অধিদৈবতরূপ, কর্ম্মবিভাগ হেতু যে কর্ম্মের নিয়ন্তা পরমাত্মার অনন্ত ভাগ্য বা শক্তি জন্য এই বিভাগ-কল্পনা, তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। নিরুক্তকার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঋগ্বেদেই ইহা উক্ত হইয়াছে। যথা—

"ইন্দ্রম্ মিত্রম্ বরুণম্ অগ্নিমাহুঃ
অথো দিব্যঃ স সুপর্ণঃ গরুত্মান্।
একং সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি
অগ্নিম্ যমম্ মাতরিশ্বানম্ আহুঃ॥"

(ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪৬)

ঋগ্বেদ অনুসারে সৃষ্টির পূর্ব্বে সেই একই ছিলেন, ইহাও উক্ত হইয়াছে। সৃষ্টি সম্বন্ধে "নাসদাদীয়" সূক্তে আছে—

"অনীদং অবাতং স্বধয়া তদেকম্।
তস্মাৎ হ অন্যৎ ন পরঃ কিঞ্চ আস॥"

(ঋগ্বেদ ১০।১২৯ সূক্ত)।

"সুপর্ণম্ বিপ্রাঃ কবয়ঃ বচোভিঃ
একম্ মন্ত্রম্ বহুধা কল্পয়ন্তি। (ঋক্, ১০।১১৪।৫-৬)

ঋগ্বেদে যেমন নির্গুণ 'তৎ'পদবাচ্য ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন, সেইরূপ সগুণ "সঃ" পদবাচ্য ব্রহ্মও প্রতিপাদিত হইয়াছেন।

ঋগ্বেদে আছে—

কঃ দদর্শ প্রথমম্ জায়মানম্
অস্থন্বনন্তং যৎ অনস্থা বিভর্ত্তি।
ভূম্যা অসুঃ অসৃক আত্মা ক্বচিৎ
কঃ বিদ্বাংসং উপপাৎ প্রষ্ঠু সেদৎ"

(ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।৪)

ঋগ্বেদে 'কঃ' 'প্রজাপতি' বিশ্বকর্ম্মা প্রভৃতি দেবতার সূক্তে জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরের কথা আছে। ঈশ্বর এবং সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে, পরমাত্মা সূক্ত (১০।১২৯) দেবীসূক্ত (১০।১২৫) এবং পুরুষ-সূক্তই (১০।৯০) প্রধান। ঋগ্বেদে জীবাত্মার কথা (১০।১১৭) আছে। ঋগ্বেদে যুক্তিযুক্ত বাক্য দ্বারাও পরমাত্মতত্ত্ব নিশ্চয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যথা,—

"বি মে কর্ণা পতয়তঃ বি চক্ষুঃ
বি ইদং জ্যোতিঃ হৃদয়ে আহিতম্ যৎ।
বি মে মনঃ চরতি দূর আধিঃ
কিম্ স্বিদ্ বক্ষামি, কিম্ উনু মানিষ্যে॥
(ঋগ্বেদ ৬।৯।৬)।

অন্যত্র আছে—

"অচিকিত্বান্ চিকিতুষঃ চিৎ অত্র
কবিন্ পৃচ্ছামি বিদ্মনে ন বিদ্বান্।
বি যঃ তস্তম্ভষৎ ইমা রজাংসি
অজস্য রূপে কিমপি স্বিৎ একম্॥"
(ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৬)।

এইরূপ অনেক মন্ত্র ঋগ্বেদে আছে, যাহা দ্বারা এই "এক" ব্রহ্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ও ভস্মান্ত শরীর হইতে আত্মার পার্থক্যতত্ত্ব ও পরমাত্মতত্ত্ব বিচার পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বেদ-সংহিতাই ব্রহ্মতত্ত্ব-প্রতিপাদক জ্ঞানকাণ্ডের বা বেদান্তের মূল। উপনিষদে তাহাই বিস্তারিত হইয়াছে। উপনিষদে যে ব্রহ্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, জগতত্ত্ব বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে, তাহা অনেকেই জানেন। এস্থলে দৃষ্টান্ত দ্বারা আর তাহা দেখাইবার প্রয়োজন নাই। অতএব এ শ্লোকের এ স্থলে যে অর্থ করা হইয়াছে যে, ঋষিগণ 'ছন্দে' ও ব্রহ্মসূত্রপদের দ্বারা, এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব নানারূপে ও পৃথক্ ভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাই সঙ্গত।

ছন্দ।—ছন্দ অর্থে ব্যাখ্যাকারগণ চার বেদ-সংহিতা (এবং কেহ কেহ সংহিতা ও ব্রাহ্মণ উভয়ই) বুঝিয়াছেন। কিন্তু ছন্দ অর্থে মূল বেদ-সংহিতা। পদ্যে যাহাকে ছন্দ বলে, তাহা সকলেই জানেন। ছন্দে মাত্রা বা অক্ষর আবৃত্তি নিয়মিত। ছন্দ নানা প্রকার। বেদ-সংহিতার ছন্দ প্রধানতঃ সাতপ্রকার। কিন্তু আরও অনেক ছন্দ বেদে

ব্যবহৃত। প্রধান ছন্দগুলির নাম—গায়ত্রী, উষ্ণিক্, ককুভ্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ্, জগতী ও বিরাট্ (যাস্ক)। ইহার কোন না কোন ছন্দে বেদমন্ত্র গ্রথিত। ছন্দে গ্রথিত বলিয়া বেদসংহিতাকে ছন্দ বলা যাইতে পারে। বেদের ব্রাহ্মণাংশ ছন্দের অন্তর্গত নহে।

কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ছন্দের আর এক অর্থ করেন। যে ভাষায় বেদ রচিত, তাহা ছন্দ। ছন্দই আমাদের প্রাচীন ভাষা। তাহাই ক্রম-পরিণত হইয়া পরে সংস্কৃত ভাষা হইয়াছে। ছন্দের ভাষা কেবল বেদেই নিবদ্ধ নহে। পারাশক্‌দিগের ধর্ম্মগ্রন্থ 'জেন্দাবস্তা' ছন্দে রচিত। এজন্য তাহার নাম 'জেন্দ'। জেন্দ শব্দ ছন্দেরই অপভ্রংশ। ছন্দের অপেক্ষাও যে প্রাচীন ভাষা ছিল, তাহাতে বেদের প্রাচীনতম 'নিবিদ্' অংশ রচিত। বেদের অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভাষাকে 'গাথা'ও বলে। যাহা হউক, এস্থলে তাহা বুঝিবার আবশ্যক নাই। এস্থলে ছন্দের অর্থ যে বিভিন্ন অক্ষরাবৃত্তিক ছন্দে রচিত বেদ-সংহিতা, তাহাই বুঝিতে হইবে।

ব্রহ্মসূত্রপদ—শঙ্করাচার্য্য, মধুসূদন প্রভৃতি ব্রহ্মসূত্রপদ অর্থে ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বাক্য, এবং তাহা উপনিষদ্—ইহাই বুঝিয়াছেন। রামানুজ প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ ব্রহ্মসূত্রপদ অর্থে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া যে উত্তর-মীমাংসা বা শারীরক সূত্র বা বেদান্ত-দর্শন বাদরায়ণ ব্যাস কর্ত্তৃক রচিত, তাহাই বুঝিয়াছেন। কেহ বা উভয় অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু 'ব্রহ্মসূত্র-পদ'—এই বেদান্ত-দর্শন হইতেই পারে না। বেদান্ত-দর্শনে অনেক স্থলে "স্মৃতেশ্চ" "অপিচ স্মর্য্যতে" ইত্যাদি সূত্রে 'স্মৃতি' শব্দের দ্বারা ভগবদ্-গীতার উল্লেখ আছে। সে স্থলে স্মৃতি অর্থে যে ভগবদ্গীতা, তাহা সকল ব্যাখ্যাকারগণই স্বীকার করিয়াছেন। (বেদান্ত-দর্শনের ১।২।৩ ; ১।৩।২৯; ২।৩।৪৫ ; ৩।২।২৭ ; ৪।১।১০ প্রভৃতি সূত্র ও তাহার ভাষ্য এস্থলে দ্রষ্টব্য)। অতএব বেদান্ত-দর্শনে সিদ্ধান্ত স্থাপন জন্য যখন ভগবদ্গীতার শ্লোক প্রমাণ

স্বরূপ গৃহীত হইয়াছে, তখন বেদান্তদর্শন অবশ্য ভগবদ্‌গীতার পরবর্ত্তী গ্রন্থ। তাহা হইলে গীতায় বেদান্ত-দর্শনের উল্লেখ থাকিতে পারে না। আর যদি বেদান্ত-দর্শন ও গীতা উভয়ই বেদব্যাস কর্ত্তৃক গ্রথিত বলা যায়, তবে ঋষিশ্রেষ্ঠ ব্যাস যে নিজের দর্শন-শাস্ত্রের গৌরব-বৃদ্ধির জন্য শ্রীভগবানের মুখে তাহার উল্লেখ করাইবেন, ইহা কখন অনুমান করা যায় না। বরং বেদান্ত-দর্শনেরই প্রমাণ স্বরূপে ভগবদ্‌বাক্য গ্রহণ করা, তাঁহার পক্ষে সঙ্গত বটে। অতএব ব্রহ্মসূত্রপদ অর্থে উপনিষদ্ বা উপনিষদেরও পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কোন ঋষি-প্রচারিত শ্লোক বা পদ হইতে পারে। এই কথা বুঝিতে হইবে। ব্রাহ্মণে ও উপনিষদে স্থানে স্থানে তত্ত্বসমর্থন জন্য প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার ভাষাও অনেক স্থলে সংহিতার ভাষার ন্যায় প্রাচীন। সুতরাং উপনিষদের অগ্রেও ব্রহ্মতত্ত্বপ্রতিপাদক ব্রহ্মসূত্রপদ বা শ্লোক ঋষিগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কেনোপনিষদে আছে—

"ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ ব্যাচচক্ষিরে।" (১।৩)।

ইহা দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে, এই উপনিষদ-দ্রষ্টা ঋষির পূর্ব্বেও প্রাচীন ঋষিরা ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছিলেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মানন্দ বল্লীতে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ উপলক্ষে "তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি" এই বলিয়া প্রত্যেক অনুবাকের শেষে কয়েকটি প্রাচীন শ্লোক উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। এই শ্লোকগুলি হইতে জানা যায় যে, "অন্ন (বা অন্নময় কোষ) ব্রহ্ম, প্রাণ (বা প্রাণময় কোষ) ব্রহ্ম, বিজ্ঞান (বা বিজ্ঞানময় কোষ) ব্রহ্ম, আনন্দ (বা আনন্দময় কোষ) ব্রহ্ম, ব্রহ্ম সৎ; এজগৎ পূর্ব্বে অসৎ (অব্যাকৃত কারণে লীন) ছিল, তাহা হইতে জগৎ সৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রহ্মই জগতে সকলের নিয়ন্তা, তিনি আনন্দস্বরূপ।" এই সকল প্রাচীন শ্লোক হইতে জানা যায় যে, বর্ত্তমান উপনিষদ্‌গুলির পূর্ব্বেও ঋষিগণ-প্রচারিত

ব্রহ্মতত্ত্ব-প্রতিপাদক অনেক পদ বা শ্লোক প্রচলিত ছিল। অতএব ব্রহ্মসূত্র-পদ বলিতে যে এই সকল প্রাচীন শ্লোক-নিবদ্ধ গ্রন্থ বুঝায় না, তাহা বলিতে পারা যায় না। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ঋষিগণ ব্রহ্মতত্ত্ব জীবতত্ত্ব, জগত্তত্ত্ব আলোচনা করিতেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান উপনিষদের প্রচারে সে সকল গ্রন্থ ক্রমে বিলুপ্ত হইয়াছে। তাহার কোন কোন শ্লোক কোন কোন উপনিষদে উক্ত রূপে সংগৃহীত আছে মাত্র। বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদেও এইরূপ অনেক প্রাচীন শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে।

বৃহদারণ্যকে উদ্ধৃত (৫।১।১) এইরূপ একটি প্রাচীন শ্লোকের দৃষ্টান্ত এই,—

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"

বর্ত্তমান উপনিষদ্ সেই সকল ব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্লোকে অপেক্ষা আধুনিক। বেদান্তদর্শনে দশখানি মাত্র উপনিষদ্ প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। সেইরূপ বেদান্ত-দর্শনে গীতাও প্রামাণ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। অতি প্রাচীন উপনিষদ ছান্দোগ্য হইতে, দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ যে ঘোর ঋষির নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন, তাহাও জানা যায়। সুতরাং গীতা যদি শ্রীকৃষ্ণোক্ত, ও বেদব্যাস কর্ত্তৃক মহাভারতের অন্তর্ভূত হইয়াছিল, ইহা বলা যায়, তবে গীতা উক্ত উপনিষদ্ অপেক্ষা আধুনিক নহে। অতএব ব্রহ্মসূত্রপদ অর্থে, উপনিষদ্ অপেক্ষা উক্ত ব্রহ্মপ্রতিপাদক প্রাচীন শ্লোকগ্রন্থ, এইরূপ অনুমান অধিক সঙ্গত।

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥ ৫

মহাভূতগণ, অহঙ্কার, বুদ্ধি আর—
অব্যক্ত, ইন্দ্রিয়গণ—দশ এক আর,
আর সেই পঞ্চ—যাহা ইন্দ্রিয় গোচর,— ॥ ৫

মহাভূতগণ—সূক্ষ্মভূতগণ। মহৎ অর্থে বৃহৎ ব্যাপক। সকল প্রকার বিকারের ব্যাপক বলিয়া স্থূলভূত সমূহের কারণ-স্বরূপ যে সূক্ষ্ম-ভূতসমূহ তাহাই মহাভূত। ইহারা ইন্দ্রিয়ের অগোচর (শঙ্কর)। পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এ সকল ক্ষেত্র-আরম্ভক দ্রব্যই মহাভূত (রামানুজ)। ভূমি প্রভৃতি পঞ্চভূত, (মধু, স্বামী, বলদেব)। শরীরের উপাদান দ্রব্য পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত (কেশব)। সূক্ষ্ম অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত—ইহারা পঞ্চতন্মাত্র বা পঞ্চসূক্ষ্মভূত ইন্দ্রিয়ের অগোচর (শঙ্করানন্দ)।

অতএব কোন কোন ব্যাখ্যাকারের মতে মহাভূত অর্থে সূক্ষ্মভূত, কাহার মতে তন্মাত্র, কাহারও মতে স্থূলভূত। শঙ্কর বলিয়াছেন যে, এই শ্লোকে পরে 'পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর' বস্তুর উল্লেখ আছে, তাহারাই স্থূলভূত। এস্থলে যে মহাভূত উক্ত হইয়াছে, তাহা অবশ্য ইন্দ্রিয়ের অগোচর—সুতরাং সূক্ষ্মভূত। সূক্ষ্মভূত ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে।

সাংখ্য মতে ইহাদিগকে পঞ্চতন্মাত্র বলা হইয়াছে। রূপ রস শব্দ গন্ধ ও স্পর্শ ইহারাই পঞ্চতন্মাত্র। তন্মাত্র হইতে স্থূলভূতের সৃষ্টি হইয়াছে। শব্দ হইতে আকাশের সৃষ্টি, স্পর্শ হইতে বায়ুর সৃষ্টি ইত্যাদি। সুতরাং তন্মাত্র স্থূলভূতের কারণ বলিয়া তাহাদিগকে মহাভূত বলা যাইতে পারে। কিন্তু এ অর্থে এক আপত্তি হয়। পঞ্চভূতের মধ্যে যাহা ইন্দ্রিয়-গোচর—যাহা ইন্দ্রিয়ের বিষয়, তাহাইত তন্মাত্র শব্দস্পর্শাদিই আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর। আর তাহা হইতেই ত আমাদের স্থূলভূতের জ্ঞান হয়। সুতরাং পঞ্চ মহাভূতদিগকে সাংখ্যোক্ত তন্মাত্র কিরূপে বলা যাইতে

পারে? মহাভূতের কথা সাংখ্যদর্শনে কোথাও নাই। বেদান্তেই তাহা পাওয়া যায়। বেদান্ত হইতেই মহাভূত-তত্ত্ব বুঝিতে হইবে।

বেদান্ত মতে, আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে অপ্‌ এবং অপ্‌ হইতে ভূমি উৎপন্ন হয়। (তৈত্তিরীয় উপ, ২।১।১)। ইহাদের মধ্যে আকাশ ও বায়ু অমূর্ত্ত, এবং অগ্নি, জল ও ভূমি মূর্ত্ত। উভয় রূপই ব্রহ্মের (বৃহদারণ্যক উপঃ, ৩।২।১)। এই মূর্ত্তই অন্ন।

এই মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত রূপ ক্ষিতি অপ্‌ তেজঃ মরুৎ ব্যোম ইহারা পঞ্চমহাভূত। ঐতরেয় উপনিষদে (৫ম খণ্ড।৩) আছে,—

"এব ব্রহ্ম * * ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতীংষীত্যেতানি * * * সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং * * * প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।"

এই পঞ্চমহাভূত—সূক্ষ্মভূত। শ্রুতি অনুসারে ইঁহারা দেবতা। এই পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতের পরস্পর মিশ্রণে বা পঞ্চীকরণে পঞ্চ স্থূলভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। আকাশ ভূতের অর্দ্ধাংশ, ও অপর চারি ভূতের প্রত্যেকের অষ্টমাংশ মিশিয়া স্থূল আকাশ (æther)। বায়ু ভূতের অর্দ্ধাংশের সহিত, অন্য চারি ভূতের প্রত্যেকে অষ্টমাংশ মিলিয়া স্থূল বায়ু (air—gas)। সূক্ষ্ম অগ্নির অর্দ্ধাংশের সহিত অন্য চারি ভূতের প্রত্যেকের অষ্টমাংশ মিশিয়া স্থূল অগ্নি (heat or fire)। সূক্ষ্ম জলীয় ভূতের অর্দ্ধাংশ ও অপর চারি ভূতের প্রত্যেকের অষ্টমাংশ মিলিয়া স্থূল অপ্‌ ভূত (liquid)। আর সূক্ষ্ম ভূমির অর্দ্ধাংশ সহিত অপর চারি ভূতের প্রত্যেকের অর্দ্ধাংশ মিশিয়া স্থূল পৃথিবী ভূত (solid)। এই পঞ্চীকরণ দ্বারাই সূক্ষ্মভূত হইতে স্থূলভূতের উৎপত্তি হয়। ইহা ব্যতীত, মূর্ত্ত বা মর্ত্ত্য অগ্নি, অপ্‌ ও ভূমি এই তিন সূক্ষ্ম ভূতের মধ্যে ত্রিবৃৎকরণ দ্বারা (বা উক্তরূপে মিশ্রণ হইতে) উক্ত মূর্ত্ত তিন স্থূল

ভূতের উৎপত্তির কথাও উপনিষদে আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে ষষ্ঠ অধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে আছে যে, এই সৃষ্টির পূর্ব্বে সত্তা (অমূর্ত্ত আকাশ ও বায়ুরূপে স্থিত ব্রহ্ম সত্তা) ছিলেন। তিনি বহু হইবার জন্য ঈক্ষণ করিলেন। তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন। তেজঃ অপ্ সৃষ্টি করিলেন।... অপ্ দেবতা অন্ন সৃষ্টি করিলেন। এই তিন দেবতা ত্রিলোকের বা ত্রিস্থানের কারণ। তেজঃ বা জ্যোতিঃ হইতে দ্যুলোক, অপ্ হইতে অন্তরীক্ষ লোক আর ভূমি হইতে পৃথিবী লোক। এই তিন দেবতাই ভূতগণের বীজ। সেই দেবতা ঈষণ করিলেন,—আমিই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপ দ্বারা ব্যাকৃত করিব। তদনন্তর তিনি এই তিন দেবতাকে ত্রিবৃৎ করিয়া স্থূলীকৃত করিলেন। সে যাহা হউক, এইরূপে এই পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূত হইতে পঞ্চ স্থূল ভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত। সুতরাং এস্থলে মহাভূত অর্থে অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ভূতই বুঝিতে হইবে।

অহঙ্কার—সেই সূক্ষ্মভূত সকলের কারণ এবং 'আমি' এই প্রকার বৃত্তি যাহার লক্ষণ, সেই অন্তঃকরণকেই অহঙ্কার বলা যায় (শঙ্কর)। এই অহঙ্কারই ভূতগণের আদি (রামানুজ, কেশব)। ইহা অন্তঃকরণাত্মক (স্বামী)। উক্ত ভূতগণের কারণভূত অভিমান (মধু)। তামস অহঙ্কারই ভূতাদির কারণ (বলদেব)। শঙ্করাচার্য্য এক স্থলে বলিয়াছেন, অনাত্ম-বিষয়ে অহংজ্ঞানই অহঙ্কার। এস্থলে অর্থ ভিন্ন।

সাংখ্যদর্শন অনুসারে অভিমানই অহংকার। কোন বিষয় জ্ঞেয়-রূপে জ্ঞানে উপস্থিত হইলে, তাহার সহিত জ্ঞাতা 'আমি' ইহা জানি-তেছি, এইরূপ সাত্ত্বিক বা বৈকৃত অহঙ্কার জ্ঞাতাকে প্রকাশ করে। তামসিক অহঙ্কারকে ভূতাদি বলে, তাহা সেই 'জ্ঞেয়'কে প্রকাশ করে। রাজস বা তৈজস অহংকার দ্বারা পরিচালিত হইয়া সাত্ত্বিক অহঙ্কার মন ও দশ ইন্দ্রিয় প্রকাশ করে। আর ভূতাদি তামস অহঙ্কার এই রাজস

অহঙ্কার দ্বারা পরিচালিত হইয়া পঞ্চতন্মাত্রকে প্রকাশ করে, ও তাহা হইতে স্থূলভূতদের প্রকাশ করে। রাজস অহঙ্কারই ক্রিয়াত্মক, তাঁহাই সাত্ত্বিক ও তামস অহঙ্কারকে পরিচালিত করে, তাই একাদশ ইন্দ্রিয়ের ও পঞ্চতন্মাত্রের অভিব্যক্তি হয়। প্রত্যভিজ্ঞান অভিজ্ঞান সহ যুগপৎ উদিত হয়, এবং তাহারই সহিত 'আমি যে এই বিষয় জানিতেছি, তাহা সুখাত্মক কি দুঃখাত্মক' এইরূপ অনুভব হয়, এবং 'আমি সেই বিষয় ত্যাগ বা গ্রহণ জন্ম কর্ম্ম করিব কিনা', এইরূপ বুদ্ধি হয়। এই বৃত্তিকে অহঙ্কার বলে; বুদ্ধিতে বৃত্তিজ্ঞানের ক্রিয়াকালে যে এইরূপে জ্ঞাতা, ও কর্ত্তা ভোক্তা 'আমি'র, এবং তাহার সহিত যে জ্ঞেয় কার্য্য ও ভোগ্য ইহার যুগপৎ অভিব্যক্তি হয়, তাহাই অহঙ্কার। যাহা জ্ঞানের মধ্যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই ভেদ প্রধানতঃ সৃষ্টি করে, এবং জ্ঞাতাকে জ্ঞেয় হইতে পৃথক্ করিয়া দেয়, তাহাই অহঙ্কার। তাহাতেই 'আমিত্বের' অভিব্যক্তি হয়, 'মান' বা প্রমাণ বৃত্তির ক্রিয়াকালে, তাহার 'অভি'মুখে বা তাহার সহিত যে প্রমাতার প্রমেয় হইতে পৃথক্ ভাবে অভিব্যক্তি (apperception) হয়, তাহাই অভিমান। তাই সাংখ্যদর্শন অনুসারে অভিমানই অহঙ্কার। বলিয়াছি ত, সাংখ্যমতে অহঙ্কার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ।

সাংখ্য-কারিকায় আছে,—

> "অভিমানোঽহঙ্কারস্তস্মাৎ দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ।
> একাদশকশ্চ গণস্তন্মাত্রপঞ্চকশ্চৈব॥"
> "সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ।
> ভূতাদেস্তন্মাত্রঃ স তামসস্তৈজসাদুভয়ম্॥"
>
> (কারিকা ২৪।২৫)।

সে যাহা হউক, এই অহঙ্কারতত্ত্ব স্বতন্ত্র ভাবে বেদান্তে উল্লিখিত হয় নাই। ইহা চিত্তের ধর্ম্ম। বেদান্তমতে ইহা মনের ধর্ম্ম। অথবা বেদান্ত-

মতে, ইহা আত্মা—মনোময় কোষস্থ আত্মা। তাই বেদান্তে এই আত্মা হইতে আকাশাদি ক্রমে মহাভূতগণের উৎপত্তির কথা উক্ত হইয়াছে।

তামসিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র ও স্থূলভূত কিরূপে উৎপন্ন হয়, এ সম্বন্ধে আমরা আরও একটি কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব। ইন্দ্রিয়দ্বারে যখন বিষয় গ্রহণ হয়, তখন প্রথমে জ্ঞানে বৃত্তিক্রিয়া হয়। তাহা বলিয়াছি। ইহা বুদ্ধিরই ব্যাপার। বেদান্তমতে জ্ঞান তখন প্রকাশোন্মুখ হয়। সেই সময়ে জ্ঞানে যুগপৎ জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই 'ত্রিপুটী'র বিকাশ হয়। জ্ঞাতাতে প্রকাশ স্বভাব সত্ত্ব হেতু 'অহং' বোধ হয়। আর জ্ঞেয় বিষয়ে আবরণ স্বভাব তমঃ হেতু 'ইদং' বা 'ত্বং' অর্থাৎ 'আমি' হইতে 'ভিন্ন' অন্য কিছু—ইহা বোধ হয়। যাহাকে এই তামসিক অহঙ্কার হেতু 'আমি' হইতে ভিন্ন বোধ হয়, তাহাই ভূতাদি, তাহাই সাংখ্যের তন্মাত্র; তাহাই জ্ঞানের বিষয়। সে বিষয় শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ। সাংখ্যমতে তাহা তন্মাত্র (only that অথবা thing in-itself)। তাহা নির্বিশেষ অনুভূতির বিষয়। এই রূপ রসাদি ভিন্ন কোন বস্তুর কিছুই আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় না। আমরা অনুমান করিয়া সেই জ্ঞানের বিষয় 'রূপ' তন্মাত্র হইতে তাহার বাহ্য কারণ স্থূল রূপাত্মক অগ্নি, 'রস' তন্মাত্র হইতে জলীয় স্থূলভূত, 'শব্দ' তন্মাত্র হইতে আকাশ ইত্যাদি রূপে পঞ্চ স্থূল ভূতের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করি। অতএব সাংখ্যমতে পঞ্চতন্মাত্র এইরূপে পঞ্চ স্থূল ভূতের কারণ হয়। যাহা হউক, ব্যক্তিগত অহঙ্কার (ego) যদি স্থূল ভূতের কারণ বলা যায়, তবে বিজ্ঞানবাদ (Idealism) আসিয়া পড়ে। কিন্তু সেই অহঙ্কার যদি সমষ্টিভূত অহঙ্কার বা হিরণ্যগর্ভের অহঙ্কার বলা যায়, যদি তাহাকে মনোময় বা বিজ্ঞানময় কোষস্থ ব্রহ্ম বা আত্মা বলা যায়, তবে ঠিক্ এ বিজ্ঞানবাদ আসে না। সাংখ্যদর্শন মতেও সূক্ষ্ম শরীর এক। "সপ্তদশৈকং লিঙ্গং"—(ইতি সাংখ্যসূত্র ৩।৯)। বিজ্ঞানভিক্ষু ইহার অর্থ করেন, সপ্তদশ অবয়বযুক্ত লিঙ্গ শরীর একই। হিরণ্যগর্ভই সেই সমষ্টি-

ভূত সূক্ষ্ম-শরীরাভিমানিনী দেবতা। মহাভূত তাঁহারই অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন। বেদান্ত শাস্ত্রেরও ইহাই সিদ্ধান্ত। তাহা পরে উল্লিখিত হইবে। এস্থলে সাংখ্য ও বেদান্ত-দর্শন অনুসারে এই অহঙ্কার-তত্ত্ব বুঝিতে হইবে।

বুদ্ধি—যাহা অহঙ্কারের কারণ, যাহা অধ্যবসায়াত্মিকা বৃত্তি, তাহাই বুদ্ধি (শঙ্কর)। অহঙ্কারের কারণভূত জ্ঞানাত্মক বা জ্ঞানপ্রধান—বুদ্ধি (স্বামী, বলদেব)। অধ্যবসায়-লক্ষণ মহত্তত্ত্ব (মধু)। মহত্তত্ত্ব (রামানুজ কেশব)।

সাংখ্যদর্শন মতে মূল প্রকৃতি বা অব্যক্ত হইতে এই বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার-তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। সাত্ত্বিক বুদ্ধি—ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যরূপ। রাজস-তামস বুদ্ধি তাহার বিপরীত। (কারিকা, ২৩)। বুদ্ধিই মহত্তত্ত্ব। সাংখ্যমতে বুদ্ধি অধ্যবসায়াত্মিকা। অধ্যবসায় অর্থে স্থির-নিশ্চয় হওয়া। যখন ইন্দ্রিয় বিষয় গ্রহণ করিয়া মনকে অর্পণ করে, মন তাহার সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত হয়, তাহা কি, তাহার সে অনুভূতির কারণ কি, তাহা স্থির করিতে পারে না। বুদ্ধি তাহা বিচার পূর্ব্বক স্থির করে,—সে বিষয় কি, ইহা স্থির নিশ্চয় করিয়া দেয়। মনে ইন্দ্রিয় দ্বারে যে অনুভূতি (sensation) হয়, বুদ্ধি তাহার স্বরূপ নির্ণয় (perception) করে এবং তাহা সুখদ কি দুঃখদ, এবং তাহা ত্যাগ কি গ্রহণ করিতে হইবে, বুদ্ধি তাহা স্থির করে। সেইরূপ কর্ম্ম সম্বন্ধে কর্ত্তব্য কি, তাহা বুদ্ধি স্থির করিয়া দেয়। কর্ম্ম-সাধন জন্য, কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য কি পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, বুদ্ধি তাহাও নিশ্চয় করিয়া দেয়। (বুদ্ধি = Understanding অথবা Intellect)। ইহাই আমাদের বুদ্ধি। কিন্তু সমষ্টি অহঙ্কারের ন্যায় যাহা সমষ্টি বুদ্ধিতত্ত্ব, তাহা মহত্তত্ত্ব। তাহা এস্থলে বিবৃত করিবার আবশ্যক নাই। সেই সমষ্টি বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহত্তত্ত্ব অব্যক্ত হইতে অভিব্যক্ত। তাঁহাকেই বেদান্তে হিরণ্যগর্ভ বলে।

অব্যক্ত—সেই বুদ্ধির যাহা কারণ, যাহা কার্য্যরূপে ব্যক্ত নহে, যাহা অব্যাকৃত—তাহাই অব্যক্ত। "মম মায়া দুরত্যয়া" এই কথায় যাহার পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে, সেই ঈশ্বর-শক্তি মায়াই এই অব্যক্ত (শঙ্কর)। গুণত্রয়াত্মক প্রধানই অব্যক্ত (কেশব)। অব্যক্ত অর্থাৎ মূল প্রকৃতি (রামানুজ, স্বামী, বলদেব)। ইহা সত্ত্বরজস্তমো-গুণাত্মক প্রধান। ইহা সকলের কারণ, কাহারও কার্য্য নহে (মধু)।

গীতায় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, "অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ"...ইত্যাদি (গীতা ৮।১৮)। সে স্থলে অব্যক্ত অর্থে মূল প্রকৃতি। ভগবান্ অন্যত্র বলিয়াছেন, "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" (৯।১০)। অতএব অব্যক্তই এই মূল প্রকৃতি। যে স্থলে 'অব্যক্ত' বিশেষণ, সে স্থলে 'অব্যক্ত' ব্রহ্মের বা আত্মার বিশেষণ। ব্রহ্ম অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত (গীতা ৮।২০)।

সে যাহা হউক, সাংখ্যমতে এই অব্যক্তই মূল প্রকৃতি বা প্রধান। তাহা অবিকৃত। তাহা হইতে সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতির উৎপত্তি হয়। প্রকৃতি-বিকৃতি হইতে ষোড়শ প্রকার বিকৃতির অভিব্যক্তি হয়।—

"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শস্তু বিকারাঃ......।" (কারিকা, ৩)।

এই সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতি—বুদ্ধিতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব এবং পঞ্চতন্মাত্র। মূল প্রকৃতি হইতে বুদ্ধিতত্ত্বের উৎপত্তি হয়, বুদ্ধি হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়, অহঙ্কার হইতে মন, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এই ষোড়শ তত্ত্বের উৎপত্তি হয়, তন্মাত্র হইতে পঞ্চভূতের উদ্ভব হয়। এই মন দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ স্থূলভূত ইহারাই ষোড়শ বিকৃতি। মন, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত ইহারা কার্য্য, ইহা হইতে আর কিছু উৎপন্ন হয় না; এজন্য এই ষোলটি কেবল বিকৃতি।

"প্রকৃতের্মহাংস্ততোঽহংকার স্তস্মাদ্গণশ্চ ষোড়শকঃ।
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি॥" (কারিকা, ২২)।

সাংখ্য-দর্শন অনুসারে, প্রকৃতিই অবিকৃত, তাহা অব্যক্ত, তাহাই প্রধান,—মূল কারণ। প্রকৃতির যাহা কার্য্য, তাহা ব্যক্ত। এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত মধ্যে সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য আছে। বৈধর্ম্ম্য সম্বন্ধে কারিকায় সূত্র এই—

"হেতুমৎ অনিত্যম্ অব্যাপি সক্রিয়ম্, অনেকম্, আশ্রিতং লিঙ্গম্।
সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং, বিপরীতম্ অব্যক্তম্॥" (১০)

উভয়ের এবং পুরুষ হইতে বৈধর্ম্ম্য সাধর্ম্ম্য সম্বন্ধে সূত্র এই—

ত্রিগুণম্ অবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যম্ অচেতনং প্রসবধর্ম্মি।
ব্যক্তং তথা প্রধানং, তদ্বিপরীতং তথা চ পুমান্। (১১)

অতএব সাংখ্যমতে এই অব্যক্ত=প্রকৃতি, আর বেদান্তমতে ইহা পরমেশ্বরের পরাশক্তি—মায়া। শ্রুতিতে আছে—"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" (শ্বেতাশ্বতর উপঃ, ৪।১০)। আর এই মায়া বা প্রকৃতিকে 'দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্' 'স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াত্মিকা পরাশক্তি' বলা হইয়াছে। (শ্বেতাশ্বতর উপঃ, দ্রষ্টব্য)। এই মায়া ও প্রকৃতি এক অর্থে অভেদ হইলেও, তাহাদের মধ্যে ভেদ গীতায় উক্ত হইয়াছে। ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

এই যে অব্যক্ত অব্যাকৃত, অনির্ব্বচনীয়, পরমেশ্বরের মায়াখ্য পরাশক্তি—অথবা তাঁহারই মূল প্রকৃতি, তাহা হইতে সৃষ্টির আদিতে কিরূপে বুদ্ধি ও অহঙ্কারাদির উৎপত্তি হয়, বেদান্তেও তাহার আভাস আছে। শ্রুতিতে আছে,—সৃষ্টির প্রারম্ভে "তৎ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়"—অর্থাৎ তিনি ঈক্ষণ করিলেন—আমি প্রজনন জন্য বহু হইব। এই ঈক্ষণ বা কল্পনা হইতে বুদ্ধির বা মহত্তত্ত্বেরও উৎপত্তি হয়। তাহার পর "বহু স্যাং প্রজায়েয়" অর্থাৎ আমি বহু হইব—এই ঈক্ষণ বা কল্পনা হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি

হয়। তাহার পর 'আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ' ইত্যাদি ক্রমে, এই অহঙ্কার হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, ইত্যাদি ক্রমে মহাভূতগণের সৃষ্টি হয়। এইরূপে বেদান্ত হইতেও অব্যক্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পঞ্চ মহাভূততত্ত্ব জানা যায়। যাহা হউক, ভগবান্ গীতায় প্রকৃতিকে বা অব্যক্তকে তাঁহার বলিয়াছেন। সুতরাং প্রকৃতি বা অব্যক্ত স্বতন্ত্রা নহে। এইরূপে গীতায় সাংখ্য ও বেদান্ত মতের সামঞ্জস্য হইয়াছে। প্রকৃতি অনাদি হইলেও তাহা ভগবৎশক্তির অভিব্যক্তরূপ মাত্র।

ভগবান্ পূর্ব্বে (গীতা, ৭।৪ শ্লোকে) বলিয়াছেন—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"

এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, ভগবানের প্রকৃতি আটভাগে ভিন্ন হয়। এই আটভাগে ভিন্ন প্রকৃতিকে অপরা প্রকৃতি বলে। এই আটের নাম—পঞ্চমহাভূত—ভূমি, অপ্, অনল, বায়ু ও আকাশ, আর বুদ্ধি, মন ও অহঙ্কার। ইহাদের মধ্যে মূল প্রকৃতি বা অব্যক্তকে গ্রহণ করা হয় নাই। কারণ, ইহারা সেই অব্যক্ত প্রকৃতিরই ব্যক্তরূপ, প্রকৃতিই এইরূপে অষ্টধা ভিন্ন। কিন্তু এই আলোচ্য শ্লোকে অব্যক্ত গৃহীত হইয়াছে। কারণ, অব্যক্তই ক্ষেত্রের মূল উপাদান। সুতরাং উক্ত শ্লোকের সহিত এ শ্লোকের কোন বিরোধ নাই। তবে একটি কথা বুঝিতে হইবে। সাংখ্য-দর্শন হইতে জানা যায় যে, মূল প্রকৃতি এক—অবিকৃত। তাহা হইতে সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতির উৎপত্তি হইয়াছে। মূল প্রকৃতি ও সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতি—ইহাই প্রকৃতির মূল অষ্টরূপ। মন তাহার অন্তর্ভূত নহে। কারণ, মন কেবল বিকৃতি—অহঙ্কারের কার্য্য। এইজন্য এস্থলে প্রথমে এই আট তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে; যথা,—মহাভূত পাঁচ, তাহাদের

কারণ অহঙ্কার, তাহার কারণ বুদ্ধি, তাহার কারণ অব্যক্ত। কিন্তু এই পাঁচ মহাভূত সাংখ্যের তন্মাত্র নহে, তাহারা পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর স্থূলভূত পঞ্চও নহে—তাহারা সূক্ষ্মভূত বা স্থূলভূতের কারণ, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহা বলা যায় যে, এই মূলপ্রকৃতি ও সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতি এই আট তত্ত্ব উল্লেখের পরে এ শ্লোকে সাংখ্যোক্ত ষোড়শ বিকৃতি-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। তাহা একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়-গোচর বিষয়। এইরূপে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি ও তাহা হইতে উদ্ভূত ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব এস্থলে ক্ষেত্রের উপাদানরূপে বিবৃত হইয়াছে,, ইহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা এ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তাহাতে সাংখ্য বেদান্তের সহিত কোন বিরোধ হয় না।

ইন্দ্রিয় দশ ও এক—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, আর বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়। এই দশ ইন্দ্রিয়। শ্রোত্রাদি পাঁচটি বুদ্ধি উৎপাদন করে বলিয়া বুদ্ধীন্দ্রিয়। বাক্ প্রভৃতি পাঁচটি কর্ম্ম-নির্ব্বর্ত্তক বলিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়। আর মনকেও এস্থলে ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে। মন সংকল্পাত্মক। সেই মনের সহিত ইন্দ্রিয়গণ—একাদশ। (শঙ্কর, রামানুজ, স্বামী, মধু, কেশব)।

সাংখ্যদর্শন অনুসারে মন এক ইন্দ্রিয় মাত্র। কিন্তু বেদান্তদর্শন অনুসারে মন ইন্দ্রিয় হইতে স্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠ। এস্থলে গীতায় উভয় মতের সামঞ্জস্য আছে। মূলে আছে "ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ।" অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দশ আর এক। এইরূপে এই 'এক' মনকে ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন করা হইয়াছে, এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সম্বন্ধও ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

সাংখ্যদর্শনে আছে,

"সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাৎ অহংকারাৎ।"

(কারিকা, ২৫)—

এই একাদশ ইন্দ্রিয় মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি, ও কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটি,—

"বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চক্ষুঃ-শ্রোত্র-ঘ্রাণ-রসন-ত্বগাখ্যানি।
বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থান্ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যাহুঃ॥" (কারিকা, ২৬)

আর মন একাদশক ইন্দ্রিয়,—

"উভয়াত্মকমত্র মনঃ সঙ্কল্পকমিন্দ্রিয়ঞ্চ সাধর্ম্ম্যাৎ।
গুণপরিণামবিশেষান্নানাত্বং বাহ্যভেদাচ্চ॥" (কারিকা, ২৭)।

অর্থাৎ মন বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয়াত্মক। চক্ষুঃ প্রভৃতি পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ে, এবং বাক্‌প্রভৃতি পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়ে মন অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাদিগকে প্রবর্ত্তিত করে। আমাদের জানিবার বা কোন কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা হইলে, তাহা বুদ্ধিকে নিয়োজিত করে, বুদ্ধি মনকে নিয়োজিত করে, এবং মন উপযুক্ত ইন্দ্রিয়কে প্রবর্ত্তিত করে, তখন সে ইন্দ্রিয় বিষয়ে সংযুক্ত হয়। সেইরূপ যখন কোন বাহ্য বিষয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সম্মুখে উপস্থিত হয়, ইন্দ্রিয়ের দ্বারে স্বশক্তি বলে আঘাত করে, তখন সেই বিষয়কে গ্রহণ বা আহরণ করিয়া লইয়া ইন্দ্রিয়গণ মনকে উপহার দেয়। মন যদি তখন অন্য ব্যাপারে নিযুক্ত থাকে, তবে সেই উপহৃত বিষয় গ্রহণ না করিতেও পারে। আর যদি গ্রহণ করে, তবে তাহা কি, ইহা আলোচনা করে। মন তাহাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করে,—ইহা কি বা কি নহে, ইহা স্থির করিতে চেষ্টা করে এবং সে সম্বন্ধে কোন্ কর্ম্মেন্দ্রিয়কে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে, তাহাও স্থির করিতে চেষ্টা করে। ইহাই মনের সংকল্পধর্ম্ম। সংকল্প হেতুই মন ইন্দ্রিয়দ্বারা গৃহীত বিষয়কে লক্ষ্য করে, আলোচনা করে; তাহা কি, ইহার সন্ধান করে। এই আলোচনা প্রথমতঃ নির্ব্বিকল্প। পরে তাহা সবিকল্প হয়। তখন মন বুদ্ধির শরণ লয়। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি আসিয়া সে বিষয় যে কি, তাহা স্থির করিয়া দেয়।—

"ততঃ পরং পুনর্ব্বস্তুধর্ম্মৈঃ জাত্যাদিভির্যয়া।
বুদ্ধ্যাঽবসীয়তে সা হি প্রত্যক্ষত্বেন সম্মতা॥"

বুদ্ধি এইরূপে স্থির করিয়া দিলে, তবে সে বিষয়ের প্রত্যক্ষজ্ঞান

(perception) হয়। এইরূপে যখন জ্ঞানবৃত্তি বহির্মুখী হয়, অথবা যখন বাহ্যক্রিয়া অন্তর্মুখী হয়, তখন মনের মধ্য দিয়াই সে ক্রিয়া হয়। বিষয়-গ্রহণ ব্যাপারে মন ইন্দ্রিয়াত্মক। তাই সাংখ্যদর্শনে মনকে একাদশক ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে। কিন্তু বেদান্তমতে মন ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ। "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ" (কঠ উপঃ ৬।৭)। গীতাতেও ইহাই উক্ত হইয়াছে। (গীতা, ৩।৪২ দ্রষ্টব্য)। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১।৫।৩) আছে, প্রজাপতি মনকে আত্মার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। মন ব্যতীত কোন ইন্দ্রিয়-ব্যাপার হয় না।—

"অন্যত্রমনা অভূবং নাদর্শনম্, অন্যত্রমনা অভূবং ন অশ্রৌষম্ ইতি। মনসা হি এব পশ্যতি মনসা শৃণোতি।" ইহা ব্যতীত কামসংকল্প প্রভৃতি মনের স্বরূপ, তাহাও উক্ত হইয়াছে। "কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা ধৃতিঃ অধৃতিঃ হ্রীঃ, ধীঃ, ভীঃ ইত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব।... মনসা বিজানাতি।" (বৃঃ আঃ ১।৫।৩) মন যে সংকল্পাত্মক, তাহাও উক্ত হইয়াছে। "সংকল্পো বাব মনসো ভূয়ান্' (ছান্দোগ্য ৭।৮।১)। 'সর্ব্বেষাং সংকল্পানাং মন একায়নম্।' (বৃঃ আঃ ২।৪।১১)। অতএব দশ ইন্দ্রিয় হইতে মন স্বতন্ত্র। গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে, "মনঃ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি" (১৫।৭)। সেখানে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্বন্ধেই মনকে বলা হইয়াছে যে, মন যাহার ষষ্ঠ, সেই সকল ইন্দ্রিয়। এস্থলেও মনকে ইন্দ্রিয়ের সহিত সম-জাতীয় বলা হয় নাই। মহাভারত যেমন পঞ্চম বেদ, মন সেইরূপ একাদশক বা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়।

পঞ্চ ইন্দ্রিয় গোচর—অর্থাৎ শব্দাদি বিষয় (শঙ্কর)। অথবা পঞ্চ স্থূলভূত (গিরি)। তবে সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সহিত সামঞ্জস্য জন্য এই পাঁচ ইন্দ্রিয়গোচর শব্দাদি বিষয়কে পঞ্চ তন্মাত্রও বলা যাইতে পারে (গিরি)। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচ (রামানুজ)। ইহারা তন্মাত্র, শব্দ আকাশের বিশেষ গুণ, স্পর্শ বায়ুর বিশেষ গুণ ইত্যাদি।

এই বিশেষ গুণ দ্বারা আকাশাদিরূপ ব্যক্ত বা ইন্দ্রিয়-গোচর হয় (স্বামী)। এই শব্দাদি বুদ্ধীন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞাপ্য এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্যরূপে উপলব্ধি হয়। এজন্য তাহারা ইন্দ্রিয়ের গোচর বিষয় (মধু)। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়—শব্দ স্পর্শরূপ রস ও গন্ধ (কেশব)।

অতএব প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারের মতে রূপরসাদি পাঁচই পঞ্চ ইন্দ্রিয়-গোচর। শঙ্কর ও গিরি বলেন যে, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর শব্দাদি বিষয়ই পঞ্চ স্থূলভূত। এস্থলে প্রথম অর্থ ই গ্রাহ্য।

আপত্তি হইতে পারে যে, যদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর পঞ্চ তন্মাত্র হয়, আর পঞ্চ মহাভূত যদি পঞ্চ সূক্ষ্মভূত হয়, তবে এ শ্লোকে স্থূল ভূত উক্ত হয় হয় নাই, রূপরসাদি স্থূলভূত নহে। এই স্থূলভূতও আমাদের শরীরের বা ক্ষেত্রের উপাদান। ইহা বাদ দিলে আর স্থূল শরীর থাকে না—সূক্ষ্ম শরীর ও কারণ শরীর থাকিতে পারে। অথবা বেদান্ত অনুসারে প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ-বিশিষ্ট দেহ বা ক্ষেত্র থাকিতে পারে, কিন্তু অন্নময় কোষ থাকে না। অতএব বলা যায়, যে শরীর স্থায়ী, আমাদের মৃত্যুতেও থাকে, তাহারই উপাদান এইগুলি। আর যে শরীরের জন্মবৃদ্ধি মৃত্যু আছে, যাহা সংজাত, তাহার উপাদান পরে উক্ত হইয়াছে। এই গোলযোগ নিবারণ জন্য শঙ্কর ও গিরি পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর তন্মাত্রকেই পঞ্চ স্থূলভূত বলিয়াছেন। ইহা বুঝিতে হইবে।

আমরা বুঝিতে পারি যে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মন যে বিষয় গ্রহণ করে, তাহা এই শব্দ-স্পর্শ-রূপাদি-ভেদে পাঁচ প্রকার। মন ইন্দ্রিয়দ্বারা এই সকল বিষয় গ্রহণ করিয়া, সেই শব্দ-স্পর্শাদি সম্বন্ধেই আলোচনা করে। সে আলোচনার কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কারিকায় (২৮) আছে—

"শব্দাদিষু পঞ্চানাং আলোচনমাত্রমিষ্যতে বৃত্তিঃ।"

এই শব্দাদি বিষয় আলোচনাকালে মন এই শব্দাদি বিষয়ই অনুভব (sensation) করে। মন তাহার বাহিরে গিয়া সেই শব্দস্পর্শাদির

বাহ্য কারণ কি, তাহা স্থির করিতে পারে না। তাহা বুদ্ধির কার্য্য। বুদ্ধি সেই অনুভূতির বাহ্য কারণ স্থির করে। বলিয়াছি ত, তাহা হইতে প্রত্যক্ষ (external perception) হয়। শব্দ-তন্মাত্র হইতে তাহার কারণ আকাশের প্রত্যক্ষ হয়। স্পর্শানুভব হইতে বায়ুর প্রত্যক্ষ হয়—ইত্যাদি। এ প্রত্যক্ষও যে অনুমানমূলক, ইহা বলা যায়। এই গুণ ও ক্রিয়ার অনুভব হইতে তৎকারণ বাহ্য দ্রব্যের অনুমান বা প্রত্যক্ষ হয়। সে দ্রব্যের স্বরূপ কি, তাহা বস্তুতঃ আমরা জানিতে পারি না। এই অনুভূত রূপরসাদি ব্যতীত সেই অনুভূতির কারণ বাহ্যদ্রব্যে যে আর কিছু আছে, তাহা প্রত্যক্ষগম্য হয় না। এই জন্য এই শব্দাদিকে তন্মাত্র-(সেই মাত্র) স্বরূপ বলা হয়। এ কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।* অতএব এই শব্দাদিই পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়, তাহা স্থূলভূত নহে। সে শব্দাদির কারণ বা আধার পঞ্চ সূক্ষ্মভূত হইতে পারে। কিন্তু তাহা স্থূলভূত নহে,

---

* আধুনিক পাশ্চাত্য জড়বাদী পণ্ডিতগণও এ কথা স্বীকার করেন। জন্ ষ্টুয়ার্ট, মিল্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, "Matter is that which can be felt, seen, heard, tasted and smelt. Matter এর স্বরূপ বুদ্ধির অগোচর। জার্ম্মনির শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ক্যাণ্ট বলিয়াছেন যে, বাহ্যেন্দ্রিয় গোচর বিষয়ের যাহা স্বরূপ,— যাহাকে তিনি Thing-in-itself বা Things-in-themselves বলিয়াছেন, তাহা আমরা জানিতে পারি না। আমাদের ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি তাহাদের যে ভাবে—যেরূপ Categories বা দেশকালনিমিত্ত প্রভৃতি উপাধি বা আবরণ দ্বারা সাজাইয়া আমাদের যেরূপ প্রত্যক্ষ করায়, আমরা তাহাই প্রত্যক্ষ হয় মনে করি। সাংখ্য দর্শন অনুসারে এক অর্থে এই Thing-in-itselfই তন্মাত্র—That only। তাহাই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপ-রসাদি। তাহাই ইন্দ্রিয়গোচর হয় মাত্র। তাহা হইতে বাহ্য বিষয় আমাদের মনই কল্পনা করে। এই জন্য মন সংকল্পাত্মক। বেদান্তমতে এই Thing-in-itselfই ব্রহ্ম.—উক্ত আবরণ মায়ার আবরণ। সেই মায়া আবরণ আবৃত বলিয়া অথবা এই—যোগমায়া-সমাবৃত বলিয়া ব্রহ্ম বা ঈশ্বর আমাদের প্রত্যক্ষ হন না। সর্পে রজ্জু ভ্রমের ন্যায় বাহ্য বিষয় সম্বন্ধে আমা[illegible] ভ্রান্ত [illegible] হয় এ [illegible] এ স্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই।

এক্ষণে এ সম্বন্ধে আর এক কথা বুঝিতে হইবে। এই শব্দাদি তন্মাত্র বা পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়কে ক্ষেত্রের উপাদান কিরূপে বলা যায়? ইহারা ত বাহ্য-ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ, তবে কোন্ অর্থে ইহাদিগকে শরীরের অন্তর্ভূত পদার্থ বলিব? সাংখ্যমতে শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র ভূতাদি অহঙ্কার হইতেই উৎপন্ন হয়। চিত্তে যে সংস্কারবীজ আছে, তাহা হইতে আমাদের চিত্তে জ্ঞানক্রিয়া-কালে জ্ঞেয়রূপে প্রথমে নির্ব্বিশেষ-ভাবে রূপ-রসাদির অভিব্যক্তি হয়, সেই রূপরসাদির জ্ঞান ক্রমে সবিশেষ হয়। সুতরাং ইহারা অহঙ্কারের তামস ভূতাদিভাব। ইহা চিত্তেরই উপাদান। ইহা হইতে জ্ঞানে তাহাদের কারণরূপে বাহ্য স্থূল ভূতাদির প্রকাশ হয়, ও সেই ক্রিয়া-কালে বিশেষতঃ জ্ঞানের জাগ্রদবস্থায়ই স্থূল ভৌতিক শরীরেরও অনুভূতি হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারে যখন জ্ঞানক্রিয়া হয়, তখন এই ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের বিষয়রূপে এই শব্দস্পর্শাদিই অনুভব করে। চক্ষু—রূপ অনুভব করে, কর্ণ—শব্দ অনুভব করে, নাসা—গন্ধ অনুভব করে, জিহ্বা—রস অনুভব করে ও ত্বক্—স্পর্শ অনুভব করে। মন স্বতন্ত্র বাহ্য কিছু অনুভব করে না, অবশ্য অন্তরে সুখদুঃখাদি অনুভব করে এইরূপে চিত্তে জ্ঞানক্রিয়াকালে শব্দাদি বিষয়ের অনুভব হয়। বুদ্ধি তখন সেই অনুভূতির কারণকে বাহ্য আকাশাদি ভূতরূপে নির্দ্দেশ করে। এইরূপে যে বাহ্য পাঞ্চভৌতিক জগতের জ্ঞান ও ভোগ হয়, এই অহঙ্কারকে তাহার কারণ বলা যায়। পঞ্চদশীতেও ইহাকে মনঃ-কল্পিত জগৎ বলা হইয়াছে। ইহাই ভোগ হয়। এক অর্থে ইহাতে বিজ্ঞানবাদ আসিয়া পড়ে। যদি আমরা বাহ্যাস্তিবাদ স্বীকার করি, তবে বলা যাইতে পারে যে, বাহ্য বস্তু ইন্দ্রিয়দ্বারে ক্রিয়া করে বলিয়া, আমাদের এই শব্দাদির জ্ঞান হয়। তাহা হইলেও শব্দস্পর্শাদি মানস ব্যাপার ও মনের বিশেষ অনুভূতি মাত্র। এজন্য ইহারা চিত্তের অন্তর্ভূত—চিত্তের বিকার মাত্র, সুতরাং ক্ষেত্রের অন্তর্গত। ইন্দ্রিয়গোচর

শব্দাদি কিন্তু বাহ্য পদার্থে আরোপিত হয়, তাহা বাহ্য পদার্থের গুণ বলিয়া, জ্ঞান স্বতঃই সিদ্ধান্ত করিয়া লয়।

কিন্তু বেদান্তের সিদ্ধান্ত অন্যরূপ। ব্রহ্মই—'শব্দ'ব্রহ্মরূপে জগৎ কারণ হন,—নাম ও 'রূপ' দ্বারা জগৎ ব্যাকৃত করেন। সুতরাং 'শব্দ' 'রূপ' প্রভৃতি আমাদের চিত্তের অন্তর্ভূত নহে। শব্দাদি আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের কারণ। সুতরাং তাহারা বাহ্য। তাহারা পরমাত্মা হইতে অভিব্যক্ত। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, বেদান্ত দর্শনে আছে,—

'আত্মা হইতে আকাশের উৎপত্তি, আকাশ হইতে বায়ু ইত্যাদি। কিরূপে আত্মা হইতে আকাশের উৎপত্তি হয়, বেদান্ত শাস্ত্রে তাহার ইঙ্গিত আছে। আমরা তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। শ্রুতিতে আছে— "তৎ ঐক্ষত (বা অকাময়ত) বহু স্যাং প্রজায়েয়।" শব্দ বা বাক্ দ্বারা সেই ঈক্ষণ বা কল্পনা সম্ভব হয়। এই কল্পনাকালে ব্রহ্ম শব্দব্রহ্ম হন। এইজন্য শ্রুতিতে আছে—"বাগেব ইদং সর্ব্বম্।" সেই শব্দই সৃষ্টির মূল। তাহাই ব্যাপ্ত হইয়া আকাশ হয়। সেই শব্দ যখন প্রকাশ হয়, তখন প্রাণের দ্বারা শব্দ-স্বরূপ আকাশে অনুকম্পন হয়, তাহা প্রাণে বিধৃত হয়। (প্রাণে এজনি নিঃসৃতম্)। প্রাণে সেই অনুকম্পন হেতু আকাশ হইতে তাহার ঘনীভূত রূপ বায়ু উৎপন্ন হয়। অনুকম্পন হেতু শব্দাত্মক আকাশ ঘন ও তরল উভয়রূপ হয়। ঘনীভূত অংশ বাধা উৎপন্ন করে। স্পর্শের কারণে এই বাধা উৎপন্ন হইলে, ঘনীভূত আকাশ হইতে বায়ু হয়। এই বাধা স্পর্শাত্মক—স্পর্শদ্বারা জ্ঞেয়। অতএব স্পর্শ তন্মাত্র অগ্রে উৎপন্ন হইয়া বায়ুর কারণ হয়। এইরূপে বেদান্তমতে শব্দব্রহ্ম হইতে আকাশ, তাহা হইতে স্পর্শ গুণ হেতু বায়ু হয়। বায়ু ঘনীভূত হইয়া মূর্ত্ত বা রূপ-বিশিষ্ট হয়, তাহাতে তেজঃ বা অগ্নির উৎপত্তি হয়। এইরূপে রস ও গন্ধাদিক্রমে জল ও পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। এইরূপেই আকাশ বায়ুর কারণ হয়, বায়ু অগ্নির কারণ, অগ্নি জলের কারণ এবং জল পৃথিবীর

কারণ হয়। কারণ-গুণ কার্য্যে প্রকাশিত হয় বলিয়া, বায়ুতে স্পর্শ-গুণের সহিত আকাশের গুণ (শব্দও) থাকে। অগ্নিতে রূপের সহিত বায়ু ও আকাশের গুণ—শব্দ ও স্পর্শ থাকে। তরল অপ্‌ভূতে আকাশ, বায়ু ও তেজের গুণ—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ থাকে, আর কঠিন পৃথিবীভূতে আকাশাদি চারিভূতের গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস থাকে। তবে যাহা কার্য্যের বিশেষ গুণ, তাহা বিশেষ ভাবে ব্যক্ত হয়। এজন্য যেমন আকাশের বিশেষ গুণ শব্দ, সেইরূপ বায়ুর বিশেষ গুণ স্পর্শ, অগ্নির বিশেষ গুণ রূপ, জলের বিশেষ গুণ রস, ও পৃথিবীর বিশেষ গুণ স্পর্শ। সূক্ষ্ম ভূত হইতে পঞ্চীকৃত হইয়া পাঁচ স্থূলভূতের উৎপত্তি হেতু, এবং এই জড়জগৎ এই পাঁচ স্থূলভূতের পরিণাম বলিয়া, প্রত্যেক দ্রব্যেতেই ইতর-বিশেষ ভাবে এই পাঁচ গুণের অবস্থান আছে। এ সমুদায়ই ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মসত্তায় বিধৃত থাকে। এইরূপে এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর এই রূপরসাদি বিষয়, বেদান্ত-মতে পঞ্চ তন্মাত্র নহে, পঞ্চমহাভূতের কারণ বা গুণ। ইহাই কেবল ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়। শ্রুতিতে আছে—

"যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ পশ্যতি।
এতেনৈব বিজানাতি···।" (কঠঃ উপঃ, ৪।৯)।

কিন্তু এই রূপ-রসাদি বাহ্য ও ইন্দ্রিয়-গোচর হইলে, তাহারা আমাদের জ্ঞেয় হয়। জ্ঞেয় হয় বলিয়াই তাহারা ক্ষেত্র। শঙ্কর বলিয়াছেন,—যাহা জ্ঞেয়, তাহাই ক্ষেত্র। এইজন্য তাহাদিগকে ক্ষেত্রের উপাদান বলা হয়।

এই রূপ-রসাদি গুণ দ্বারাই আমরা আমাদের জ্ঞানে বাহ্য অগ্নি জল প্রভৃতি জানিতে পারি। পরমাত্মা এই শব্দাদি গুণের আধার আকাশাদি-রূপে অভিব্যক্ত হন, এবং শব্দাদি দ্বারাই বাহ্য পাঞ্চভৌতিক বিষয় জ্ঞানে ও শক্তিতে বিধৃত করেন। তাঁহার সৃষ্টি সত্য। সেই পরমাত্মার জ্ঞানের অংশী হইয়া বা তাহার প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া, আমরা, শব্দাদি অনুভূতি হইতে, বাহ্য আকাশাদি জানিতে পারি। ইহাই বেদান্তের প্রকৃত বিজ্ঞানবাদ।

ইহা ব্যক্তিগত বিজ্ঞানবাদ বা ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ নহে। এ বিজ্ঞানবাদ বাহ্যাস্তিবাদের বিরোধী নহে। সে যাহা হউক, আমরা বলিতে পারি যে, এই রূপরসাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর বিষয় আমাদের বাহ্য বা জ্ঞেয় হইলেও, এই জ্ঞেয়রূপেই তাহারা এই শরীরের বা ক্ষেত্রের উপাদান। তাহারা আমাদের পাঞ্চ-কৌষিক শরীরের মধ্যে বিজ্ঞানময় ও মনোময় কোষের অন্তর্ভূত। আমরা আরও এক অর্থে বলিতে পারি যে, এই রূপরসাদি আমাদের স্থূল পাঞ্চভৌতিক শরীরের উপাদান। সাংখ্য-তত্ত্বকৌমুদীতে আছে, "শরীরং তত্তু পার্থিবাদি পাঞ্চভৌতিকং. শব্দাদীনাং পঞ্চানাং সমূহঃ পৃথিবীতি। তে চ দিব্যাদিব্যতয়া দশেতি।" (সাংখ্য-কারিকা ৩২ শ্লোকের ব্যাখ্যা)। অতএব পূর্ব্বোক্ত কারণে এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর রূপরসাদি তন্মাত্রকে স্থূল পাঞ্চভৌতিক শরীরের উপাদানও বলা যায়।

যাহা হউক, অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারগণ সাংখ্যদর্শন হইতে এই শ্লোকোক্ততত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এই শ্লোকে সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে। সেই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব কি, তাহা পূর্ব্বে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বই যে ক্ষেত্রের উপাদান, ও ক্ষেত্রের স্বরূপ, তাহা অবশ্য এই শ্লোকে বুঝিতে পারা যায়। গিরি বলেন,—পূর্ব্ব-শ্লোকে "তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ" ইহা বলিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া ভগবান্ এই শ্লোকে সেই ক্ষেত্রের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।" এই ক্ষেত্র "যতশ্চ" অর্থাৎ ইহার উপাদান কি, এবং ইহার স্বরূপ কি (যৎ), তাহা পরের শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে।

এই ক্ষেত্রের স্বরূপ ও উপাদান যে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, তাহা কেবল সাংখ্যদর্শন-সম্মত নহে, তাহা বেদান্তদর্শন-সম্মতও বটে। সাংখ্যদর্শন অনুসারে অর্থ করিতে হইলে, পঞ্চ মহাভূতকে পঞ্চ স্থূলভূত ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের গোচরকে পঞ্চ তন্মাত্র বলিতে হয়। অথবা পঞ্চ মহাভূতকে পঞ্চ তন্মাত্র

ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়-গোচরকে পঞ্চ স্থূলভূত বলিতে হয়। গিরি তাহাই বলিয়াছেন। আর বেদান্ত-দর্শন অনুসারে অর্থ করিতে হইলে পঞ্চ মহাভূতকে অপঞ্চীকৃত পঞ্চ সূক্ষ্মভূত, ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়-গোচরকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয় রূপরসাদি বুঝিতে হয়। বেদান্ত-মতে রূপরসাদি পঞ্চভূতের গুণ মাত্র, তাহারা স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। এজন্য এ স্থলে বেদান্ত-মতে মহাভূত অর্থে সূক্ষ্ম অপঞ্চীকৃত ভূত, আর পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর অর্থে রূপরসাদি ইন্দ্রিয়-বিষয়। এই অর্থে যে এই রূপরসাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়-গোচর বিষয়কে ক্ষেত্রের উপাদানরূপে গ্রহণ করা যায়, তাহা বলিয়াছি। আমরা এ স্থলে বেদান্ত ও সাংখ্য সমন্বয়পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছি, এবং তাহার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। সমষ্টিভাবে এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হইতে ব্যক্ত এই জগৎ—ক্ষেত্র। এই জগৎই পরমাত্মা পরমপুরুষের শরীর। এজন্য তিনি এ জগৎরূপ শরীরে ক্ষেত্রজ্ঞ। আর ব্যষ্টিভাবে এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হইতে প্রাণি-শরীর হইয়াছে। এই প্রাণি-শরীরে জীব সেই শরীরের ক্ষেত্রজ্ঞ। ভগবান্ যে সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞ, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ—ক্ষেত্র হইতে পৃথক্। এই ক্ষেত্রের উপাদান যে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, তাহার মধ্যে যাহা কারণ ও যাহা কার্য্য, তাহা সাংখ্য-দর্শন হইতে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। যাহা কারণ, তাহা কার্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর যাহা কারণেরও অতীত, তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এ সম্বন্ধে কঠোপনিষদে যাহা আছে, তাহা জানা উচিত। কঠোপনিষদের শ্লোক এই, (৩।১০।১১ ; ৬।৭-৮ মন্ত্র দ্রষ্টব্য)—

> "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
> মনসশ্চ পরা বুদ্ধিঃ বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
> মহতঃ পরমব্যক্তম্ অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
> পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ, সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥"

* * * *

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্॥
অব্যক্তাৎ পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এবচ।"

গীতাতেও উক্ত হইয়াছে,—

"ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধি র্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥"

(গীতা, ৩।৪২)।

উক্ত কঠ-মন্ত্রোক্ত 'অর্থ'=ইন্দ্রিয়-গোচর রূপরসাদি বিষয়, আর 'সত্তা' —'বুদ্ধি'=মহানাত্মা—ব্যষ্টিভাবে জীবাত্মা ও সমষ্টিভাবে হিরণ্যগর্ভ।

ইহা হইতে অব্যক্ত, বুদ্ধি, মন, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়-গোচর বিষয়—ইহাদের লক্ষ্যার্থও জানা যায়। অহঙ্কারের কথা এ স্থলে উল্লিখিত নাই। কিন্তু সত্ত্বকে এই অহঙ্কার ও মহানাত্মাকে বুদ্ধিতত্ত্ব বলা যায়। প্রকৃতি হইতে যে মহানের সৃষ্টি, ইহা সাংখ্যদর্শনে আছে। মহাভূত-সম্বন্ধে এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়-গোচর-সম্বন্ধে সাংখ্য ও বেদান্তমত পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সে মতের পার্থক্য আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এক অর্থে সাংখ্য ও বেদান্ত উভয় মতই এ সম্বন্ধে এক। গীতায় তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। উভয় মতেই এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সিদ্ধান্ত হইয়াছে। তবে সাংখ্য-দর্শনে মূল প্রকৃতি বা প্রধান, স্বতন্ত্র তত্ত্বরূপে গৃহীত এবং তাহা হইতে অপর ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের উৎপত্তি সিদ্ধান্ত হইয়াছে। আর বেদান্তে ব্রহ্ম বা আত্মা হইতে ইহার উৎপত্তি সিদ্ধান্ত হইয়াছে। গীতায় এই উভয় মতের সামঞ্জস্য আছে। গীতায় অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতিকে পরমাত্মা পরমেশ্বরের প্রকৃতি বলা হইয়াছে। আরও এক কথা বুঝিতে হইবে,—এই তত্ত্ব ঋষিগণদ্বারা ছন্দে ও ব্রহ্মসূত্রপদেই বিস্তারিত হইয়াছে, পূর্ব্ব-শ্লোকে ইহা উক্ত হইয়াছে। এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের বিবরণ যে বেদান্ত গ্রন্থে—উপনিষদে আছে, তাহাও আমরা দেখিয়াছি। সুতরাং ইহা

কেবল সাংখ্য-দর্শনোক্ত তত্ত্ব নহে। সেই দর্শন প্রচারের পূর্ব্বেও সে তত্ত্ব প্রাচীন ঋষিগণ দর্শন করিয়াছিলেন, ইহা জানা যায়। গীতার এই অধ্যায়োক্ত প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-যোগ কেবল সাংখ্যশাস্ত্র হইতে গৃহীত নহে। ইহা ছন্দে ও ব্রহ্মসূত্র-পদে ঋষিগণদ্বারা যেরূপ বিবৃত হইয়াছে, তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ। গীতার অন্যত্র সাংখ্যমতের উল্লেখ আছে, সিদ্ধ-শ্রেষ্ঠ কপিলের উল্লেখ আছে। কিন্তু এ স্থলে সাংখ্যজ্ঞান উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং বেদান্ত হইতেই ইহা প্রধানতঃ বুঝিতে হইবে।

যাহা হউক, উপরে উদ্ধৃত উক্ত শ্রুতি হইতে এবং গীতার বচন হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ইন্দ্রিয়ের 'অর্থ' বা 'বিষয়' ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই 'অর্থ' হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি (বা সত্ত্ব) শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে মহানাত্মা শ্রেষ্ঠ, মহানাত্মা হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, আর এই অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। এই পুরুষই প্রকৃত ক্ষেত্রজ্ঞ। এই পুরুষই ব্যাপক অলিঙ্গ। এই পুরুষই কাষ্ঠা (শ্রেষ্ঠ) ও পরা গতি। এই পুরুষ-স্বরূপ লাভ করিতে হইলে, যে শাণিত ক্ষুরের ধারের ন্যায় দুর্গম দুরতি-ক্রমণীয় (যোগরূপ) পথে যাইতে হয় (কঠ, ৩।১৪), তাহার জন্য বাক্ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ও ইন্দ্রিয়গণকে মনে সংযত করিতে হয়, মনকে বিজ্ঞানাত্মায় সংযত করিতে হয়, বিজ্ঞানাত্মাকে মহানাত্মায় সংযত করিতে হয়, ক্রমে মহানাত্মাকে সেই পরম শান্ত আত্মাতে বা পুরুষে সংযত করিতে হয়, (কঠ, ৩।১৩)। ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এইরূপে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের স্বরূপে অবস্থান হয়।—এইরূপে 'অর্থ' হইতে অব্যক্ত পর্য্যন্ত উক্ত সমুদায় ক্ষেত্রকে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ হইতে পৃথক্‌ভাবে জানিয়া সেই পুরুষের স্বরূপ লাভ করিতে হয়। সেই তত্ত্ব প্রথমে জানিবার উপায়—"উত্তিষ্ঠ জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" (কঠ, ৩।১৪)। অর্থাৎ অজ্ঞান নিদ্রা হইতে উত্থিত ও জাগ্রত হইয়া শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণের নিকট যাইয়া ইহা জানিতে হয়। গীতায় এ স্থলে সেই উপদেশই দেওয়া হইতেছে। ইহাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানোপদেশ।

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৬

ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা,
আর ধৃতি,—সমুদায় বিকার সহিত
ক্ষেত্র ইহা, সংক্ষেপেতে হয় অভিহিত ॥ ৬

৬। ইচ্ছা দ্বেষ—পূর্ব্বে সুখের সাধন বলিয়া লোকে যে জাতীয় বস্তুকে অনুভব করিয়াছিল, পরে আবার সেই জাতীয় বস্তুকে দেখিয়া তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য ইচ্ছা করে। এই ইচ্ছা অন্তঃকরণের ধর্ম্ম। সুতরাং ইহা জ্ঞেয়। জ্ঞেয় বলিয়া ইহাও ক্ষেত্র। সেইরূপ পূর্ব্বে যেপ্রকার বস্তুকে দুঃখের কারণ বলিয়া অনুভব করা হইয়াছিল, সেই প্রকার বস্তুকে আবার দেখিতে পাইলে, লোকে তাহার প্রতি দ্বেষ করে। এই দ্বেষও অন্তঃকরণের ধর্ম্ম—সুতরাং ইহা জ্ঞেয়। অতএব ইহাও ক্ষেত্র, বা ক্ষেত্রের ধর্ম্ম, (শঙ্কর)। সুখজনক বিষয়ে ইচ্ছা এবং দুঃখহেতু বিষয়ে দ্বেষ—ইহারা জ্ঞেয় বলিয়া ক্ষেত্রের ধর্ম্ম (গিরি)। আমার সুখসাধন জন্য এ বস্তু আমার হউক, এই স্পৃহাত্মক চিত্তবৃত্তিই 'কাম' বা "রাগ" বা ইচ্ছা। আর ইহা আমার দুঃখসাধন, এ বস্তু আমার না হউক, এইরূপ যে স্পৃহাবিরোধী চিত্তবৃত্তি, তাহা ক্রোধ, ঈর্ষা বা দ্বেষ, (মধু)। সুখহেতু বলিয়া অভিমত বস্তুর ঈপ্সা=ইচ্ছা, আর প্রতিকূল বস্তুর নিরাশাত্মক চিত্তবৃত্তি=দ্বেষ। ইহারা ক্ষেত্রের ধর্ম্ম (কেশব)। কোনও সুখকর বস্তু উপস্থিত হইলে, তাহা পাইবার কামনা—ইচ্ছা, আর দুঃখকর বস্তু উপস্থিত হইলে, তাহা ত্যাগের প্রবৃত্তি—দ্বেষ। যেমন সুখদ বস্তু পাইবার ইচ্ছা হয়, সেইরূপ দুঃখদ বস্তু ত্যাগের বা না পাইবার ইচ্ছা হয়। উভয় সম্বন্ধেই ইহাকে সাধারণভাবে ইচ্ছা বলা যায়।

কিন্তু এ স্থলে কেবল সুখকর বস্তু পাইবার জন্য যে বাসনা, তাহাকেই বিশেষভাবে ইচ্ছা বলা হইয়াছে। ইচ্ছা অর্থাৎ পাইবার ইচ্ছা। দ্বেষ অর্থাৎ ত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি। তাহাকে ঠিক্ ইচ্ছা বলা যায় না। রাগহেতু ইচ্ছা, দ্বেষহেতু অনিচ্ছা হয়। এই ইচ্ছা (রাগ) ও দ্বেষ ইহারা দ্বন্দ্ব।

সুখ দুঃখ—যাহা অনুকূল, প্রসাদময় ও সত্ত্বগুণের পরিণাম, তাহাই সুখ। সে সুখ জ্ঞেয়, এজন্য তাহা ক্ষেত্র বা ক্ষেত্রের ধর্ম্ম। আর দুঃখ প্রতিকূলস্বভাব প্রমাদকর, ইহা রজোগুণের পরিণাম। দুঃখও জ্ঞেয়, এজন্য ইহা ক্ষেত্র বা ক্ষেত্রের ধর্ম্ম (শঙ্কর)। নিরুপাধি ইচ্ছাবিষয়ীভূত অসাধারণ কারুণিক ধর্ম্মযুক্ত যে চিত্তবৃত্তি, যাহা পরমাত্ম-সুখব্যঞ্জক, তাহা সুখ। আর নিরুপাধি দ্বেষবিষয়ীভূত যে চিত্তবৃত্তি, তাহা দুঃখ (মধু)। পুণ্যজন্মানুকূল বিষয়ানুভব=সুখ (কেশব)। এই সুখ-দুঃখও দ্বন্দ্ব। এই রাগ-দ্বেষ সুখ-দুঃখ—বাসনারূপ সংস্কার-বীজ। ইহাই সংসারের বা ভবের কারণ।

মধুসূদন সুখের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত। সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ—ইহারা নিরুপাধিক হইতে পারে। ইহারা চিত্তের বা অন্তঃকরণের ধর্ম্ম। বিষয়গ্রহণকালে এই ধর্ম্মের বিকাশ হয়, অন্য সময় ইহারা চিত্তে বীজভাবে থাকে। মন যখন কোন বিষয় অনুভব করে, এবং বুদ্ধি তাহা গ্রহণ করে, তখনই চিত্তের এই সুখ-দুঃখ রাগ-দ্বেষাদিরূপ ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট বৃত্তির বিকাশ হয়। সুখাত্মক চিত্তবৃত্তি স্বভাবতঃ সাত্ত্বিক, তাহাতে বিষয়-প্রকাশ-কালে সুখ অনুভূত হয়। আর রাজসিক বৃত্তিতে দুঃখ অনুভূত হয়। ইহা সাধারণ নিয়ম। বিশেষ স্থলে রাজসিক চিত্তবৃত্তিতেও সুখ এবং সাত্ত্বিক চিত্তবৃত্তিতে দুঃখ ও রাগদ্বেষের বিকাশ হয়। ন্যায়দর্শনে আছে, (১।১।২১) "বাধনালক্ষণং দুঃখম্।" যখন পীড়া-তাপাদি উৎপন্ন হয়, তখন পীড়া-তাপাদি লক্ষণ দুঃখ হয়। সুখ ও দুঃখ দ্বন্দ্ব, ইহারা পরস্পর

বিরোধী। বৈশেষিক দর্শনে আছে (১০।১।১)—"ইষ্টানিষ্টকারণ-বিশেষাৎ বিরোধাচ্চ সুখদুঃখয়োরর্থান্তরভাবঃ।" সুখ ইষ্টকর ও দুঃখ অনিষ্টকর। সুখের সময় দুঃখ অন্তঃকরণে লীন থাকে এবং দুঃখের সময় সুখ লীন থাকে। এই সুখ-হেতু 'রাগ' বা অনুরাগ জন্মে, এবং দুঃখহেতু দ্বেষ জন্মে। পাতঞ্জল-দর্শনে (২।৭-৮) আছে—

"সুখানুশয়ী রাগঃ। দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ॥"

চিত্তবৃত্তি মাত্রেই প্রায় সুখকর, না হয় দুঃখকর। পাতঞ্জল-দর্শনে আছে—"বৃত্তয়ঃ পঞ্চতষ্যঃ ক্লিষ্টা অক্লিষ্টাঃ।"

এ স্থলে কেশবাচার্য্য বলিয়াছেন যে, গীতায় উক্ত হইয়াছে—"পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে।" এজন্য বলা যায় যে, ইচ্ছাদ্বেষ সুখদুঃখ আত্মারই ধর্ম্ম। তথাপি আত্মার ক্ষেত্র-সম্বন্ধ প্রযুক্তই তাহা হইতে উৎপন্ন হেতু ইহাদিগকে ক্ষেত্রাশ্রিত বলা যায়।

এই সুখদুঃখ ও রাগদ্বেষতত্ত্ব আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এই সুখ-দুঃখ রাগদ্বেষ চিত্তেরই বিকার; সুতরাং ক্ষেত্রের বিকার। ইহাতে ক্ষেত্র যদ্বিকারী, তাহা উক্ত হইয়াছে। ভগবান পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—বুদ্ধি জ্ঞান ইচ্ছা দ্বেষ সুখ দুঃখ ভূতগণের যে পৃথগ্বিধ ভাব, তাহা তাঁহা হইতেই অভিব্যক্ত হয় (গীতা, ৯।৫)। ক্ষেত্রেই এই বিবিধভাব অভিব্যক্ত হয়।

সংঘাত—দেহ ও ইন্দ্রিয়গণের সংহতি (শঙ্কর)। দেহ ও ইন্দ্রিয়ে আত্মাধ্যাস নিবারণ জন্য ইহাদিগকে ক্ষেত্রান্তর্গত বলা হইয়াছে (গিরি)। শরীর (স্বামী)। পঞ্চমহাভূত-পরিণাম ইন্দ্রিয় সহিত শরীর (মধু)। ভূত-পরিণাম দেহ (বলদেব)। ভূত-সংঘাত, ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ভূত প্রকৃতি—এই পৃথিবী পর্য্যন্ত দ্রব্য (রামানুজ)। সংঘাত=চেতন ভোগায়তনভূত পঞ্চমহাভূত পরিণাম (কেশব)। সংঘাত অর্থে "অযুত সিদ্ধ অবয়ব"

পাতঞ্জল-দর্শনের ৩।৪৪ সূত্রের ব্যাস-ভাষ্য)। ইহা তিন প্রকার— জীব শরীর (animal organism) বৃক্ষ (vegetable organism, এবং পরমাণু। অতএব সংঘাত অর্থে, যাহা সাংখ্যোক্ত চতুর্বিংশতি তত্বকে সম্মিলিত করিয়া এই স্থূল শরীর উৎপন্ন করে, সেই শরীর-গঠন-শক্তি (vital force) হইতে উৎপন্ন শরীর। ইহাকে organism বলা যায়। যাহা organised হয়—শরীররূপে সংহত হয়, তাহা সংঘাত। সুতরাং সংঘাত অর্থে স্থূল (organised) শরীর। পূর্ব্বে যে প্রকৃতি ও প্রকৃতি-জাত ত্রয়োবিংশতি তত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতেও লিঙ্গ ও অধিষ্ঠান বা আতিবাহিক শরীররূপ ক্ষেত্রের উৎপত্তি হয়। সাংখ্যদর্শন অনুসারে বুদ্ধি, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রে লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর হয়। পঞ্চ মহাভূত বা স্থূলভূতের সূক্ষ্মাংশ হইতে তাহার অধিষ্ঠান বা আতিবাহিক শরীর হয়। ইহা মৃত্যুর পরেও থাকে। 'সাংখ্য-সূত্র—"আতিবাহিকস্তল্লিঙ্গাৎ" দ্রষ্টব্য। যখন আবার জন্ম হয়, তখন এই সূক্ষ্ম শরীর বীজরূপে স্থূলভূত আকর্ষণ করিয়া পিতৃমাতৃজ পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীর গঠিত হয়। অতএব পূর্ব্ব-শ্লোকে স্থূল পাঞ্চভৌতিক শরীরের কথা নাই। সেই শ্লোকোক্ত সূক্ষ্ম শরীরদ্বারা, তাহাতে সঞ্চিত বাসনা সংস্কার অর্থাৎ রাগ দ্বেষ সুখদুঃখাদি হইতে যে প্রারব্ধ কর্ম্ম ফলোন্মুখ হয়, তাহা হইতে যে স্থূল শরীর বা পিতৃমাতৃজ শরীর গঠিত (organised) হয়, তাহাই সংঘাত। এই স্থূল শরীর যে ভূতগ্রাম বা বহুভূত-বিশেষের সমবায়ে উৎপন্ন, তাহা পরে ১৬।২৬-২৭ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বে যে ক্ষেত্র সম্বন্ধে "যতশ্চ যৎ" উক্ত হইয়াছে, এই স্থলে তাহারই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে বলা যায়। এই ক্ষেত্র বা শরীরকে সাধারণতঃ আমরা এই দৃশ্যমান স্থূল শরীর বা অন্নময় শরীর বলিয়াই বুঝি। ইহাকেই সাধারণতঃ সঙ্ঘাত বলে। ইহা লিঙ্গশরীরের বিকার-রাগ-দ্বেষ-সুখ-দুঃখরূপ বাসনা বা সংস্কার-বীজ হইতে উৎপন্ন। ইহাই নানাবিধ স্থূল

শরীররূপে ব্যক্ত হয়। আমরা বলিয়াছি যে, সংঘাতের মূল কারণ প্রাণ-শক্তি (vital energies)। ইহা ভগবানের সনাতন অংশ, এই জীব লোকে জীবভূত হয়, ও জীবভূত হইবার কালে প্রকৃতিস্থ মন ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিয়া সংহত করে। স্থূল শরীরের ধ্বংস বা উৎপত্তি-কালে ইহাই (চিত্ত বা) মন ও ইন্দ্রিয়গণকে গ্রহণ করিয়া লইয়া যায় এবং লইয়া আসে, এই শক্তিই স্থূল শরীর সংযোগ করে। এ জন্য এই স্থূল শরীরই সংঘাত।

চেতনা—প্রতপ্ত লৌহপিণ্ডে অগ্নির ন্যায় সেই সংঘাতে অভিব্যক্ত যে অন্তঃকরণের বৃত্তি, যাহা আত্মচৈতন্যের আভাসরূপ রসে আপ্লুত, সেই অভিব্যক্ত অন্তঃকরণ-বৃত্তিই চেতনা। এই চেতনা জ্ঞেয় বলিয়া ক্ষেত্র। (শঙ্কর)। তপ্ত লৌহপিণ্ডে বহ্নির অভিব্যক্তির ন্যায়, সেই সংঘাতে বা শরীরে বুদ্ধিবৃত্তির অভিব্যক্তি হয়, এবং তাহাতে অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিতে আত্মচৈতন্যেরও অভিব্যক্তি হয়। সেই আভাস-চৈতন্যকে আত্মা বলিয়া বোধ হয়। এই আভাস-চৈতন্যকেই চেতনা বলে। তাহা আত্মচৈতন্যের জ্ঞেয়। এজন্য তাহা ক্ষেত্র (গিরি)।

চেতনা=জ্ঞানাত্মক মনোবৃত্তি (স্বামী)। চেতনা=চেতনস্বরূপ জ্ঞানব্যঞ্জক জ্ঞানাখ্য চিত্তবৃত্তি। (মধু)। ভূত পরিণাম দেহ সংঘাতই চেতনা (বলদেব)। চেতনা=বিষয় অনুভব-যোগ্য দেহেন্দ্রিয়ের অবৈকল্য অবস্থা (কেশব)।

ধৃতি—দেহ ও ইন্দ্রিয় অবসন্ন হইয়াও যাহার প্রভাবে বিধৃত হয়, সেই শক্তি-বিশেষকে ধৃতি বলে (শঙ্কর)। দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ অবসন্ন হইলে, তাহাদের ধারণ জন্য প্রযত্ন (মধু)। ভোগ-মোক্ষ হেতু যতমান চেতনাযুক্ত জীবের আধাররূপে উৎপন্ন (বলদেব)। দেহ ইন্দ্রিয়ের বৈকল্য হেতু উপস্থিত হইলে, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অবষ্টম্ভক ধর্ম বিশেষ (কেশব)। ধৈর্য্য (স্বামী)।

রামানুজের পাঠ অন্যরূপ। তাঁহার পাঠ—"সংঘাত চেতনা

আধৃতি"। আধৃতিঃ অর্থে আধার। সুখদুঃখভোক্তা, ভোগ ও অপবর্গ-সাধন জন্য যত্নবান্ চেতনার আধাররূপে উৎপন্ন পঞ্চভূতের সংঘাত শরীর।" চেতনার আধার সংঘাত। ইচ্ছা দ্বেষাদি বিকারভূত সংঘাতে চেতনের সুখদুঃখাদি ভোগের এ আধার প্রয়োজন।

যাহা হউক, সংঘাত, চেতনা ও ধৃতি ইহারা পরস্পর বিভিন্ন। চেতনা অর্থ শঙ্করেরই সঙ্গত। এই চেতনার অর্থ এ স্থলে আরও বিশেষভাবে বুঝিতে হইবে। চেতনা, চৈতন্য, চিৎ প্রভৃতি শব্দের অর্থভেদ বুঝিতে হইবে। চেতনের ইংরাজী প্রতিশব্দ "Consciousness। ইহা দুই রূপ—এক আত্ম-চৈতন্য (Self-consciousness) আর এক ক্ষেত্রে অভিব্যক্ত চেতনা (Phenomenal Consciousness)। আত্মা চিৎ-স্বরূপ, 'জ্ঞ'-স্বরূপ, নিত্য-বোধ-স্বরূপ। সাংখ্য কারিকায় আছে, "তস্মাৎ তৎসংযোগাৎ অচেতনং চেতনাবৎ ইব লিঙ্গং" (কারিকা, ২০)। 'জ্ঞ'-স্বরূপ—চিৎস্বরূপ পুরুষের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া—লিঙ্গ-শরীর চেতনবৎ হয়। অতএব লিঙ্গ-শরীরে অভিব্যক্ত চৈতন্য—প্রতিবিম্বিত আভাস চৈতন্য। ইহাতেই জীবভাব হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন—"ভূতানামস্মি চেতনা।" শ্রীচণ্ডীতে আছে—ব্রহ্মশক্তি "চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নম্ এতৎ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।" সুতরাং এই ক্ষেত্রে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য ক্ষেত্রের ধর্ম্ম। চিৎস্বরূপ আত্মার এই প্রতিবিম্ব হেতু ক্ষেত্রে এই জীব-চৈতন্যের বিকাশ হয়। পরমাত্মাই 'চেতনশ্চেতনানাং' (কঠ, ৫.১৩ ; শ্বেতাশ্বতর, ৬।১৩)।

ইহা হইতে আমরা বলিতে পারি যে, সংঘাত (organised body) মাত্রেই চেতনা-বিশিষ্ট। কিন্তু এ চেতনা আমরা সর্ব্বত্র বুঝিতে পারি না। যাহা জড় সংঘাত, তাহার মধ্যে আমরা এ চেতনার বিকাশ দেখিতে পাই না। কিন্তু কোন সংঘাত যে চেতনা-বিশিষ্ট নহে, তাহা বলা যায় না। এ সম্বন্ধে জর্ম্মান দার্শনিক প্রসিদ্ধ সপেনহয়র বলিয়াছেন, "Consciousness that sleeps in stone dreams in ammals and awakes

in man." অতএব সর্ব্বভূতে এই চেতনা আছে। তাহা ভগবানেরই অংশ বা তাঁহার বিশেষ ভাব,—ক্ষেত্রে অভিব্যক্ত ভূতভাব।

এক্ষণে ধৃতির অর্থ কি, তাহা বুঝিতে হইবে। গীতার পরে উক্ত হইয়াছে যে, ধৃতি তিন প্রকার,—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক ধৃতি দ্বারা মন প্রাণ ইন্দ্রিয় ক্রিয়া অব্যভিচারিত যোগে ধৃত হয়, রাজসিক ধৃতি দ্বারা তাহা ধর্ম্ম কাম ও অর্থের প্রতি ধৃত হয়। আর তামসিক ধৃতি দ্বারা, স্বপ্ন ভয় প্রভৃতিতে ধৃত হয়। সুতরাং ধৃতিই ধারণশক্তি। ইহা বুদ্ধি, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদিকে কোন বিশেষ ব্যাপারে বিধৃত করে। (গীতা ১৮।৩৩-৩৫)। বেদান্ত অনুসারে ধৃতি অধৃতি মনই বা মনের ধর্ম্ম (বৃঃ আঃ ১৫)। সাংখ্যদর্শন অনুসারে এই ধারণ বা ধার্য্য কর্ম্ম, বুদ্ধি অহঙ্কার মন দশ ইন্দ্রিয় —এই ত্রয়োদশ করণের সামান্য বৃত্তি মাত্র। সাংখ্যদর্শনে আছে—

"করণং ত্রয়োদশবিধং তদাহরণং ধারণং প্রকাশকরম্।
কার্য্যঞ্চ তস্য দশধা হার্য্যং ধার্য্যং প্রকাশ্যঞ্চ॥

(কারিকা, ৩২)

অতএব বুদ্ধি মন অহঙ্কার ও দশ ইন্দ্রিয়—এই ত্রয়োদশ করণের এক বৃত্তি—ধারণ বা ধারণ শক্তিই ধৃতি। প্রাণ ও সাংখ্যমতে সামান্য করণ-বৃত্তি। "সামান্য করণ-বৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা পঞ্চবায়বঃ।" এই প্রাণাদি পঞ্চবায়ু দ্বারা এই ধারণ কার্য্য হয়।

উক্ত কারিকার ব্যাখ্যায় সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদীতে আছে,—"বুদ্ধ্যহঙ্কার-মনাংসি তু স্ব-বৃত্ত্যা প্রাণাদিলক্ষণয়া ধারয়ন্তি।" * * * ধার্য্য-মপ্যন্তঃকরণত্রয়স্য প্রাণাদিলক্ষণয়া বৃত্ত্যা শরীরম্। তত্তু পার্থিব্যাদি পাঞ্চ-ভৌতিকম্।...তে চ পঞ্চ দিব্যাদিব্যতয়া দশেতি, ধার্য্যমপি দশধা।"

এতদনুসারে বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণ যে পাঞ্চভৌতিক শরীরকে ধারণ করে—অর্থাৎ রক্ষণ পোষণ ও বর্দ্ধন করে, তাহা তাহাদের এই প্রাণ-বৃত্তির দ্বারাই সম্ভব। এই জন্য বলিতে পারা যায় যে, ধৃতি প্রাণেরই

ধারণ-শক্তি। আর ইহাই প্রাণের পঞ্চবিধ প্রাণনাদি ক্রিয়াকে নিয়মিত করে। প্রাণ সাংখ্যমতে উক্ত ত্রয়োদশ করণে সামান্য বৃত্তি হইলেও (কারিকা ২৯) বেদান্তমতে প্রাণ, বুদ্ধি প্রভৃতি ত্রয়োদশ করণ অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। প্রাণ হিরণ্যগর্ভ হইতে প্রথম উৎপন্ন। (পূর্ব্বে ৭।৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। এই প্রাণ হইতে সমুদায় জগতের অভিব্যক্তি হয়। ('প্রাণে এজতি নিঃসৃতম্'—ইতি শ্রুতিঃ)। প্রাণে সমুদায় জগৎ বিধৃত হয়। প্রাণই এ সমুদায় ('প্রাণ এব ইদং সর্ব্বম্'—ইতি শ্রুতিঃ। অতএব এই ধৃতিই মুখ্য প্রাণেরই মূল বৃত্তি, প্রাণাদি পঞ্চবায়ু এই প্রাণেরই কার্য্যরূপ, এই প্রাণই শরীর-ধারণশক্তি ও তাহাই বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর ক্রিয়ার ধারণ ও নিয়মন শক্তি।

এ স্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, প্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে সাংখ্য ও বেদান্ত-মতের সামঞ্জস্য করিতে হইলে বেদান্তোক্ত প্রাণ ও সাংখ্যোক্ত প্রাণবায়ু স্বতন্ত্র ভাবে বুঝিতে হইবে। প্রাণ—ধারণ, শক্তি পঞ্চপ্রাণ বায়ুর তাহা কার্য্য (function)। প্রাণ,—মূল শক্তি, পঞ্চপ্রাণ-ক্রিয়া তাহা হইতে অভি-ব্যক্ত। প্রাণ বুদ্ধি মন প্রভৃতি 'করণ' হইতে শ্রেষ্ঠ, প্রাণ তাহাদিগকে ধৃতি-শক্তিরূপে বিধারণ করে। তাহা হইতে এই বুদ্ধি প্রভৃতি ত্রয়োদশ করণের সামান্য বৃত্তিরূপে এই প্রাণাদি পঞ্চ (পরিচালক) বায়ুর অভিব্যক্তি হয়। এই পঞ্চপ্রাণ-ক্রিয়াকে মূল প্রাণ ধৃতিরূপেই ধারণ করে। গীতা অনুসারে এই প্রাণই জীবভূত হইয়া জীবজগৎ ধারণ করে।

সমুদায় বিকার সহিত—(সবিকারং)—বিকার বা পরিণামের সহিত সম্বন্ধ মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি যাবতীয় জ্ঞেয় বস্তু মাত্রেই ক্ষেত্র বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে (শঙ্কর)। ক্ষেত্র ভেদজাত ব্যষ্টি দেহ বিভাগ সমুদায়ও ক্ষেত্র। তাহারই সংহতি সমষ্টি শরীর (গিরি)। বিকার সহিত অর্থাৎ কার্য্য সহিত (রামানুজ)। ইন্দ্রিয়াদি বিকার সহিত (স্বামী)। জন্ম-মরণাদি পরিণামযুক্ত (কেশব)।

এই ইচ্ছা দ্বেষ সুখদুঃখ ভূতগণের ভাব, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই ভাব ক্ষয় ভাব—বিকারী ভাব। ইহারা ক্ষেত্রেরই বিকার।

মধুসূদন বলেন,—"এই মহাভূত হইতে আরম্ভ করিয়া ধৃতি পর্য্যন্ত জড়। ইহারা সাক্ষী ক্ষেত্রজ্ঞের অবভাস্যমান হেতু অনাত্ম। ক্ষেত্র ভাস্যমান চেতন। ক্ষেত্রের সহায়েই চেতনের অভিব্যক্তি। লোকায়তিকগণের মতে শরীর ইন্দ্রিয়ের সংঘাতেই চৈতন্য—তাহাই ক্ষেত্রজ্ঞ। সৌগত বা বৌদ্ধগণের মতে, ক্ষণিক বিজ্ঞান-সংততিই আত্মা। অন্য আত্মা নাই। আর, ইচ্ছা দ্বেষ প্রযত্ন সুখ দুঃখ চেতনা আত্মারই লিঙ্গ বা পরিচায়ক—ইহা নৈয়ায়িকগণের মত। অতএব এ সকলকে কিরূপে ক্ষেত্র বলা যায়? উহারই উত্তরে বলা হইয়াছে যে, ইহারা ক্ষেত্রের বিকার। নিরুক্তমতে মহা জন্মাদি ষড়ভাব বিকারযুক্ত, তাহাই বিকারী। এই মহাভূত হইতে ধৃতি পর্য্যন্ত সমুদায় সেই বিকারযুক্ত। ক্ষেত্রজ্ঞ অবিকারী। যিনি দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা, তিনি স্বয়ং নিজের উৎপত্তি-বিনাশের দ্রষ্টা হইতে পারেন না। তিনি দর্শনের কর্ত্তা, তিনি দর্শনের কর্ম্ম হইতে পারেন না। আত্মা নির্ব্বিকার, তিনি সর্ব্ববিকারের সাক্ষী মাত্র। অতএব বিকারই ক্ষেত্রের চিহ্ন"।

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, যাহা জ্ঞেয়, তাহাই ক্ষেত্র। এই দুই শ্লোকে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহারা জ্ঞেয়—এজন্য ক্ষেত্র। পূর্ব্বে দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় শঙ্করের এই মত বিবৃত হইয়াছে।

শঙ্করাচার্য্য আরও বলেন যে, "বৈশেষিক দর্শন অনুসারে ইচ্ছা-দ্বেষাদি আত্মার গুণ। তাহারা যে ক্ষেত্রেরই ধর্ম্ম, আত্মার নহে, তাহারা সবিকারী, সুতরাং নির্ব্বিকার আত্মার ধর্ম্ম হইতে পারে না, তাহা এই শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।" বৈশেষিক দর্শনে আছে—

"ইচ্ছা-দ্বেষ-সুখ-দুঃখ-প্রযত্নাশ্চ আত্মনো লিঙ্গানি।"

(বৈশেষিক দর্শন, ৩।২।৪)।

ন্যায়দর্শনেও এই কথা আছে ; যথা—

"ইচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্ন-সুখ-দুঃখজ্ঞানানি আত্মনো লিঙ্গম্।"

(ন্যায়-দর্শন, ১।১।১০)।

ন্যায়-মতে মন আত্মা হইতে স্বতন্ত্র ও সুখদুঃখাদি মনের ধর্ম্ম বটে ; কিন্তু মনের সহিত আত্মার সংযোগেই আত্মা চৈতন্যযুক্ত, এবং সুখদুঃখাদি-গুণযুক্ত হয়।

শ্রুতিতেও আছে,—আত্মা 'সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ' ইত্যাদি। গীতায় আছে,—"পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে।" (গীতা, ১৩।২০)। কিন্তু মনেতেই সুখ দুঃখ, ইচ্ছা দ্বেষ, কাম, সংকল্প ইত্যাদির অভিব্যক্তি হয়। শ্রুতি অনুসারে তাহারা মনই—বা মনের ধর্ম্ম ; ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এজন্য তাহা ক্ষেত্রের অন্তর্গত (বলদেব)।

আমি এই শরীরের বেত্তা ক্ষেত্রজ্ঞ। আমার যাহা বেদ্য বা জ্ঞেয়, তাহাই এই শরীর বা ক্ষেত্র। ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই তত্ত্ব আরও বিশেষ ভাবে এস্থলে পরিস্ফুট হইয়াছে। মহাভূত হইতে আরম্ভ করিয়া ধৃতি পর্য্যন্ত সমুদায়ই ক্ষেত্রজ্ঞ আমার বেদ্য, আমার জ্ঞেয়, এজন্য ইহারাই ক্ষেত্র। ইহা অপেক্ষা আরও বিশেষ ভাবে এ তত্ত্ব জানিতে হইবে। এই কয়টির মধ্যে কোন্‌গুলি কিরূপ, কোন্‌গুলি ক্ষেত্রের উপাদান, কোন্‌গুলি তাহার বিকার, কোন্‌গুলি ক্ষেত্রের উৎপাদক কারণ, কোনগুলি বা তাহার কার্য্য, তাহা আরও বিশেষ করিয়া জানিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ কি, ইহাদের লক্ষণ কি, কার্য্য কি, স্বরূপ কি, তাহাও জানিতে হইবে। এই দুই শ্লোকে তাহার ইঙ্গিত আছে মাত্র।

পূর্ব্ব-শ্লোকে ক্ষেত্রের স্বরূপ কি, তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহা "যচ্চ যাদৃক্‌চ"—ইহা বিবৃত হইয়াছে। এ শ্লোকে ক্ষেত্রের বিকার 'যদ্বিকারী', তাহা নিরূপিত হইয়াছে, (গিরি)। এই শ্লোকে আরও 'যতশ্চ যৎ' ইহাও বিবৃত হইয়াছে বলিতে হইবে। নতুবা ভগবানের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়। 'যতঃ'

অর্থাৎ যাহা হইতে, অথবা যাহা কারণ। কারণ সাধারণতঃ দুইরূপ,— উপাদান কারণ, ও নিমিত্ত কারণ। মহাভূতাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ক্ষেত্রের উপাদান কারণ। ইচ্ছা দ্বেষ সুখ দুঃখ ইহারা নিমিত্ত কারণ ('যতঃ')। সংঘাত ইহাদের কার্য্য ('যৎ')। আর চেতনা ও ধৃতি তাহার প্রকাশক ও ধারক শক্তি। বেদান্ত, সাংখ্য এবং পাতঞ্জল দর্শন অনুসারে অজ্ঞান বা অবিদ্যাই শরীর-সংযোগের প্রকৃত নিমিত্ত কারণ। এই অজ্ঞান বা অবিদ্যা হইতে ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখাদি চিত্তধর্ম্মের বিকাশ হয়, এবং তাহা আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া ভ্রম হয়। এই ইচ্ছা দ্বেষ প্রভৃতির বশে আমরা কর্ম্ম করি। সেই কর্ম্ম হইতে সংস্কার উৎপন্ন হয়। এইরূপে ইচ্ছা দ্বেষ, সুখ দুঃখ, এবং তদনুযায়ী কর্ম্মপ্রবৃত্তি বীজ-ভাবে অন্তঃকরণে থাকিয়া যায়। তাহাই সংস্কার। এই সংস্কারের মূল বাসনা। বাসনা বা 'কাম' দ্বারা প্রবর্ত্তিত স্ফুটনোন্মুখ এই সংস্কার হইতেই স্থূলশরীর গঠিত হয়। "সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগঃ।" (পাতঞ্জল সূত্র, ৪।২)। সুতরাং এই সংস্কারই স্থূল শরীর সংযোগের নিমিত্ত কারণ। পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্ম হইতে যে সংস্কাররাশি সঞ্চিত হয়, তাহাদের মধ্যে যাহারা ফলোন্মুখ হয়, তাহা হইতেই জন্ম হয়, এবং পশু পক্ষী মানুষ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় শরীরমধ্যে সেই সকল সংস্কার বিকাশের উপযুক্ত শরীর গ্রহণ হয়। উদ্ভিজ্জাদি নিম্ন জীবে সূক্ষ্ম শরীর অবিকাশিত, তাহা বীজভাবে থাকে। এজন্য নিম্নশ্রেণীর জীবে বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতির বিশেষ বিকাশ থাকে না। তাহাদের স্থূল শরীরই বিকাশ হয়। তাহার পর কর্ম্ম দ্বারা যে সংস্কার সঞ্চিত হয়, জন্মের পর জন্ম-গ্রহণ দ্বারা সেই সংস্কারের উন্নতি হয়। তাহা দ্বারা ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম শরীরের ক্রমোন্নতি হয়। প্রথম প্রাণ শরীরের বিকাশ হয়। প্রকৃতির আপূরণে সংস্কার সঞ্চয়ে জাত্যন্তর পরিণাম হয়। অপেক্ষাকৃত উন্নত শ্রেণীর জীবে সেই সংস্কার হইতে মনোময় শরীরের বিকাশ হয়। তখন ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ অনুভূতির আরম্ভ হয়। কামমানস শরীর এইরূপে ক্রমোন্নত হয়।

এইরূপে এই দুই শ্লোকে সংক্ষেপে ক্ষেত্র যাহা, যে প্রকার, যাহা হইতে উৎপন্ন, যেরূপ ও যে বিকারযুক্ত, তাহা অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। আমরা তাহা বিস্তারিত ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। যাহা হউক, এই ক্ষেত্রতত্ত্ব বুঝা বড় কঠিন। ভগবান্ বলিয়াছেন,—এই ক্ষেত্র সম্বন্ধে জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান। ক্ষেত্রকে জানিলে, তাহার বিপরীতধর্ম্মযুক্ত ক্ষেত্রজ্ঞকেও জানা যায়; ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিবেক জ্ঞান বা সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিপুরুষবিবেক জ্ঞান লাভ হয় এবং সে জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়। অতএব ক্ষেত্র সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা একরূপ দুঃসাধ্য। আমাদের শাস্ত্রে নানাস্থানে, নানারূপে ইহা বুঝান আছে। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে, বিশেষতঃ মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে, বুদ্ধি অহঙ্কার মন ইন্দ্রিয়াদি—যাহাকে সমষ্টিভাবে অন্তঃকরণ বা (mind) বলা হইয়াছে—তাহা যে ক্ষেত্র বা দেহের, অর্থাৎ সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীরের অন্তর্গত, তাহা বুঝান হয় নাই, বরং তাহারা আত্মার ধর্ম্ম বা আত্মার স্বরূপ,—তাহারা শরীরের অন্তর্গত নহে, ইহাই বুঝান হইয়াছে। মন, বুদ্ধি, চেতনা প্রভৃতি যে আত্মার ধর্ম্ম নহে, আত্মা যে তাহা হইতে ভিন্ন, ইহা বুঝান হয় নাই। এজন্য আধুনিক দর্শনের Psychology শাস্ত্রের সাহায্যে, এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব বুঝিবার বিশেষ সম্ভাবনা নাই। এ তত্ত্ব আমাদের শাস্ত্র হইতে, বিশেষতঃ সাংখ্য ও বেদান্ত-দর্শন হইতেই আমরা জানিতে পারি।

সাংখ্য-দর্শন অনুসারে, শরীর যে, কারণ শরীর, সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর, স্থূল শরীর এবং অধিষ্ঠান (বা আতিবাহিক) শরীর ভেদে চারি প্রকার, এবং বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র—এই সপ্তদশ প্রকৃতির পরিণাম মিলিয়া যে সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর তাহা পূর্ব্বে, বিশেষতঃ দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে।

বেদান্ত-দর্শন ও উপনিষদ্ অনুসারেও শরীর পাঁচ প্রকার। তাহাদের

কোষ বলে। তাহা অন্নময় কোষ (স্থূল শরীর), প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ (এই তিন মিলিয়া সাংখ্যোক্ত লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর), আর আনন্দময় কোষ (কারণ শরীর)। ইহা ব্যতীত বেদান্তে সূক্ষ্ম ভূতময় আতিবাহিক দেহ (সাংখ্যোক্ত অধিষ্ঠান শরীর) ও উক্ত হইয়াছে। (আতিবাহিকস্তল্লিঙ্গাৎ,—এই বেদান্ত সূত্র দ্রষ্টব্য)। অতএব আমাদের শাস্ত্র হইতেই এই ক্ষেত্র বা দেহতত্ত্ব প্রকৃত রূপে জানিতে পারা যায়। ইহা ব্যতীত, শরীরের উৎপত্তির কারণ কি, কি উপাদানে ইহা গঠিত, কোন্ নিমিত্ত কারণ দ্বারা ইহার পরিবর্ত্তন হয়, কিরূপে স্থূল শরীর গ্রহণ হয়, কিরূপে স্থূল দেহ নাশে সূক্ষ্ম শরীর থাকিয়া যায়, এবং কি জন্য আবার স্থূল শরীর-গ্রহণ হয়, কিরূপে প্রকৃতির আপূরণে জাত্যন্তর পরিণাম হয়, কি কারণে জাতি আয়ু ও ভোগ নির্দ্দিষ্ট হয়, ইত্যাদি সমুদায় জ্ঞাতব্য বিষয়, আমাদের উপনিষদ্, দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। এ তত্ত্ব যাঁহারা বিস্তারিত ভাবে জানিতে চাহেন, তাঁহারা অবশ্য এ সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন।

কিন্তু এই অধ্যয়নের জন্য প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে, আর একটি কথা বুঝিতে হইবে। আমরা সাধারণতঃ দেহাত্মবাদী। এজন্য এই স্থূল দেহ হইতে ভিন্ন করিয়া আত্মাকে বুঝিতে পারি না। আর বুঝিতে পারিলেও আমরা প্রাণাত্মবাদী, মনাত্মবাদী বা বিজ্ঞানাত্মবাদী হইয়া পড়ি। আত্মাকে প্রাণ হইতে, মন হইতে, ইন্দ্রিয় হইতে বা বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন করিয়া আত্মাকে ধারণা করিতে পারি না। এই স্থূল দেহ, প্রাণ, মন বুদ্ধি হইতে ভিন্ন ভাবে আত্মাকে জানিতে হইলে বিশেষ সাধনার প্রয়োজন। চিত্তকে স্বচ্ছ নির্ম্মল শুদ্ধ সাত্ত্বিক না করিতে পারিলে, তাহাতে আত্মার স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হয় না,—এই ক্ষেত্র হইতে পৃথক্ ভাবে আত্ম-দর্শন হয় না,—ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিবেক-বিজ্ঞানও হয় না।

সে যাহা হউক, ক্ষেত্র কি, তাহা বিচার পূর্ব্বক প্রথমে আমাদের

বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কোন্‌টি ক্ষেত্র এবং কোন্‌টি ক্ষেত্র নহে, তাহা বিচার করিয়া স্থির করিবার সেই মূল সূত্র কি, তাহা অগ্রে বুঝিতে হইবে।

আমাদের এই স্থূল পাঞ্চভৌতিক জড় শরীর যে আত্মা নহে, তাহা নিতান্ত জড়বাদী পণ্ডিত ব্যতীত, সকল পণ্ডিতই সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু বলিয়াছি ত, বুদ্ধি, মন, অহঙ্কার এবং চিত্তের ধর্ম্ম সুখ দুঃখ রাগ দ্বেষাদি যে আত্মা বা আত্মার ধর্ম্ম নহে, চিত্তে অভিব্যক্ত চেতনা ও ধৃতি যে ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা বা আত্মার ধর্ম্ম নহে, তাহা অনেকে, বিশেষতঃ আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন না। অতএব বুদ্ধি প্রভৃতি (যাহাকে এক কথায় mind বলে) তাহা যে আত্মা নহে, বা সুখ-দুঃখাদি যে আত্মার ধর্ম্ম নহে, তাহা কিরূপে বুঝা যাইবে? ভগবান্ এই স্থলে তাহার মূল সূত্র দিয়াছেন। যিনি আত্মা বা পুরুষ—তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, যিনি ক্ষেত্রকে জানেন, ক্ষেত্রের বেত্তা, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। আর তাঁহার জ্ঞানের বিষয় যাহা, যাহা "ইদং শরীরং" রূপে জ্ঞেয়, তাহা ক্ষেত্র। শঙ্করাচার্য্য ইহা বুঝাইয়াছেন। যাহা জ্ঞেয়, তাহা জ্ঞাতা হইতে পারে না। যাহা Object, তাহা Subject হইতে পারে না। আর যাহা 'জ্ঞাতা', তাহাও জ্ঞেয় হইতে পারে না। Subject কখন Object হয় না। অতএব যাহা কিছু জ্ঞেয়, তাহা ক্ষেত্র। যাহা জ্ঞাতার অপরোক্ষভাবে জ্ঞেয়, তাহা জ্ঞাতার নিজের শরীর, তাহাই তাহার ক্ষেত্র। সে তাহারই বেত্তা। বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, ইন্দ্রিয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি যাহা এই দুই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, তাহারা সকলেই জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞেয়। অতএব তাহারা জ্ঞাতা হইতে পারেন না। তাহারা জড়। 'জ্ঞাতা' ও 'জ্ঞেয়ে'র ধর্ম্ম পরস্পর বিরোধী। যাহা একের ধর্ম্ম, তাহা অপরের হইতে পারে না। এই তত্ত্ব সাংখ্য-দর্শনেও বিবৃত হইয়াছে।

যাহা হউক, যাহা জ্ঞাতা, তাহা জ্ঞেয় হইতে পারে না, যাহা জ্ঞাতার

ধর্ম্ম, তাহা কখনই জ্ঞেয়ের ধর্ম্ম হইতে পারে না, ইহার তাৎপর্য্য কি? ইহা অতি দুর্ব্বোধ্য দার্শনিকতত্ব। দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ প্রবেশ না থাকিলে ইহা বুঝা যাইবে না। জ্ঞাতা যদি জ্ঞেয় হইতে না পারেন, তবে আমি আপনাকে জানি কিরূপে? তাহা হইলে 'আত্মাকে জান' "know thy self" এ উপদেশ ব্যর্থ হয়। তাহা নহে। জ্ঞাতা জ্ঞেয়-রূপে আপনাকে জানেন না, জ্ঞাতৃরূপে জ্ঞেয় হইতে পৃথক্ করিয়াই আপনার স্বরূপ জানিতে পারেন। জ্ঞাতৃরূপেই আমার প্রকৃত আত্ম-প্রত্যয় হয়। তবে আমি জ্ঞাতা, আমি কর্ত্তা ও আমি ভোক্তা রূপে,—আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি রুগ্ণ ইত্যাদি নানা ভাবে আপনাকে যে জানি বলিয়া বোধ হয়, ইহার কারণ এই যে, সে জ্ঞান প্রকৃত আত্মজ্ঞান নহে। তাহা চিত্তে অধ্যস্ত আত্মার (Phenomenal self এর) জ্ঞান। পরমার্থতঃ জ্ঞাতার জ্ঞাতা কেহ থাকিতে পারে না। জ্ঞাতার আত্মসম্বন্ধে এই ব্যবহারিক জ্ঞান, প্রকৃত জ্ঞান নহে। তাহাকেই শাস্ত্রে অবিদ্যা বা অজ্ঞান বলে। পরমার্থতঃ আমি এ জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তা নহি। আমি এ জ্ঞাতারও জ্ঞাতা, জ্ঞানস্বরূপ। তাহা Absolute self। আর আমাকে আমি জ্ঞাতা কর্ত্তা বা ভোক্তা বলিয়া যে জানি, যে আমি আমার জ্ঞেয়, তাহা আমার এই জ্ঞাতার জ্ঞাতা বা বিজ্ঞাতা নহেন। সে বিজ্ঞাতা জ্ঞেয় নহেন (বৃঃ আঃ উপঃ ৩।৭।২৩)। তিনিই প্রকৃত আত্মা। তিনিই পরমাত্মা, আমি তাহারই জ্ঞেয়, সেই phenominal ego বা phenomenal selfই জ্ঞাতা ভোক্তা ও কর্ত্তা। তাহা Absolute বা Noumenal self নহে। তাহাই জীব। তাহাকে প্রকৃত জ্ঞাতা মনে করাই ভ্রম বা অধ্যাস মাত্র।

অতএব যে 'জ্ঞেয়'তে জ্ঞাতা আপনার অধ্যাস হয়,—যে বদ্ধ অহঙ্কার মন প্রভৃতি—এই দুই শ্লোক উক্ত তত্ত্বে জ্ঞাতার এইরূপ আত্মাধ্যাস হয়, তাহা সে 'আমি' বা 'আত্মা' নহে, তাহা জানিবার উপায় কি? তাহারা

যে কেবল জ্ঞেয়, তাহারা জ্ঞাতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, ইহা জানিবার উপায় কি? যাহা জ্ঞেয়, তাহা জ্ঞাতা নহে,—এ কথা স্বীকার করিলেও, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় মধ্যে এই সীমা রেখা কোথায়, তাহা স্থির করা বড় কঠিন। জ্ঞাতা জ্ঞেয় মধ্যে এই ভেদজ্ঞানকেই বিবেকজ্ঞান বলে। সাংখ্য শাস্ত্র অনুসারে এই বিবেকজ্ঞানই মুক্তিহেতু, তাহা উক্ত হইয়াছে। এই বিবেক জ্ঞানলাভ না হইলে এই দুই শ্লোকোক্ত তত্ত্বগুলি যে জ্ঞেয় বা বেঁগু ক্ষেত্রের অন্তর্গত ও ইহাদের জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে যে ইহারা পৃথক্. তাহা জানা যায় না।

যাহা হউক, আমাদের জ্ঞানে এই যে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-ভেদ নিত্যসিদ্ধ, ইহাই কি পরমার্থ সত্য! তাহা হইলে ত অদ্বৈত-সিদ্ধি হয় না। অথবা অদ্বৈত-সিদ্ধি জন্য এই জ্ঞেয়কে মায়িক মিথ্যা—কেবল কল্পনা, কেবল বিজ্ঞানের অভিব্যক্তির বাহ্যরূপ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমাদের জ্ঞানের উপর এই জ্ঞেয় জগৎ প্রতিষ্ঠিত নহে। আমাদের এ জ্ঞান নিত্য জ্ঞান নহে, তাহা বৃত্তি-জ্ঞান মাত্র। জড়চিত্তে আত্মজ্ঞান প্রতিবিম্বিত হইলে চিত্ত চেতনবৎ হয়, তাহাতে বৃত্তি-জ্ঞানের প্রকাশ হয়।

আমাদের চিত্তে অভিব্যক্ত জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়—এই দ্বন্দ্ব ভাবও (Phenomenal) ব্যবহারিক বা আপেক্ষিক। আমাদের জ্ঞানে জ্ঞাতা ব্যতীত জ্ঞেয় থাকিতে পারে না, আর জ্ঞেয় ব্যতীত জ্ঞাতাও থাকিতে পারে না,—অথচ উভয়ে এইরূপ পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়াও পরস্পর বিরোধী। তবে যিনি জ্ঞানস্বরূপ আত্মা বা পরমব্রহ্ম—যিনি Absolute Reason তাঁহার নির্ব্বিকল্প, নির্ব্বিশেষ জ্ঞানে কখন এই দ্বৈতভাব এই বিরোধ থাকিতে পারে না। সেই জ্ঞান যখন সবিকল্প হয়, তখন তাহা হইতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দ্বৈততত্ত্বের বিকাশ হয় সত্য, কিন্তু সে জ্ঞানে এইরূপে পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব অভিব্যক্ত হইয়াও একীভূত থাকে।

আর অজ্ঞানযুক্ত জীব জ্ঞানে এই পরস্পর বিরোধী জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভাব কখন একীভূত ও অদ্বৈতীভূত হয় না। এই দ্বৈতীভূতজ্ঞান হেতু আমাদের জ্ঞানে এ ভেদ থাকে, জ্ঞাতা কখন জ্ঞেয় হইতে পারে না, বা 'জ্ঞেয়' ধর্ম্মযুক্ত হয়েন না। জ্ঞেয় হইতে ভিন্ন করিয়াই জ্ঞাতা আপনাকে জানিতে পারে।

ব্রহ্ম জ্ঞান অনাদি মায়াশক্তি যুক্ত বলিয়া, সেই জ্ঞানের প্রকট অবস্থায়, তাহা পরম জ্ঞাতৃরূপে প্রকাশিত হন। তাহা Absolute Ego বা Self। সেই জ্ঞাতা তখন আপনার জ্ঞানমধ্যেই জ্ঞানের জ্ঞেয় কল্পনা করেন, এবং স্বীয় মায়াশক্তি দ্বারা সেই কল্পনাকে সৎরূপে ব্যাকৃত করেন। 'আমি বহু হইব' এই কল্পনা বা ঈক্ষণরূপ জ্ঞানক্রিয়া হেতু, সে জ্ঞান দ্বৈতাত্মক হইয়া, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপে বা Absolute Subject ও Absolute Object রূপে প্রথম বিবর্ত্তিত হয় বটে, কিন্তু তাহা অজ্ঞানদোষহীন বলিয়া এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এ বিরোধভাব থাকে না। সে 'জ্ঞেয়' মধ্যে জ্ঞাতা অনুপ্রবিষ্ট থাকেন। এই পরম জ্ঞাতাই ঈশ্বর। তাঁহার অনন্ত জ্ঞানশক্তি হইতে অভিব্যক্ত সকল জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ভাব তাহার অনন্ত জ্ঞানের অন্তর্ভূত, তাহার পরম 'অহং' বা পরমাত্মা স্বরূপে বিধৃত। তিনি সকল জ্ঞেয়েরই "আমি" সকল জ্ঞেয়েই সে জ্ঞাতার বিশেষ রূপ, এবং সকল জ্ঞেয় মধ্যেই সে 'আমি' জ্ঞাতৃরূপে অবস্থিত, ইহা জানেন। সে জ্ঞানে অজ্ঞান নাই, এজন্য তাহাতে এই জ্ঞাতৃজ্ঞেয় ভেদ নাই। সে ভেদ তাঁহার জ্ঞানের কল্পনা মাত্র। তিনি সকলই 'আমি' ও সকলই আমার বলিয়া জানেন। কিন্তু জীব জ্ঞান চিত্তে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান বলিয়া, তাহার পরিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। আরও অবিদ্যা বা অজ্ঞান হইতেই জ্ঞেয় দেহে জ্ঞাতার অধ্যাস হয়। দেহাত্মজ্ঞান, সত্ত্বাত্মজ্ঞান বিজ্ঞানাত্মজ্ঞান আসিয়া পড়ে। এইরূপে আমাদের জ্ঞানে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় দেহ মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ অভেদ জ্ঞান অজ্ঞান-মূলক।

এই জ্ঞেয় দেহ হইতে জ্ঞাতা আপনাকে পৃথক্‌রূপে জানিতে পারিলে

এ অধ্যাস বা অজ্ঞান দূর হয়। দেহমধ্যে আপনাকে ভিন্নরূপে দেখিলে, জ্ঞাতার স্বরূপ-সিদ্ধি হয়। তাহার ফলে সর্ব্বাত্মভূতাত্মা হওয়া যায়। তখন সমুদায় জ্ঞাতার আত্মার সহিত, আপনার অভেদ জ্ঞান হয়, জ্ঞাতা আপনার সমুদায় জ্ঞেয়মধ্যে সেই পরম জ্ঞাতাকে অনুভব করে, ও সেই পরম জ্ঞাতাকে জানিতে পারিয়া, সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। প্রথমে নিজ দেহ বা ক্ষেত্র হইতে আপনাকে পৃথক্ জানিতে হয়। পরে জ্ঞানে সকল ক্ষেত্রজ্ঞের সহিত আপনার একত্ব ধারণা করিতে হয়। তাহার পর সকল ক্ষেত্রে পরম ক্ষেত্রজ্ঞকে দেখিয়া ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ ইহা পরমার্থত অভেদ জানিয়া, জ্ঞাতা জ্ঞেয়—এই দ্বৈতহীন প্রকৃত 'অদ্বয়' জ্ঞান-স্বরূপ পরমব্রহ্মের ধারণা করিতে হয়। ইহাই গীতা ও বেদান্তের উপদেশ। গৌড়পাদ কারিকায় আছে—যে ব্রহ্ম 'অকল্পকং অজং জ্ঞান-জ্ঞেয়াভিন্নং" (৩।৩১)। মৈত্রায়ণ উপনিষদে আছে, "যত্র অদ্বৈতীভূতং বিজ্ঞানং ...যত্র দ্বৈতীভূতবিজ্ঞানম্" (৬।৭)। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভেদ বা দ্বৈতীভূত বিজ্ঞান দূর না হইলে, অদ্বৈতীভূত বিজ্ঞান লাভ হয় না। আর জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভেদ প্রথমে না জানিলে, সে ভেদও দূর হয় না। তাই বিশেষভাবে প্রথমে ক্ষেত্রস্বরূপ ও তাহা হইতে ভিন্ন ক্ষেত্রজ্ঞ-স্বরূপ জানিতে হয়। ক্ষেত্রের স্বরূপ ইত্যাদি জানিয়া তাহা হইতে পৃথক্ ভাবে তাহার জ্ঞাতৃরূপে ক্ষেত্রজ্ঞকে জানিতে হয়। তাহার পর সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞ পরমেশ্বরকে জানিয়া প্রকৃত ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ জানিতে হয়, এবং সেই পরম ব্রহ্মতত্ত্বে এই সর্ব্বক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব—একীভূত ইহা দর্শন করিতে হয়। সমষ্টিভাবে এই সমুদয় ক্ষেত্র—সেই ভগবানের শরীর, তাঁহার বিরাট্ বিশ্বরূপের অন্তর্গত, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সর্ব্বক্ষেত্রকে সেই ভাবেই দেখিতে হইবে। তবে এই দ্বৈত ও অদ্বৈত তত্ত্বের অতীত প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান এই অদ্বৈতীভূত বিজ্ঞান লাভ হইবে—তখন জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা অভিন্ন হইবে। 'ভেদ' জ্ঞানের মধ্য দিয়াই এই 'অভেদ' জ্ঞান লাভ হয়। তাই প্রথমে ক্ষেত্রকে

ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে ভিন্ন করিয়া লইয়া তাহা জ্ঞেয়রূপে জানিতে হইবে। ে
জ্ঞান না হইলে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের অদ্বৈতীভূত ব্রহ্মস্বরূপ জানা যায় না।

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসাক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥ ৭

মানহীন দম্ভহীন হিংসাহীন ভাব—
ক্ষান্তি সরলতা আচার্য্যের উপাসনা,—
শৌচ, স্থিরভাব আর আত্মবিনিগ্রহ,—৭

৭। মানহীনভাব (অমানিত্ব)—মানীর ভাব আত্মশ্লাঘা, তাহা
অভাব অমানিত্ব (শঙ্কর)। উৎকৃষ্টরূপে অবধারণা বা অবজ্ঞারহিত ভা
(রামানুজ)। স্বগুণশ্লাঘা-রহিত (স্বামী)। গুণ থাকুক বা না থাকুক
তাহা আমার আছে জ্ঞান করিয়া যে আত্মশ্লাঘা—তাহা মানিত্ব, তাহা
অভাব অমানিত্ব (মধু)। স্ব সৎকার অনপেক্ষত্ব (বলদেব)। আপনাে
উৎকর্ষ আরোপ=মান, তাহার অভাব (গিরি)।

দম্ভহীনভাব (অদম্ভিত্ব)—নিজের ধার্ম্মিকতাকে প্রকাশ করা
নাম দম্ভ। তাহার অভাব (শঙ্কর)। লোকে ধার্ম্মিক বলিবে, এই যশে
জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান দম্ভ। সেই দম্ভরহিত ভাব (রামানুজ, বলদেব)।
লাভ ও পূজার্থ স্বধর্ম্ম প্রকটীকরণ দম্ভ, তাহার অভাব (মধু)।

হিংসাহীন্ ভাব—(অহিংসা)—প্রাণিমাত্রেরই অপীড়ন (শঙ্কর)।
কায়মনোবাক্য দ্বারা কাহারও পীড়া না দেওয়া (রামানুজ, গিরি)। পর-
পীড়া-বর্জ্জন (স্বামী, মধু)। পাতঞ্জল দর্শনে আছে—এই অহিংসা—
"জাতিদেশকাল-সময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতম্।" (২।৩১ সূত্র)।

ক্ষান্তি—পরের অপরাধ দেখিয়াও মনে কোনরূপ বিকার আসিতে না দেওয়া (শঙ্কর, গিরি)। পরের দ্বারা পীড়াপ্রাপ্ত হইয়াও তাহার প্রতি অবিকৃতচিত্তত্ব (রামানুজ)। পরপীড়াবর্জ্জন (স্বামী)। পরের অপরাধ সহন (মধু)। অপমান-সহিষ্ণুতা (বলদেব)।

সরলতা (আর্জ্জবং)—ঋজুভাব, অবক্রতা (শঙ্কর)। পরাপরাধে মনের কার্য্যবৃত্তির একরূপতা (রামানুজ)। পরের সহিত ব্যবহারে প্রতারণারাহিত্য; অকুটিল ভাব ; (মধু)। সরলতা (বলদেব)। সদা একরূপ ব্যবহার (গিরি)। বাক্ মনঃ কায়ের সমত্ব অকৌটিল্য (কেশব)।

আচার্য্যের উপাসনা—মোক্ষ-সাধনের উপদেষ্টা আচার্যাকে শুশ্রূষা দ্বারা সেবা (শঙ্কর)। আত্মজ্ঞান-প্রদাতা আচার্য্যকে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন সেবা দ্বারা তুষ্ট করা (রামানুজ)। সদ্গুরুর উপাসনা বা সেবা (স্বামী) এস্থলে আচার্য্য অর্থে মোক্ষ-সাধনের উপদেষ্টা, মনু-উক্ত "উপনীয় অধ্যাপক" নহে (মধু)। গীতা, ৪।৩৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শৌচ—মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা দেহের মল প্রক্ষালন ও প্রতিকূল ভাবনা দ্বারা আভ্যন্তর বা মনের মল রাগ-দ্বেষাদি অপনয়ন (শঙ্কর, মধু, স্বামী)। কায়, মন ও বাক্যকে আত্মজ্ঞান-সাধনযোগ্য করা (রামানুজ)। বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ (স্বামী, কেশব)।

স্থির ভাব—(স্থৈর্য্যং)—স্থির ভাব, মোক্ষমার্গে দৃঢ়তর অধ্যবসায়-যুক্ত হওয়া (শঙ্কর)। অধ্যাত্ম-শাস্ত্রোক্তাষিত বিষয়ে নিশ্চয় ভাব (রামানুজ)। সন্মার্গে একনিষ্ঠতা (স্বামী, বলদেব)। মোক্ষ-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাতে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও, তাহাতে পুনঃ পুনঃ অধিক যত্নপূর্ব্বক অবলম্বন (মধু, কেশব)।

আত্ম-বিনিগ্রহ—আত্মার উপকরণ যে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি, তাহাই এস্থলে আত্মা। তাহা চিত্ত প্রভৃতি। তাহাদের স্বভাবতঃ কার্য্যে সকল দিকেই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সেই প্রবৃত্তি নিরোধ করিয়া,

সন্মার্গে প্রবৃত্তির স্থিরতা সম্পাদন (শঙ্কর)। আত্মস্বরূপ ব্যতিরিক্ত বিষয় হইতে মনকে নিবর্ত্তন (স্বামী, বলদেব)। দেহ ইন্দ্রিয় সংঘাত স্বভাব প্রাপ্ত আত্মার মোক্ষ প্রতিকূল প্রবৃত্তি নিরোধ পূর্ব্বক মোক্ষ সাধনে ব্যবস্থাপন (মধু)। দেহ ও ইন্দ্রিয় সকলের শাস্ত্রবিরুদ্ধ অসৎপ্রবৃত্তির সংযম (কেশব)। চিত্তের অধঃস্রোতোবৃত্তির নিরোধকরণ।

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৮

রাগহীন ভাব—সব ইন্দ্রিয় বিষয়ে,
অহঙ্কারহীন ভাব, দোষদৃষ্টি আর
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ সমুদায়ে,—৮

৮। রাগহীন…ইন্দ্রিয় বিষয়ে (ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যং)—ঐহিক পারত্রিক শব্দাদি সমুদায় ভোগ্য বস্তু সম্বন্ধে বিরাগ ভাব (শঙ্কর)। আত্মব্যতিরিক্ত সমুদায় বিষয়ে দোষ অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাহাদের উদ্বেজন (রামানুজ)। দৃষ্ট ও অনুশ্রাবিক শব্দাদি ভোগ্য বিষয়ে—রাগ বিরোধী, অস্পৃহাত্মক চিত্তবৃত্তি (মধু)। শব্দাদি বিষয়ে রুচির অভাব (বলদেব)। শব্দাদি বিষয়ে দোষদৃষ্টি উৎপাদন দ্বারা, তাহাতে রাগরাহিত্য (কেশব)।

অহঙ্কারহীন ভাব—(অনহঙ্কার)—অনাত্মদেহে আত্মাভিমান-রাহিত্য (রামানুজ, বলদেব)। আত্ম-শ্লাঘা অভাবেও আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এইরূপ গর্ব্ব মনে প্রাদুর্ভূত হইতে পারে,—সেই ভাববিরহিত (মধু)। অহঙ্কারের অভাব (শঙ্কর)। অভিজন জাতি ক্রিয়া প্রভৃতিতে আপনার উৎকৃষ্টত্ব, অভিমান বা গর্ব্বরাহিত্য (কেশব)।

দোষ-দৃষ্টি···সমুদায়ে—জন্ম, মরণ, জরা, ব্যাধিসমুহে ও অন্যান্য দুঃখ সমূহে প্রত্যেকেই দোষ দেখা। জন্ম-লাভে দোষ অর্থাৎ গর্ভবাস, ও গর্ভ হইতে জন্ম ইহাতে যে যন্ত্রণা বা দোষ, তাহার অনুদর্শন বা আলোচনা। সেইরূপ সর্ব্বমর্ম্মচ্ছেদনরূপ মৃত্যুতেও দোষদর্শন। সেইরূপ জরাতে বা বার্দ্ধক্যে দোষদর্শন। বার্দ্ধক্যে প্রজ্ঞাশক্তি ও তেজের হ্রাস হয়, সকলের নিকট পরিভব ভোগ করিতে হয়, জরায় ইত্যাদি রূপ দোষ-দর্শন। যেরূপ ব্যাধিতে যে যন্ত্রণা হয়, তাহার দোষ দর্শন। সেইরূপ আমাদের ইষ্টবিয়োগ ও অনিষ্টসংযোগরূপ দুঃখসমূহে, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখের দোষ অনুদর্শন। অথবা দুঃখ মাত্রই দোষ। এই অর্থে দুঃখ-দোষ। জন্মে যেরূপ দুঃখ-দোষ আছে, সেইরূপ মৃত্যু, জরা, ব্যাধি প্রত্যেকেই দুঃখ-দোষ আছে। এই জন্মাদিই দুঃখের কারণ। এজন্য জন্মাদিই দুঃখ। স্বরূপতঃ তাহারা দুঃখ নহে। এইরূপ দুঃখ দোষানুদর্শন দ্বারা দেহ ইন্দ্রিয় ও বিষয় ভোগে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। তাহার পর আত্মদর্শনার্থ প্রবৃত্তি হয়। অতএব ইহারা জ্ঞানের সাধন। (শঙ্কর, মধু, গিরি)। শরীর থাকিলেই, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখরূপ দোষ অবর্জ্জনীয়, ইহার অনুসন্ধান (রামানুজ, কেশব)। জন্মাদিতে দুঃখরূপ দোষ দর্শন (বলদেব)। অনুদর্শন = পুনঃ পুনঃ আলোচনা (স্বামী, মধু, কেশব)। পাতঞ্জল দর্শনে আছে,—

"পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ।" (পাঃ সূঃ ২।১৫)।

অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯

অনাসক্তি, পুত্রদারাগৃহাদি বিষয়ে—
সঙ্গহীন ভাব, সদা চিত্তে সমভাব—
ইষ্ট বা অনিষ্ট কিছু হলে উপস্থিত ॥ ৯

৯। অনাসক্তি—(অসক্তিঃ) = সঙ্গ হেতু শব্দাদি বিষয়ে যে প্রীতি ভক্তি, তাহার অভাব অসক্তি (শঙ্কর)। আত্মব্যতিরিক্ত বিষয়ে সঙ্গরাহিত্য, (রামানুজ)। পুত্রদারা প্রভৃতিতে প্রীতিত্যাগ (স্বামী)। ইহা আমার, এই মমতা হেতু সে বিষয়ে আসক্তি বা প্রীতি (মধু)। পরমার্থ জ্ঞান বিরোধী বলিয়া পুত্রাদিতে প্রীতিত্যাগ (বলদেব)। ইহা আমার, এইরূপ যে অতিশয় প্রীতি, তাহার রাহিত্য (কেশব)।

পুত্র দারা...সঙ্গভাবহীন (অনভিষঙ্গঃ...)—অভিষঙ্গ = আসক্তি। যাহা আত্মা নহে, তাহাকে আত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া যে ভাবনা, তাহা অভিষঙ্গ। পুত্র, দারা, মিত্র প্রভৃতির সুখ হইলে আমি সুখী হইব, তাহাদের দুঃখ হইলে আমি দুঃখী হইব, তাহাদের কাহারও মৃত্যুতে আমি মরিলাম, —পুত্র, দারা প্রভৃতি সম্বন্ধে যে এইরূপ ভাবনা—অথবা যে কোন অত্যন্ত ইষ্ট বস্তু সম্বন্ধে এরূপ ভাবনা, তাহাই অভিষঙ্গ। সেই অভিষঙ্গবিরহিত ভাব। এই অসক্তি ও অনভিষঙ্গও জ্ঞানের সাধন (শঙ্কর)। পুত্র, দারা, গৃহাদিতে শাস্ত্রীয় কর্ম্ম সাধনের উপকরণ এইরূপ ভাবনা ব্যতিরিক্ত অন্যরূপ ভাবনা শ্রেয়োরহিত বলিয়া, তাহাতে আসক্তিরহিত ভাব (রামানুজ)। পুত্রাদির সুখে আমি সুখী, পুত্রাদির দুঃখে আমি দুঃখী ইত্যাদি অধ্যাসরাহিত্য (স্বামী)। পুত্র দারা গৃহাদি এ সমুদায়ে "সক্তি' ও অভিষঙ্গ উভয়ই বর্জ্জনীয় (মধু)। পুত্রাদির সুখ-দুঃখে আসক্তি-নিরোধ (বলদেব)। অনাত্ম বিষয়ে আত্মাভিমানরাহিত্য (কেশব)।।

এই শ্লোকে শঙ্কর প্রভৃতি অসক্তির স্বতন্ত্র অর্থ করিয়াছেন, আর অনভিষঙ্গ পুত্রদারাগৃহাদির সহিত অন্বয় পূর্ব্বক অর্থ করিয়াছেন।

কেশবাচার্য্য বলেন] যে, এস্থলে অসক্তি ও অনভিষঙ্গের বিষয়—পুত্রদারা গৃহাদি। প্রথমে যে বিত্ত পশু ভৃত্যাদির সহিত সম্বন্ধ গ্রহণ হয়, তাহাতে স্নেহ বর্জ্জনীয়। কিন্তু শঙ্করের অর্থ অধিক সঙ্গত।

সদা চিত্তে সমভাব…উপস্থিত—নিত্য বা সর্ব্বদা তুল্যচিত্ততা। অভিলষিত বিষয় লাভে হর্ষ-রাহিত্য, এবং অনিষ্টকর অনভিলষিত বিষয়-প্রাপ্তিতে বিষাদ-রাহিত্য। উভয় অবস্থাতেই তুল্যচিত্ততা। ইহা জ্ঞানের সাধন (শঙ্কর)। সংকল্প-প্রভব ইষ্ট উপস্থিত হইলে তাহাতে হর্ষ-রাহিত্য,—এবং অনিষ্ট উপস্থিত হইলে, তাহাতে উদ্বেগরাহিত্য (রামানুজ, মধু)। অনুকূল বা প্রতিকূল বিষয় উপস্থিত হইলে, তাহাতে সর্ব্বদা সমচিত্ততা বা হর্ষবিষাদবিরহিত ভাব (বলদেব, কেশব)। (পূর্ব্বে ১২।১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১০

অনন্যযোগেতে ভক্তি অব্যভিচারিণী
আমা প্রতি, রুচি শুদ্ধ জনহীন দেশে
বহুজন সমাগমে বিরতি সেরূপ,—১০

১০। অনন্যযোগেতে ভক্তি…আমা প্রতি—আমাতে অর্থাৎ ঈশ্বরে অনন্যযোগের সহিত অব্যভিচারিণী ভক্তি। ভগবান্ বাসুদেব হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কেহ নাই—ইহা দৃঢ় নিশ্চয়—অর্থাৎ যে নিশ্চয়ের ব্যতিক্রম হয় না, তাহাই অনন্যযোগ, সেই অনন্যযোগের সহিত যে ভক্তি,

যাহার কোন কালে অন্যথাভাব বা অভাব হয় না। এই ভক্তি জ্ঞানের উপায় বা সাধন (শঙ্কর)। সর্ব্বেশ্বর আমাতে একান্ত যোগে স্থির ভক্তি (রামানুজ, বলদেব)। অনন্যযোগে অর্থাৎ সর্ব্বাত্মদৃষ্টিতে; অব্যভিচারিণী ভক্তি, অর্থাৎ একাগ্র ভক্তি (স্বামী)। বাসুদেব পরমেশ্বর আমাতে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানপূর্ব্বক প্রীতি, সর্ব্বাত্মা আমা হইতে আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই, আমিই পরম গতি, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যে ভক্তি, যাহা কোন প্রতিকূল হেতু দ্বারা নিবারিত হয় না, যাবৎ দেহ থাকে, তাবৎ যে প্রীতির অভাব হয় না, তাহাই এই ভক্তি (মধু)।

আমাতে—অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ বাসুদেবে, অনন্যযোগে—অর্থাৎ অনন্য সম্বন্ধের দ্বারা—আমা হইতে অন্য দেবাদি ভজনীয় নহে। এই ভাবে ভক্তি অর্থাৎ সেবনাত্মিকা বাহ্যান্তঃকরণ-বৃত্তি, অব্যভিচারিণী—অর্থাৎ কোন রূপ কামনা দ্বারা বা ব্যক্তি দ্বারা যাহা প্রতিহত হয় না (কেশব)।

রুচি শুদ্ধ জনহীন দেশে—(বিবিক্তদেশসেবিত্বং)=যে স্থান স্বভাবতঃ বা কৃত্রিম উপায়ে অশুচিবর্জ্জিত, যে স্থানে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু বিচরণ করে না,—তাহাই বিবিক্ত দেশ। যেমন অরণ্য, নদী-পুলিন, দেবগৃহ ইত্যাদি। সেই দেশ সেবাকারীর ভাব। বিবিক্ত বা নির্জ্জন ও পবিত্র দেশে বাস করিলে চিত্ত প্রসন্ন হয়, আত্মজ্ঞান স্বতই উদিত হয়। ইহাও জ্ঞানের সাধন, এজন্য ইহাকে জ্ঞান বলা হইয়াছে। (শঙ্কর, গিরি, মধু)।

শাস্ত্রে আছে—

"সমে শুচৌ শর্করবহ্নিবালুকৌ
বিবর্জ্জিতে শব্দ-জনাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোঽনুকূলে ন চ চক্ষুঃ-পীড়নে
গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রয়োজয়েৎ॥"

(শ্বেতাশ্বতর উপঃ ২।১০)।

জনবর্জ্জিতদেশবাসিত্ব (রামানুজ)। শুদ্ধ ও চিত্তপ্রসাদকর স্থান সেবা-করিবার ভাব (স্বামী)। বিবিক্ত—অর্থাৎ ভগবদারাধনবিরোধী জনসংসর্গবর্জ্জিত, এরূপ দেশসেবনশীলত্ব (কেশব)। নির্জ্জনস্থান-প্রিয়তা (বলদেব)। পূর্ব্বে গীতার ৬।১১ শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। এস্থলে শঙ্কর প্রভৃতির অর্থ অনুসারে অনুবাদ করা হইয়াছে। তাহাই অধিক সঙ্গত। জ্ঞানসাধনের উপযুক্ত—জ্ঞানসাধনের বিঘ্ন-বিরহিত যে স্থান, সেই স্থানকে বিবিক্ত দেশ বলা যায়। তাহা অবশ্য জন-সমাগম-বর্জ্জিত, শুদ্ধ ও বিঘ্নহীন হওয়া উচিত।

বিরতি বহুজন-সমাগমে—যাহারা অশিক্ষিত, অবিনীত, অসংস্কৃত-হৃদয়, সেই সকল সাধারণ লোক-সমাগমকে এস্থলে জনসংসদ্ বলা হইয়াছে। মার্জ্জিত, বিনীত, শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সংসদ্‌কে এস্থলে জন-সংসদ্ বলা হয় নাই। কারণ, সাধুসঙ্গ জ্ঞানসাধনের উপায়। এস্থলে প্রাকৃত জনের সংসদ্ বা সভাই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং সেই প্রাকৃত জনসংসদ্ প্রতি যাহার প্রীতি বা আকর্ষণ নাই, তাহার ভাব (শঙ্কর)। প্রাকৃত জনের সভায় অপ্রীতি (স্বামী)। আত্মজ্ঞান-বিমূঢ় বিষয়-ভোগা-সক্ত লোকের সমবায়ে, তাহা তত্ত্বজ্ঞান লাভের প্রতিকূল বলিয়া রুচিহীন (মধু)। ভগবদ্‌ভক্তি-জ্ঞানহীন বিষয়প্রবণ জনগণের সমাজে প্রীতির অভাব অর্থাৎ অসঙ্গতি (কেশব)। শাস্ত্রে আছে—

> "সঙ্গঃ সর্ব্বাত্মনা ত্যাজ্যঃ স চেৎ ত্যক্তুং ন শক্যতে।
> বিদ্বদ্ভিঃ সহ কর্ত্তব্যঃ সতাং সঙ্গো হি ভেষজম্॥"
>
> (মধুসূদনোদ্ধৃত বচন)।

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥ ১১

—:*:—

আত্মজ্ঞানে নিত্যস্থিতি, তত্ত্বজ্ঞানার্থেতে
সদা দৃষ্টি,—জ্ঞান ইহা আছয়ে কথিত,
ইহার অন্যথা যাহা, তাহাই অজ্ঞান ॥ ১১

১১। আত্মজ্ঞানে নিত্যস্থিতি—(অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বম্)—আত্মাদি সম্বন্ধে জ্ঞানই অধ্যাত্মজ্ঞান। তাহাতে নিত্যভাব। সেই জ্ঞান সর্ব্বদা অনুশীলন (শঙ্কর)। আত্মা ও অনাত্মা-বিষয়ক বিবেক-জ্ঞানে নিষ্ঠা (গিরি)। আত্মাতে জ্ঞান=অধ্যাত্মজ্ঞান (রামানুজ, বলদেব)। আত্মাকে অধিকরণ করিয়া বর্ত্তমান যে জ্ঞান, তাহাতে নিত্যভাব। তৎ ও ত্বম্-পদার্থ-শুদ্ধি-নিষ্ঠত্ব (স্বামী)। আত্মাকে অধিকরণ করিয়া—বা অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত যে আত্মজ্ঞান ও অনাত্মবিষয় বিবিক্তি যে আত্মজ্ঞান, তাহাতে সদা নিষ্ঠত্ব (মধু, কেশব)।

আত্মা সম্বন্ধে যে জ্ঞান, তাহাকে অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ আত্মাকেই কেবল জ্ঞানের বিষয় করিয়া, নিয়ত স্থিতি। সর্ব্বদা অনাত্ম-বিষয় বিবিক্ত আত্মার অনুসন্ধান আত্মতত্ত্ব আলোচনা আত্মস্বরূপ অবধারণ করা শুদ্ধ জ্ঞানের যে প্রবৃত্তি, তাহাই অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব।

অধ্যাত্ম শাস্ত্রের ইংরাজী নাম Psychology। কিন্তু তাহাতে আত্মতত্ত্ব বিশদ ভাবে বিবৃত হয় নাই। তাহা মনোবিজ্ঞান (mental philosopy) মাত্র। কেহ কেহ এই অধ্যাত্ম শাস্ত্রকে philosopy of the spirit বলেন।

তত্ত্বজ্ঞানার্থেতে সদা দৃষ্টি।—অমানিত্বাদি (এই পঞ্চ শ্লোকোক্ত যে জ্ঞানের সাধন, তাহাদিগের সম্বন্ধে ভাবনা পরিপাক নিমিত্ত যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহারই অর্থ (বিষয় বা লক্ষ্য) যে মোক্ষ বা সংসার-উপরতি তাহার আলোচনা। তত্ত্বজ্ঞান ফলের আলোচনায়, তাহার সাধনে প্রবৃত্তি হয়। এজন্য ইহাও জ্ঞান (শঙ্কর)। ভাবনা পরিপাক—অর্থাৎ যত্ন সাধিত

এই অমানিত্বাদির প্রকর্ষ পর্য্যন্ত (পূর্ণরূপে) লাভ হইলে, তাহার ফলে তত্ত্বজ্ঞান পরিপাকে আত্মসাক্ষাৎকার হয়, ঐক্য জ্ঞান হয়,—সেই ফলের আলোচনা (গিরি)। "অহং ব্রহ্ম" এই তত্ত্বজ্ঞান অমানিত্বাদি সর্ব্বসাধন পরিপাকের ফল, বেদান্ত বাক্যার্থ সাক্ষাৎ করণ বা প্রত্যক্ষ করণের ফল। সেই তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য নিখিল দুঃখনিবৃত্তি-রূপ ও পরমানন্দলাভরূপ মোক্ষ, তাহার দর্শন অর্থাৎ আলোচনা। এই আলোচনাফলে হিতসাধনে প্রবৃত্তি হয় (মধু)। তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজনে যে তত্ত্ব, তাহাতে নিরতভাব (রামানুজ)। তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন যে মোক্ষ, তাহা যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ইহার আলোচনা (স্বামী)। তত্ত্বজ্ঞানের যে অর্থ, তাহা প্রাপ্তি লক্ষণ যাহা, তাহা হৃদয়ে স্মরণ, ভগবৎ-ইত্যাদি চিন্তন (বলদেব)। তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ বা প্রয়োজন এই যে, তাহা নিঃশেষে অবিদ্যা নিবৃত্তি পূর্ব্বক নিরতিশয় আনন্দ ভগবদ্ভাব প্রাপ্তি লক্ষণ মোক্ষ হয়। তাহার দর্শন বা আলোচনা ইত্যাদি (কেশব)।

ন্যায় দর্শন অনুসারে প্রমাণ-প্রমেয়াদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির কারণ। বৈশেষিক দর্শন অনুসারে দ্রব্যগুণ প্রভৃতি ছয় বা সাত পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির কারণ। সাংখ্য দর্শন অনুসারে তত্ত্ব পঞ্চবিংশতি (পুরুষ প্রকৃতি ও প্রকৃতির বিকৃতি ত্রয়োবিংশতি)। পাতঞ্জল দর্শনে তত্ত্ব নিত্য ঈশ্বর সহিত এই পাঁচিশটি, মোট ছাব্বিশটি।

এই তত্ত্বের অর্থ মূলতত্ত্ব। বেদান্ত অনুসারে এই মূলতত্ত্ব এক, বহু নহে। সে তত্ত্ব ব্রহ্ম। গীতানুসারে এই মূলতত্ত্ব পরম ব্রহ্ম। ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র, বা পুরুষ ও প্রকৃতি এই ব্রহ্মতত্ত্বের অন্তর্গত। ঈশ্বর সগুণ ব্রহ্ম। এই অধ্যায়ে সেই জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব ও তদন্তর্গত ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব পুরুষপ্রকৃতি-তত্ত্ব পরমাত্মতত্ত্ব ঈশ্বরতত্ত্ব ভূতপ্রকৃতি মোক্ষ-তত্ত্ব প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে। এই তত্ত্বের জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞানের 'অর্থ'—সেই জ্ঞানের বিষয় বা লক্ষ্যার্থ—যাহা সেই জ্ঞান

প্রকাশ করে তাহা। যেমন ইন্দ্রিয়ার্থ=ইন্দ্রিয় দ্বারে প্রকাশিত শব্দাদি, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানার্থ=সেই জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব প্রভৃতি। সেই তত্ত্বজ্ঞানার্থের মনন বা অনুশীলনই তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন।

জ্ঞান ইহা—অমানিত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন পর্য্যন্ত যে বিংশতি পদার্থ এই পাঁচ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, তাহা জ্ঞানের সাধন, এই হেতু 'জ্ঞান' নামে উক্ত হইয়াছে। এই সকল সাধন জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায়। এই সাধন দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞজ্ঞানের অধিকারী সাধক সেই জ্ঞানলাভের যোগ্য হয়। সন্ন্যাসীরা যে সকল উপায়ের অনুষ্ঠানে জ্ঞাননিষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হন, অমানিত্বাদি সেই জ্ঞানসাধন বা সেই জ্ঞান-প্রাপ্তির উপায়, এজন্য তাহারা জ্ঞান। এই স্থলে 'জ্ঞানের' অর্থ জ্ঞান নহে, জ্ঞানের সাধন মাত্র। অমানিত্বাতি যম বা নিয়মের অন্তর্গত। তাহারা জ্ঞানের সহকারী কারণ মাত্র। ইহাদের দ্বারা কোন বস্তু জ্ঞাত হওয়া যায় না। ইহারা কোন বিষয়ের প্রকাশকও নহে। অথচ জ্ঞানই তাহার (জ্ঞেয়) বিষয়ের প্রকাশক। অতএব ইহারা জ্ঞানের সাধন বা সহকারী কারণ মাত্র (শঙ্কর)। 'জ্ঞায়তে অনেন আত্মা ইতি জ্ঞানম্,'—যাহা দ্বারা আত্মাকে জানা যায়, যাহা আত্মজ্ঞানের সাধন, তাহা জ্ঞান। ক্ষেত্রসম্বন্ধযুক্ত পুরুষের অমানিত্বাদি গুণসমূহই আত্মজ্ঞানের উপযোগী। এ সকল ক্ষেত্রের কার্য্যান্তর্গত, আত্মজ্ঞান সাধন পক্ষে উপাদেয় গুণ (রামানুজ)। ইহারা জ্ঞানের সাধন, এজন্য জ্ঞান নামে উক্ত (স্বামী)। জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন বলিয়া ইহারা জ্ঞান (হনু)। যে জ্ঞান দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞবিবেক লাভ হয়, সেই জ্ঞান-লাভের যোগ্যতা কিরূপে হয়, তাহাই অমানিত্বাদি দ্বারা উক্ত হইয়াছে (মধু)। ইহা দ্বারা তত্ত্ব জানা যায়; এজন্য ইহারা জ্ঞান (কেশব)। এই অমানিত্বাদি—পরম্পরারূপে এবং সাক্ষাৎভাবে সেই জ্ঞানের

উপলব্ধির কারণ বা সাধন—এজন্ত তাহারা জ্ঞান। "জ্ঞায়তে উপলভ্যতে অনেন ইতি জ্ঞানম্।" (বলদেব)।

ইহার অন্যথা যাহা…অজ্ঞান—এই অমানিত্বাদি বিংশতিটির অন্যথা বা বিপরীত যে মানিত্ব, দম্ভিত্ব, অক্ষান্তি, কুটিলতা প্রভৃতি, তাহাই অজ্ঞান। তাহা জ্ঞান-সাধনের বিরোধী (শঙ্কর)। ইহা ব্যতিরিক্ত সমুদায় ক্ষেত্র কার্য্য আত্মজ্ঞান-বিরোধী বলিয়া অজ্ঞান (রামানুজ)। ইহাদের যাহা বিপরীত, তাহা জ্ঞান-বিরোধী বলিয়া অজ্ঞান (স্বামী, মধু কেশব,)। অজ্ঞান ঠিক জ্ঞানের বিপরীত কিছু নহে। উহা মনের অপ্রকাশিত জ্ঞান। যেমন অব্রাহ্মণ পতিত ব্রাহ্মণ হইলেও ব্রাহ্মণরূপ, সেইরূপ জ্ঞানের রাজসিক ও তামসিকরূপই অজ্ঞান (বলদেব)।

এই অমানিত্ব হইতে তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন পর্য্যন্ত এই পাঁচটি শ্লোকে উক্ত বিংশতিটি জ্ঞানের সাধন হেতু জ্ঞান এবং তাহাদের বিপরীত যাহা, তাহা অজ্ঞান; ইহাই সকল ব্যাখ্যাকারগণের সিদ্ধান্ত। মধুসূদন বলিয়াছেন, অমানিত্বাদি এই বিংশতিটি এক সঙ্গে থাকিলে, তবে তাহাদিগকে জ্ঞান বলা যায়; ইহাদের একটিরও অভাব হইলে জ্ঞান হয় না। 'এই অর্থ সঙ্গত।' বিশ্বনাথ বলিয়াছেন, "ইহাদের মধ্যে প্রথম আঠারটি ভক্ত ও জ্ঞানীর সাধারণ, শেষ দুইটি অর্থাৎ 'অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব' ও 'তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শন', ইহা জ্ঞানিগণের অসাধারণ। পূর্ব্বের অষ্টাদশটির মধ্যে অনন্য-যোগে আমাতে অব্যভিচারিণী ভক্তিই, ভক্তগণ যত্নে সাধন করেন। এবং তাহা হইতেই অবশিষ্ট সতেরটি আপনা হইতেই উৎপন্ন হয়। তাহার জন্য স্বতন্ত্র যত্ন করিতে হয় না।" কিন্তু ইহা সঙ্গত অর্থ নহে। তৃণ হইতে নীচ হইয়া, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু হইয়া এবং অমানীকে মান দিয়া ভক্তি সাধন করিতে হয়; ইহা শ্রীচৈতন্যেরই উপদেশ। চিত্ত নির্ম্মল না হইলে, তাহাতে জ্ঞান বা ভক্তি কিছুরই স্ফূর্ত্তি হয় না। অমানিত্বাদি চিত্তকে পবিত্র করে। আর চিত্ত নির্ম্মল হইলে অমানিত্বা-

দির বিকাশ হয়। যাহা কার্য্য, তাহাই কারণ হইতে পারে। অমানিত্বাদি চিত্তকে পবিত্র করিয়া, তাহাতে ভক্তি ও জ্ঞান বিকাশের কারণ হয়। আবার ভক্তি বা জ্ঞান বিকাশ হইলে, চিত্ত আপনিই নির্ম্মল হয়, তাহাতে অমানিত্বাদি ধর্ম্ম বা গুণ আপনিই প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই অমানিত্বাদি দ্রব্য নহে। তাহারা গুণ বা ধর্ম্ম। তাহারা জ্ঞানের সাধন হইলে, তাহাদিগকে কর্ম্ম বলা যাইতে পারে। শ্রীমানুজ বলিয়াছেন, এগুলি ক্ষেত্র-কার্য্য। কিন্তু তাহারা কর্ম্ম হইতে পারে না। অমানিত্বাদি শব্দ ভাববাচক। তাহারা দ্রব্যবিশেষের অবস্থাজ্ঞাপক। সুতরাং তাহাদিগকে গুণ বা ধর্ম্ম বলিতে পারা যায়। তাহারা অন্তঃকরণ বা চিত্তের ধর্ম্ম অথবা গুণ। চিত্ত এই অমানিত্বাদি গুণ বা ধর্ম্মযুক্ত হইলে, তাহাতে জ্ঞান প্রকাশিত হইতে পারে। (গীতা ৫।১৬ শ্লোক)। এই জন্য ব্যাখ্যাকারগণ ইহাদিগকে জ্ঞানের সাধন বলিয়াছেন। মনু-সংহিতায় এইরূপ গুণগুলিকে ধর্ম্ম বলা হইয়াছে। তাহাতে যে দশ লক্ষণ ধর্ম্মের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা এই :—

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥" (মনু, ৬।৯২)

এইগুলিকে অন্য ধর্ম্মশাস্ত্রেও ধর্ম্ম বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। যাজ্ঞ-বল্ক্য-সংহিতা, ১।১১২ ও বিষ্ণু সংহিতা ৬৭-৮ দ্রষ্টব্য।

অতএব এই কয় শ্লোকে যে অমানিত্বাদিকে জ্ঞান বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এই জ্ঞান—ক্ষেত্রেরই ধর্ম্ম; ইহা ক্ষেত্রান্তর্গত চিত্তের বিশেষ ধর্ম্ম বা অবস্থা-বিশেষ। এ জ্ঞান ক্ষেত্রজ্ঞের নহে। ইহা ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞেয়। ক্ষেত্রজ্ঞ "জ্ঞ"-স্বরূপ (সাংখ্য-কারিকা, ২ দ্রষ্টব্য)। আত্মা বা পরমাত্মা জ্ঞানস্বরূপ অথবা জ্ঞাতৃস্বরূপ। তিনি সাক্ষী—দ্রষ্টা মাত্র। ব্রহ্ম "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" (তৈত্তিরীয় উপঃ ২।১।১)। এই জ্ঞানস্বরূপ বা 'জ্ঞ'-স্বরূপ পুরুষের, অথবা 'চিৎ' বা জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের যে জ্ঞান, সে জ্ঞান এই স্থলে উক্ত হয় নাই।

সে জ্ঞানের স্বরূপ আমাদের জ্ঞেয় নহে। আমাদের যে জ্ঞান, তাহা চিত্তবৃত্তি মাত্র, তাহাকে বৃত্তিজ্ঞান বলে। সে জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন। তাহা দ্বারা জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম-জ্ঞান আমরা ধারণা করিতে পারি না। তবে চিত্ত নির্ম্মল হইলে, চিত্তবৃত্তি নিরোধ পূর্ব্বক—এই বৃত্তিজ্ঞান নিরোধপূর্ব্বক সমাধিস্থ হইলে, যে প্রজ্ঞার আলোক প্রকাশিত হয়, যে ভাস্বৎ জ্ঞানদীপ প্রজ্বলিত হয়, তাহাতে এই ব্রহ্মজ্ঞান আত্মাতে অভিব্যক্ত হয়। বিশেষ সাধনা দ্বারা যাঁহাদের চিত্ত অত্যন্ত নির্ম্মল হইয়াছে, তাঁহারা ব্যুত্থিত বা জাগ্রদবস্থায়,—সেই সমাধি বা নিদ্রা অবস্থার নির্ব্বিকল্প জ্ঞান কিরূপে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়রূপে ভিন্ন হয়—তাহা অনুভব করিয়াছেন, বিশেষতঃ যাঁহারা নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারা দ্রষ্টৃ বা জ্ঞাতৃস্বরূপে অবস্থানপূর্ব্বক, অপরোক্ষ ভাবে ইহা আত্মাতে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা এই ব্রহ্মজ্ঞানের যে আভাস দিয়াছেন ও শ্রুতি তাহা যেরূপে বুঝাইয়াছেন, তাহা হইতেই সে ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানের স্বরূপ কতকটা জানিতে পারা যায়। আমরা পূর্ব্বে (দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায়) ইহার অর্থ সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি। ব্রহ্ম বা আত্মা সেই জ্ঞানস্বভাব হেতু বিজ্ঞাতা হন। সেই জ্ঞান হইতে 'জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়' এই দ্বৈত ভাব বিবর্ত্তিত হইয়া জগতের অভিব্যক্তি হয়। সে জ্ঞান নিত্য জ্ঞান, তাহা অজ্ঞানমিশ্রিত নহে। তাহাতে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-ভাব অভিব্যক্ত হইলেও জ্ঞাতৃজ্ঞেয় (Subject-Object) ভেদ থাকে না। সে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় মধ্যে চিত্ত বা অন্তঃকরণ ব্যবধান নাই। হিরণ্যগর্ভাখ্য সগুণ ব্রহ্মে, সেই অন্তঃকরণ বা সূক্ষ্ম শরীরাভিমান ব্যবধান থাকিলেও নির্গুণ ব্রহ্মে সে ব্যবধান নাই। অন্তঃকরণই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে। জীবের—বিশেষতঃ উচ্চশ্রেণীর জীবের এই অন্তঃ-করণ অভিব্যক্ত হয়। অন্তঃকরণ অর্থাৎ বুদ্ধি মন ও অহঙ্কার বা চিত্ত, জড়, তাহা জ্ঞেয়। তাহাতে জ্ঞাতার জ্ঞান প্রতিবিম্বিত হয়, এজন্য অন্তঃ-করণে জ্ঞানের প্রকাশ হয়। সেইরূপ আত্মচৈতন্য চিত্তে প্রতিফলিত

হওয়ায় চিত্ত চেতনাযুক্ত হয়। তাই চিত্ত জ্ঞানস্বরূপ হয়। চেতনাযুক্ত চিত্তে যেমন এক দিকে জ্ঞাতা প্রতিবিম্বিত হন, সেইরূপ অন্যদিকে জ্ঞেয় (জগৎ) প্রতিফলিত হয়। বাহ্য বিষয় ইন্দ্রিয়দ্বারে অন্তঃকরণে ক্রিয়া উৎপাদন করিলে, তাহার ফলে জ্ঞেয় বিষয় চিত্তে অভিব্যক্ত হয়, এবং সেই জ্ঞাতার প্রতিবিম্বিত জ্ঞান দ্বারা তাহা প্রকাশিত হয়। এইরূপে অন্তঃকরণে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া বৃত্তিজ্ঞান উৎপাদন করে। এই বৃত্তিজ্ঞান হেতু জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় পরস্পর গ্রাহক-গ্রাহ্যরূপে ভিন্ন হইয়া যায়। আর এই জ্ঞাতা জ্ঞেয়রূপে ভিন্ন হইয়া জ্ঞাতার ব্যক্তিত্ব (Principium individuationis) তাহার ভিন্নত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে দেশ কাল ও নিমিত্ত দ্বারা সেই জ্ঞান আরও পরিচ্ছিন্ন ও সঙ্কীর্ণ হয়। চিত্তে কর্ত্তা ও ভোক্তার ভাব প্রকাশ দ্বারা সে জ্ঞান আরও মলিন হইয়া যায়।

অতএব আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান (Absolute Self-consciousness) এই বৃত্তিজ্ঞান (pheno-menal consciousness) হইতে স্বতন্ত্র। চিত্তে আত্মজ্ঞানের প্রতিবিম্ব হইতেই বৃত্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। আত্মজ্ঞান চিত্তে কেবল বিজ্ঞাতৃরূপে প্রকাশিত হইলেও সে বৃত্তিজ্ঞান জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দ্বৈতভাব বদ্ধ, 'অহং'-'ইদং' রূপে পরিচ্ছিন্ন হয়। আত্মজ্ঞান—নিত্য, অবিদ্যাবিরহিত, আর বৃত্তিজ্ঞান অশুদ্ধ, ক্ষণিক ও অবিদ্যা-জড়িত। আত্মজ্ঞান 'জ্ঞাতা'ই থাকেন, কখনও জ্ঞেয় হন না। বৃত্তিজ্ঞান সেই জ্ঞাতার জ্ঞেয়ই থাকে, কখন জ্ঞাতা হইতে পারে না, তবে অবিদ্যাবশে তাহাতে জ্ঞাতাভাবেরও বিকাশ হয়। তাহাতে জ্ঞাতার অধ্যাস হয়।

যাহা হউক, যখন আত্মজ্ঞান চিত্তে প্রতিফলিত হইয়া বৃত্তিজ্ঞান উৎপন্ন করে, তখন চিত্ত যত নির্ম্মল হয়, ততই আত্মজ্ঞান তাহাতে স্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে। চিত্ত নির্ম্মল হইলে, সাত্ত্বিক হইলে তবেই সে প্রতিবিম্ব পরিষ্কার হয়। চিত্ত যত নির্ম্মল হয়, বুদ্ধি যত সাত্ত্বিক

হয়, মন যতই কামক্রোধাদিহীন হয়, ততই এই জ্ঞান চিত্তে পরিস্ফুট হইতে থাকে। চিত্ত সম্পূর্ণ নির্ম্মল হইলে, অবিদ্যামলা সম্পূর্ণ দূর হইলে, অজ্ঞানজ তমঃ সম্পূর্ণ নষ্ট হইলে, তবে চিত্তে প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশ হয়,—চিত্তই জ্ঞানস্বরূপ হয়। যেমন নির্ম্মল দর্পণে মুখ স্পষ্ট দেখা যায়, কিন্তু দর্পণ মলিন হইলে, মুখের প্রতিবিম্ব ভাল করিয়া দেখা যায় না, চিত্তে জ্ঞানের প্রতিবিম্ব সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। নির্ম্মলচিত্তে এইরূপে আত্ম-জ্ঞানের প্রতিবিম্ব পড়িলে, তাহাতে যে ভাবের বিকাশ হয়, তাহার স্বরূপ এই কয় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। গীতায় অনেক স্থলে এই জ্ঞানের—এই চিত্তে অভিব্যক্ত জ্ঞানের কথাই উক্ত হইয়াছে। এই জ্ঞানকে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান বলিয়া বুঝিলে গীতার মূল তত্ত্ব বুঝা যায় না। যাঁহারা নিত্য আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান মানেন না, কেবল বৃত্তিজ্ঞানই স্বীকার করেন, তাঁহারা ত ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী। বেদান্তে এই ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ বা কেবল বৃত্তিজ্ঞানবাদ গৃহীত হয় নাই। নিত্যবিজ্ঞানবাদের উপরই বেদান্তশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত।

গীতায়ও এই নিত্য বিজ্ঞানবাদ প্রতিষ্ঠিত। গীতোক্ত জ্ঞান প্রধানতঃ নিত্য ব্রহ্মজ্ঞান। সে যাহা হউক, গীতায় জ্ঞান বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা পূর্ব্বে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এস্থলে তাহা সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে। (১) গীতার কোথাও জ্ঞানকে 'পরম জ্ঞান' বলা হইয়াছে। এই জ্ঞানই নিত্যজ্ঞান—ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান। এই জ্ঞান ব্রহ্মের বা আত্মার স্বরূপ বা স্বভাব; এজন্য এই পরম জ্ঞানকে ব্রহ্ম বলা হয়। ব্রহ্মই 'বিজ্ঞান ঘন'—চিৎস্বরূপ। (২) কোথাও জ্ঞানের অর্থ নির্ম্মল শুদ্ধ সাত্ত্বিক চিত্তের ভাব বা অবস্থা বা স্বরূপ। ইহা বুদ্ধিরই বিশেষ অবস্থা। বিশেষ সাধনা দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে, বুদ্ধির এই জ্ঞানভাব বা জ্ঞানরূপত্ব লাভ হয়। (৩) কোথাও জ্ঞানের অর্থ এই জ্ঞান-স্বরূপ নির্ম্মল চিত্তে প্রতি-

বিম্বিত আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান। নির্ম্মল চিত্ত আত্মভাবে বা ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইলে, সেই ভাবনা সিদ্ধিতে ব্রহ্মভূত হওয়া যায়। এই নির্ম্মল শুদ্ধ চিত্তে জ্ঞেয় ও ধ্যেয় ঈশ্বর বা ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান যে প্রকাশ হয়; তাহাকেই এই জন্য জ্ঞান বলা যায়। এই জ্ঞানকেই মুক্তিহেতু বলে। (৪) আমাদের অন্তঃকরণ বা চিত্ত জড়। পুরুষের বা আত্মার প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া তাহা চেতনবৎ হয়। তাহাতে বুদ্ধির অভিব্যক্তি হয়। এই বুদ্ধিতে যে বাহ্য বিষয়-গ্রহণ হয় ও তাহার যে জ্ঞান হয়, তাহাকেও গৌণ অর্থে অনেক স্থলে জ্ঞান বলা হয়। এ জ্ঞানকে বৃত্তিজ্ঞান বলে। চিত্তবৃত্তির ক্রিয়াকালে এই জ্ঞানের দ্বারা যে বিষয়-জ্ঞান হয়, তাহা অবিদ্যা বা অজ্ঞান-যুক্ত। এজন্য ইহাকে সাধারণতঃ অজ্ঞান বলে। চিত্ত অশুদ্ধ, মলিন, রজস্তম-মলাযুক্ত থাকিলে, তাহাতে যে বিষয়জ্ঞান প্রকাশিত হয়, তাহাকে সাধারণতঃ জ্ঞান বলিলেও তাহা অজ্ঞান। চিত্ত যখন সাধনা দ্বারা নির্ম্মল শুদ্ধ হয়, তখন চিত্ত জ্ঞানরূপ বা জ্ঞানভাববিশিষ্ট হয়, তখন এই অজ্ঞান দূর হইয়া যায়। যখন চিত্তের এই অজ্ঞানরূপ মলা বা তমঃ বিনষ্ট হয়, তখন চিত্ত প্রকৃত জ্ঞানভাব লাভ করে, সম্পূর্ণ নির্ম্মল হয়। তখন তাহার যাহা পরম জ্ঞেয়, তাহার পরম আদর্শ, তাহার ভাবে ভাবিত হইয়া চিত্ত সেই আকারে আকারিত হয়। তখন জ্ঞেয় সেই নির্ম্মল জ্ঞান-স্বরূপ চিত্তে 'জ্ঞান'রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব এই জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, জ্ঞান কি, তাহা জানিতে হয়; সে জ্ঞানলাভ জন্য চিত্তকে নির্ম্মল করিতে হয়, তাহার অজ্ঞানজ তমঃ নষ্ট করিতে হয়, এবং এই অজ্ঞান দূর করিয়া চিত্তের যে 'জ্ঞানভাব' বা জ্ঞানরূপ, তাহা জানিতে হয় ও লাভ করিতে হয়। এই জ্ঞানভাব লাভ করিবার জন্য কঠোর সাধনা করিতে হয়।

(৫) ইহার জন্য অর্থাৎ বুদ্ধির এই অজ্ঞান দূর করিয়া 'জ্ঞান'ভাব লাভ করিবার জন্য যে সাধনা, ব্যাখ্যাকারগণ তাহাকেও জ্ঞান বলিয়াছেন।

গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, চিত্তকে অজ্ঞান হইতে মুক্ত ও জ্ঞানভাবযুক্ত করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হয়। এই জ্ঞান কি, তাহা জানিবার জন্য প্রথমে তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী আচার্য্যের উপাসনা করিয়া তাঁহার নিকট এই জ্ঞানের উপদেশ লইতে হয়।

"তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

(গীতা, ৪।৩৪)।

চিত্তকে এই জ্ঞানভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার জন্য 'জ্ঞানযজ্ঞ' করিতে হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥"

(গীতা, ৪।৩৩)।

এইরূপ জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা চিত্তকে নির্ম্মল করিতে হয়, বুদ্ধির যাহা জ্ঞানভাব, তাহা লাভ করিতে হয়। তাহা হইলে চিত্ত পবিত্র হয়—সর্ব্বপাপ মলা দূর হইয়া যায়। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।"

(গীতা, ৪।৩৮)।

চিত্ত যতই সাধনা দ্বারা নির্ম্মল হইতে থাকে, বুদ্ধির এই 'জ্ঞান'-ভাব ততই অভিব্যক্ত হইতে থাকে, ততই তাহাতে আত্মার প্রতিবিম্ব স্পষ্টতর হইতে থাকে। যোগ-সংসিদ্ধিতে চিত্তের এই জ্ঞানভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি হয়, তাহার আত্মস্বরূপে অবস্থান হয়। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন, এই জ্ঞান—

"তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।"

(গীতা, ৪।৩৮)।

এই জ্ঞান লাভ হইলে আর অজ্ঞান বা মোহ থাকে না। এ জ্ঞান লাভ হইলে সর্ব্বত্র আত্মদর্শন হয়।

"যজ্ জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥"

(গীতা, ৪।৩৫)।

অতএব কঠোর সাধনা দ্বারা চিত্তকে নির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপ করিতে হয়। চিত্ত জ্ঞানস্বরূপ হইলে তাহা দ্বারা সর্ব্বভূতকে আত্মাতে দর্শন হয়, ও সমুদায় পরমাত্মা ঈশ্বরে দর্শন হয়। এই জ্ঞানস্বরূপ চিত্তেই ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন, ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

বলিয়াছি ত, আমাদের চিত্তে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা তাহা জ্ঞান-স্বরূপ হয়। কিন্তু চিত্ত নির্ম্মল না হইলে এই প্রতিবিম্ব স্পষ্ট হয় না। সে অবস্থায় চিত্তের যে জ্ঞানভাব, তাহা রজস্তমোমলিনতা হেতু অজ্ঞান মাত্র। জ্ঞান-সাধন দ্বারা এই অজ্ঞান দূর করিতে হয়। তবে চিত্ত জ্ঞানস্বরূপ হয়। তবে চিত্তে উক্ত পরম জ্ঞান প্রকাশিত হয়।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।"

(গীতা, ৫।১৫)।

পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানসাধন দ্বারা এই অজ্ঞান দূর করিতে হয়, তাহাও গীতায় আরও উক্ত হইয়াছে,—

"জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥"

(গীতা, ৫।১৬)।

উক্ত আত্মজ্ঞান-সাধন দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ হইলে, তাহা দ্বারাই অজ্ঞান বিনষ্ট হয়। আর অজ্ঞান বিনষ্ট হইলেই সেই পরম জ্ঞান আদিত্যবৎ প্রকাশিত হয়, অথবা সেই জ্ঞান তখন সেই পরম তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে এই শ্লোকের ব্যাখ্যাও পঞ্চম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে দ্রষ্টব্য।

যাহা হউক, জ্ঞানসাধন দ্বারা অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে চিত্তে পরম জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। গীতায় পরে দশম অধ্যায়ে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, ভক্তিযোগে সাধনা করিলেও এই জ্ঞান লাভ হয়।

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥"

(গীতা, ১০।১০-১১)।

ভগবান্ যখন ভক্ত সাধকের আত্মভাবস্থ হন, তখন তাঁহার চিত্তে ভাস্বৎ জ্ঞানদীপ প্রজ্বলিত হয়, তাঁহার অজ্ঞানজ অন্ধকার দূর হইয়া যায়। এই জ্ঞানদীপ দ্বারাই তত্ত্বদর্শন হয়।

ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, পরম জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান। চিত্ত নির্ম্মল শুদ্ধ স্বচ্ছ জ্ঞানস্বরূপ হইলে, তাহাতে পরম জ্ঞান প্রতিবিম্বিত হয়, আদিত্যবৎ সে পরম জ্ঞান তাহাতে প্রকাশিত হয়। তাহা যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ আমাদের চিত্তে অভিব্যক্ত জ্ঞান অজ্ঞান-আবরিত থাকে।

এই পাঁচ শ্লোকে এই জ্ঞান ও অজ্ঞানের স্বরূপ উক্ত হইয়াছে। জ্ঞান-সাধনা দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে তাহার যে ভাব বা অবস্থা হয়, তাহাই চিত্তের জ্ঞানাবস্থা জ্ঞাননিষ্ঠা। সেই জ্ঞানাবস্থায়ই চিত্তে পরম জ্ঞান প্রকাশিত হয়,—তাহার যাহা পরম 'জ্ঞেয়', তাহা অভিব্যক্ত হয়। শুদ্ধ সাত্ত্বিক নির্ম্মল চিত্তের এই জ্ঞানাবস্থা বা যে জ্ঞানভাব, তাহাই এই কয় শ্লোকে 'জ্ঞান' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। তাহারা জ্ঞানের সাধন নহে, তাহারা শুদ্ধ চিত্তের 'জ্ঞান'-ভাব মাত্র। চিত্তের সেই শ্রেষ্ঠ শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাব—অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব, অহিংসা, ক্ষান্তি প্রভৃতি এই বিংশতি প্রকার। এই ভাব সাধনা দ্বারা সিদ্ধ হইলে চিত্তের যে রাজস ও তামস

মলিন অজ্ঞান ভাব—মানিত্ব, দম্ভিত্ব, হিংসা, অক্ষান্তি, কুটিলতা প্রভৃতি, তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন সেই নির্ম্মল জ্ঞান স্বরূপ চিত্তে যাহা প্রকৃত জ্ঞান, বা তাহার পরম জ্ঞেয়তত্ত্ব, তাহা প্রকাশিত হয়। তখন চিত্তে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহাকে ভগবান্ পূর্ব্বে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-জ্ঞান বলিয়াছেন। তাহাতে জ্ঞেয়রূপে পরম ব্রহ্মতত্ত্ব, পুরুষপ্রকৃতিতত্ত্ব, জীব-ঈশ্বরতত্ত্ব যে প্রকাশিত হয়—তাহাও জ্ঞান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

এইরূপে গীতা হইতে আমরা জ্ঞানের বিভিন্ন অর্থ বুঝিতে পারি। উপনিষদ্ হইতেও জ্ঞানের এই বিভিন্ন অর্থ পাওয়া যায়। এ স্থলে তাহা উল্লেখের আবশ্যক নাই। কেবল এ স্থলে সাংখ্যদর্শনের কথা বলিব। সাংখ্যদর্শন অনুসারে পুরুষ 'জ্ঞ'-স্বরূপ। তাহারই সংযোগে প্রকৃতির পরিণাম হইয়া বুদ্ধি-তত্ত্বের অভিব্যক্তি হয়।

সুতরাং সাংখ্য-দর্শন অনুসারে "জ্ঞ"-স্বরূপ পুরুষের জ্ঞান, বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র। সাত্ত্বিক বুদ্ধির এক ভাব বা রূপ যে জ্ঞান, তাহার সম্বন্ধে সাংখ্য-দর্শনে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে। সাংখ্য-দর্শনে আছে,—

"অধ্যবসায়ো বুদ্ধির্ধর্ম্মো জ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্য্যম্।
সাত্ত্বিকং এতদ্রূপং তামসং অস্মাৎ বিপর্য্যস্তম্॥ (কারিকা,২৩)।

সাংখ্য-দর্শনমতে এই বুদ্ধি ত্রিবিধ;—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক বুদ্ধির রূপ ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য। তামসিক বুদ্ধির রূপ অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য। এই জ্ঞানের অর্থ কি? তত্ত্ব-কৌমুদীতে আছে—"সত্ত্ব-পুরুষান্যথাখ্যাতির্জ্ঞানম্।" অর্থাৎ বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদ সাক্ষাৎকারকে জ্ঞান বলে। "মোক্ষে ধীর্জ্ঞানম্"—মোক্ষ-বিষয়িণী বুদ্ধিকে জ্ঞান বলে।

এই যে বুদ্ধির আট প্রকার রূপ বা ভাব,—এই যে জ্ঞান, ধর্ম্ম বৈরাগ্য

ঐশ্বর্য্য ও তাহার বিপরীত অজ্ঞান অধর্ম্ম অবৈরাগ্য অনৈশ্বর্য্য, ইহাদের মধ্যে সাতটি ভাব বন্ধন করেন, কেবল একমাত্র ভাব. জ্ঞানই মুক্তি-হেতু। কারিকায় আছে,—

"রূপৈঃ সপ্তভিরেব বধ্নাত্যাত্মানম্ আত্মনা প্রকৃতিঃ।
সৈব চ পুরুষার্থং প্রতি বিমোচয়ত্যেকরূপেণ॥"
(কারিকা, ৬৩)।

বুদ্ধির এই একরূপই 'বিবেকখ্যাত তত্ত্বজ্ঞান'। ইহাই প্রকৃত-জ্ঞান। ইহা সাত্ত্বিক শুদ্ধ নির্ম্মল বুদ্ধিরই শ্রেষ্ঠ ভাব। সাত্ত্বিক বুদ্ধি এই 'জ্ঞান-ভাবে' ভাবিত হইলে, বুদ্ধির অমানিত্বাদি এই অবস্থা হয়।

অতএব জ্ঞান সাত্ত্বিক বুদ্ধির স্বরূপ বা ভাব। গীতাতেও এই কথা স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। গীতায় আছে—

"সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্।" (১৪।১৭)

অর্থাৎ সত্ত্বগুণ হইতেই জ্ঞানের উৎপত্তি। অন্যত্র আছে—

"সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাৎ বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥" (গীতা, ১৪।১১)

বুদ্ধিতেই এই জ্ঞানের বিকাশ হয়, অথবা বুদ্ধি জ্ঞানস্বরূপ হয়। গীতায় এই বুদ্ধির সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অবস্থাভেদে জ্ঞানের ত্রিবিধ অবস্থা উক্ত হইয়াছে। যথা—

"সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥
পৃথক্‌ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্‌বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥
যত্তু কৃৎস্নবৎ একস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্॥" (গীতা ১৮।২০—২২)।

অতএব জ্ঞান যাহা, তাহা এই সাত্ত্বিক বুদ্ধির স্বরূপ, ভাব অথবা তাহার অবস্থাবিশেষ। বুদ্ধির কিরূপ অবস্থা বা ভাবকে জ্ঞান বলে, তাহা এ স্থলে এই পাঁচ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। বুদ্ধিতে যখন এই অমানিত্ব প্রভৃতি উক্ত বিংশতি প্রকার ভাব প্রকাশিত হয়, তখন তাহাকে জ্ঞান বলা যায়। যখন বুদ্ধিতে ইহার বিপরীত ভাব—মানিত্ব, দম্ভিত্ব প্রভৃতি প্রকাশ হয়, অথবা বুদ্ধি যখন এই সকল ভাবযুক্ত থাকে, তখন তাহাকে অজ্ঞান বলিতে হইবে। অতএব এই জ্ঞান ও অজ্ঞান বুদ্ধির স্বরূপ বা চিত্তের ধর্ম্ম। ইহা জ্ঞাতার জ্ঞেয়। চিত্ত নির্ম্মল হইলেই এই অমানিত্ব প্রভৃতির বিকাশ হয়, এবং তখন নির্ম্মল চিত্তের এই প্রকাশ অবস্থাকে 'জ্ঞান' বলে। শ্রুতি অনুসারেও জ্ঞান—বুদ্ধিরই স্বরূপ। শ্রুতিতে আছে যথা—"যচ্ছেৎ বাঙ্‌মনসি প্রাজ্ঞঃ তৎ যচ্ছেৎ জ্ঞান আত্মনি। জ্ঞানম্ আত্মনি মহতি..." (কঠ, ৩।১৩)। এ স্থলে জ্ঞানাত্মা অর্থ শঙ্করাচার্য্যমতে "প্রকাশস্বরূপ বুদ্ধি।"

বেদান্ত-শাস্ত্রে আছে যে, আমাদের চিত্তে প্রতিফলিত চৈতন্য জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান, প্রমাতা, প্রমেয়, প্রমাণ, দ্রষ্টা, দৃষ্ট, দর্শন—এই প্রকার 'ত্রি-পুটি'যুক্ত। ইহার মধ্যে জ্ঞাতা—দ্রষ্টা বা প্রমাতা অন্তঃকরণে প্রতিফলিত আত্মস্বরূপ। জ্ঞান এই চিত্ত বা অন্তঃকরণ। আর জ্ঞেয়—অন্তঃকরণে প্রকাশিত বাহ্য বিষয়। আর 'জ্ঞ'-স্বরূপ আত্মা চিত্তে প্রতি-বিম্বিত হইয়া এই জ্ঞান প্রকাশ করে। "জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়ানাম্ আবির্ভাবতিরোভাবজ্ঞাতা।" (সর্ব্বোপনিষদ্‌সার, ৩)।

অন্তঃকরণে এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সংযুক্ত হইয়া জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইলেই এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়, এবং তৎসংযোগে জ্ঞান প্রকাশ হয়। সেই জ্ঞান—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়-স্বরূপ প্রকাশ করে। অন্তঃকরণ যে পরিমাণে মলিন হয়, রজঃ ও তমঃ যুক্ত হয়, সেই পরিমাণে জ্ঞান অজ্ঞানজড়িত হয়, এবং 'জ্ঞাতা ও

জ্ঞেয়'র প্রতিবিম্ব অপরিস্ফুট হয়। চিত্তের বা অন্তঃকরণের একদিকে (অন্তরে) জ্ঞাতৃস্বরূপ আত্মা, আর একদিকে (বাহ্যে) জ্ঞেয় জগৎ। চিত্তে উভয়েরই ছায়া পড়ে, উভয়ই চিত্তে প্রতিফলিত হয়। চিত্ত নির্ম্মল হইলে, তবে আত্মার প্রতিবিম্ব স্পষ্ট গ্রহণ করিতে পারে, নতুবা পারে না। চিত্ত নির্ম্মল হইলে, আত্মা তাহার অতি সন্নিকট বলিয়া আত্মার প্রতিবিম্ব অন্যদিকে সহজে গ্রহণ করিতে পারে। পরন্তু চিত্ত নির্ম্মল হইলেও ইন্দ্রিয়াদি যদি বিকল হয়, তবে তাহা বাহ্যবিষয় স্পষ্ট গ্রহণ করিতে পারে না। সে যাহা হউক, নির্ম্মল চিত্তেই আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ পাইতে পারে। নির্ম্মল চিত্তই জ্ঞানস্বরূপ। সেই জ্ঞানেই আত্মস্বরূপের প্রকাশ হয়।

অতএব এই জ্ঞান অন্তর্মুখ হইলে, অন্তরাত্মার দর্শন হয়। কাহাকেও জ্ঞানী বলিলে, তাঁহার চিত্ত যে এই অমানিত্ব-প্রভৃতি গুণ বা ধর্ম্মযুক্ত, ইহাই বুঝিতে হইবে। কেবল ভক্ত হইলে অথবা কেবল অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্যস্থিত হইলে, এমন কি, কেবল তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শী হইলেও, তাঁহাকে জ্ঞানী বলা যায় না। যাঁহাতে অমানিত্ব-প্রভৃতি এই বিংশতি ভাব বিশেষরূপে অভিব্যক্ত—তিনিই জ্ঞানী। অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্য অবস্থিতি ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন—ইহাই প্রধানতঃ জ্ঞান বলিয়া উক্ত হয় বটে, কিন্তু অমানিত্বাদি না থাকিলে, বুদ্ধি এই অধ্যাত্মজ্ঞানে অবস্থিত বা অবিচলিত ভাবে স্থিত হইতে পারে না; তত্ত্বজ্ঞানার্থও তাহার দর্শনের বিষয়ীভূত হয় না। সেইরূপ ঈশ্বরে অনন্যভক্তি যে এই জ্ঞানের লক্ষণ,—যাহাকে জ্ঞানের প্রধান লক্ষণও বলা যায়, তাহাও চিত্তের অমানিত্বাদি ভাব ব্যতীত লাভ করা যায় না।

জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১২

জ্ঞেয় যাহা—কহি এবে জানি, যাহা হয়
অমৃতত্ব লাভ,—তাহা সে পরমব্রহ্ম
আদিহীন, নহে বাচ্য সৎ বা অসৎ ॥ ১২

১২। জ্ঞেয় যাহা কহিতেছি—পূর্ব্বে যে জ্ঞানের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা দ্বারা জ্ঞাতব্য কি, এই প্রশ্ন আকাঙ্ক্ষা করিয়া ভগবান্ তাহার উত্তর দিতেছেন—জ্ঞাতব্য যাহা, তাহা আমি প্রকৃষ্টরূপে বলিতেছি (শঙ্কর)। বেদিতৃ-লক্ষণ অর্থাৎ জ্ঞাতৃলক্ষণ ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ যাহা, তাহাই জ্ঞেয়, ইহা বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে (রামানুজ)। যাহার জন্য উক্ত অমানিত্বাদি সাধন উক্ত হইয়াছে, তাহাই জ্ঞেয়, তাহাই প্রকৃতি-বিবিক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ-স্বরূপ, তাহাই জ্ঞেয় (কেশব)। উক্ত অমানিত্বাদি সাধন দ্বারা কি জ্ঞেয়, তাহাই এই ছয় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে (মধু)। এই জ্ঞানরূপ চিত্তে যাহা জ্ঞেয়, প্রসিদ্ধ জর্ম্মান দার্শনিক পণ্ডিত ক্যাণ্টের (Kant) ভাষায় তাহা "Ideal of Reason"।

পূর্ব্বে ব্রহ্মযোগ-যুক্তাত্মা জ্ঞানীর কথা উক্ত হইয়াছে (৫, ২১)। এবং তিনি ব্রহ্মভূত ব্রহ্মে নির্ব্বাণ লাভ করেন, তাহাও উক্ত হইয়াছে, (গীতা, ৫।২৪—২৬)। অন্যদিকে—সর্ব্বভূতের সুহৃদ্, সর্ব্বলোকমহেশ্বর ভগবান্‌কে জানিয়া শান্তিলাভ হয় (গীতা, ৫।২৯), শ্রদ্ধার সহিত ভগবানে যোগযুক্ত যোগীই শ্রেষ্ঠ (গীতা, ৬।৪৭) এবং ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানে যোগযুক্ত হইলে, সমগ্ররূপে তাঁহাকে জানা যায় (গীতা, ৭।১), ইহাও উক্ত হইয়াছে। অথচ এ স্থলে জ্ঞেয় কি, তাহার উত্তরে ব্রহ্মই জ্ঞেয়, ইহা বলা হইয়াছে। তবে কি পরমেশ্বর জ্ঞেয় নহেন? ইহার উত্তর পূর্ব্বে এই অধ্যায়ের দশম শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে। প্রথমে অমানিত্বাদি গুণযুক্ত নির্ম্মল চিত্তে ভগবানে অনন্য অব্যভিচারিণী ভক্তিরূপ জ্ঞান হইলে—এবং তাহা দ্বারা সমগ্ররূপে ভগবান্‌কে জানিলে, এবং অধ্যাত্ম-জ্ঞানে নিত্য স্থিত হইলে ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ

দর্শনরূপ জ্ঞান হইলে,তবে সেই জ্ঞানে ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন,—সেই জ্ঞানে ব্রহ্মকে জানিবার অধিকার হয়। ভগবান্‌ই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা ভগবান্‌কে বা সগুণ ব্রহ্মকে জানিলে, তবে তাহা দ্বারা নির্গুণ শান্ত অচল ধ্রুব অক্ষর ব্রহ্মের ও অনির্ব্বাচ্য অনির্দ্দেশ্য নির্ব্বিশেষ পরমব্রহ্মের জ্ঞান সম্ভব হয়, পরমব্রহ্ম সেই নির্ম্মল জ্ঞানে জ্ঞেয় হন। তিনিই পরম বেদিতব্য। ব্রহ্মকে জানিলে আর কিছুই জ্ঞাতব্য থাকে না। শ্রুতিতে আছে—

"নাতঃ পরং বেদিতব্যং. হি কিঞ্চিৎ।" (শ্বেতাশ্বতর। ১২)।

ব্রহ্মই পরং বেদিতব্য, কেননা—

"তস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি"(মুণ্ডক, ১।১।৩)

"আত্মনো বিজ্ঞানেন ইদং সর্ব্বং বিদিতম্।" (বৃহদারণ্যক, ২।৪।৫)

এই শ্লোকে 'ব্রহ্ম'ই জ্ঞেয়রূপে উক্ত হইয়াছেন। এই ব্রহ্ম কি, এবং কিরূপে তিনি পূর্ব্বের কয় শ্লোকোক্ত অমানিত্বাদি জ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয় হন, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এই ব্রহ্মতত্ত্ব বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে প্রকৃতি-বিবিক্ত আত্মা বা ক্ষেত্রজ্ঞ। আর শঙ্করাচার্য্য-প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণের মতে এই ব্রহ্মই পরম ব্রহ্ম, বেদান্তোক্ত 'একমেবাদ্বিতীয়' ব্রহ্মতত্ত্ব। এ মতভেদ পরে বিবৃত হইবে।

পূর্ব্বোক্ত অমানিত্বাদি জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্ম কিরূপে জ্ঞেয় হন, সে সম্বন্ধে শঙ্কর বলিয়াছেন,—এক্ষণে শঙ্কা হইতে পারে যে, পূর্ব্বে যে অমানিত্বাদি বলা হইয়াছে, সে সমুদায় 'যম-নিয়মের' অন্তর্নিবিষ্ট। ইহাদের দ্বারা কোন বস্তু ত জ্ঞাত হওয়া যায় না। অমানিত্বাদি কখন কোন বস্তুর প্রকাশক হইতে পারে না। সর্ব্বত্র দেখা যায় যে, যে জ্ঞানের যাহা বিষয়, সেই জ্ঞানই তাহার প্রকাশক হইয়া থাকে; এক-বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা অন্য-বিষয় বা বস্তু জ্ঞানে কখনই প্রকাশিত হইতে পারে না,—ঘট-বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা অগ্নি কখন প্রকাশিত হয় না। কিন্তু এইরূপ শঙ্কাদোষ হইতে পারে না। কারণ, পূর্ব্ব-শ্লোকে যে অমানিত্বাদি জ্ঞান বলা হইয়াছে,

উহার অর্থ জ্ঞান নহে—জ্ঞানের সাধন মাত্র। উহারা জ্ঞানের সহকারী কারণ।"

আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এই অমানিত্বাদি জ্ঞানের সাধন নহে। ইহারা শুদ্ধ সাত্ত্বিক নির্ম্মল চিত্তের বা বুদ্ধিতত্ত্বের 'জ্ঞানভাব' বা 'জ্ঞানরূপ।' চিত্ত এইরূপ জ্ঞানাকার হইলে, তাহাতে এই 'জ্ঞেয়' তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। সুতরাং উক্তরূপ কোন শঙ্কাই হইতে পারে না।

এ স্থলে আরও এক শঙ্কা হইতে পারে যে, যিনি ব্রহ্ম—যিনি বিজ্ঞাতা—যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ—তিনি কিরূপে জ্ঞেয় হন? জ্ঞাতা ত কখন জ্ঞেয় হয় না। সুতরাং এ স্থলে তাঁহাকে জ্ঞেয় বলা হইল কেন? এই ব্রহ্মকে যদি জ্ঞাত্মা হইতে ভিন্ন পরা ও অপরা প্রকৃতি বা মূল প্রকৃতি, অথবা ভগবানের যোনি 'মহদ্‌ব্রহ্ম' বলা যায়, তবে অবশ্য এ বিরোধ হয় না। কিন্তু কেহই তাহা বলেন নাই। সকল ব্যাখ্যাকারই এই জ্ঞেয়কে জ্ঞান-স্বরূপ 'পরব্রহ্ম' বা ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মা বলিয়াছেন। সুতরাং তিনিই জ্ঞাতা। যাহা হউক, 'জ্ঞাতা' কিরূপে জ্ঞেয় হন, তাহা আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। পরেও ইহা বিবৃত হইবে। সুতরাং এ স্থলে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শঙ্কর বলেন,—এ স্থলে জ্ঞেয় অর্থ জ্ঞাতব্য। যাহা জানা কর্ত্তব্য, যাহা (অতঃ) চতুবর্গ-সাধন-সম্পন্ন হইলে, জিজ্ঞাস্য,—তাহা এই জ্ঞেয়।

জানি যাহা হয় অমৃতত্ত্ব লাভ—এই তত্ত্ব শ্রবণ-প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিবার জন্য উক্ত হইয়াছে যে, এই জ্ঞেয়-স্বরূপ জানিলে অমরত্ব লাভ হয়—মৃত্যু সংসারসাগর হইতে পার হওয়া যায় (শঙ্কর)।

শ্রোতার আদর সিদ্ধি জন্য—অর্থাৎ যাহাতে শ্রোতার এই তত্ত্ব শ্রবণ জন্য আগ্রহ হয়, সে কারণ বলা হইয়াছে যে, এই 'জ্ঞেয়'কে জানিলে মোক্ষ হয়, (স্বামী)।

যে প্রকৃতিবিবিক্ত আত্মস্বরূপ জানিলে জন্ম জরা-মরণাদি প্রাকৃত-ধর্ম্ম-বিযুক্ত শুদ্ধ আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়;" (কেশব)।

ইহা মুমুক্ষুদিগের জ্ঞেয়, এজন্ত তাহা বিশেষ ভাবে বলিতেছি যে, সেই জ্ঞানে সংসার হইতে মুক্তি হয় (মধু)।

ইহাদ্বারা এই জ্ঞানের প্রয়োজন উক্ত হইয়াছে (বল্লভ)।

'যৎ জ্ঞাত্বা অমৃতম্ অশ্নুতে'—ইহা 'জ্ঞেয়' শব্দের বিশেষণ। অর্থ এই যে, যে জ্ঞেয় সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান হইলে অমৃতত্ব লাভ হয়,সেই'জ্ঞেয়ে'র বিষয় তোমাকে বলিতেছি। 'জ্ঞেয়' অনেক হইতে পারে, কিন্তু সকল জ্ঞেয় বিষয়ের জ্ঞানে মুক্তি হয় না ; কেবল একমাত্র এই ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই মুক্তি হয়। এই জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব জানিলে যে মুক্তি হয়, মুক্তির অন্ত উপায় নাই, তাহাই উপদিষ্ট হয়। শ্রুতিতে আছে,—

"তমেব বিদিত্বাতি-মৃত্যুমেতি,নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"

(শ্বেতাশ্বতর, ৩।৮।৬-১৫ দ্রষ্টব্য)।

সুতরাং এ কথা যে শ্রোতার চিত্তাকর্ষণ জন্য বলা হইয়াছে, এরূপ অনুমান করা ঠিক.সঙ্গত নহে।

তাহা সে পরম ব্রহ্ম আদিহীন—(তৎ অনাদিমৎ পরংব্রহ্ম)—মূল অনুসারে দুইরূপ পাঠ হয় ; যথা (১) 'অনাদিমৎ' 'পরংব্রহ্ম' আর (২) 'অনাদি' 'মৎপরং' 'ব্রহ্ম'। শঙ্করাচার্য্য, মধুসূদন প্রভৃতি প্রথম পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। অনুবাদে সেই পাঠ গৃহীত হইয়াছে। আর রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণব ব্যাখ্যাকারগণ দ্বিতীয় পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। এই দুইরূপ পাঠের অর্থভেদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রথম পাঠ অনুসারে অর্থ এই যে,যাহার আদি আছে,তাহা আদিমৎ। যাহা আদিমৎ নহে, তাহা অনাদিমৎ। সেই অনাদিমৎ বস্তুই 'পরং' বা নিরতিশয় ব্রহ্ম। তাহাই 'জ্ঞেয়রূপে' এ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। (শঙ্কর, গিরি, মধু, স্বামী।) দ্বিতীয় পাঠ অনুসারে অর্থ এই যে, আদি বা উৎপত্তি যাহার নাই,তাহাই'অনাদি','মৎপর'অর্থাৎ আমিই যাহার পরম্, যাহা আমার স্থানভূত, সেই ব্রহ্ম (রামানুজ, কেশব, বলদেব, হনু, বল্লভ, বিশ্বনাথ)।

রামানুজ, বলদেব প্রভৃতি বলেন যে, 'অনাদি' শব্দের যে অর্থ, অনাদিমৎ শব্দেরও সেই অর্থ। অতএব এ স্থলে 'অনাদি' অর্থে 'অনাদিমৎ' ব্যবহার নিরর্থক হয়। এই জন্য 'অনাদি' ও 'মৎপর'—এইরূপ পাঠই সঙ্গত। তাঁহাদের মতে এই ব্রহ্ম—জীবাত্মা বা প্রত্যগাত্মা। ভগবান্ জ্ঞেয় যাহা, তাহাই বলিতেছেন। সেই জ্ঞেয় ক্ষেত্রজ্ঞ—তাহা দ্বিবিধ—ক্ষেত্রজ্ঞ জীব ও ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর। এই শ্লোকে প্রকৃতি-বিযুক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের কথা উক্ত হইয়াছে। পরের কয় শ্লোকে ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিশ্বনাথ বলিয়াছেন, জ্ঞেয় দুই রূপ ;—জীবাত্মা ও পরমাত্মা, অর্থাৎ প্রতি-ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মা আর সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মা, এই শ্লোকে ব্রহ্ম অর্থে জীবাত্মা, আর পরের কয় শ্লোকে ব্রহ্ম পরমাত্মা পরমেশ্বর। রামানুজ বলেন, ক্ষেত্রজ্ঞ জীব ভগবানের পরা প্রকৃতি। (গীতা, ৭।৫)। অপরা প্রকৃতি জড়, ও পরা প্রকৃতি জীব। উভয়েই ভগবানের শরীর, এবং ভগবানের সহিত একরস হেতু জীব তাঁহার আত্মস্বরূপ। জীবের উৎপত্তি নাশ নাই—এজন্য জীব অনাদি, ভগবান্ই জীবগণের স্বামী, এজন্য ভগবান্ বলিয়াছেন, তাহারা 'মৎপর' বা ভগবৎপরায়ণ। ভগবান্ই 'প্রধানঃ ক্ষেত্রজ্ঞপতি-গুণেশঃ।' আর জীবাত্মা ব্রহ্ম—বৃহৎ হেতু তাহা ব্রহ্ম, তাহা স্বভাবতঃ শরীরাদি দ্বারা পরিচ্ছেদরহিত—সর্ব্বগত। তাহার শরীরের দ্বারা যে পরিচ্ছিন্নতা, তাহা কর্ম্মবন্ধনজনিত। নতুবা জীবাত্মা বৃহৎ অষ্টগুণবিশিষ্ট। শ্রুতিতে আত্মাকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। "আত্মা—অপহতপাপ্মা, বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকঃ—সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স আত্মা।" ইতি শ্রুতিঃ। অন্যত্র আছে—"বিজ্ঞানং ব্রহ্ম।" গীতাতেও আছে—

"স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি॥"

কেশবাচার্য্য বলিয়াছেন, "যাহার জন্ম নাই, সেই অনাদি, আর আমি যাহার 'পর' বা গুণশক্তিপ্রভৃতি দ্বারা যাহা হইতে উৎকৃষ্ট, তাহা

'মৎপর'। তাহা প্রকৃতিবিযুক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ—জীব। শ্রুতিতে আছে, "স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষম্ ঈক্ষতে।" স্মৃতিতে আছে,—"প্রধানপুরুষব্যক্তকালানাং কারণং পরমং হি যৎ পশ্যন্তি সূরয়ঃ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।" অতএব যাহার অখিল-অবিদ্যা নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই প্রত্যগাত্মার শুদ্ধাবস্থাই ব্রহ্ম। আবরণ অভাবে বৃহত্ব গুণযোগে তাহার ব্রহ্মত্ব। 'বৃহতো গুণা অস্মিন্ ইতি ব্রহ্ম।'

এইরূপ যুক্তিদ্বারা রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণব ব্যাখ্যাকারগণ এ শ্লোকে ব্রহ্ম অর্থে জীবাত্মা, বা প্রত্যগাত্মা বুঝিয়াছেন, এবং জীবই অনাদি ও 'মৎপর' বা ভগবৎপরায়ণ এবং তাহাই জ্ঞেয়, ইহা বুঝাইয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্য,মধুসূদন প্রভৃতি বলেন যে,যিনি এই জ্ঞেয়,তিনি 'পরমব্রহ্ম'। জীব ব্রহ্ম বটে, কিন্তু এ স্থলে সেই সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্রহ্ম উক্ত হয় নাই। পরের কয় শ্লোকেও যে ব্রহ্মের "সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ" প্রভৃতি বিশেষণ যে উক্ত হইয়াছে, তাহা জীবাত্মা সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে না। অতএব এ স্থলে 'অনাদিমৎ' ও 'পরংব্রহ্ম' এইরূপ পাঠই ধরিতে হইবে। আর, যাঁহারা অনাদি ও 'মৎপর' এইরূপ পাঠ ধরেন, তাঁহারা বলেন যে, বহুব্রীহি সমাসের দ্বারা যে অর্থ বুঝান যায়, তাহাই বুঝাইবার জন্য 'মতুপ্' প্রত্যয় করিলে তাহা বৃথা হয়। অনাদি অর্থে যাহার আদি নাই—তিনি, (এই বহুব্রীহি সমাস)। অনাদিমৎ বলিলেও সেই অর্থই হয়। সুতরাং মতুপ্ প্রত্যয় নিষ্ফল। এ অতিরিক্ত প্রয়োগে লাভ কি? এরূপ বৃথা পদপ্রয়োগ হইতে পারে না। উত্তরে শঙ্কর বলেন, 'অনাদি' ও 'মৎপর' এই প্রকার পদদ্বয় কল্পনা করিলে, পুনরুক্তিরূপ দোষ পরিহার হয় সত্য, কিন্তু তদনুসারে ব্যাখ্যা সঙ্গত হয় না। কেন না, এ স্থলে যে জ্ঞেয় ব্রহ্মকে প্রতিপাদিত করা হইয়াছে, তাহাকে সৎ নহে ও অসৎ নহে বলায় তাহা সকলপ্রকার উপাধিবর্জ্জিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। তাহা যদি ভগবানের পরা শক্তি হয়, তবে সে ব্রহ্ম শক্তিবিশিষ্ট হন। অর্থাৎ তাহা হইলে

তাহাকে সৎ বা অসৎ বলা যায় না,এরূপ বলা সঙ্গত হয় না। যাহা বিশিষ্ট-শক্তিযুক্ত, তাহার বিশেষত্ব প্রতিষেধসম্ভব হয় না।

শঙ্করাচার্য্য এ আপত্তির অন্য মীমাংসা করেন নাই। স্বামী বলেন,—ছন্দের অনুরোধে এ স্থলে মতুপ্ প্রত্যয় করিয়া 'অনাদিমৎ' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। মধুসূদন ও স্বামী উভয়ে 'অনাদি' ও 'মৎপর' এরূপ পাঠ ধরিয়াও অর্থ করিয়াছেন। তদনুসারে 'মৎপর' অর্থে 'আমি বিষ্ণু—আমার যে পরম বা নির্ব্বিশেষ রূপ—সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। অথবা আমা হইতে অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম হইতে পরম বা নির্ব্বিশেষ রূপ যে ব্রহ্ম। অথবা পরংব্রহ্ম আদিমৎ বিশ্ব হইতে ভিন্ন। এজন্য তিনি অনাদিমৎ।'

যাহা হউক, এ স্থলে 'অনাদিমৎ' পাঠই সঙ্গত। উপনিষদে 'অনাদিমৎ' শব্দ পাওয়া যায়। যথা—

'অনাদিমত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বাঃ॥"

(শ্বেতাশ্বতর ৪।৪)

যাঁহা হইতে বিশ্ব-ভুবনের উৎপত্তি, সেই ব্রহ্মই বিভু অনাদিমৎ। উপনিষদে অন্যত্র 'আদিমৎ' শব্দ আছে, যথা—'আদিমত্বাৎ বা' (মাণ্ডুক্য, ৯)। গৌড়পাদের কারিকা ভাষ্যে আছে—"অনন্ততা চ আদিমতো মোক্ষস্য ন ভবিষ্যতি।" সাংখ্য-কারিকায় (১০) আছে যে, 'লিঙ্গং হেতুমৎ'। অতএব যাহা আদিমৎ নহে, যাহা কোন কারণ হইতে উৎপন্ন নহে, তাহা অনাদিমৎ। প্রকৃতি ও পুরুষ অনাদি, (গীতা ১৩।১৯) প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই ব্রহ্মের বিশেষ ভাব বলিয়াই অনাদি। এ উভয়ের অনাদিত্ব অপেক্ষায় ব্রহ্মের অনাদিত্ব বিশেষভাবে লক্ষিত বলিয়া, এ স্থলে 'মতুপ্' প্রত্যয়ের সার্থকতা আছে। প্রকৃতি পুরুষ অনাদি হইলেও তাহাদের মূল ব্রহ্ম। যেহেতু, মায়া বা প্রকৃতি ব্রহ্মেরই শক্তি। পুরুষও তাঁহার ভাব-বিশেষ। কিন্তু ব্রহ্ম হইতে আর কোন পরম তত্ত্ব নাই, এ জন্য তাহা অনাদিমৎ। পরব্রহ্ম সর্ব্ব 'আদিমৎ' হইতে ভিন্ন,—এজন্য তিনি অনাদিমৎ।

আমরা পূর্ব্বে গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যায়, এই গীতোক্ত অক্ষর পরম ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। ব্রহ্ম অর্থে যে জীবাত্মা বা প্রত্যগাত্মা হইতে পারে না, তাহা সে স্থলে দেখান হইয়াছে। অতএব রামানুজ, বলদেব প্রভৃতি বৈষ্ণব আচার্য্যগণের ব্যাখ্যা এ স্থলে সঙ্গত নহে। তবে 'অনাদি' ও 'মৎপর' এইরূপ পাঠ ধরিলেও যে এ শ্লোকের সঙ্গত অর্থ হইতে পারে অর্থাৎ ব্রহ্ম অর্থে যে পরমব্রহ্ম হইতে পারে, তাহা স্বামী ও মধুসূদন দেখাইয়াছেন। তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্ম অর্থে এ স্থলে পরম ব্রহ্ম। উপনিষদে অনেক স্থলে ব্রহ্মকে পরমব্রহ্ম বলা হইয়াছে ; যথা—

"এতদ্বৈ সত্যকাম পরম্ অপরঞ্চ ব্রহ্ম" (প্রশ্ন উপনিষদ্ ৫।২১)

"যৎ পরংব্রহ্ম সর্ব্বাত্মা।" (কৈবল্য উপনিষদ, ১৩)

* * * *

"দ্বে বাব ব্রহ্মণী অভিধেয়ে শব্দশ্চ অশব্দশ্চ।"

"পরে অশব্দে অব্যক্তে ব্রহ্মণি অস্তংগতা... ।"

"দ্বে বাব বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ।"

"...পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।" (মৈত্রায়ণী উপঃ ৬।২২)।

"অক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরম্।" (কঠ উপনিষদ্ ৩।১)।

"ততঃ পরং ব্রহ্ম পরং বৃহন্তম্।" (শ্বেতাশ্বতর উপঃ, ৩।৭)।

"উদ্গীতমেতৎ পরমং তু ব্রহ্ম।" (ঐ ১।৭)। ইত্যাদি।

এইরূপে শ্রুতিতে 'ব্রহ্ম' ও পরংব্রহ্ম উভয়ই উক্ত হইয়াছে। শ্রুতিতে ব্রহ্ম যে স্থলে পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত, সে স্থলে ব্রহ্ম অর্থ সগুণ ব্রহ্ম—হিরণ্যগর্ভ। আর যেখানে ব্রহ্ম ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত, সেখানে ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ নির্গুণ ব্রহ্ম। তিনি পরংব্রহ্ম—তিনি তৎ-শব্দ-বাচ্য। গীতায় এ স্থলে ব্রহ্ম 'তৎ'—অতএব তাহা পরমব্রহ্ম। গীতায় ব্রহ্ম শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত। যথা—শব্দ-ব্রহ্ম, অক্ষর-ব্রহ্ম, পরমব্রহ্ম, মহদ্‌ব্রহ্ম ইত্যাদি। অতএব এ স্থলে কোন্ ব্রহ্ম উদ্দিষ্ট

হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিবার জন্য সেই 'তৎ' শব্দ-বাচ্য পরমব্রহ্ম উক্ত হইয়াছে। কেবল 'ব্রহ্ম' বলিলে তাহা বুঝা যাইত না।

'ব্রহ্ম' বেদের 'মন্ত্র', এজন্য বেদ ব্রহ্ম। ইহাই ব্রহ্ম শব্দের প্রাচীন অর্থ। উপনিষদে 'ব্রহ্ম' জগতের জন্মাদি কারণ হইলেও আকাশকে ব্রহ্ম, অন্নকে ব্রহ্ম, মনকে ব্রহ্ম—এইরূপ নানা স্থলে উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম এইরূপ নানার্থে ব্যবহৃত। কিন্তু এ সমুদায় অর্থ সমন্বয় করিয়া বেদান্ত-দর্শন আকাশাদি সমুদায় সেই জগতের কারণ ব্রহ্মেরই নির্দ্দেশক বলিয়াছেন। যাহা হউক, পরমব্রহ্ম সম্বন্ধে কোন অর্থবিরোধ নাই। পরমব্রহ্ম বলিলে সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে বুঝায়। এজন্য এ স্থলে 'অনাদি-মৎ' 'পরংব্রহ্ম' এই পাঠই সঙ্গত।

গীতার কোন স্থানেই ব্রহ্মকে জীবাত্মা বলা হয় নাই, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। গীতায় নানা স্থলে 'পরং ব্রহ্ম'ই উক্ত হইয়াছে।

আমরা এ স্থলে, তাহার কয়েকটি উদ্ধৃত করিব।

ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন, যাঁহারা ঈশ্বরযোগী, তাঁহারা তদ্‌ব্রহ্মকে জানিতে পারেন। তাহাতে অর্জ্জুন প্রশ্ন করেন—'তদ্‌ব্রহ্ম কি ?'' (গীতা, ৮।১)। তাহার উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম"। (গীতা, ৮।৩)

অর্জ্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিয়া স্তুতি করিতে করিতে ভগবান্‌কে বলিয়াছেন,—

"পরং ব্রহ্ম পরং ধাম।" (গীতা, ১০।১২)

সেই পরমব্রহ্ম অক্ষর অব্যক্ত ভগবানের পরম ধাম।

"তদ্ধাম পরমং মম।" (গীতা, ৮।২১)

উপনিষদেও কোথাও ব্রহ্ম যে জীব, তাহা বলা হয় নাই। জীব যে ব্রহ্ম, তাহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। ব্রহ্মই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। সুতরাং তিনি ভিন্ন আর দ্বিতীয় কোন সত্তা থাকিতে পারে না। অতএব জীবে

পৃথক্ সত্তা নাই। ব্রহ্ম-সত্তাতেই জীবের সত্তা, ব্রহ্ম-জ্ঞানেই জীবের জ্ঞান, ব্রহ্মানন্দ হইতেই জীবের আনন্দ অনুভূতি। জীবের জ্ঞান ও আনন্দ পরিচ্ছিন্ন। সেই পরিচ্ছেদ দূর করিয়া জীবের ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্তির উপদেশ উপনিষদে আছে। জীব-ব্রহ্মের ঐক্যবাদের এ অর্থ নহে যে, জীবাত্মাই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম জীবাত্মা হইলেও জীবাত্মা ব্রহ্ম নহেন। জীবাত্মার জগৎস্রষ্টিত্ব উপনিষদে কোথাও উপদিষ্ট হয় নাই।

শ্রুতিতে আছে—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"(বৃহদারণ্যক উপঃ ৩।১৪।১)। তাঁহা হইতেই এ জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হয়; তিনিই সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন।

তিনিই এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাকে ধারণ করেন, তাহাকে শাসন করেন। তাঁহাতে ভূত সকল প্রতিষ্ঠিত। (বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৫।৫।১ ; ৪।৮।৯ দ্রষ্টব্য)। শঙ্কর জীব-ব্রহ্মে অভেদবাদ স্থাপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু জীব যে জগৎ-স্রষ্টা হইতে পারেন না, তাহা স্বীকার করিয়াছেন। বেদান্ত-দর্শনেও তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্ম জীবাত্মা নহেন।'অহং ব্রহ্মাস্মি'—এই মহাবাক্যের অর্থ 'আমি ব্রহ্ম' এরূপ নহে। ইহার অর্থ ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত আমার স্বতন্ত্র সত্তা নাই। তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র ভাব—পরিচ্ছিন্ন ভাব আমার অজ্ঞান বা ভ্রম মাত্র। যদি 'আমি ব্রহ্ম' ইহার অর্থ এইরূপ হইত যে, 'একা আমি আছি, আর কিছু নাই—আমিই ব্রহ্ম, আমি জ্ঞাতা, আমি জ্ঞেয়রূপে সমুদায় জগৎ, আমার জ্ঞানে ব্যক্ত ও বিধৃত', তাহা হইলে ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ Subjective বা Individual Idealism বা Egoism আসিয়া পড়িত। উপনিষদে কোথাও সে উপদেশ নাই। অতএব ব্রহ্ম অর্থে এ স্থলে জীবাত্মা হইতে পারে না। ব্রহ্ম—পরম ব্রহ্ম নিরুপাধিক নির্ব্বিশেষ পরম তত্ত্ব। সেই ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ ভাবে দ্বিবিধ। ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। যিনি পরম ব্রহ্ম, তিনি নির্ব্বিশেষ, অবাঙ্মনসগোচর, অচিন্ত্য, ও এক অর্থে অজ্ঞেয়, তিনি

প্রপঞ্চোপশম,—তাঁহাকে সৎ বা অসৎ বলা যায় না। এই শ্লোকে সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। আর সগুণ ব্রহ্ম যাহা, যিনি পরমেশ্বর বিশ্বরূপ সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী সকলের নিয়ন্তা পরম পুরুষ, তাঁহার তত্ত্ব পরে ত্রয়োদশ হইতে সপ্তদশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। এই সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্ম উভয়ই জ্ঞেয়। কিন্তু এ উভয় ভাবাতীত পরম ব্রহ্ম অবাচ্য, অনির্দ্দেশ্য, অজ্ঞেয়। সগুণ ব্রহ্মরূপে, পরমাত্মা পরমেশ্বররূপেই তিনি জ্ঞেয় হন। বেদান্তদর্শনে ও তাহার শাঙ্করভাষ্যে এই সকল তত্ত্ব বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। জীব-ব্রহ্ম এক হইলেও জীব যে সগুণ ব্রহ্ম নহে, জীব যে জগৎ-স্রষ্টা নহে, তাহা বেদান্ত-দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের কয়েকটি সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এ স্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এ স্থলে একটি কথা মনে হয়। চিত্তের বা বুদ্ধির অমানিত্বাদি জ্ঞানভাব স্থায়ী হইলে, তাহাতে যে ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞেয় হয়, তাহা ভগবান্ এ স্থলে প্রকৃষ্টরূপে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সে ব্রহ্মতত্ত্ব যে কি, তাহা গীতায় এই কয় শ্লোকের বিবরণ হইতে স্পষ্ট জানিতে পারা যাইবে, ইহাই ভগবানের অভিপ্রায়। কিন্তু ব্যাখ্যাকারগণের বিভিন্ন বাদ অনুসারে ব্যাখ্যা হইতে আমাদের এই গীতোক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিবার বিশেষ বাধা হয়। যাঁহারা কোন মতের পক্ষপাতী নহেন, তাঁহারা এ স্থলে অবশ্য শঙ্করের অর্থই গ্রাহ্য করিবেন। সেই অর্থই উপনিষদ্ ও বেদান্ত-সম্মত। আমরা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী; তিনি ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরয়িতা এই ত্রিবিধ ব্রহ্ম বা ব্রহ্মের এই তিন ভাব স্বীকার করেন। তাঁহার মতে চিৎ-স্বরূপ সগুণ ঈশ্বরই পরম ব্রহ্ম। জীব ও জড়ময় জগৎ তাঁহার শরীর-রূপে তাঁহা হইতে অভিন্ন। বিশেষতঃ জীব চিদচিৎস্বরূপে, চিদংশে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন। রামানুজ নির্গুণ অক্ষর ব্রহ্ম স্বীকার করেন না। এ স্থলে যে অনাদি অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, তাঁহাকে সে জন্য তিনি জীবাত্মা

বলিয়াই বুঝিয়াছেন। কিন্তু এ অর্থে তাঁহার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপিত হয় না। এ অর্থে ব্রহ্ম ঈশ্বর হইতে ভিন্ন হন। এ শ্লোকে জীবাত্মা ব্রহ্ম-তত্ত্ব ও পরের কয় শ্লোকে পরমেশ্বর ব্রহ্মতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে,—এ অর্থ করিলেও, তাঁহার মতের সামঞ্জস্য হয় না। দ্বৈতবাদী বৈষ্ণবাচার্য্যগণের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহাদের মতে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই পরম তত্ত্ব। তিনি ব্রহ্মেরও পর, তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। ব্রহ্ম অর্থে আত্মা বা জীবাত্মা। উপনিষদ হইতে তাঁহারা ব্রহ্মের এই অর্থই গ্রহণ করেন। মুক্ত জীবই স্বরূপতঃ, ব্রহ্ম—নির্গুণ অক্ষর কূটস্থ তত্ত্ব। মুক্ত না হইলে, জীব এই ব্রহ্মভাব লাভ করিতে পারে না। এই মুক্ত জীবের পরম ধ্যেয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। এজন্য ভগবান্ ব্রহ্মকে 'মৎপর' বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাঁদের মতে জীব বহু। সুতরাং ব্রহ্মও বহু; অতএব ইহাতে বহু ব্রহ্মবাদ আসিয়া পড়ে। এ মতের অন্য দোষ এ স্থলে নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন নাই। ভগবান্‌ই 'পরম ব্রহ্ম', 'পরম ধাম' না স্বীকার করিলে, বেদান্তের বা গীতার ব্রহ্ম-বাদের কোন সঙ্গত অর্থ হয় না। বরং ব্রহ্মকে মহদ্‌ব্রহ্ম বা মূল প্রকৃতি বলিলে, ইহা অপেক্ষা সঙ্গত অর্থ হইত।

যাহা হউক, পুরুষতত্ত্ব ও প্রকৃতিতত্ত্ব বা ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্রতত্ত্ব সমুদায়ই এই পরমব্রহ্ম-তত্ত্বের অন্তর্গত। ব্রহ্মই সর্ব্ব ও সর্ব্বাতীত। শ্রুতি বলিয়াছেন, এই এক ব্রহ্ম-বিজ্ঞানেই সর্ব্ববিজ্ঞান লাভ হয়, সমুদায় বিদিত হয়। সেই ব্রহ্ম—কখনও জীবাত্মা হইতে পারেন না। চিত্ত নির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপ হইলে, চিত্তে ঈশ্বরে একান্ত অনন্য অব্যভিচারিণী ভক্তি, অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্য স্থিতি ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনরূপ জ্ঞান হইলে, তবে সে জ্ঞানে এই ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন। সে ব্রহ্ম কখন প্রত্যগাত্মা হইতে পারেন না। ঈশ্বরে পরাভক্তি সাধনে সিদ্ধ হইয়া, সেই ভক্তি দ্বারা সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্ব লাভ করিয়া, সে ভক্তিরূপ জ্ঞান দ্বারা কি জীবাত্মা জ্ঞেয় হন? অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্য স্থিত হইলে কি সে জ্ঞানে সেই আত্মাই জ্ঞেয়

হন? তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনরূপ জ্ঞান দ্বারা কি এই প্রত্যগাত্মাই জ্ঞেয় হন? সুতরাং এই জ্ঞান দ্বারা জীবাত্মা বা প্রত্যগাত্মা জ্ঞেয়—এই সিদ্ধান্ত কখনও সমীচীন হইতে পারে না। বলিয়াছি ত, যখন উক্ত অমানিত্বাদি জ্ঞান লাভ দ্বারা সেই জ্ঞাননিষ্ঠা হেতু প্রকৃত অধিকারী হইয়া, সেই জ্ঞানে জ্ঞেয় কি তাহার অনুসন্ধান হয়, সেই জ্ঞেয় কি তাহার জিজ্ঞাসা উদয় হয়—যখন স্বতঃই "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" হয়, তখন সে জ্ঞানের জ্ঞেয় বা জিজ্ঞাসার বিষয় সেই ব্রহ্ম যিনি—

"জন্মাদ্যস্য যতঃ।" (বেদান্তদর্শন, ১।২)

বলিয়াছি ত যে ব্রহ্ম হইতে এ বিশ্বের উৎপত্তি স্থিতি নিয়মন বিধারণ ও লয় হয়, তিনি জীবাত্মা বা প্রত্যগাত্মা হইতে পারেন না। তিনি জগৎ-কারণ ব্রহ্ম। তিনিই নির্ব্বিশেষ পরম ব্রহ্ম, নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম। গীতার এই শ্লোকে ও পরের শ্লোকে সেই ব্রহ্মতত্ত্বেরই মীমাংসা হইয়াছে।

যাহা হউক, বিভিন্ন মতবাদের জন্য আমরা ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারি না। বাস্তবিক চিত্ত শুদ্ধ সাত্ত্বিক নির্ম্মল না হইলে, বুদ্ধি অমানিত্বাদি জ্ঞানভাবে স্থিত না হইলে এবং ধ্যানযোগে সিদ্ধি না হইলে, কখনই ঐ জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞানে প্রতিভাত হয় না। ততদিন এই বাদবিবাদই থাকিয়া যায়।

নহে বাচ্য সৎ বা অসৎ—(ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে)।—অর্থাৎ তৎ ব্রহ্মকে সৎও বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না। এ সম্বন্ধেও অদ্বৈত-বাদী শঙ্করাচার্য্য, গিরি ও মধুসূদন একরূপ অর্থ করেন, এবং রামানুজ-প্রমুখ বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ ভিন্ন অর্থ করেন। শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজের অর্থ এস্থলে বিস্তারিত ও বিবৃত হইল।

শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা এইরূপ,—

"এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ব্রহ্মকে যদি 'সৎ', ইহা বলিতে পারা না যায়, এবং 'অসৎ' ইহাও বলিতে পারা না যায়, তবে ব্রহ্ম 'জ্ঞেয়',

হইবেন কিরূপে,—উপনিষদে তাহা বিবৃত হইয়াছে। সকল উপনিষদেই যখনই পরব্রহ্মের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তখনই 'তাহা স্থূল নহে, তাহা অণু নহে'—ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সকল প্রকার উপাধির নিষেধমুখে 'নেতি নেতি' বাক্যে তাহার স্বরূপ ইঙ্গিত করা হইয়াছে। * ইহা তাহা নহে—অর্থাৎ বাচ্যবস্তুসমূহের নিষেধ দ্বারাই তাহা বুঝান সম্ভব। কারণ, সাক্ষাৎ-ভাবে কোন বাক্য দ্বারা তাঁহাকে নির্দ্দেশ করা যায় না। এ জন্য তাঁহাকে 'সৎ' বা 'অসৎ' ইহাও বলা যায় না। শ্রুতিতেই আছে—

"ন সৎ ন চাসৎ শিব এব কেবলম্।" (শ্বেতাশ্বতর ৪।১৮)

আশঙ্কা হইতে পারে, যে বস্তুকে 'সৎ' বলা যায় না, যাহা 'অস্তি' এই শব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয় না, সেরূপ কোন বস্তু থাকিতেই পারে না। যদি 'অস্তি' শব্দ দ্বারা সেই 'জ্ঞেয়' নির্দ্দিষ্ট না হয়, তবে বলিতে হইবে যে, তাহা

---

* শঙ্কর যে শ্রুতিগুলির ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত হইল। নিগুর্ণ ব্রহ্ম "নেতি নেতি" এই নিষেধমুখেই নির্দ্দেশ্য। ব্রহ্ম ইহা বা এই প্রকার, এরূপ বলিতে পারা যায় না। তিনি অবাঙ্মনসগোচর। শ্রুতি যথা—

"স এষ নেতি নেতি আত্মা।"—(বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২২)

"অথাত আদেশো নেতি নেতি, ন হ্যেতস্য অস্মাৎ:অন্যৎ পরম্ অস্তি।" (বৃহদারণ্যক, ২।৩।৬)।

"অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্।" (বৃহদারণ্যক, ২।৫।১৯ কঠ, ৩।১৫)।

"যত্তৎ অদ্রেশ্যম্ অগ্রাহ্যম্ অগোত্রম্ অবর্ণম্ অচক্ষুঃশ্রোত্রম্, তদপাণিপদম্।" (মুণ্ডক, ১।৬)।

"অকায়ম্, অব্রণম্, অস্নাবিরং, অপাপবিদ্ধম্।" (ঈশ উপনিষদ, ৮)।

"এতদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি—অস্থূলম্ অনণু,অহ্রস্বম্, অদীর্ঘম্, অলোহিতম্, অস্নেহম্, অচ্ছায়ম্, অতমঃ, অবায়ু, অনাকাশম্, অসঙ্গম্, অরসম্, অগন্ধম্, অচক্ষুষম্, অশ্রোত্রম্, অবাক্, অমনো,অতেজস্কম্, অপ্রাণম্, অমুখম্, অমাত্রম্, অনন্তরম্, অবাহ্যম্।" (বৃহদারণ্যক, ৩।৮।৮)।

"নান্তঃপ্রজ্ঞং, ন বহিঃপ্রজ্ঞং, নোভয়তঃ প্রজ্ঞং, ন প্রজ্ঞানঘনং, ন প্রজ্ঞং, ন অপ্রজ্ঞম্, অদৃষ্টম্, অব্যবহার্য্যম্, অগ্রাহ্যম্, অলক্ষ্যম্, অচিন্ত্যম্, অব্যপদেশ্যম্, একাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং, শান্তং, শিবম্, অদ্বৈতম্। স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।" ইত্যাদি শ্রুতিঃ। (মাণ্ডুক্য উপঃ ৭)।

নাই। এ শঙ্কাও নিরর্থক। যে হেতু, ইহা দ্বারা সেই 'জ্ঞেয়' নাই—এরূপ বলা হয় নাই,—কেবল, তাহা 'নাই' এইরূপ জ্ঞানের বিষয়ও নহে, ইহাই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহাকে যেমন 'অস্তি' বলা যায় না, সেইরূপ 'নাস্তি'ও বলা যায় না।

"ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যত প্রকার জ্ঞান আছে, সকল জ্ঞানই হয় 'অস্তি' এই বুদ্ধির সহিত মিলিত, না হয় 'ন অস্তি'—'নাই'—এই বুদ্ধির সহিত মিলিত। অতএব সে জ্ঞেয় 'ব্রহ্ম'—হয় 'অস্তি' এই প্রকার বুদ্ধির সহিত মিলিত যে জ্ঞান, তাহার বিষয় হইবে; না হয় ত, 'নাস্তি' এই প্রকার বুদ্ধির সহিত মিলিত যে জ্ঞান, তাহার বিষয় হইবে"। কিন্তু মন ও ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু সম্বন্ধেই এইরূপ জ্ঞান হয়। ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয়, এ জন্য ব্রহ্ম এই উভয় প্রকার বুদ্ধির মধ্যে কোন বুদ্ধির বিষয় হইতে পারেন না। এই ব্রহ্মের স্বরূপ যে জ্ঞেয়, তাহা অতীন্দ্রিয়; সুতরাং একমাত্র বেদরূপ শব্দপ্রমাণ দ্বারা তাহা জ্ঞেয়—তাহা কেবল সেই শব্দ-প্রমাণেরই বিষয়।* এই জন্য সে প্রমাণ দ্বারাও ব্রহ্ম ঘটাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর ন্যায় 'অস্তি' বা 'নাস্তি' এই দুই প্রকার বুদ্ধির মধ্যে কোন একটি বুদ্ধিরও বিষয় হইতে পারেন না। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, পরব্রহ্মকে সৎও বলা যায় না, বা অসৎও বলা যায় না।

"ব্রহ্ম যদি সৎও নহেন, এবং অসৎও নহেন, তবে তিনি 'জ্ঞেয়' হন কিরূপে? এরূপে ব্রহ্ম জ্ঞেয় নহেন বটে, কিন্তু ব্রহ্ম অজ্ঞেয়ও নহেন। সেই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন,

"অন্যৎ এব তৎ বিদিতাৎ অথ অবিদিতাৎ অধি।" (কেন, ৩)।

"অর্থাৎ তিনি বিদিতও নহেন, অবিদিতও নহেন। ইহা বিরুদ্ধার্থ শ্রুতি

* এই নির্ব্বিশেষ নিরুপাধিক অনির্ব্বাচ্য পরম ব্রহ্মই 'নেতি নেতি' এই নিষেধমুখে নির্দ্দেশ্য। তাই তাঁহাকে সৎ বা অসৎ বলা যায় না।

নহে। অতএব ব্রহ্ম 'সৎ'ও নহেন, 'অসৎ'ও নহেন, 'সৎ' বা 'অসৎ'— কোন বাক্যের দ্বারা ব্রহ্ম বাচ্য হন না। এ সম্বন্ধে অন্য শ্রুতি যথা—

"নৈব বাচা, ন মনসা, প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।" (কঠ, ৬।১২)।

"ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি, ন বাক্ গচ্ছতি, ন মনো
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ।" (কেন, ৩)।

"শ্রুতি আরও বলিয়াছেন যে, যে বলে তাঁহাকে জানিয়াছি, সে তাঁহাকে জানে না, বরং যে বলে যে তাঁহাকে জানি না, সে তাঁহাকে জানে,—

"যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং, বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥ (কেন, ১১)।

"শ্রুতিতে আরও উক্ত হইয়াছে যে, তিনি বিদিত ও অবিদিত সকল বস্তু হইতে বিভিন্ন,—

"অন্যদেব অবিদিতাদথো অবিদিতাদধি।" (কেন, ৩)।

শ্রুতিতে আরও উক্ত হইয়াছে,—

"বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ।" (বৃহদারণ্যক ২।৪।১৫)।

"যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ।"

(বৃহদারণ্যক, ২।৪।১৫, ৪।৫।১৫)৮

"অথচ ব্রহ্ম বা আত্মাই একমাত্র জ্ঞেয়। তিনিই একমাত্র জিজ্ঞাসার বিষয়। "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, (বেদান্ত-দর্শন,১।১।১)। "তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম।" (তৈত্তিরীয় ৩।১।১)। অর্থাৎ এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ যে ব্রহ্ম—তিনিই জ্ঞেয় বা জিজ্ঞাসার বিষয়। সেই ব্রহ্মই আত্মা। "স আত্মা তদ্‌বিজ্ঞেয়ম্।" ইহাই শ্রুতি। অতএব যিনি শিব শান্ত অদ্বৈত তুরীয় আত্মা বা ব্রহ্ম—তিনিই জ্ঞাতব্য। এইরূপে শ্রুতি ব্রহ্মকে অজ্ঞেয় ও বিজ্ঞেয় উভয়ই বলিয়াছেন। তিনি যে জ্ঞেয়, তাহাও শ্রুতি বিশেষভাবে বলিয়াছেন।

'সৎ' বা 'অসৎ' ইত্যাদি শব্দের দ্বারা যে পরব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশিত

হইতে পারে না, এই প্রকার সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত। অর্থবোধ করাইবার জন্য প্রযুক্ত সকল শব্দই শ্রোতৃগণ শ্রবণ করিয়াই 'জাতি' 'গুণ' 'ক্রিয়া' ও 'সম্বন্ধ' —এই কয়টির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন-শক্তি জ্ঞানের সাহায্যে অর্থ প্রতিপাদন করাইয়া থাকেন। অন্য কোন প্রকারে অর্থবোধ হয় না। যেমন, 'গো', 'অশ্ব'—এই সকল শব্দ জাতিবিশিষ্ট বস্তুকে বোধ করাইয়া থাকে; 'পাক করিতেছে', 'পাঠ করিতেছে'—এই প্রকার শব্দ ক্রিয়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বস্তুকে বোধ করায়; 'শুক্ল' বা 'কৃষ্ণ'—ইত্যাদি শব্দ গুণযুক্ত বস্তুকে বোধ করায়; ধনী, গোমান্—ইত্যাদি শব্দ সম্বন্ধযুক্ত বস্তুকে বোধ করায় ব্রহ্মকে এরূপ কোন জাতি, গুণ প্রভৃতি বাচক শব্দ দ্বারা জানা যায় না। ব্রহ্ম এক, এজন্য ব্রহ্মের কোন জাতি নাই; সুতরাং ইহা 'সৎ' প্রভৃতি জাতিবাচক শব্দের দ্বারা বাচ্য নহে। ব্রহ্ম গুণবিশিষ্ট নহেন, সুতরাং গুণবাচক শব্দ দ্বারা ব্রহ্ম বাচ্য নহেন। কারণ, ব্রহ্ম নির্গুণ। কোন প্রকার পরিণামাদি ক্রিয়া ব্রহ্মের নাই। সুতরাং কোন ক্রিয়াবাচক শব্দের দ্বারা ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেন না। শ্রুতিতে আছে—"ব্রহ্ম নিষ্কল, নিষ্ক্রিয় ও শান্ত।" কাহারও সহিত ব্রহ্মের যে সম্বন্ধ আছে, তাহাও নহে, কারণ, ব্রহ্ম এক, অদ্বয়, অবিষয়, প্রপঞ্চাতীত। সুতরাং কোন সম্বন্ধবাচক শব্দ দ্বারাও ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেন না। 'যত্র বাচো নিবর্ত্তন্তে' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা ইহা সিদ্ধ হয়।

রামানুজ অর্থ করেন,—"কার্য্যাবস্থা—'সৎ', আর কারণাবস্থা—'অসৎ'। কার্য্যাবস্থা—দেবাদি নামরূপ দ্বারা ব্যাকৃত অবস্থা—তাহা সৎ। আর অসৎ—অব্যাকৃত কারণাবস্থা। তাহা হইতে নামরূপ সকল ব্যাকৃত হয়। এজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন,—"অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ ততো বৈ সদজায়ত ইতি"। আর আত্মা (জীবাত্মা) এই কার্য্যকারণরূপ অবস্থাদ্বয়রহিত। আত্মার সহিত যে কার্য্য ও কারণাবস্থার অন্বয়, তাহা কর্ম্মজন্য, তাহা স্বরূপতঃ নহে।

"যদি বলা যায় যে, এই সদসৎ শব্দ দ্বারা আত্মস্বরূপ উক্ত হয় নাই, 'অসদ্' বা ইদমগ্র আসীৎ'—ইহা দ্বারা কারণাবস্থাযুক্ত পরব্রহ্মই উক্ত হইয়াছেন, সেই নামরূপ বিভাগের অযোগ্য, সূক্ষ্ম, চিদচিৎ শরীরযুক্ত পরব্রহ্মকেই কারণাবস্থা বলিতে হয়; আর এই কারণাবস্থায়ও ইহা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপ,—তবে তাহাই 'অসৎ' পদ বাচ্য। ক্ষেত্রজ্ঞের সৎ অবস্থা কর্ম্মজন্য। তাহা পরিশুদ্ধস্বরূপে সৎ বা অসৎ শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ্য নহে।"

স্বামী বলেন, "বিধিমুখে প্রমাণের বিষয়ই 'সৎ' শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ্য হয়, আর নিষেধ বিষয় 'অসৎ' শব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়। এই ব্রহ্ম সেই উভয় হইতে বিলক্ষণ বা ভিন্ন। তিনি বিষয় নহেন।"

কেশব বলেন, "এই প্রত্যগাত্মা ব্রহ্মের স্বরূপ সৎও নহে, অসৎও নহে। ইহাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কার্য্যাবস্থায় নামরূপ বিভাগ যোগ্য বস্তুই 'সৎ' শব্দের দ্বারা উক্ত হয়। কারণাবস্থায় নামরূপ বিভাগের অযোগ্য বস্তুই 'অসৎ' শব্দ দ্বারা উক্ত হয়। প্রত্যগাত্মা এ উভয় অবস্থার অতীত।"

পূর্ব্বে একাদশ অধ্যায়ের ৩৭শ শ্লোকে 'সৎ অসৎ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্জ্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিয়া স্তুতি করিতে করিতে বলিয়াছেন, "ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎপরং যৎ।" অর্থাৎ হে ভগবন্! তুমি অক্ষর, 'তুমি সৎ', তুমি অসৎ এবং যাহা সদসৎ হইতে অতীত, তাহাও তুমি। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই 'সৎ' ও 'অসৎ'এর অর্থ বিবৃত হইয়াছে। তাহা এ স্থলে দেখিতে হইবে। সে স্থলে শ্রুতি অবলম্বন করিয়া দেখান হইয়াছে যে, 'সৎ' ও 'অসৎ' দুইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক অর্থ,—সৎ=যাহা 'অস্তি' বা যাহার 'অস্তিত্ব' আছে, আর অসৎ= যাহা নাই—'নাস্তি' বা যাহার অস্তিত্ব নাই—যাহা শূন্য। আর এক অর্থ,— সৎ=যাহার 'অস্তিত্ব' প্রতিভাত, যাহা ব্যক্ত (manifest) মূর্ত্ত। আর অসৎ=যাহা অব্যক্ত (unmanifest) অমূর্ত্ত; যাহার সত্তা প্রতিভাত

বা ইন্দ্রিয়গোচর হয় না। এই অমূর্ত্ত অব্যক্ত অবস্থাকে কারণ, এবং মূর্ত্ত ব্যক্ত অবস্থাকে কার্য্য বলে। প্রথম অর্থ শঙ্কর ও দ্বিতীয় অর্থ রামানুজ প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু যে শ্রুতি অবলম্বন করিয়া রামানুজ এই অর্থ করিয়াছেন, তাহার এ অর্থ স্পষ্ট বোধ হয় না। শ্রুতিতে যে 'সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ' ও 'অসদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ' উক্ত আছে, সে স্থলে 'অসৎ' অর্থে অব্যক্ত কারণাবস্থা, এবং 'সৎ' অর্থে ব্যক্ত কার্য্যাবস্থা হইতে পারে না। 'ইদং' অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যখন ছিল না, তখন কি ছিল,—ইহারই উত্তরে বলা হইয়াছে যে, আদিতে 'অসৎ' ছিল, অথবা আদিতে 'সৎ' ছিল। এই উভয় মত নির্দ্দেশ করিয়া শ্রুতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সৃষ্টির আদিতে 'সৎ'ই ছিল। জগতের আদি বা বীজাবস্থা, যাহা কারণাবস্থা, তাহা উক্ত অর্থে 'অসৎ'ই হয়, তাহা এ অর্থে 'সৎ' নহে। সুতরাং জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহার কি অবস্থা ছিল,—এ স্থলে সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় নাই। এই জগতের অগ্রে, তাহার কারণ বা কার্য্যাবস্থার পূর্ব্বে কি ছিল, তাহাই জিজ্ঞাস্য। তাহাই ব্রহ্মতত্ত্ব। যাহা হউক, এ স্থলে বলা যাইতে পারে যে, অগ্রে যে অবস্থা ছিল, সে অবস্থা অব্যক্ত, অমূর্ত্ত, ইন্দ্রিয়ের অগোচর। এজন্য তাহা 'অসৎ' বা অনভিব্যক্ত। সেই অনভিব্যক্ত বীজাবস্থা হইতে অভিব্যক্তির উন্মুখ অবস্থা—তাহাই সৎ। কেন না, তাহাও অমূর্ত্ত, অব্যক্ত বটে ; কিন্তু তাহা বীজের অঙ্কুরের ন্যায় কতকটা ব্যক্তও বলা যায়। অবশ্য এ অর্থে 'অসৎ'কে জগতের কারণাবস্থা ও 'সৎ'কে জগতের প্রথম কার্য্যারম্ভাবস্থা বা কার্য্যোন্মুখ অবস্থা বলা যায়। কিন্তু তাহা হইলে,সে অবস্থা 'সৎ' কি 'অসৎ' এ প্রশ্ন হয় না। আদি অবস্থা অবশ্য কারণ অবস্থা। এ অর্থে সে কারণ অবস্থা 'অসৎ'ই। অথচ সে অবস্থাকে শ্রুতি 'অসৎ' বলেন নাই ; বরং 'সৎ'ই বলিয়াছেন। জগতের আদিম অবস্থা সৎ। কারণাবস্থায় এই জগৎ—ব্রহ্মেরই অমূর্ত্তরূপ। এ ব্যক্ত জগৎ এই কার্য্যাবস্থা তাঁহারই মূর্ত্তরূপ। 'সর্ব্বং

খল্বিদং ব্রহ্ম'। যাহা হউক, এই জগতের অগ্রে যাহা ছিল, তাহা 'সৎ' হউক বা অসৎ হউক—তাহাই ব্রহ্মতত্ত্ব। শ্রুতি বলেন—

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ।" (বৃহদারণ্যক, ১।৪।১০)

'ইহা' ব্রহ্মের সোপাধিক অবস্থা, জগৎকারণরূপ। সে সগুণ অবস্থায় ব্রহ্মকে কারণরূপে 'অসৎ' বলা যায় না। তিনি সৎ। পরম ব্রহ্ম এই সৎ বা অসৎ-বাচ্য অবস্থার অতীত। "সদসৎ তৎ পরমং যৎ"।

অতএব এই 'সৎ' ও 'অসৎ' বা জগতের কারণরূপ সগুণ ব্রহ্মে প্রযোজ্য হইলেও, প্রপঞ্চাতীত নির্গুণ পরব্রহ্মে প্রযোজ্য হইতে পারে না।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ব্রহ্ম অর্থে জীবাত্মা বুঝিয়াছেন। সে অর্থে এইরূপ সৎ ও অসতের ব্যাখ্যা কিছুতেই সঙ্গত হয় না। আরও আমাদের আত্মার অস্তিত্ব 'আমি আছি' এ বোধ নিত্যসিদ্ধ। এই আত্ম-প্রত্যয়ের উপরই প্রমাণ প্রমেয় সর্ব্বব্যবহার সিদ্ধ হয়। সুতরাং আত্মাকে 'সৎ' বলিতেই হয়। তাহা সৎ নহে বা অসৎও নহে—ইহা কিছুতেই বলা যায় না। এজন্য তাঁহারা সৎ ও অসতের উক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

অতএব যাহা 'আছে', যাহা 'অস্তি' বা যাহার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, তাহা সৎ। যাহার সম্বন্ধে দ্রব্যগুণ বা কর্ম্মভাব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, তাহাকে সৎ বলা যায়, 'সৎ'পদার্থই সত্তাযুক্ত। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি দ্বারাই সে অস্তিত্ব জানা যায়। আর যাহার অস্তিত্ব এইরূপে প্রতিভাত হয় না বলিয়া, যাহার সত্তা নাই বা অভাব জ্ঞান হয়, যাহাকে নাই বলা যায়—যাহা 'ন-অস্তি', বা 'নাস্তি'—তাহা অসৎ, তাহা অভাবাত্মক। যাহাকে মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না,—তাহা অসৎ। এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ব্রহ্ম সৎ নহেন—ব্রহ্মের অস্তিত্ব নাই, আবার ব্রহ্ম অসৎও নহেন, তাঁহার অস্তিত্ব আছে—এই দুইটি কথা পরস্পর বিরুদ্ধ। ব্রহ্মকে 'নাই' বলিব কিরূপে? তাহা হইলে ত সকলই মিথ্যা হয়,—শূন্যবাদ

আসে। আর ইহার পরের কয়েক শ্লোকে যে জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, তাহাও নিরর্থক হয়। ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যবস্তু যেরূপ সৎ বা অসৎ এই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, ব্রহ্ম সেরূপে 'সৎ' বা 'অসৎ' এইরূপ জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহেন। প্রমাণজ বৃত্তি জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। শঙ্কর ইহাই বুঝাইয়াছেন। আমরা শ্রুতি হইতে এ কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্ম 'ন সৎ তৎ ন অসৎ উচ্যতে'। 'উচ্যতে' শব্দের এক অর্থ কথিত হয় বা উক্ত হয়, আর এক অর্থ এইরূপে বাচ্য হয়। প্রথম অর্থ অনুসারে জিজ্ঞাসা হইতে পারে—ব্রহ্ম কাহার দ্বারা 'সৎ নহেন এবং অসৎও নহেন' এইরূপে কথিত হইয়াছেন। ইহার একমাত্র উত্তর হইতে পারে যে, তিনি 'ঋষিভিঃ ছন্দোভিঃ ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ' এরূপ কথিত হন। ঋষিগণ ছন্দে বা বেদে এবং ব্রহ্মসূত্র পদে বা উপনিষদে ব্রহ্ম সৎ বা অসৎ বাচ্য নহেন, এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, তাহা এ স্থলে দেখিতে হইবে।

ঋগ্বেদসংহিতার প্রসিদ্ধ 'নাসদাদীয়' সূক্তে (ঋগ্বেদ দশম মণ্ডল, ১২৯ সূক্ত) এই 'সদসৎ' উক্ত হইয়াছে।—

"নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীং
নাসীদ্রজো নো ব্যোমাপরো যৎ।
কিমাবরীবং কুহকস্য শর্ম্মন্
অম্ভঃ কিমাসীদ্‌গহনং গভীরম্॥"

অর্থাৎ এই সৃষ্টি যখন ছিল না, তখন অসৎও ছিল না, সৎও ছিল না। পৃথিবী ব্যোম কিছুই ছিল না। তখন কোন আবরণ ছিল কি? কোন আধারস্থান ছিল কি? তখন কোন সুখাদির ভোগাদি ছিল কি? তখন দুর্গম গভীর জল (কারণবারি) ছিল কি?

অতএব এ স্থলে 'সৎ' ও 'অসৎ' কিছুই না থাকিলেও, আর কিছু ছিল কিনা, এ প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে, এবং ইহার উত্তরে উক্ত হইয়াছে,—

'তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে
প্রকেতং সলিলং সর্ব্বমাসীৎ।'

এই তমঃ দ্বারা গূঢ় তমঃ ও প্রলয়কালে বিশ্বের 'অপ্রকেত' বীজাবস্থা কার্য্য-কারণরূপে অবিভক্ত অবস্থা ছিল। তাহা তপস্যার মহিমারই সৃষ্টি-কালে বিশ্বরূপে ব্যক্ত হইয়াছিল। কাহার তপস্যায় অর্থাৎ—কাহার জ্ঞানময় তপঃ দ্বারা এ বিশ্বের অভিব্যক্তি হইয়াছে? সে সম্বন্ধে এই সূক্তে উক্ত হইয়াছে,—

'আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং
তস্মাদ্ধ অন্যৎ ন পরং কিঞ্চন আস।'

সায়ণাচার্য্য ইহার অর্থ করেন যে, "এ স্থলে সৃষ্টির প্রাগবস্থা নিরূপিত হইয়াছে। প্রলয় অবস্থায় যাহা জগতের মূল কারণ, তাহা শশবিষাণবৎ 'অসৎ' নহে। তাদৃশ অসৎ কারণ হইতে জগতের উৎপত্তি সম্ভব নহে। আর তাহা আত্মবৎ সৎ বা 'সৎ' শব্দ দ্বারা নির্দ্ধার্য্য নহে, অসৎ শব্দ দ্বারাও নির্দ্ধার্য্য নহে। তাহা সদসৎ উভয় হইতে বিলক্ষণ 'এক'। তাঁহা হইতে পর বা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই।" অতএব তাহা জগতের কার্য্যাবস্থা বা তাহার কারণাবস্থা—এতদুভয়ের অতীত তত্ত্ব। যখন এ জগৎ থাকে না, এ সৃষ্টি থাকে না, তখন এই 'এক'—নিরুপাধিক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম 'স্বধা' বা স্বীয় মায়াশক্তি সহ বিদ্যমান থাকেন। তিনি তমদ্বারা—গূঢ়তম দ্বারা আবৃত থাকেন। জগৎ বীজ তাহাতে নিহিত থাকে। এ অর্থে নিরুপাধিক প্রপঞ্চাতীত ব্রহ্ম 'সৎ' নহেন, 'অসৎ'ও নহেন। কারণ, তখন 'সৎ' বা 'অসৎ' ছিল না।

উপনিষদে এই 'সৎ' ও 'অসৎ' যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। তবে রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ উপনিষদের

যে মন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া এই শ্লোকের অর্থ করিয়াছেন, সে মন্ত্র পূর্ব্বে সমুদায় উদ্ধৃত হয় নাই, তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত হইল। তাহা এই—

"সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্। তদ্ধৈক আহুঃ অসদেব ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্। তস্মাদসতঃ সজ্জায়েত ইতি।

কুতস্তু খলু সোম্য এবং স্যাৎ ইতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েত ইতি। সত্ত্বেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি।" (ছান্দোগ্য উপঃ, ৬৮ ১-৩)। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ইহা দ্বারা সৎ-কারণবাদ প্রতিষ্ঠিত এবং অসৎ কারণবাদ নিরাকৃত হইয়াছে। এই জগতের অভিব্যক্তির পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহা 'সৎ' বা সত্তা। তাহা অসৎ নহে। যাঁহারা বলেন, 'অসৎ' অগ্রে ছিল, এবং অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইয়াছে, তাঁহাদের এ কথা ঠিক্ নহে। অসৎ হইতে কিরূপে সতের উৎপত্তি হইবে?

এ স্থলে এইরূপে অসৎকারণবাদ নিরাকৃত হইয়া সৎকারণবাদ স্থাপিত হইয়াছে। সেই সৎকারণই ব্রহ্ম। এজন্য অন্যত্র শ্রুতি বলিয়াছেন,— "ব্রহ্ম এব ইদমগ্র আসীৎ।"

তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে,—

"অসদেব ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত।" (২।৭।১)

এ স্থলে শঙ্করও অর্থ করিয়াছেন যে, অসৎ অর্থে প্রকাশিত-নামরূপবিশেষ বিপরীত অবিকৃত ব্রহ্ম। আর সৎ নামরূপবিশেষ দ্বারা প্রকাশিত জগৎ। এ অর্থ স্বতন্ত্র। এ শ্লোকে এই অর্থ গ্রাহ্য নহে।

অতএব এ স্থলে 'সৎ' অর্থে জগতের কার্য্যাবস্থা ও 'অসৎ' অর্থে তাহার কারণাবস্থা হইতে পারে না। এ অর্থে ব্রহ্ম সৎ বা অসৎ শব্দ বাচ্য নহেন, ইহা বলা যায় না। ইহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে।

যাহা হউক, এইরূপ শ্রুতি-প্রমাণ হইতে বলা যায়, ঋষিগণ দ্বারা

বিবিধ ছন্দে ও ব্রহ্মসূত্রপদে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম সৎও নহেন, অসৎও নহেন। অতএব 'উচ্যতে' অর্থ শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। বাস্তবিক আমরা শ্রুতি হইতে জানিতে পারি যে, 'সৎ' বা জগতের কার্য্যাবস্থা এবং 'অসৎ' বা জগতের কারণাবস্থা— এ উভয়ের অতীত সেই (তৎ) 'এক' তত্ত্ব—"স্বধয়া তদেকম্"। তাহা অসৎ, অভাব বা শূন্য নহে। কিন্তু সেই 'এক' সগুণ—স্বশক্তি মায়াযুক্ত ও জগদ্‌বীজ তমঃ দ্বারা আবৃত। তাহা দ্বারা নির্গুণ নিরুপাধিক ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হন না। শঙ্করের মতে সেই নির্গুণ নিরুপাধিক নির্ব্বিশেষ প্রপঞ্চোপশম পরম ব্রহ্মই সৎ (অস্তি) বা অসৎ (নাস্তি) বাচ্য নহে। এখানে সৎ অর্থে জগতের কার্য্যাবস্থা ও অসৎ অর্থে কারণাবস্থা হয় না।

এইজন্য শঙ্করের মতে এই শ্লোকে 'ন উচ্যতে' অর্থ বাচ্য নহে। ব্রহ্মকে সৎও বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না। ব্রহ্ম 'সৎ' বটেন, কিন্তু 'সৎ' শব্দ দ্বারা বাচ্য নহেন। শব্দার্থ বা শব্দ দ্বারা বুদ্ধিগ্রাহ্য যে বিষয়, তাহা ব্রহ্ম নহেন। কেননা, ব্রহ্ম 'অবাঙ্‌মনসগোচর'। কোন বাক্য দ্বারা তাঁহাকে ব্যক্ত বা পরিচ্ছিন্ন করা যায় না। ইহাই শ্রুতির উপদেশ। ইহা দ্বারা সমস্ত বাক্যার্থ হইতে ব্রহ্মকে ভিন্ন করা হইয়াছে। বলিতে পারা যায় যে, শব্দও অনেক আছে,—বাক্যার্থও অনেক আছে। তাহার মধ্যে কেবল 'সৎ' ও 'অসৎ' এই দুই শব্দ কেন এ স্থলে ব্যবহৃত হইল? ইহার উত্তর এই যে,—যত কিছু বাক্যের বিষয় আছে, তাহা 'সৎ' বা 'অসৎ' এই দুই ভাগে বিভক্ত। তাহা 'আছে' অথবা 'নাই'। ইহার অতিরিক্ত আর কোন শব্দার্থ থাকিতে পারে না। বৈশেষিক দর্শন মতে 'সৎ' বা সত্তাই পরা জাতি—বা পর সামান্য। * অতএব 'সৎ' ও 'অসৎ' শব্দ দ্বারা সমুদায় বাক্যার্থ বা বাক্যদ্বারা প্রতিপাদিত বিষয় উক্ত

---

* "ভাবোঽনুবৃত্তেরেব হেতুত্বাৎ সামান্যমেব।"—বৈশেষিক দর্শন, ১।২।৪

হইয়া থাকে। ব্রহ্ম তাহার কোন বিষয় নহে। এজন্য তিনি সৎ বা অসৎ শব্দ দ্বারা বাচ্য নহেন।

আরও এক কথা শঙ্কর বলিয়াছেন;—জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সম্বন্ধ দ্বারাই বাক্যার্থ প্রতিপাদিত হয়। ব্রহ্ম এক বলিয়া কোন জাতিবাচক শব্দ দ্বারা তিনি প্রকাশ্য নহেন। তিনি নির্গুণ নিষ্ক্রিয়—এজন্য কোন গুণ বা ক্রিয়াবাচক শব্দ তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। তাহার পর সম্বন্ধের কথা। ইহা আমাদের ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। ব্রহ্ম যদি একেবারে সম্বন্ধ-বিরহিত হন, তবে কোন সম্বন্ধ-বাচক শব্দই তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। প্রপঞ্চাতীত (Transcendent) ব্রহ্মই সকল সম্বন্ধ-বিহীন, তিনি নিরুপাধি, নির্ব্বিশেষ। 'নেতি নেতি' শব্দের দ্বারা তিনি উদ্দিষ্ট হইতে পারেন মাত্র। কিন্তু সগুণ ভাবে ব্রহ্ম সম্বন্ধবিহীন নহেন। এই সগুণ (Immanent) ভাব হেতুই ব্রহ্ম জ্ঞেয়, আর সেই সগুণ ভাব হইতেই কেবল তাঁহার পরম অক্ষর স্বরূপের আভাস পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধ হেতুই ব্রহ্ম জগৎকারণ, জগতের ঈশ্বর। সেইরূপ আমার সহিত সম্বন্ধ হেতু তিনি আমার আত্মার আত্মস্বরূপে জ্ঞেয়। ব্রহ্ম আমার আত্মার পরমাত্মা। এইরূপে আমার আত্মার সহিত এবং জগতের সহিত সম্বন্ধ হইতেই ব্রহ্মকে ধারণা করা যায়। তবে জগতের সহিত সম্বন্ধ হইতে তটস্থ লক্ষণ দ্বারা তাঁহার স্বরূপ জানা যায় না, তাহা পরে উল্লিখিত হইয়াছে। আত্মার সহিত সম্বন্ধ হইতেই তাঁহার স্বরূপ জ্ঞেয়। যাহা হউক, জগতের সহিত সম্বন্ধ হেতু ব্রহ্ম সগুণ, সোপাধিক। শঙ্করাচার্য্য সেই সগুণ রূপকে পারমার্থিক সত্য বলেন না। কিন্তু তাহা পারমার্থিক ভাবে সত্য না হইলে, কোন সম্বন্ধবাচক শব্দ দ্বারা বা কোনরূপে তাঁহাকে ধারণা করা যাইত না। তাহা হইলে তাঁহার 'সত্তা' বা অসত্তা কিছুই জানা যাইত না। তাহা হইলে শূন্যবাদ খণ্ডন করা যাইত না। মূলে যে বিরোধ

(জর্ম্মান্ দার্শনিক ক্যাণ্টের কথায়—যে Antinomy) তাহা থাকিয়া যাইত, তাহার সিদ্ধান্ত হইত না। সুতরাং সগুণ সোপাধিক ভাবে জগতের সহিত সম্বন্ধ হইতে জগতের মূল কারণরূপে তিনি জ্ঞেয়। জগতের সৎকারণরূপে তিনি 'সৎ'। কিন্তু নির্ব্বিশেষ নিরুপাধিক নিষ্প্রপঞ্চ-ভাবে, সর্ব্বসম্বন্ধ-বিরহিতরূপে পরম ব্রহ্ম অবাচ্য অচিন্ত্য অজ্ঞেয়। অতএব 'সৎ' বা 'অসৎ' এই বাক্য দ্বারা নিরুপাধিক নির্ব্বিশেষব্রহ্ম বাচ্য নহেন। তিনি সকল সম্বন্ধ-বিরহিত সত্য। কিন্তু সগুণভাবে, এই সম্বন্ধ হইতেই ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন। *

---

* এই সদসৎ সম্বন্ধে বিখ্যাত জর্ম্মান্ দার্শনিক পণ্ডিত Paul Deussen তাঁহার Philosophy of the Upanishads নামক গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

As early as Rigveda X. 129.1 * * * it is said of primeval condition of things, the primeval substance, therefore of Brahman in the later sense, that at that time there was *na asad na u sad.* 'neither not-being nor yet being". Not the former, for a non-being neither is nor has been. not the latter, because empirical reality, and with it the abstract idea of "being" derived from it, must be denied of the primeval substance. Since however metaphysics has to borrow all its ideas and expressions from the reality of experience, to which the circle of our conceptions is limited, and to remodel them solely in conformity with its needs, it is natural that in process of time we should find the first principle of things defined now as the (non empirical being) : now as the (empirical) not-being. The latter already occurred in the two myths of creation :—

The universe in truth in the beginning was not-being (Sata p. Br. 6.2.1.3.). and "This universe in truth in the beginnig was nothing at all......(Taitt. Br. 2.7.1). Similarly in some passages of the Upanishad:—"This universe was in the beginning not-being: this (not-being) was being. It arose, (Chhand. 3.19.1). And in Taitt 2.7—

Not-being was this in the beginning.
From it being arose........

ব্রহ্ম কিরূপে জ্ঞেয়—নির্ব্বিশেষ নিরুপাধি (Transcendental) পরম ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞেয় হয় না, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। তাঁহার সগুণ নির্গুণ ভাব আমাদের ধারণা হইলে সেই সকল ভাবের অতীত সর্ব্ব ভাবের অতীত তত্ত্ব আমরা ইঙ্গিতে 'নেতি নেতি' দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে পারি মাত্র। তাহা অবাচ্য হইলেও এইরূপে নির্দ্দিষ্ট

(Then) it is further explained how Brahman created the universe ......after he had created it he entered into it; after he had entered into it, he was:

"The being and the beyond (*sat* and *tyat*)
Expressible and inexpressible,
Founded and foundationless,
Consciousness and unconsciousness,
Reality and unreality.

As reality he became everything that existed: for this men call reality (*tat satyam iti achakshate*)'.

A similar distinction is drawn as early as Brih. 2.3.1.,—"In truth there are two forms of Brahman, that is to say:—

'The formed and the unformed
The mortal and the unmortal
The abiding and the fleeting
The being and the beyond''.

This passage...gives an impression of greater age...and develops the thought further by more clearly contrasting Brahman as the beyond, inexpressible foundationless, unconscious, unreal, with the universe as the being, expressible, founded, conscious, real.

At the same time, this decides the question...whether the universe originated from the being or not-being, at which question the passage, Chhand. 6.2.1 glance:—

"Being only, my good sir, this was in the beginning, one only without a second: from this not-being being was born. Both how my good sir, could this be so? How can being be born from not-being? Being therefore rather, my good sir, this was in the be-

হইয়া, তাহা জ্ঞেয় হয়। আর যাহা সগুণ ব্রহ্মভাব, তাহা জগতের সহিত সম্বন্ধ হইতে "সর্ব্বং খল্বিদং" রূপে আমাদের জ্ঞেয় হইতে পারেন। আর যাহা ব্রহ্মের অক্ষর কূটস্থ অব্যক্ত ধ্রুব, তাহা আমাদের অধ্যাত্মজ্ঞানে আমার আত্মারূপে জ্ঞেয় হয়। 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'সোঽহং' এই মহাবাক্যের অর্থ দ্বারা আমাদের নির্ম্মল জ্ঞানে তাহা জ্ঞেয় হয়। এইরূপে এই জগতের ও আমার সহিত সম্বন্ধ হইতে, ব্রহ্ম আমাদের নির্ম্মল অমানিত্বাদি জ্ঞানরূপ চিত্তে জ্ঞেয়রূপে অভিব্যক্ত হন।

এই সম্বন্ধ হইতে কিরূপে ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন? কিরূপে তাঁহাকে নির্ম্মল জ্ঞানে জানা যায়, ইহা আরও বিশেষভাবে বুঝিতে হইবে। আমাদের

---

ginning, one only and in that a second". In harmony with the position thus taken...Brahman is usually named *sat* "being" or 'satyam' reality (in its empirical sense).

* * *

For the later Upanishads the question whether Braman is (non-empirical) being, or (empirical) non being has no farther significance These, like all other pairs of opposites, are transcended by Brahmàn, "He neither being, nor non-being (1) higher than that which is, and that which is not (2); "he comprehends in himself empirical reality, the realm of ignorance, and eternal reality, the kingdom of knowlege" (3).

Philosophy of the Upanishads p. 128-31

(1) 'ন সন্ ন চ অসন্ শিব এব কেবলঃ
তদক্ষরং...।' (শ্বেতাশ্বতর, ৪।১৮)

(2) 'যৎ সদসৎ বরেণ্যং, বরিষ্ঠং, প্রজ্ঞানাম্ বিজ্ঞানাৎ পরম্।'
(মুণ্ডক, ২।২।১)।

(3) 'দ্বে অক্ষরে ব্রহ্ম পরে ত্বনন্তে
বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়ে।
ক্ষরন্ত্ববিদ্যা হ্যমৃতং তু বিদ্যা
বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোঽন্যঃ॥'
(শ্বেতাশ্বতর, ৫।১)।

'আত্মার বোধের সহিত আত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদ সম্বন্ধ অনুভব হইতে আত্ম-জ্ঞানের সহিত ব্রহ্মজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ হয়। 'আমি' আছি— আমাদের এ জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ। সামান্য ভাবে এই আত্মজ্ঞান 'প্রতিবোধ-বিদিত' (কেন, ১২) এই আত্মজ্ঞান অবলম্বন করিয়াই আমার আমিত্ব ও সত্তা স্বতঃসিদ্ধ হয়। আমি কে—তাহা আমি বিশেষ ভাবে জানি না বটে, কিন্তু আমি যে আছি—তাহা জানি। এই আত্মজ্ঞান অবলম্বন করিয়াই আমার আমিত্ব ও সত্তা স্বতঃসিদ্ধ হয়, এই আত্মজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়াই সমস্ত জগৎ আমার জ্ঞেয় হয়। এই আত্মজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়াই আত্মস্বরূপে ব্রহ্ম আমার জ্ঞেয় হন। সেই আত্মজ্ঞান অবলম্বন করিয়াই ব্রহ্ম আছেন, ইহা সিদ্ধ হয়। কেবল আমি আছি—সামান্যভাবে এই আত্মজ্ঞান দ্বারা আত্মার প্রকৃতস্বরূপ জানা যায় না—আমি কে, তাহার প্রকৃত পরিচয় হয় না। এই জন্য আত্মা কিরূপ, এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে, এবং দেহাত্মবাদ প্রভৃতি নানা বাদ উপস্থাপিত হইয়াছে। (গীতা, ৬।৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। আত্মস্বরূপ না জানিলে ব্রহ্মস্বরূপও জানা যায় না। আমি আছি—এই জ্ঞানের সহিত ব্রহ্ম বা ঈশ্বর আছেন, এই মাত্র জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ সত্য, কিন্তু বুদ্ধি নির্ম্মল না হইলে আত্মস্বরূপ বা ব্রহ্মস্বরূপ জানা যায় না, ও আত্মা ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে নানা মতভেদ উপস্থিত হয়। যাহার আত্মজ্ঞান যেরূপ, ব্রহ্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহার ধারণাও সেইরূপ হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বুদ্ধি যখন সাধনাবলে নির্ম্মল হয়, তাহার সকল মলা, তাহার অজ্ঞানজ তমঃ দূর হয়, তখন তাহাতে আত্মজ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়। আত্মস্বরূপের প্রতিবিম্ব-যুক্ত সেই নির্ম্মল বুদ্ধিকেই জ্ঞান বলে, তাহা 'বোধলক্ষণা' বুদ্ধি (ইতি শ্রীচণ্ডী)। সেই জ্ঞানেই আত্মস্বরূপ সম্বন্ধে 'জ্ঞেয়' রূপেই ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞান বিকাশিত হয়। ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞান লাভের আর অন্য উপায় নাই। সেই জ্ঞান লাভ হইলেই—জ্ঞাতৃরূপে আমার মধ্যেও

জ্ঞেয়রূপে এই জগতের অন্তরালে ব্রহ্ম-দর্শন হয়। জগৎ বা এই Phenomenal world সেই জ্ঞানে যতই লীন হইতে থাকে, 'ব্রহ্ম-জ্ঞান, ততই উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়। ভগবান্‌ও এ স্থলে এই জ্ঞানের ও এই জ্ঞানে জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্বের কথা বলিয়াছেন। সে জ্ঞান সদসদাত্মক বস্তুজ্ঞান নহে। ব্রহ্মই সে জ্ঞানের স্বরূপ—সে জ্ঞানে জ্ঞাতা-জ্ঞেয় একীভূত, অহং ইদং একীভূত। সে জ্ঞানে দ্রষ্টা-দৃষ্ট ভোক্তা-ভোগ্য সর্ব্বদ্বৈত একীভূত 'অদ্বৈতীভূত' হয়। সে জ্ঞান অদ্বয়ব্রহ্মজ্ঞান। সেই জ্ঞানে জ্ঞেয় ব্রহ্ম 'সৎ' বা 'অসৎ' এইরূপ বাক্যার্থ দ্বারা প্রকাশিত হন না। তাঁহাকে 'Being' বা 'Naught' কিছুই বলা যায় না। তাঁহাকে স্থূল, সূক্ষ্ম, হ্রস্ব, দীর্ঘ, কোন স্থানবাচক শব্দদ্বারা তাঁহাকে নির্দ্দেশ করা যায় না। সেইরূপ ক্ষণ, মুহূর্ত্ত প্রভৃতি কোন কালবাচক শব্দদ্বারা তাঁহাকে নির্দ্দেশ করা যায় না। পরম ব্রহ্ম স্থান-কালের অতীত, স্থান-কালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। তাঁহাকে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ দ্বারাও নির্দ্দেশ করা যায় না। কেন না, তিনি 'নিমিত্তের' বা 'কার্য্যকারণ' সম্বন্ধের (Causation এর) অতীত,—তাহার দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, তিনি জ্ঞাতার জ্ঞাতা। এজন্য এ পরমাত্মরূপে আত্মজ্ঞানে তাঁহাকে একরস, নিষ্কল, ধ্রুব, নিত্য, নির্গুণ, অবিক্রিয় ভাবেই ধারণা হয়, এবং সচ্চিদানন্দময়-স্বরূপেও তাঁহাকে অনুভূত হয়।

পরম ব্রহ্ম যে জ্ঞেয় হন, তাহা বলা যায় না। তাঁহার সগুণভাব এই বিশ্বরূপ বিশ্বকারণরূপ ও বিশ্বনিয়ন্তৃরূপ ভাব যেমন সবিশেষ সোপাধিক, তাঁহার এই আত্মাতে অনুভূত নির্গুণ ভাবও সোপাধিক সবিশেষ। তাঁহাকে আমরা কূটস্থ অব্যয় অক্ষর নির্গুণ শান্ত শিব ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা সবিশেষভাবেই জানিতে পারি। ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ বলিয়া যে শ্রুতি তাঁহাকে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতেও ব্রহ্মের পরম স্বরূপ জানা যায় না। পরম ব্রহ্মের যাহা নির্ব্বিশেষ

নিরুপাধিক অপ্রমেয় ভাব, যাহা সগুণ নিগুণ ভাবের অতীত—সদসদ্-ভাবের অতীত সেই পরম ভাব জানা যায় না। অতএব বলিতে হয় যে, পরম ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞেয় হইয়াও অজ্ঞেয়।

ব্রহ্ম 'জ্ঞেয়' হইয়াও যে 'অবিজ্ঞেয়', তাহা শ্রুতি বার বার উপদেশ করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ব্রহ্ম "অন্যদেব তৎ বিদিতাৎ অথ অবিদিতাৎ অধি" (কেন, ৩)। ধীর যতিগণ তাঁহাকে 'আত্মস্থ' অনুদর্শন করেন সত্য (কঠ, ৫।১৩), কিন্তু সে দর্শন কিরূপ, তাহার সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দ্দেশ্যং পরমং সুখম্।
কথং নু তদ্বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা॥"
(কঠ, ৫।১৫)

---

* এ সম্বন্ধে জার্ম্মাণ দার্শনিক পণ্ডিত Paul Deussen তাঁহার কৃত (Philosophy of the Upanishads) গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"......in his essential nature Brahman is and remains unknowable. Neither as the (metaphysical) being (*sat*), nor as the knowing subject within us (*chit*), nor as the bliss (*ananda*) that holds us in deep sleep when the opposition of subject and object is destroyed, is Brahman accessible to knowledge. No character or action of Him therefore is possible otherwise than by the denial to Him of all empirical attributes, definitions and relations—'*neti neti*'—it is not thus, it is not so. Specially he is independent, as we have shown, of all imitations of space, time and cause, which rule all that is objectively presented, and therefore the entire empirical universe".

"This exclusion is already implied......in the thought mainly, of the ensential unity of things : For this unity excludes all pluralty, and therefore a sproximity in space, all succession in time, all interdependence as cause and effect, and all opposition as subject and object".—Philosophy of Upanishads p. 156.

এ সম্বন্ধে অন্য শ্রুতি পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। অতএব পরমব্রহ্ম অবাচ্য, অনির্দ্দেশ্য, অচিন্ত্য, অবিজ্ঞেয়। গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে—তিনি সূক্ষ্ম হেতু অবিজ্ঞেয় (১৩।১৫)।

অতএব এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, তবে এই ব্রহ্ম কিরূপে এই জ্ঞানের জ্ঞেয় হন? শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন যে, যাহা জ্ঞেয়, তাহা জ্ঞাতা হন না, এবং যাহা জ্ঞাতা, তাহাও জ্ঞেয় হন না। শ্রুতি বলিয়াছেন, —'অরে বিজ্ঞাতারং কেন বিজানীয়াৎ।' অতএব বিজ্ঞাতৃরূপে তিনি জ্ঞেয় হন না। তাহা হইলে ব্রহ্ম যদি জ্ঞেয় হন, তবে তিনি জ্ঞাতা নহেন, ইহা অবশ্য বলিতে হইবে। অথচ শ্রুতি অনুসারে তিনি 'বিজ্ঞাতা'। তিনি ব্যতীত আর কেহ বিজ্ঞাতা নাই। তিনি বিজ্ঞাতা বলিয়াই আমরা জ্ঞাতা। তিনি জ্ঞাতার জ্ঞাতা; অতএব যদি ব্রহ্ম জ্ঞাতাই হন, তবে তিনি 'জ্ঞেয়' নহেন। আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ব্রহ্ম বিজ্ঞানস্বরূপ। বিজ্ঞানস্বরূপে তিনি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই হইতে পারেন। মৈত্রায়ণী উপনিষদে (৬।৭) আছে যে, সেই ব্রহ্মে "অদ্বৈতীভূতবিজ্ঞানং…দ্বৈতীভূতম্।" গৌড়পাদ কারিকায় আছে—

"অকল্পকমজং বিজ্ঞানং জ্ঞেয়াভিন্নম্।" (৩।৩১)

এজন্য ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত হইয়াও বিজ্ঞাত। "বিজ্ঞাতং বিজিজ্ঞাস্যম্ অবিজ্ঞাত এত এব" (বৃহদারণ্যক, ১।৫।৮)। যাহা হউক, জীবের পরিচ্ছিন্ন অজ্ঞানবদ্ধ জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় একীভূত হয় না বটে, কিন্তু অপরিচ্ছিন্ন নিত্য জ্ঞান সম্বন্ধে যে সেই নিয়ম, ইহা বলা যায় না। এই জন্য ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত হইলেও আমাদের জ্ঞানের মধ্য দিয়াই তাঁহাকে জানা যায়, তিনি বিজ্ঞাত হন। পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ হইতে নিত্য জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত থাকিয়াও কতক বিজ্ঞাত হন।

এ স্থলে আমাদের এ জ্ঞানের কথা বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ

কি, তাহা জানিতে পারা যায় না সত্য, কিন্তু আমাদের নির্ম্মল জ্ঞানে ব্রহ্ম কিরূপে জ্ঞেয়, তাহাই বুঝিতে হইবে। শঙ্কর পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, ক্ষেত্রজ্ঞের নিকট ক্ষেত্র জ্ঞেয়। আমাদের যে শরীর সম্বন্ধে 'আমি' বা 'আমার' বলিয়া অভিমান হয়, সেই শরীরই আমার জ্ঞেয় ক্ষেত্র। শরীরান্তর্গত যাহা কিছু জানা যায়—তাহাই ক্ষেত্র। এজন্য বুদ্ধি, মন প্রভৃতি সকলই আমার ক্ষেত্র। আমি সেই ক্ষেত্রের জ্ঞাতা। সেইরূপ যিনি সমষ্টিভাবে সর্ব্বক্ষেত্রাভিমানী জ্ঞাতা, যিনি সর্ব্বক্ষেত্রকে আমার বলিয়া জানেন, তিনিই হিরণ্যগর্ভ পরমেশ্বর। এ জগৎ তাঁহার বিরাট্ শরীর। এজন্য সেই ঈশ্বর সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ। এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিবেক জন্যই শঙ্কর বলিয়াছেন যে, যাহা জ্ঞেয়, তাহা জ্ঞাতা নহে, আর যাহা জ্ঞাতা, তাহা জ্ঞেয় নহে। সে স্থলে এ কথা উক্ত হয় নাই যে, এই শরীর ব্যতীত আর কিছু জ্ঞেয় নাই; যেমন শরীর আমাদের জ্ঞেয়, সেইরূপ বাহ্য জগৎও জ্ঞেয়। শরীর সেই জগতের অংশ। তবে যে শরীরে 'আমি আমার' অভিমান হয়, তাহাকে জগৎ হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়াই আমি সেই আমার শরীরকে ক্ষেত্র বলি। তাহা বিশেষভাবে আমার জ্ঞেয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমার শরীর অপরোক্ষভাবে আমার জ্ঞেয়-ক্ষেত্র, আর তাহার বাহ্য যাহা কিছু তাহা পরোক্ষ ভাবে আমার জ্ঞেয়—এই প্রভেদ।

এই আমার শরীর ও আমার এই বাহ্য জগৎ যে ভাবে আমার নিকট জ্ঞেয়, সে ভাবে ব্রহ্ম আমার জ্ঞানে জ্ঞেয় হইতে পারেন না। আমাদের শরীরের জ্ঞান আমাদের অনুভূতি-সাপেক্ষ, আর জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান প্রত্যক্ষাদি প্রমাণজ। ব্রহ্মজ্ঞান সেরূপ অনুভূতি বা প্রমাণজ নহে। ব্রহ্ম অপ্রমেয়। ব্রহ্মজ্ঞান অপরোক্ষ জ্ঞান। বলিয়াছি ত, তাহা স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয় মাত্র। জ্ঞাতার বাহ্য জগৎও শরীর যেরূপ জ্ঞেয়, জ্ঞাতা সেরূপ জ্ঞেয় না হইয়াও যেরূপে সে আপনাকে জানে, সেইরূপেই সে ব্রহ্মকে জানে। সেইরূপে ব্রহ্ম তাহার জ্ঞেয় হয়। বুদ্ধি নির্ম্মল হইলে অমানিত্ব প্রভৃতি যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানে

ব্রহ্মস্বরূপ স্বতঃ প্রকাশিত হয়, সেই জ্ঞানেই ব্রহ্ম প্রকৃত জ্ঞেয় হন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ অনুকম্পাপূর্ব্বক বা কৃপা করিয়া, যাহার অজ্ঞানজ তমঃ দূর করিয়া দিয়া তাহার আত্মভাবস্থ হন, তাহারই ব্রহ্ম-জ্ঞান প্রকাশিত হয়। গীতা (১০।১১)।

আমরা এ তত্ত্ব আরও বিশদভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে; আত্মার প্রতিষ্ঠাহেতু চিত্তে যে, সেই 'জ্ঞ'-স্বরূপ আত্মার জ্ঞানের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহাতেই চিত্ত জ্ঞানস্বরূপ হয়। কিন্তু চিত্তে বা বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত এই জ্ঞান বৃত্তিজ্ঞান মাত্র। সেই বুদ্ধি-বৃত্তির জ্ঞানক্রিয়াকালে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই ভেদ হয়। তখন সে জ্ঞাতা জ্ঞেয়কে জানে। কিন্তু সে 'জ্ঞেয়' জ্ঞানের সহিত 'জ্ঞাতা' আপনাকেও তখন জানে। আমি ইহা জানিতেছি, তখন তাহার এই প্রত্যয় হয়। এই স্থলে জ্ঞানে জ্ঞাতাই 'জ্ঞেয়' হন। এই আত্মজ্ঞানের সহিত, এই একাত্মপ্রত্যয়ের সহিতই ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হন। এইরূপেই ব্রহ্ম নির্ম্মল জ্ঞানে জ্ঞেয় হন। চিত্ত নির্ম্মল না হইলে, যেমন আমরা আত্মস্বরূপ জানিতে পারি না, সেইরূপ পরমাত্মা ব্রহ্মস্বরূপও জানিতে পারি না।

এজন্য আমরা বলিতে পারি যে, কেবল নির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপ চিত্তেই ব্রহ্ম অনুভূত ও জ্ঞেয় হন। সে জ্ঞেয় বাহ্য জ্ঞেয় নহে। সেখানে জ্ঞাতা জ্ঞেয়ে ভেদ নাই; এজন্য সে স্থলে ব্রহ্মকে জ্ঞেয় বলা যায়। এইরূপে কেবল অমানিত্বাদি জ্ঞানভাবযুক্ত চিত্তেই ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন।

এখন কথা হইতে পারে যে, বুদ্ধি নির্ম্মল মার্জ্জিত না হইলে, উক্তরূপ অমানিত্বাদি জ্ঞান বিকাশিত না হইলে কি ব্রহ্মকে জানা যায় না? তাহা নহে। এ জ্ঞান বুদ্ধির ধর্ম্ম বা বুদ্ধির স্বরূপ। চিত্তে আত্মা নিয়তই প্রতিবিম্বিত থাকেন। এজন্য বুদ্ধিতে এ জ্ঞান নিয়তই থাকে। বলিয়াছি ত, চিত্ত নির্ম্মল না হইলে এ জ্ঞান উপযুক্তরূপে প্রকাশিত হয় না। দর্পণের মলিনতা অনুসারে যেমন তাহাতে যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহা মলিন হয়, সেইরূপ

মলিন জ্ঞানে ব্রহ্মজ্ঞানের যে ছায়া পড়ে, তাহাও মলিন হয়। বুদ্ধি যত নির্ম্মল হইতে থাকে, জ্ঞান ততই প্রকাশিত হইতে থাকে, (গীতা ৫।১৬); এবং ব্রহ্মতত্ত্ব তাহাতে ততই প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। বুদ্ধিতে যখন আর কোন মলা থাকে না, তখনই ব্রহ্মতত্ত্ব তাহাতে আপনিই পূর্ণ প্রকাশিত হয়। তখন তাহার জ্ঞানে যে জ্ঞাতা আত্মা ও জ্ঞেয় জগৎ প্রকাশিত হয়, ইহাদের অন্তরালে উভয়ের মধ্যে সে কেবল সেই ব্রহ্মতত্ত্বই অনুভব করে। সেই অনুভূতিমধ্যে ক্রমে এই জ্ঞেয় জগৎ লীন হইয়া যায়। এইরূপে ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন।

এইরূপ ব্রহ্ম 'জ্ঞেয়'। জ্ঞানে ব্রহ্ম পরমাত্মস্বরূপে 'সৎ'রূপেই প্রতিভাত। সে 'সৎ' জ্ঞানের অনুভূতির বিষয়। তাহা বাচ্য নহে। তিনি একমাত্র সত্তা-স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ। তাঁহার সত্তাতেই আমার সত্তা, তাঁহার জ্ঞানেই আমার জ্ঞান। তাঁহার সত্তাতে এ জগৎ সত্তাযুক্ত। যাহা হউক, জগতের সহিত সম্বন্ধ হইতে ব্রহ্ম প্রকৃতরূপে জ্ঞেয় হন না। এ সম্বন্ধ হইতে কোনরূপ অনুমান দ্বারা ব্রহ্ম প্রমেয় হন না। তাঁহাকে জগতের 'সৎ-কারণ' বলা হয় সত্য, অথচ কেবল জগতের সহিত সম্বন্ধ হইতে জগতের কারণভাবেও তিনি 'সৎ' শব্দবাচ্য নহেন। এ জগৎ সৃষ্টি-

---

* পরমব্রহ্ম যে বাচ্য নহেন, কোন শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ্য নহেন, তাহা জার্ম্মাণ দার্শনিক Kant-প্রমুখ অনেক দার্শনিক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

Le Roy বলিয়াছেন,—

"Kant has conclusively established that what lies beyond language can only be attained by direct vision, not by dialective progress."

'A New philosophy Henri Bergson'—p 157.

সে যাহা হউক, ব্রহ্ম অনির্ব্বাচ্য হইয়াও কেবল প্রণবের দ্বারা বাচ্য হ'ন। তাহা আমরা অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে একাক্ষর ব্রহ্মতত্ত্বে বিবৃত করিয়াছি, এ স্থলে তাহা উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

লয়ের অধীন। জগতের সকল বস্তুই অনিত্য। সকল বস্তুই ষড়্ভাব-বিকারযুক্ত, জন্মস্থিতিলয়ের অধীন। সকল বস্তুই আদিতে অব্যক্ত হেতু অসৎ, মধ্যকালে ব্যক্ত হেতু সৎ, এবং লয়কালে পুনঃ অব্যক্ত হয় বলিয়া অসৎরূপে প্রতীয়মান হয়। সকলই ব্যক্তাবস্থাতেও (Becoming)—সৎ (Being) এবং অসৎ (Naught)—এই দুই ভাবে অনুস্যূত থাকে। তাহা হইতে নিত্য সত্তার জ্ঞান হয় না। আমার জ্ঞানে জ্ঞেয় জগৎ সৎ কি অসৎ মায়াময় স্বপ্ন মাত্র, তাহাই বিচার পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করা কঠিন; এবং সে জগতের কারণ 'সৎ' কি 'অসৎ', তাহাও সিদ্ধান্ত করা দুঃসাধ্য। আত্মতত্ত্বজ্ঞান হইতেই ব্রহ্মতত্ত্বের প্রকৃত অনুভব হয়। সুতরাং যাঁহারা কেবল জগৎকারণরূপে ব্রহ্মসত্তা যুক্তি দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে যান, অথবা এ জগৎ কার্য্য, অতএব তাহার কর্ত্তা নিয়ন্তা বিধাতা অবশ্য কেহ কেহ আছেন, জগৎ সান্ত, সসীম (finite) বিকারী, সদসদাত্মক, নিত্য পরিবর্ত্তনশীল, অতএব অবশ্য তাহার অনন্ত অসীম (infinite) নির্ব্বিকার 'সৎ' আধার আছে, আর এই 'আমি'—জীব, আমিও ক্ষুদ্র, সান্ত, পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানযুক্ত, আমারও অবশ্য অসীম, অনন্ত, অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপ স্থির আধার আছেন—এই অনুমান-প্রমাণ দ্বারা যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করিতে যান, তাঁহারা পরস্পর বিরুদ্ধবাদে উপনীত হন। কেহ সে জগতের মূল কারণকে জড় বলেন, কেহ চৈতন্য বলেন, কেহ শক্তিমাত্র বলেন। কেহ তাঁহাকে 'সৎ' (Being, Substance) বলেন, কেহ বা অসৎ, (Naught) বা শূন্য বলেন। কেহ বলেন, ইহার কোন একটি মূল কারণ নাই। কেহ বা এই পরস্পর-বিরোধী তত্ত্বের সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করেন। কেহ এই চেষ্টায় বিফল হইয়া তাঁহাকে অজ্ঞেয় বলেন। কেহ বা জ্ঞেয় বলেন। যাহা হউক, এইরূপে তিনি জ্ঞেয় নহেন,—অজ্ঞেয়ও নহেন, তিনি সৎ নহেন, অসৎও নহেন। বাক্য দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব সিদ্ধান্ত করিতে গেলে এইরূপ নানা মত-

বিরোধ হয়, কিছুই সিদ্ধান্ত হয় না। এজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন,—ব্রহ্ম 'অবাঙ্‌মনসগোচর' তিনি মন বা বাক্য দ্বারা নির্দ্দেশ্য নহেন। তিনি কেবল আত্মাতে অনুভাবের বিষয় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিষয়কে একীভূত করিয়া দিয়া, সর্ব্বভেদ দূর করিয়া দিয়া নির্ম্মল জ্ঞানে অধ্যাত্মযোগে সত্য জ্ঞান অনন্ত স্বরূপে তিনি অধিগম্য হন। তিনি পরমাত্মস্বরূপে প্রত্যেকের অন্তরে প্রকাশিত হইয়া জ্ঞেয় হন। শ্রুতিতে আছে, ব্রহ্ম "অধ্যাত্মযোগাধিগম্য (কঠ, ২।১২) ব্রহ্ম একাত্মপ্রত্যয় সার (মাণ্ডুক্য, ৭), তিনি প্রতিবোধবিদিত (কেন উপঃ ২২)। তিনি হৃদয়ে সংশয়-রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হন।" (কঠ ৬।৯)। "জ্ঞানপ্রসাদে যিনি বিশুদ্ধচিত্ত, ধ্যানযোগে তিনি নির্ম্মল পরমাত্মাকে দর্শন করেন।" (মুণ্ডক, ৩।১।৮), নির্ম্মল চিত্তেই তিনি বিদিত হন (মুণ্ডক)। "এই সূক্ষ্মদর্শীরা সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করেন।" (কঠ, ৩।২২)। অতএব শ্রুতি অনুসারে নির্ম্মল বুদ্ধিপ্রসাদে ব্রহ্ম অন্তরে জ্ঞেয় ও অনুভূত হন। সে অনুভব কোন বাক্য দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না। এজন্য এ স্থলে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, সম্পূর্ণ নির্ম্মল বুদ্ধিতে, অমানিত্বাদিরূপ জ্ঞানে তিনি ধারণার বিষয়। তিনি জ্ঞেয়। নতুবা তিনি সৎ বা অসৎ কোন বাক্য দ্বারা বাচ্য নহেন, কোন 'নাম' বা 'রূপের' দ্বারা তিনি জ্ঞেয় হন না। তাঁহার কোন প্রতিমা নাই, (শ্বেতাশ্বতর, ৪।১৯)। তিনি অপ্রত্যক্ষ, অপ্রমেয়। কঠ ৩।৯, ৪।১৭)। ব্রহ্ম কি প্রকারে বা কিরূপে নির্ম্মল জ্ঞানে জ্ঞেয় হন, তাহা পরবর্ত্তী পাঁচ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩

সর্ব্বদিকে হস্ত পদ চক্ষু শির মুখ
হন তিনি শ্রুতিমান্ তিনি সর্ব্বলোকে
সর্ব্ব আবরিয়া তিনি হন অবস্থিত ॥ ১৩

১৩। সর্ব্বদিকে…হন তিনি—শঙ্কর বলেন, 'সৎ' এই শব্দের দ্বারা যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানের বিষয় না হওয়ায় ব্রহ্ম নাই—এই প্রকার শঙ্কা হইতে পারে। এইজন্য সকল প্রাণীর ইন্দ্রিয়-সমূহরূপ উপাধি দ্বারা ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়া সেই আশঙ্কা নিবৃত্তি করা হইতেছে। স্বামী বলেন, ব্রহ্ম যদি 'সৎ' ও 'অসৎ' হইতে বিলক্ষণ বা ভিন্ন হন, তবে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং" ইত্যাদি শ্রুতির সহিত সে বাক্যের বিরোধ হয়। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে। এই জন্য শ্রুতিপ্রতিপাদিত ব্রহ্ম অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা তাঁহার সর্ব্বাত্মস্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রুতিতে আছে—

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। (শ্বেতাশ্বতর, ৬।৮)।

মধুসূদন বলেন, "নিরুপাধিক ব্রহ্ম 'সৎ' শব্দ-প্রত্যয়বিষয় নহে বলিয়া তিনি 'অসৎ',—এরূপ আশঙ্কা নিরসন জন্য সর্ব্বপ্রাণীর 'কারণ' (অর্থাৎ চিত্ত ও ইন্দ্রিয়) উপাধি দ্বারে চেতন ক্ষেত্রজ্ঞরূপে, তাঁহার অস্তিত্ব প্রতিপাদন জন্য এইরূপ উক্ত হইয়াছে।"

গিরি বলেন, সর্ব্ববিশেষণরহিত অবাঙ্‌মনসগোচর ব্রহ্ম অদৃষ্ট হইলেও প্রতি জীবাত্মাতে সর্ব্ব ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি হেতু কল্পিতদ্বৈতসত্তার স্ফূর্ত্তি হেতু ব্রহ্ম সর্ব্ব হস্তপদাদি দ্বারা দৃষ্টবৎ প্রতীয়মান হন। প্রত্যক্-চেতনাধিষ্ঠিত ব্রহ্ম চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত হস্ত-পদাদিযুক্ত বলিয়া অনুমান হয়।

কেশবাচার্য্য বলেন,—পূর্ব্ব-শ্লোকে যে ব্রহ্মতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহাই এই শ্লোকে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। শ্রুতিতে আছে—

"অপাণিপাদো যবনো গৃহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।"

ইহা হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম অনিন্দ্রিয় হইলেও সর্ব্বদিকে দর্শন করেন, শ্রবণ করেন, গ্রহণ করেন। পরমাত্মা সর্ব্ব পাণিপাদবিরহিত হইলেও গ্রহণ, গমন, দর্শন, শ্রবণ আদি সর্ব্বকার্য্যে তাঁহার কর্তৃত্ব তাঁহার অনন্ত শক্তিযোগে নিরূপিত হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন, "তথা বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি"। গীতাতেও আছে,—

"ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।"

এইরূপে শ্রুতি-স্মৃতিতে জীবাত্মার সহিত ব্রহ্মের সাম্য উক্ত হইয়াছে। এই সাম্যভাবাপন্ন প্রত্যগাত্মার ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ হইয়াও গ্রহণ, গমন, দর্শন প্রভৃতি ক্রিয়া সম্ভব হয়। সেই পরিশুদ্ধস্বরূপ প্রত্যগাত্মা এই জন্য সর্ব্বত্র পাণিপাদ-চক্ষু-শিরোমুখ-শ্রোত্র হন।

বল্লভ সম্প্রদায় অনুসারে ব্যাখ্যা এইরূপ, এই শ্লোকে যে ব্রহ্ম বর্ণিত হইয়াছেন, যিনি 'মৎপর বা মৎস্থানভূত' ব্রহ্ম, তিনি 'সর্ব্বতঃ পাণিপাদ' শব্দ দ্বারা সর্ব্ব ক্রিয়াশক্তি ও সর্ব্ব-সেব্যত্ব (সর্ব্বরূপে ভগবানকে সেবা করিবার শক্তি) নিরূপিত হইয়াছে। 'সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্' এই বিশেষণের দ্বারা সর্ব্বজ্ঞানত্ব ও সর্ব্বমুখত্ব উক্ত হইয়াছে। সর্ব্বত্র শ্রুতিমৎ এই বিশেষণ দ্বারা সকল ভক্তের স্তুতি-শ্রবণের যোগ্যত্ব উক্ত হইয়াছে।

এই পাঁচ শ্লোকে যে ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, শঙ্করপ্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণ তাহা সেই জ্ঞেয় অনাদিমৎ পরম ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়াই বুঝিয়াছেন. কিন্তু বৈষ্ণব ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে রামানুজ বিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদ অনুসারে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম যে ঈশ্বর জীব ও জগৎ বা প্রেরয়িতা, ভোক্তা ও ভোগ্যরূপে নিত্য প্রকাশিত থাকেন, তাহার মধ্যে ঈশ্বরের স্বরূপ এই কয় শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। আর পূর্ব্ব-শ্লোকে মুক্ত জীবাত্মা বা প্রত্যগাত্ম-

স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অন্য বৈষ্ণব ব্যাখ্যাকারগণ বলেন যে, এস্থলেও ব্রহ্মই প্রত্যগাত্মস্বরূপ। কেশবাচার্য্য এইরূপ বুঝাইয়াছেন, কিন্তু এ অর্থ সঙ্গত নহে।

এই শ্লোক হইতে ১৭শ শ্লোক পর্য্যন্ত জ্ঞেয় পরব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে এবং পরব্রহ্ম "তৎ"-শব্দবাচ্য ক্লীবলিঙ্গে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উপনিষদে নির্গুণ, নিরুপাধিক ব্রহ্মই তৎশব্দবাচ্য ক্লীবলিঙ্গ। সগুণ ব্রহ্ম 'সঃ' শব্দ-বাচ্য পুংলিঙ্গ। এ কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার বেদান্তভাষ্যে বলিয়াছেন।

"ব্রহ্ম বিষয়ে দুই প্রকার শ্রুতি দেখা যায়—এক সবিশেষ লিঙ্গশ্রুতি, যেমন তিনি 'সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস' ইত্যাদি। অপর নির্ব্বিশেষ লিঙ্গশ্রুতি; যথা তিনি স্থূলও নহেন, সূক্ষ্মও নহেন, হ্রস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন ইত্যাদি।"

শ্রুতি এই নির্ব্বিশেষ লিঙ্গ-ব্রহ্মকে ক্লীবলিঙ্গে নির্দ্দেশ করেন, সবিশেষ ভাবকে পুংলিঙ্গে নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু কোন কোন স্থলে একই শ্রুতি-মন্ত্রে ক্লীবলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ উভয়ের প্রয়োগই আছে। পরব্রহ্মে ও অপর-ব্রহ্মে স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ নাই—ভাবের প্রভেদ মাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ মুণ্ডক উপনিষদের (১।১।৬) মন্ত্র উদ্ধৃত করা যাইতে পারে,—

"তৎ অচেতনম্ অদ্রেশ্যম্ অগ্রাহ্যম্ অগোত্রম্ অচলম্ অচক্ষুঃ অশ্রোত্রম্ অপাণিপাদম্ নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তৎ অব্যয়ং যৎ ভূতযোনিম্।"

এ স্থলে নিরুপাধিক ও সোপাধিক ব্রহ্ম অর্থাৎ সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম-ভাব এই উভয় ভাবকে 'ক্লীবলিঙ্গে' উক্ত হইয়াছে। সেইরূপ গীতায়ও এই স্থলে ক্লীবলিঙ্গেই 'সোপাধিক ও নিরুপাধিক উভয় ব্রহ্মভাবই' উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব-শ্লোকে 'তৎ ন সৎ তৎ ন অসৎ উচ্যতে' এই বাক্য দ্বারা কেবল নিরুপাধিক ব্রহ্মের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আর পরবর্ত্তী পাঁচ

শ্লোকে "সর্ব্বতঃ পাণিপাদংতৎ' ইত্যাদি বাক্যে এক অর্থে ব্রহ্মের নির্গুণ ভাবের সহিত সগুণ ভাবেরই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

ব্রহ্মের এই সগুণ ভাব ক্লীবলিঙ্গে নির্দ্দেশ করায়, তাহা "পরমপুরুষ পরমেশ্বর" হইতে ভিন্ন ভাবে ধারণা করা হইয়াছে। পরমেশ্বর পুংলিঙ্গশব্দ-বাচ্য, তিনি পরম পুরুষ Personal God আর ব্রহ্ম—সগুণ ও নির্গুণ উভয় ভাবেই ক্লীবলিঙ্গ শব্দ দ্বারা বাচ্য হওয়ায়, তিনি "অপুরুষ" Impersonal। সগুণ ব্রহ্ম ও পরমেশ্বর ভাবের এই প্রভেদ।

পূর্ব্বে একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ-বর্ণনা প্রসঙ্গে ভগবান্‌কে 'অনেক-বাহূদরবক্ত্রনেত্রং" প্রভৃতি যে বলা হইয়াছে, তাহা এ স্থলে মিলাইয়া দেখিতে হইবে এবং এই একাদশ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখিতে হইবে। সে স্থলে "অনেক" বাহু প্রভৃতি উক্ত হইয়াছে, এ স্থলে "সর্ব্বতঃ" বাহু প্রভৃতি বলা হইয়াছে। সে স্থলে ভগবানের বিশ্বরূপ বর্ণিত, এ স্থলে ব্রহ্মের সর্ব্বরূপত্ব বর্ণিত; 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই তত্ত্ব প্রকটিত। এই বিশ্ব—সান্ত, সীমাবদ্ধ, পরিচ্ছিন্ন। সুতরাং বিশ্বরূপও সান্ত, সীমাবদ্ধ, পরিচ্ছিন্ন। ভগবান্ একাংশেই এই জগৎ ব্যাপিয়া স্থিত; বিশ্বরূপ তাঁহার একাংশ। তিনি জগতের বাহিরে থাকিয়াও জগতের মধ্যে ওতপ্রোত। কিন্তু: ব্রহ্ম সগুণ হইলেও সান্ত, সসীম নহেন। ব্রহ্ম অনন্ত, অপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বব্যাপী। আমাদের জ্ঞেয় জগতের বাহিরে যাহা কিছু আছে, ব্রহ্ম তাহাও ব্যাপিয়া অবস্থিত। এই সর্ব্বত্ব—এই সর্ব্বব্যাপকত্ব নির্দ্দেশ করিবার জন্ত এ স্থলে "সর্ব্বতঃ পাণিপাদ" প্রভৃতি উক্ত হইয়াছে।

এইরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব ঈশ্বরতত্ত্ব হইতে ভিন্ন ভাবে এবং ঈশ্বরতত্ত্বকে ব্রহ্মতত্ত্বেরই অন্তর্গত ভাবে বুঝিতে হইবে। এইরূপে একাদশ অধ্যায়ের বিশ্বরূপ-বর্ণনার সহিত এ স্থলে বর্ণিত সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের সর্ব্বত্ব-বর্ণনার সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। নতুবা ভগবান্ স্বয়ং যে পরমেশ্বরে অনন্ত-

যোগে অব্যভিচারী ভক্তিরূপ, এবং অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্য স্থিতিরূপ ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনরূপ পরিশুদ্ধ নির্ম্মল জ্ঞানে ব্রহ্মই জ্ঞেয় বলিয়াছেন, এবং যে ব্রহ্মতত্ত্ব, এই জ্ঞানে জ্ঞেয়রূপে প্রতিষ্ঠা করিবার উপায় বলিতেছেন, 'তাঁহার যে পরম ধাম' (৮।২১) ব্রহ্ম, তিনি যে 'ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা' (১৪।২৭) এ সকল কথা কিছুই বুঝা যাইবে না।

ব্রহ্ম যেরূপে জ্ঞেয় হন, তাহাই এই কয় শ্লোকে বুঝান হইয়াছে। তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ—প্রকৃত তত্ত্ব অবাচ্য, অচিন্ত্য, অনির্দ্দেশ্য,—তাহা এ স্থলে বুঝান হয় নাই। যে 'তটস্থ' লক্ষণ দ্বারা সগুণ ভাবে ব্রহ্ম জ্ঞেয়, তাহাই এ স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্ম নিরুপাধিক হইয়াও, যে উপাধি দ্বারা জ্ঞেয় হন, তাহাই এ স্থলে উক্ত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে শঙ্কর বলিয়াছেন,—

"সকল প্রকার জীবগণের ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা আমরা সর্ব্বত্র জীবভাবে ব্রহ্মের অস্তিত্ব বুঝিয়া থাকি। ক্ষেত্রস্বরূপ উপাধির সহিত সম্বন্ধ হয় বলিয়াই ত ব্রহ্মকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা যায়। পাণিপাদ প্রভৃতি নানা অবয়বভেদ প্রযুক্ত ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন। এই ক্ষেত্ররূপ অনির্ব্বচনীয় উপাধির ভেদ প্রযুক্ত আত্মাতে যে ভেদ কল্পনা করা যায়, তাহা মিথ্যা। সেই ক্ষেত্ররূপ উপাধিকে অপনীত করিয়া জ্ঞেয় ব্রহ্মের স্বরূপ দেখান হইতেছে।

যিনি 'সৎ' বা 'অসৎ' বাচ্য নহেন, সেই ব্রহ্ম কেবল উপাধি দ্বারা কোনরূপে তাহার স্বরূপকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিবার জন্যই এ স্থলে তাঁহাকে 'সর্ব্বতঃ পাণিপাদ' প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সম্প্রদায়বিৎ আচার্য্যগণ বলেন যে, সেই সর্ব্বোপাধিশূন্য নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্ম 'অধ্যারোপ ও অপবাদ'রূপ ন্যায়ের সাহায্যে কোন প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। সকল দেশে সকল কালে সকল দেহের অবয়ব বলিয়া যত কিছু হস্ত, পদ, চক্ষু, মুখ, মস্তক, কর্ণ প্রভৃতি আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে, সেই সকল হস্ত-পদ প্রভৃতির

যাহা কিছু ধারণ ও বিচরণাদি ব্যাপার, সে সমুদায়ই সেই জীবভাবে দেহপ্রবিষ্ট ব্রহ্মের 'সৎ' ভাবকে সূচনা করিয়া থাকে। এই কারণে এই ইন্দ্রিয়গণকে জ্ঞেয় ব্রহ্মের সত্তার জ্ঞাপক বলিয়া উক্ত হয়। এই প্রকার প্রয়োগকে উপচার বলা যায়। অর্থাৎ ইহা দ্বারা সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ না করিয়া গৌণভাবে নির্দ্দেশ করা হয়।

'সর্ব্বতঃ হস্তপদ' যে ভাবে ব্যাখ্যাত হইল, সেই ভাবে এই শ্লোকের অন্য বিশেষণও ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অর্থাৎ, এই ভাবে সর্ব্বপ্রাণীর মুখ, চক্ষু, শির ও কর্ণ-যুক্ত সেই এক ব্রহ্ম—ইহা বুঝিতে হইবে।"

শঙ্কর অদ্বৈতবাদ অনুসারে এইরূপে জীব ও ব্রহ্মের একত্ববাদ বা অভেদবাদ স্থাপন করিয়াছেন, এবং তদনুসারে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অবশ্য জীবব্রহ্মের ভেদবাদ দ্বারা এই শ্লোকের সঙ্গত অর্থ হয় না। জীবব্রহ্ম-ভেদবাদে ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন না। কেবল জগৎকারণরূপে ব্রহ্ম স্বরূপতঃ জ্ঞেয় হন না, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। আত্মাই আমাদের অপরোক্ষ অনুভূতির বিষয়। সেই আত্মজ্ঞান যখন পরিশুদ্ধ হয়, উপাধি-রূপ পরিচ্ছেদশূন্য হয়, তখন সেই আত্মজ্ঞানেই ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধ হয়। আত্মা দ্বারাই ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন। প্রতিক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞাত্মা হস্তপদাদি উপাধি-যুক্ত। আর উপাধিমুক্ত আত্মা অপাণিপাদ। ইহা হইতে সর্ব্বাত্মরূপ ব্রহ্ম সর্ব্বতঃ হস্তপদাদি উপাধিযুক্ত জ্ঞান হয়। আবার সর্ব্বোপাধিশূন্য আত্মস্বরূপ জ্ঞান হইতে ব্রহ্মও যে সর্ব্বোপাধিশূন্য, ইহাও জানিতে পারা যায়। এজন্য গীতায় পরব্রহ্মকে কেবল "সর্ব্বতঃ পাণিপাদ" ইত্যাদি যে বলা হইয়াছে, তাহা নহে। পরবর্ত্তী শ্লোকে আছে, তিনি "সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত।" অর্থাৎ পাণি, পাদ, মুখ, শিরঃ, চক্ষু, শ্রোত্র এ সব কিছুই ব্রহ্মের নাই; ব্রহ্মে এ সব উপাধি কিছুই আরোপিত হইতে পারে না। অতএব গীতা অনুসারে পরব্রহ্ম সর্ব্বত্র পাণিপাদাদি বা সর্ব্বেন্দ্রিয়যুক্তও বটেন, তিনি সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিতও বটেন। "আছে" ও 'নাই' ইহারা পরস্পর বিরোধী শব্দ।

ব্রহ্মকে সৎ বা অসৎও বলা যায় না, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সেইরূপ এখানেও পরস্পর-বিরোধী ধর্ম্ম ব্রহ্মে সমঞ্জসীভূত (synthesis) হইয়াছে। শ্রুতিও পরব্রহ্মকে এইরূপে বুঝাইয়াছেন।

প্রথমে শ্রুতি ব্রহ্মকে অপাণিপাদ বলিয়াছেন, যথা—

"তৎ অচক্ষুঃ-শ্রোত্রং তৎ অপাণিপাদম্" (মুণ্ডক ১।১।৬)।

* * *

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যম্ পুরুষং মহান্তম্॥" (শ্বেতাশ্বতর, ৩।১৯)।

আবার শ্রুতিই ব্রহ্মকে "সর্ব্বতঃ পাণিপাদ" ইত্যাদি বলিয়াছেন।

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদংতৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥" (শ্বেতাশ্বতরঃ ৩।১৬।*

অতএব শ্রুতি অনুসারেও ব্রহ্ম "অপাণিপাদ..." অথচ তিনি "সর্ব্বতঃ পাণিপাদ..."। এই পরস্পর-বিরোধী বাদ কিরূপে ব্রহ্মে সমঞ্জসীভূত হইতে পারে? ইহার একমাত্র উত্তর—নিরুপাধিকভাবে ব্রহ্মকে অপাণি-পাদ বলা হইয়াছে, আর সোপাধিক সগুণ ভাবে ব্রহ্মকে 'সর্ব্বতঃ পাণিপাদ' ইত্যাদি বলা হইয়াছে। নিরুপাধিক ভাবে তিনি 'তৎ', সোপাধিকভাবে

---

* গীতার এই শ্লোক ও পরবর্ত্তী শ্লোক, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত ৩।১৬ শ্লোকের, এবং তাহার পরবর্ত্তী শ্লোকের অনুরূপ। ইহা হইতে বলা যাইতে পারে যে গীতার এই শ্লোক শ্রুতি হইতে উদ্ধৃত। কিন্তু এই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্—দশখানি প্রামাণ্য ও প্রাচীন উপনিষদের অন্তর্গত নহে। বেদান্ত দর্শনে কোন মন্ত্রে ইহার উল্লেখ করা হয় নাই। অথচ শ্রুতেশ্চ প্রভৃতি সূত্রে গীতার উল্লেখ আছে, এবং গীতা প্রামাণ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। অতএব গীতা যদি বেদব্যাস কর্ত্তৃক মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে স্বীকার করা যায়, তবে তাহার পরবর্ত্তী শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এই শ্লোক গীতা হইতে গৃহীত সিদ্ধান্ত করিতে হয়। পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৯, ২০ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

তিনি 'সঃ'—তিনি মহান্ পুরুষ (শ্বেতাশ্বতরোক্ত ৩।১৯ মন্ত্র)। গীতায় এ স্থলে ব্রহ্ম 'সর্ব্বতঃ পাণিপাদ'' ইত্যাদিরূপে বিশিষ্ট হইলেও তিনি 'তৎ' শব্দবাচ্য। এ স্থলে নিরুপাধিক অক্ষর পরম ব্রহ্মই সোপাধিক সগুণরূপে জ্ঞেয়, ইহা উক্ত হইয়াছে। অতএব সোপাধিক ভাব হইতেই ব্রহ্মের সোপাধিক ও নিরুপাধিক উভয় ভাব জ্ঞেয়। সোপাধিক সগুণ ভাবেই ব্রহ্ম ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এই তিন প্রকারে অভিব্যক্ত। তন্মধ্যে জীব ভগবানেরই পরা প্রকৃতি এবং জড় জগৎ ও জীবদেহ তাঁহার অপরা প্রকৃতি। অতএব ঈশ্বরও জীবরূপে (ক্ষেত্রজ্ঞরূপে) সোপাধিক ব্রহ্ম "সর্ব্বতঃ পাণিপাদ…"

গীতার একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ ঈশ্বরকে 'অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্র' (১১।১৬), "অনন্তবাহু" (১১।১৯) এবং "বহুবক্ত্রনেত্র-বহুবাহূরুপাদং' বলা হইয়াছে। আর এ স্থলে ব্রহ্মকে 'সর্ব্বতঃ পাণিপাদ' বলা হইয়াছে। তাহা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন প্রভেদ আছে কি না, তাহা আরও বিশদ করিয়া বুঝিতে হইবে। ঈশ্বরের জগৎ কর্ত্তা, জগৎশাস্তা, জগৎনিয়ন্তা ভাবে 'আমি' 'আমার' এ 'অভিমান' আছে। সর্ব্বজীব, এবং সর্ব্বক্ষেত্র সম্বন্ধে ঈশ্বরের এই 'আমি' 'আমার' ভাব আছে। এজন্য তিনি সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ, এবং সর্ব্বক্ষেত্রে, সর্ব্ব-স্থূলশরীরে যে সমুদায় বাহু, উরু, পাদ প্রভৃতি অবয়ব আছে, সে সমুদায় তাঁহারই; তিনি সর্ব্বজীবে অন্তর্য্যামিরূপে এ সকলের নিয়ন্তা, এই ভাব আছে। এজন্য তিনি অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্র…। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে ১১শ অধ্যায়ের ১১শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় যাহা বলা হইয়াছে, তাহা এ স্থলে দেখিতে হইবে। ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ পুরুষসূক্ত হইতে ঈশ্বরের এই অনন্ত বাহূদরবক্ত্রনেত্রযুক্ত বিশ্বরূপের তত্ত্ব জানা যায়। ব্রহ্ম এই পরমপুরুষ-রূপেই পরমেশ্বর।

যাহা হউক, এ স্থলে যে 'সর্ব্বতঃ পাণিপাদ' ব্রহ্মতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, ইহাতে ঈশ্বরের ন্যায় 'আমি' ও 'আমার' এরূপ কোন অভিমান হেতু সর্ব্ব-

জীব ও জীবদেহ সকলকে 'আমার' এইরূপ কোন জ্ঞান হেতু ব্রহ্ম সর্ব্বতঃ পাণিপাদ হন না। জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানে কোন পরিচ্ছেদ নাই, তাহা একরসভাবেই আত্মাতে প্রতিভাত। কিন্তু তিনিই গ্রাহ্যভাবে সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস ইত্যাদি সর্ব্ববিষয়, আর অন্যদিকে সর্ব্বচক্ষু-শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়রূপে তাহাদের গ্রাহক। কিন্তু অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে এ ভেদ নাই।

যাহা হউক, শ্রুতির উপদেশ এই যে, ব্রহ্ম সগুণ ভাবে জগৎ-সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ হন। প্রলয়ের পরে তিনি কোন সৃষ্টির আরম্ভে পূর্ব্বসৃষ্টি অনুসারে জগতের বীজভূত 'বহুভাব' কল্পনা করেন বা ঈক্ষণ করেন এবং নাম ও রূপের দ্বারা সেই 'বহু' সকলকে সৎরূপে পরিণত করিয়া এই জগতের বিকাশ করেন এবং সেই সকল 'বহু' এইরূপে নিজ পরাশক্তিবলে আপনার সত্তা হইতে সৃষ্টি করিয়া তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হন, এ কথা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। এইরূপে ব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টি (জন্মাদ্যস্য যতঃ ইতি বেদান্তদর্শন, ১।২।) এই বহু কল্পনা নামরূপে ব্যাকৃত হইয়া বহু জীবজাতির সৃষ্টি হয়, এবং সেই সকল জীবজাতির রূপ (form) বহু বাহুপাদ প্রভৃতি যুক্ত ক্ষেত্র কল্পিত ও সৃষ্ট হয়। ব্রহ্ম তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হন বলিয়া, তিনি এইরূপে 'সর্ব্বতঃ পাণিপাদ' হন।

নির্গুণ নিরুপাধিক ব্রহ্ম 'মায়া'শক্তিদ্বারা সগুণ সোপাধিক হইয়া এইরূপে জড়-জীবময় জগৎ সৃষ্টি করেন ও তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হন। এই মায়া ব্রহ্মের পরাশক্তি, ইহা শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম এই অনন্ত শক্তিমান্ বলিয়া সগুণ হন। সেই শক্তি হেতুই ব্রহ্ম জগৎকারণ, এবং এ জগৎও সেই অনন্তশক্তি হেতু কার্য্যরূপে পরিণত হয়। সেই শক্তি বা প্রকৃতি হইতে সর্ব্বক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়, এবং সর্ব্বক্ষেত্রের ইন্দ্রিয়াদি ও সর্ব্ব অবয়বের বিকাশ হয়। অতএব এই অচিন্ত্য ব্রহ্মশক্তি হইতে উৎপন্ন সর্ব্বপাণিপাদ ব্রহ্মেরই। কার্য্য কারণেরই অন্তর্ভূত। তথাপি ব্রহ্মমায়া

হইতে এই যে সৃষ্টি হয়, ইহাতে ব্রহ্মজ্ঞান, অজ্ঞানযুক্ত হয় না। পরব্রহ্মে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-রূপ দ্বৈতভাব হয় না। সগুণ ব্রহ্মে সেই দ্বৈতভাব প্রতীয়মান হইলেও, ব্রহ্ম নিত্য সে ভাবের অতীত নিত্যজ্ঞানস্বরূপে থাকেন। তবে সগুণ ব্রহ্মে যে হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বরভাব, তাহাতেই এই জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-ভাব, এই "আমি আমার" ভাব অনুস্যূত থাকে। এজন্য ব্রহ্ম সর্ব্বতঃ পাণিপাদ হইয়াও তিনি অপাণিপাদ। আর বিশ্বরূপ ঈশ্বর 'অনন্ত পাণিপাদ জ্ঞানযুক্ত।' নির্গুণ ব্রহ্ম মায়াশক্তি হেতু সগুণ হন বলিয়া তাঁহাতে ঈশ্বর জীব ও জগৎ ভাব অভিব্যক্ত হয়। সর্ব্বজীব জড়ময় জগৎ ঈশ্বর-রূপ সগুণব্রহ্মে অবস্থিত বলিয়া, ব্রহ্ম সর্ব্বতঃ পাণিপাদযুক্ত হন। তিনি সর্ব্বভূতের সর্ব্ব-পাণিপাদাদি ইন্দ্রিয়ের কারণ এবং কার্য্যকারণ অভিন্ন বলিয়া তিনি সর্ব্বতঃ পাণিপাদ, সর্ব্বতঃ চক্ষুকর্ণশির-মুখাদিযুক্ত। শ্রুতিতে আছে—

"এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী।" (মুণ্ডক, ২।১।৩)।

অতএব ব্রহ্ম জগতের মূল কারণ, অর্থাৎ নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ বলিয়াই ব্রহ্মের মধ্যে জগৎ অভিব্যক্ত ও অবস্থিত, ব্রহ্ম জগতে ওতপ্রোত। জগতের প্রতি ক্ষেত্রে হস্তপদাদির অবয়ব ও চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় কার্য্যরূপে প্রকাশিত। তাহার কারণ 'ব্রহ্ম'। এ জন্য কারণরূপে ব্রহ্ম সর্ব্বতঃ পাণিপাদ নহে, তিনি অপাণিপাদ। এই সকল পাণিপাদাদির কারণরূপে ব্রহ্ম জ্ঞেয়। নতুবা নীরূপ নির্গুণ ব্রহ্মে কোন পাণিপাদ নাই—তিনি অপাণিপাদ। রামানুজ বলিয়াছেন, "পরব্রহ্ম অপাণিপাদ হইলেও সর্ব্বতঃ পাণিপাদাদি কার্য্যকৃত্য শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। প্রত্যগাত্মাও যখন পরিশুদ্ধ হইয়া পরম ব্রহ্মস্বরূপ হন, তখন তিনি 'সর্ব্বতঃ পাণিপাদাদি-কার্য্যকৃৎ' হন, ইহাও শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে।" এ স্থলে শঙ্করের অর্থের সহিত রামানুজের অর্থের বিশেষ ভেদ নাই।

সর্ব্ব আবরিয়া তিনি হন অবস্থিত।—লোকে অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণীতে তিনি সমুদায় ব্যাপিয়া অবস্থিত (শঙ্কর)। ইহা দ্বারা ব্রহ্মের সর্ব্বতঃ পাণিপাদত্ব সাধিত হইয়াছে (গিরি)। লোকে অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান জগতে যাহা কিছু বস্তুজাত, সে সমুদায় ব্যাপিয়া তিনি অবস্থিত। পরিশুদ্ধ-স্বরূপ ব্রহ্ম দেশকালাদি-পরিচ্ছেদশূন্য বলিয়া সর্ব্বগত (রামানুজ)। সর্ব্বপ্রাণীর প্রবৃত্তি দ্বারা পাণিপাদ প্রভৃতি উপাধিদ্বারা সর্ব্ব ব্যবহারসম্পন্ন হইয়া তিনি অবস্থিত। (স্বামী)। এক নিত্য বিভু ব্রহ্ম সমুদায় অচেতনবর্গকে আবৃত করিয়া স্বসত্তাস্ফূর্ত্তি দ্বারা আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে ব্যাপিয়া অবস্থান করেন; নির্ব্বিকাররূপে স্থিত হন; এই অধ্যাস হেতু জড় প্রপঞ্চের গুণ বা দোষের সহিত অণুমাত্র সম্বন্ধযুক্ত হন না। সর্ব্বদেহে একই চৈতন্য নিত্য ও বিভু, তাহা দেহভেদে ভিন্ন হয় না (মধু)। লোকে যা কিছু বস্তু আছে, সমুদায়কে সেই প্রত্যগাত্মা জ্ঞানগোচরীভূত করিয়া অবস্থান করে। তখন অবিদ্যা সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্ত হওয়ায় ধর্ম্মভূত জ্ঞানের ব্যাপকত্ব হেতু প্রত্যগাত্মার ব্যাপক ধর্ম্ম যোগ হয় এবং সেই জন্য বিভুত্ব-স্বরূপ হয়। তাহাই উক্ত হইয়াছে। (কেশব) সর্ব্ব ইন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া অবস্থান করেন (বলভ)। সর্ব্ব ইন্দ্রিয়াদিযুক্তের ন্যায় অবস্থান করেন (হনু)।

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।"—

(ইতি ঈশ উপনিষদ, ১)।

আবার তাঁহা হইতেই সমুদায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় প্রবর্ত্তিত হয়। তিনি গ্রাহ্য-গ্রাহকরূপে অন্ন-অন্নাদরূপে, ব্রহ্ম সর্ব্বদেহে পাণিপাদ, মুখ, শির, চক্ষু প্রভৃতির প্রবর্ত্তকরূপে, এ সকলকে আবৃত করিয়া অবস্থান করেন ও আপনার অন্তর্ভূত করিয়া বিদ্যমান রহেন। ইন্দ্রিয়াদির ধারণ, আহরণ ও প্রকাশ প্রভৃতি প্রবৃত্তির নিয়ন্তা প্রেরয়িতা হইয়া অবস্থিত রহেন। তিনি ক্ষেত্রজ্ঞপতি গুণেশ। তাঁহার প্রেরণায়, তাঁহার

শক্তির বিচিত্রতা অনুসারে, বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিভিন্নরূপ হস্তপদাদি বিভিন্নরূপ ক্রিয়ায় প্রবর্ত্তিত হয়। এজন্য তিনি সমুদায়কে আবৃত করিয়া, আচ্ছাদিত করিয়া, অবস্থিত আছেন বলা যায়।

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥ ১৪

তিনিই আভাস সর্ব্ব ইন্দ্রিয় গুণের,
সর্ব্ব ইন্দ্রিয়-বর্জ্জিত। অসক্ত হইয়া—
ভূতভর্ত্তা, গুণভোক্তা—নির্গুণ হইয়া॥ ১৪

১৪। সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণের আভাস।—জ্ঞেয় আত্মা বা ব্রহ্ম দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি উপাধির সহিত সংযুক্ত বা উপাধিবিশিষ্ট হইয়াও অপরিচ্ছিন্ন—ইহাই এই শ্লোকে বুঝান হইয়াছে (শঙ্কর)। শঙ্কর আরও বলিয়াছেন—

"সর্ব্বেন্দ্রিয়—অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্ত, পদ প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং মন ও বুদ্ধিরূপ দুই অন্তঃকরণ—এই দ্বাদশটি কেন্দ্রস্থলকে 'ইন্দ্রিয়' বলা হইয়াছে। কারণ, এই কয়টি করণ—(অর্থাৎ দুই অন্তঃকরণ ও বাহ্য দশ ইন্দ্রিয়রূপ করণ) সেই জ্ঞেয় ব্রহ্মের উপাধি। বিশেষতঃ বহিরিন্দ্রিয়গুলি মন ও বুদ্ধিরূপ অন্তঃকরণের সহিত সম্বন্ধ হেতু গৌণভাবে—আত্মার উপাধি। ইহাদের সহিত সাক্ষাৎভাবে আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই। অন্তঃকরণ দ্বারাই ইহারা আত্মার উপাধি বলিয়া পরিগণিত হয়। অন্তঃকরণই সাক্ষাৎভাবে আত্মার উপাধি."

"সেই সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের যাহা কিছু গুণ—অর্থাৎ অধ্যবসায়, সঙ্কল্প,

দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি, তাহাদের দ্বারা ব্যবহার-ভূমিতে আত্মা প্রকাশিত হন। ইহাতে আমাদের বোধ হয় যে, আত্মা সকল প্রকার ইন্দ্রিয়-ব্যাপারে ব্যাপৃত রহিয়াছেন; ইহা আমাদের প্রতীতি মাত্র।"

রামানুজ বলেন,—সর্ব্ব ইন্দ্রিয়-গুণ—অর্থে সর্ব্ব ইন্দ্রিয়বৃত্তি। ইন্দ্রিয়-বৃত্তি দ্বারাই বিষয় (রূপরসাদি) জানিবার সামর্থ্য হয়।

স্বামী বলেন, "চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের যে রূপাদি আকার বৃত্তি, সেই আকারে আভাসিত। অথবা ইন্দ্রিয় সকল এবং ইন্দ্রিয়-গুণসকল ও তাহাদের স্ব স্ব বিষয়ের সকল প্রকাশক যিনি, তিনি ব্রহ্ম।"

মধুসূদন বলেন,—"অধ্যারোপ ও অপবাদ—এই ন্যায় দ্বারাই প্রপঞ্চাতীত ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। সর্ব্ব প্রপঞ্চ 'অধ্যারোপ' দ্বারা তাঁহাকে পূর্ব্বে 'অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম' রূপে ব্যাখ্যাত করা হইয়াছে। এক্ষণে সেই প্রপঞ্চ 'অপবাদ' দ্বারা তিনি সৎ বা অসৎবাচ্য নহেন—ইহারই ব্যাখ্যা আরম্ভ হইয়াছে। নিরুপাধিক ব্রহ্মস্বরূপ-বিজ্ঞানার্থ তাঁহাকে সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাস প্রভৃতি বলা হইয়াছে। পরমার্থতঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়-বর্জ্জিত হইয়াও তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাস। মধুসূদন শঙ্করের অনুবর্ত্তী হইয়া—সর্ব্বেন্দ্রিয় অর্থে বহিঃকরণ দশেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ মন ও বুদ্ধি এবং ইহাদের গুণ 'অধ্যবসায়' প্রভৃতি এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়গুণ—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয়রূপে অবভাসযুক্ত, সর্ব্ব ইন্দ্রিয়-ব্যাপারে ব্যাপৃতরূপে তিনি জ্ঞেয়।"

বলদেব বলেন,—সকল ইন্দ্রিয় ও তাহাদের গুণ অর্থাৎ বৃত্তি দ্বারা আভাস বা দীপ্তিযুক্ত।

গিরি বলেন—বহিঃকরণ (পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়) ও অন্তঃকরণ (মন ও বুদ্ধি) রূপ উপাধিভূত সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণ—অধ্যবসায়, সংকল্প, দর্শনশ্রবণাদি দ্বারা অবভাসিত, সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ব্যাপারে ব্যাপৃতের ন্যায় ব্রহ্ম প্রতীয়মান হন।

কেশব বলেন—সর্ব্ব কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় বা বাহ্য করণ ও অন্তঃ-করণ মন ও বুদ্ধি ইহাদের গুণ বা বিষয় শব্দাদি তাহার আভাস বা প্রকাশ যাহাতে হয়। আত্মা বিনা ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ সম্ভব হয় না। অথচ আত্মা অর্থাৎ প্রত্যগাত্মা সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-বৃত্তি বিনাও আত্মা সমুদায় জানিতে পারে।

ব্রহ্মকে 'সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাস' কেন বলা হইয়াছে, এবং সর্ব্বেন্দ্রিয় ও সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাস দ্বারা ব্রহ্ম কিরূপে জ্ঞেয় হন, তাহা বুঝিতে হইবে। প্রথম সর্ব্বেন্দ্রিয় কি এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণ কি, তাহা দেখিতে হইবে। ইন্দ্রিয় অর্থে সাধারণতঃ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং মন এই একাদশ ইন্দ্রিয়, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু বুদ্ধিকে কোথাও ইন্দ্রিয় বলা হয় নাই। অথচ শঙ্কর প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ এ স্থলে বুদ্ধিকেও ইন্দ্রিয়মধ্যে ধরিয়াছেন। তাঁহাদের মতে যাহা আমাদের জ্ঞানের করণ বা বাহ্য বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের যন্ত্র, তাহা ইন্দ্রিয়। করণ দুই প্রকার—(১) বাহ্যকরণ, ইহারা দশ ইন্দ্রিয়, এবং (২) অন্তঃকরণ—ইহারা মন ও বুদ্ধি। এ উভয়কেই উপাধি বলে। অন্তঃকরণ-কেই বিশেষভাবে উপাধি বলে, দশ ইন্দ্রিয় গৌণভাবে উপাধি। আত্মা এই সকল করণে উপহিত হইয়া, ইহাদের দ্বারাই বাহ্য বিষয় গ্রহণ করে, বাহ্যবিষয়কে আহরণ করিয়া প্রকাশ করে, এজন্য ইহারা উপাধি। সাংখ্যদর্শন অনুসারে, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন এই তিনই অন্তঃকরণ। শঙ্করাচার্য্য অহঙ্কারতত্ত্বকে অন্তঃকরণমধ্যে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মতে অহঙ্কার মনের অন্তর্গত; অতএব যদি সর্ব্বেন্দ্রিয় অর্থে "করণ" হয়, তবে তাহা ত্রয়োদশটি। সাংখ্যদর্শনে আছে—

"করণং ত্রয়োদশবিধং ধার্য্যং হার্য্যং প্রকাশকঞ্চ।" (কারিকা)

এক্ষণে ইন্দ্রিয়গুণ কি—তাহা বুঝিতে হইবে। এই সকল ইন্দ্রিয়গুণকে ব্যাখ্যাকারগণ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি বলিয়াছেন। সাধারণভাবে বৃত্তি

অর্থে কার্য্য বুঝায়। যাহা গুণ, তাহাকে ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে, কিন্তু কর্ম্ম বা কার্য্য বলা যায় না। তবে যাহা অধিকার করিয়া কোন দ্রব্য বর্ত্তমান থাকে বা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকে তাহার বৃত্তি বলা যাইতে পারে; এবং তাহাকে গুণ বা ধর্ম্মও বলা যাইতে পারে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গুণ, ধর্ম্ম বা বৃত্তি রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ ইহাদিগকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় বলে। মনের প্রেরণায় বাহ্যবস্তুর সহিত সংযুক্ত হইয়া চক্ষু তাহার রূপ গ্রহণ করে, কর্ণ তাহার শব্দ গ্রহণ করে, রসনা তাহার রস গ্রহণ করে, নাসিকা তাহার গন্ধ গ্রহণ করে এবং ত্বক্ তাহার 'স্পর্শ' করে। এইরূপ রসাদি গ্রহণই ইন্দ্রিয়ের গুণ বা বৃত্তি। রূপরসাদি গ্রহণ করিয়া, সেই রূপরসাদি গুণযুক্ত বাহ্য দ্রব্যকে প্রকাশ করাই ইন্দ্রিয়ের গুণ বা বৃত্তি। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ নিজে তাহাদের প্রকাশ করিতে পারে না। ইহারা রূপরসাদি গ্রহণ করিয়া মনকে উপহার দেয়। মন তাহা গ্রহণ করিয়া সেই বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করে এবং পরে বুদ্ধির সাহায্যে সেই অনুভূত রূপরসাদির বাহ্য কারণ কি, তাহা স্থির করে। অতএব অন্তঃকরণ ও বহিঃকরণ উভয়ই বাহ্যবিষয় বা বস্তু প্রকাশের সহায়। যেমন ত্রিকোণ কাচের মধ্য দিয়া আসিতে সূর্য্যালোক লাল নীল প্রভৃতি বর্ণে রঞ্জিত হয়, সেইরূপ বাহ্যবস্তুজ্ঞান বাহ্য ও অন্তঃকরণ দিয়া অন্তরে পবেশ করিয়া প্রকাশিত হইতে গিয়া রঞ্জিত হয়, অন্তঃকরণধর্ম্মযুক্ত হয়। কর্ম্মেন্দ্রিয় সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম। জ্ঞানেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে ত্যাগ, গ্রহণ ইত্যাদিরূপ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হওয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বৃত্তি বা গুণ। বুদ্ধি ও মনের প্রেরণায় তাহাদের এই গুণ বা বৃত্তির বিকাশ হয়। এই কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া দ্বারা বাহ্যবস্তুজ্ঞান দৃঢ়ীভূত হয়।

অতএব ইন্দ্রিয়ের গুণদ্বারা বাহ্যজগতের সহিত আমাদের সম্বন্ধ হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা রূপরসাদি গ্রহণ হেতু এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা তাহার উপর ক্রিয়ার হেতু বাহ্যজগতের সহিত যে সম্বন্ধ হয়, তাহা বাহ্য। ইহা

বাহ্যজগৎকে আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত করে। কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা সেই জগৎকে ত্যাগ বা গ্রহণ ইত্যাদি রূপ কর্ম্মের অধীন করিতে পারা যায় এবং বাহ্যজগতের সহিত সম্বন্ধ দৃঢ়ীভূত হয়। বাহ্য জগৎ যে কাল্পনিক নহে,—সত্য, তাহার ধারণা এইরূপে স্বতঃ সিদ্ধ হয়।

ইন্দ্রিয়গণের এই গুণ বা বৃত্তি হইতে তাহার অন্তরালে কারণরূপে শক্তির ধারণা হয়। কেন না, কারণের অন্তর্ভূত শক্তি ও শক্তির অন্তর্ভূত কার্য্য, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। যেখানে কার্য্য—সেখানে তাহার মূলশক্তি, এবং এই শক্তির আধার যে কারণ আছে, তাহা আমরা সিদ্ধান্ত করি। অতএব যে শক্তিবলে এই ইন্দ্রিয়বৃত্তি এইরূপে কার্য্যকরা হয়, ইন্দ্রিয়গণ যে বাহ্য বস্তু সকল গ্রহণ করিয়া প্রকাশ করে,—বাহ্য জগতের জ্ঞান উৎপাদন করায়, এ শক্তি কোন্ কারণের অন্তর্ভূত? এ শক্তি কাহার? কাহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত? কোথা হইতে এ শক্তি আসিল? কোন্ শক্তি বা কাহার শক্তি এইরূপ ইন্দ্রিয় হইয়া, এবং এই সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইয়া জ্ঞাতার নিকট বাহ্য জ্ঞেয় বিষয় প্রকাশ করে? এই ইন্দ্রিয় ও তাহাদের বৃত্তি না থাকিলে ত বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান বা কর্ম্ম সম্ভব হইত না।

সকল জীবের ইন্দ্রিয় একরূপ। সকল জীবের সর্বেন্দ্রিয়গুণ একরূপ। ইন্দ্রিয় বিকল বা অশক্ত হইলে বা উপযুক্তরূপে বিকাশিত না হওয়ায় বিভিন্ন হইলেও সকল জীবের ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গুণ যে একরূপ, তাহা আমরা বুঝিতে পারি; এবং সকল জীবের ইন্দ্রিয়গুণ দ্বারা যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু একই প্রকার রূপ-রসাদিযুক্ত হইয়া একইরূপে প্রকাশিত হয়, তাহাও দেখিতে পাই। বিজ্ঞান যাহাকে ভৌতিক আকাশের (Ether এর) সূক্ষ্ম তরঙ্গবিশেষের ক্রিয়া বলে, তাহা তোমার আমার সকলের চক্ষু ইন্দ্রিয় সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলেও একই প্রকারে লাল বা নীলবর্ণরূপে প্রতিভাত হয়, তাহা আমরা জানি। এজন্য বাহ্য-

জগৎ তোমার নিকট যেরূপে যে ভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা প্রত্যক্ষ হয়, আমার নিকটও সেইরূপই হয়। সকলের নিকট সমান ভাবেই বাহ্যজগৎ জ্ঞেয়-রূপে জ্ঞানে প্রকাশিত হয়।

কেন এরূপ হয়? ইহার একই উত্তর—সকল জীবের ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-গুণ সেই একই শক্তির কার্য্য, সকল ইন্দ্রিয়ে সেই একই শক্তি নিহিত থাকিয়া একইরূপে কার্য্যকরী হয়। অন্তঃকরণের পার্থক্য হেতু বাহ্য-বস্তু বিভিন্ন ভাবে গৃহীত হয় সত্য, কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ তাহা একই রূপে মনের নিকট প্রকাশ করে। অতএব বলিতে হইবে যে, সেই একই শক্তি বিভিন্ন ভাবে এই সকল ইন্দ্রিয়রূপে, এবং এই সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি বা গুণরূপে বা দর্শন-গ্রহণাদি ব্যাপাররূপে প্রকাশিত হয়। এমন কি, ইহাও বলা যায় যে, সেই শক্তিই ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য রূপরসাদি বিষয়রূপে বাহ্য বস্তুকে আবরিত করিয়া প্রকাশ করে। এই রূপ-রসাদি বাহ্য বস্তুর গুণ, কি আমাদের ইন্দ্রিয়ের গুণ, কিংবা বাহ্য বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন গুণ, তাহা সিদ্ধান্ত করা কঠিন। ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্য বস্তুর সম্বন্ধ হইলে, বা সে সম্বন্ধ স্মরণ হইলে তবে এই রূপ-রসাদি বিষয় আমরা অনুভব করি, ইহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি। সুতরাং রূপরসাদি যে বাহ্য বস্তুর গুণ, তাহা বলিতে পারি না। বরং আকাশোত্থিত তরঙ্গ লাল নীল ইন্দ্রিয়ের গুণসাপেক্ষ, তাহা বলিতে পারা যায়। অতএব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য জগতের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা হয় ত আমরা জানিতে পারি না। ইন্দ্রিয়গণ তাহাকে যে প্রকার রূপ, আকৃতি, বর্ণ, শব্দ প্রভৃতি দিয়া এবং নানারূপ সম্বন্ধযুক্ত করিয়া তাহাকে প্রকাশ করে, সেইরূপেই তাহা আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়, সেইরূপেই আমরা তাহাকে জানিতে পারি, সেইরূপেই তাহা আমার জ্ঞানে 'জ্ঞেয়' হয়। বাহ্য জগৎ এইরূপে ইন্দ্রিয়গুণ দ্বারা রূপরসাদিযুক্ত হইয়া বিষয়রূপে জ্ঞেয় হয়। সেই রূপরসাদি ইন্দ্রিয়-

আরোপিত গুণ বাদ দিলে বাহ্য জগতে কি থাকে, আমরা জানিতে পারি না। শাস্ত্র বলেন, তিনিই 'ব্রহ্ম'—পরম ব্রহ্ম। জগতের এই মায়ার আবরণ দূর করিতে পারিলে, তাহার অন্তরালে এই ব্রহ্মদর্শন হয়। তখন জগৎ সেই ব্রহ্মমধ্যে লীন হইয়া যায়। যাহা হউক, সকল জীবের জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ একই প্রকার বাহ্য জগৎ প্রকাশ করে কেন? ইহার একই উত্তর এই যে, সকল জীবের সকল ইন্দ্রিয় সেই একই মূল শক্তি হইতে উৎপন্ন, সেই একই শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত, সেই একই শক্তি দ্বারা ধৃত, সেই একই শক্তি দ্বারা ক্রিয়াশীল। ইন্দ্রিয়গণ সেই একই শক্তির বিভিন্ন কার্য্যরূপ। সে সকল ইন্দ্রিয়গুণও সেই শক্তিরই কার্য্যরূপ। সেই একই শক্তি একই রূপে বিভিন্ন জীবে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গুণরূপে ব্যক্ত হইয়া কার্য্য করে বলিয়া সকল জীবই কোন একই দ্রব্য প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাতে একই প্রকার রূপ, একই প্রকার রস, একই প্রকার গন্ধ ইত্যাদি অনুভব করিতে পারে। যে বাহ্য বস্তু ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া আমার জ্ঞানে বিশেষ রূপরসাদিযুক্ত 'কমলানেবু' রূপে প্রত্যক্ষ হয়, তোমার জ্ঞানে তাহা সেই একই প্রকার রূপরসাদিযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। এ জন্য বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে আমাদের সকলের প্রতীতি ও ব্যবহার প্রায় একই রূপ হইয়া থাকে। এই জন্য তোমার ও আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ একই। ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য জগৎকে আমাদের সকলের নিকট যেরূপে প্রত্যক্ষ করায়, আমরা সকলে তাহাকে সেইরূপেই গ্রহণ করি। কাহারও ইন্দ্রিয় বিকল, বিকৃত বা অশক্ত না হইলে, ইহার কোন ব্যতিক্রম হয় না।

যে শক্তি দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ উৎপন্ন হইয়া, বাহ্যজগৎকে এই প্রকারে জ্ঞাতার নিকট জ্ঞেয়রূপে প্রকাশ করে, সেই শক্তির যিনি আধার, যিনি সেই শক্তিমান্, তিনিই ব্রহ্মরূপে জ্ঞেয়। যে কারণের অন্তর্ভূত সে শক্তি, সেই কারণকে 'মায়া' বলা হয়, প্রকৃতি বলা হয়, কখন পরাশক্তিও বলা হয়। আর সেই কারণের যিনি কারণ বা আধার, তিনিই ব্রহ্মরূপে

জ্ঞেয়। অতএব সর্ব্বভূতের এই সকল ইন্দ্রিয়রূপে যিনি তাঁহার মায়াখ্য পরাশক্তি দ্বারা প্রকাশিত, সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণরূপে যিনি অভিব্যক্ত, এবং যিনি সেই শক্তি দ্বারা এই ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা ও প্রেরয়িতা, তিনি ব্রহ্মরূপে জ্ঞেয়। এই সর্ব্বেন্দ্রিয় ও তাহাদের গুণ দ্বারা আমরা ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিতে পারি। এই শ্লোকে ইহাই উক্ত হইয়াছে। সর্ব্বত্র সর্ব্বজীবে সর্ব্বেন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-গুণ-বিকাশ যাঁহা হইতে হয়, তিনিই ব্রহ্মরূপে জ্ঞেয়। তিনি স্বীয় মায়া দ্বারা বা পরাশক্তি-বলে সর্ব্বেন্দ্রিয় ও তাহাদের গুণ ও কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত। তিনি তাহাদের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ।

সকল জীবের সকল ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-গুণ ও কর্ম্ম একরূপ। এজন্য সকল ইন্দ্রিয়-প্রকাশক শক্তি এক অনন্ত, তাহা ব্রহ্মশক্তি। প্রতি জীবের ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-গুণ বিভিন্ন হইলে, জীবকেই তাহার ইন্দ্রিয় ও গুণ-বিকাশের কারণ বলা যাইতে পারিত। কিন্তু তাহারা ভিন্ন নহে। তাহারা একরূপ, একই নিয়মবদ্ধ। এজন্য সর্ব্বজীবের সর্ব্বেন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গুণ—একই মূল শক্তির বিকাশজাত। এই এক অনাদি অনন্ত ইন্দ্রিয়-বিকাশশক্তির যিনি আধার, যিনি সেই শক্তিমান্ এবং সেই শক্তিজন্য ইন্দ্রিয়াদিরূপে তাহাদের অন্তরালে বিদ্যমান—তিনিই ব্রহ্মরূপে জ্ঞেয়। তাঁহাকে এই সমুদায় ইন্দ্রিয়রূপ উপাধিযুক্ত ও সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণ-রূপে ভাসমান বলা যায়। তিনিই ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইয়া শব্দাদি বিষয়ের আধার আকাশাদি পঞ্চভূতরূপে এবং এই পাঞ্চভৌতিক স্থূল বাহ্যজগৎরূপে ভাসমান আমাদের জ্ঞানে প্রত্যক্ষ গোচর হন, ইহাও বলা যায়। কিন্তু সে অতি দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব এ স্থলে বিচার্য্য নহে।

আরও এক কথা। বাহ্য-জগৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা আমাদের জ্ঞানে যেরূপে প্রতিভাত হয়, তাহাতে তাহা আমাদের আত্মা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র বোধ হয়। বাহ্যজগৎ স্থূল। তাহা দেশকালে বিস্তৃত, দিক্, কাল ও

নিমিত্ত দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, তাহা জড় ও পরিণামী। আর আমাদের আত্মা চেতন, দেশকালনিমিত্ত দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সূক্ষ্ম, অপরিণামী। আত্মার যদি কোন ধর্ম্ম থাকে, তবে তাহা জড়বর্গের ধর্ম্মের বিপরীত। এইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধধর্ম্মী বস্তুদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ বা সংযোগ কিরূপে সম্ভব? আত্মার স্থানকালে কোন বিস্তৃতি নাই, আত্মা দেশকাল-পরিচ্ছেদশূন্য। আত্মা সূক্ষ্ম। তাহাতে এই স্থূল দেশকালে বিস্তারিত জড়জগতের জ্ঞান কিরূপে হয়? ইহার উত্তর সহজে দেওয়া যায় না। কেহ বলেন,—এই বাহ্য-জগতের সত্তা নাই, ইহা আমাদের আন্তরানুভূতির কারণরূপে বাহ্যভাবে কল্পনা মাত্র। এ জগৎ মনঃকল্পিত। কেহ বলেন,—আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। চৈতন্য-জ্ঞান প্রভৃতি ধর্ম্ম জড়েরই, তাহা পরমাণুবিশেষের বিশেষ সমবায়সংযোগফল মাত্র। কেহ বা অন্যরূপে এই আত্মা ও জড়ের মধ্যে সম্বন্ধস্থাপনা করিতে চেষ্টা করেন। পরন্তু যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারা এই সম্বন্ধ হইতে উভয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া উভয়ের মধ্যে আদি পরমাণুপুঞ্জের নর্ত্তন, অথবা এক আদি মহাশক্তির ক্রীড়া অথবা ভগবানের লীলা দেখিতে পান। আর যাঁহারা তত্ত্বদর্শী, তাঁহারা এই সম্বন্ধমধ্যে, এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সম্বন্ধ ভিতরে পরব্রহ্মের অনন্ত জ্ঞান ও শক্তির বিকাশ বা আভাস দেখিতে পান, এবং ব্রহ্মকে অনুভব করেন। এই ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই এবং এই ব্রহ্মশক্তিদ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয় উপাধিযুক্ত, পরিচ্ছিন্নজ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, এবং এই ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই নির্ম্মল পরিশুদ্ধ জ্ঞানে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়মধ্যে প্রতীয়মান যে ভেদ, তাহা দূর হইয়া উভয়ে একীভূত হইয়া জ্ঞানস্বরূপ সৎ-স্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিভাত হয়।

বলিয়াছি ত, জীবজ্ঞানে প্রথমে এই অন্তঃকরণ ও বহিঃকরণরূপ উপাধিদ্বারা জ্ঞাতা আত্মার সহিত জ্ঞেয় বাহ্য-জগতের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়; এবং এই সকল করণ দ্বারাই সেই বাহ্য-জগতের ব্যাপার আমাদের জ্ঞানে

প্রতিভাত হয়। এই সকল করণ যিনি নিজ পরাশক্তিবলে প্রকাশিত করিয়া দিয়া, বাহ্যজগৎকে আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত করেন, তিনিই সেই সকল করণকে যেরূপ ধর্ম্ম বা শক্তিযুক্ত করেন, যেরূপ ভাবে রূপাদি-গ্রহণশক্তি এই সকল করণে বিকাশিত করেন, তদনুসারে বাহ্যজগৎ রঞ্জিত হইয়া আমাদের জ্ঞেয় হয়। তদনুসারে বাহ্যজগতের রূপাদি বিষয় আমরা গ্রহণ করিয়া তাহাদের ভোগ্য করিয়া লইতে পারি।

এইরূপে বাহ্য-জগৎ আমাদের জ্ঞেয় ও ভোগ্য হইয়া ক্রমশঃ জ্ঞান বিকাশিত হইতে থাকে, বুদ্ধি ক্রমে পরিশুদ্ধ হইতে থাকে; এবং সেই বুদ্ধি-জ্ঞানের ক্রম আপূরণ হেতু জাত্যন্তর-পরিণাম দ্বারা জীবের ক্রমোন্নতি হয়। মানুষে-যখন এই জ্ঞান পূর্ণ বিকাশিত হইয়া চিত্তকে বাহির হইতে অন্তরে লইয়া যায়, আত্ম-চৈতন্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন ইন্দ্রিয়-জয় হয়, অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয়। তখন চিত্তবৃত্তি সমুদায় নিরোধ করিয়া তিনি জ্ঞাতৃস্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন, তিনি সাধনাবলে নির্ম্মল জ্ঞান-স্বরূপে স্থিত হইতে পারেন, তখন তিনি ইন্দ্রিয়াদিরূপ সর্ব্ব-উপাধিশূন্য হইতে পারেন; এবং তখনই তিনি এই জ্ঞেয়ের স্বরূপ অনুভব করেন, তখন 'জ্ঞাতা' ও 'জ্ঞেয়'কে একীভূত করিয়া তিনি এক ভূমা জ্ঞানসাগরে অবস্থান করিতে পারেন, তখন তাঁহার এই ব্রহ্ম-স্বরূপ অনুভব হয়। তখন তিনি জ্ঞেয় জগতের মধ্যে ও আপনার আত্মার মধ্যে ব্রহ্মকে দর্শন করেন। আত্মা এইরূপে অজ্ঞানমুক্ত হইয়া শুদ্ধ জ্ঞান-স্বরূপে স্থিতি লাভ করেন।

সে যাহা হউক, এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি যে, যিনি স্বশক্তিবলে সর্ব্বজীবের মধ্যে ইন্দ্রিয়গণকে বিকাশ করিয়া দিয়া স্বয়ং সেই ইন্দ্রিয়স্বরূপ হইয়া, রূপরসাদিগ্রহণরূপ ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইয়া এইরূপ রসাদি ইন্দ্রিয়দ্বারে গ্রহণ করিয়া সর্ব্বজীবজ্ঞানে বাহ্য-জগতের বিকাশ করেন, যিনি ইন্দ্রিয়-গণকে বহির্ম্মুখ করেন, যাঁহার সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ
তস্মাৎ পরাং পশ্যতি ন অন্তরাত্মা।' (কঠ, ৪।১)।

যিনি এইরূপে ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্বজীবের সহিত বাহ্য-জগতের সম্বন্ধ স্থাপন করেন, তিনি এই জ্ঞেয় ব্রহ্ম।

সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়-বর্জ্জিত (সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিতং)—সাক্ষাৎভাবে আত্মার সহিত করণ বা ইন্দ্রিয় সকলের কোন সম্বন্ধ নাই। আত্মা সর্ব্বকরণ-বিরহিত। সুতরাং আত্মা সর্ব্ব ইন্দ্রিয়-ব্যাপারে ব্যবহারিকভাবে ব্যাপৃতের ন্যায় বোধ হইলেও পারমার্থিকভাবে আত্মার সহিত এই ইন্দ্রিয় সকলের কোন সম্বন্ধ নাই। এইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—

"আত্মা···ধ্যায়তি ইব লেলায়তি ইব।"
বৃহদারণ্যক ৪।৩।৭)।

অর্থাৎ আত্মা বুদ্ধির সহিত একীভূত হইয়া যেন চিন্তা করিতেছেন, বিচলিত হইতেছেন, এইরূপ বোধ হয়। আত্মা যেন 'ধ্যায়তি'—অর্থাং সমুদায় জ্ঞানেন্দ্রিয়-ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতেছেন, এবং 'লেলায়তি—অর্থাং সমুদায় কর্ম্মেন্দ্রিয়ব্যাপারে প্রবর্ত্তিত হইতেছেন, এইরূপ বোধ হয়। বাস্তবিক তাহা নহে।

শ্রুতিতে অন্যত্র আছে—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ॥"
(শ্বেতাশ্বতর, ৩।১৯)

অর্থাৎ তাঁহার হস্ত বা পাদ নাই অথচ তিনি জ্ঞানবান্ এবং গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহার চক্ষু নাই, কিন্তু দেখিয়া থাকেন, তাঁহার কর্ণ নাই, তিনি শ্রবণ করেন। ইহার ভাব এই যে, আত্মাতে যে বাস্তবিক গতি প্রভৃতি ক্রিয়া আছে, তাহা নহে, ক্রিয়াবান্ উপাধির সহিত অধ্যাস হেতু সম্বদ্ধ হয় বলিয়া তাহাকে ক্রিয়াবানের ন্যায় ব্যবহারিক জগতে

প্রতীয়মান হইতে হয়। "অন্ধ মণি দেখিতেছে" বলিলে 'অন্ধ যে মণি দেখিতেছে' বুঝিতে হয় ; সেইরূপ ব্রহ্ম 'সর্ব্বেন্দ্রিয়হীন অথচ সর্ব্বেন্দ্রিয়যুক্ত ও সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণযুক্ত বলিলে সেইরূপ বুঝিতে হয়। উক্ত শ্রুতিমন্ত্রের অর্থও এইভাবে গ্রাহ্য (শঙ্কর)।

সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত অর্থে ইন্দ্রিয়বৃত্তি বিনাও তিনি সমুদায় জানিতে পারেন, (রামানুজ)।

ব্রহ্ম সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত; ইহার অর্থ কি, তাহা পূর্ব্বশ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে, এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ব্রহ্ম নির্গুণ নিরুপাধিক ভাবেই সর্ব্বেন্দ্রিয়বর্জ্জিত, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। শঙ্কর এই অর্থেই বলিয়াছেন যে, সোপাধিকভাবে ব্রহ্ম সর্ব্বতঃ পাণিপাদ মুখ শির চক্ষু শ্রোত্র ইত্যাদি যুক্তরূপে প্রতীয়মান হইলেও, নিরুপাধিকভাবে তিনি এ সকল ইন্দ্রিয়বিরহিত। রামানুজ এইরূপ সোপাধিক ও নিরুপাধিক ভাবের প্রভেদ করেন নাই। তিনি অর্থ করেন যে, ব্রহ্মের চক্ষু নাই অথচ তিনি দেখিতে পান, কর্ণ নাই অথচ তিনি শুনিতে পান ইত্যাদি। এ অর্থও শ্রুতিসঙ্গত। "পশ্যতি অচক্ষুঃ, শৃণোতি অকর্ণঃ" এই যে শ্রুতি শঙ্কর উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে এই অর্থ প্রতীতি হয়। কিন্তু ঐ শ্রুতি পরমপুরুষ সম্বন্ধে প্রযোজ্য :—

"তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্"—উক্ত মন্ত্রে এই কথা উক্ত হইয়াছে। অতএব যিনি পরমেশ্বর পরমপুরুষ, তাঁহার সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে যে, তিনি চক্ষু না থাকিলেও দেখেন, কর্ণ না থাকিলেও শুনেন, অর্থাৎ তাঁহার কোন ইন্দ্রিয় না থাকিলেও সর্ব্বেন্দ্রিয়-ব্যাপার তিনি নির্ব্বাহ করেন। তাঁহার কোন জ্ঞানেন্দ্রিয় না থাকিলেও তিনি সর্ব্বজ্ঞ, এবং কোন কর্ম্মেন্দ্রিয় না থাকিলেও সর্ব্বকর্ত্তা।

"তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজম্।" (পাতঞ্জল দর্শন, ১।২৫)।

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্।" (মুণ্ডক, ১।১।৯)।

আত্মার ইন্দ্রিয় না থাকিলেও যে ইন্দ্রিয়গুণের আভাস থাকিতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। যোগবলে যোগদৃষ্টি (Clairvoyance) দ্বারা যোগী অতিদূরস্থ ব্যাপারও দেখিতে পান, ঋষিগণ ত্রিকালদর্শী হন। সেইরূপ যোগী অতি দূরের শব্দ কর্ণ দ্বারা না শুনিয়াও শুনিতে পান (Clairvoyance)। এই যোগ দর্শন ও শ্রবণ জন্য চক্ষু বা কর্ণেন্দ্রিয়ের সাহায্য আবশ্যক করে না। অন্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও এই কথা। ইন্দ্রিয়-সাহায্য ব্যতীত যখন আমাদের পক্ষেই এইরূপ দর্শনাদি সম্ভব হয়, আমরা যখন নিদ্রার বিশেষ অবস্থায় (Somnambulism) মুদ্রিত চক্ষে বাহ্য বিষয় স্পষ্ট দেখিতে পাই, তখন পরমেশ্বর যে সর্ব্বেন্দ্রিয়বর্জ্জিত হইয়াও সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। আত্মস্বরূপে যোগবলে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বচিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়াও আমরা যাহা পারি, সর্ব্বাত্মস্বরূপ পরমেশ্বর যে তাহা পারেন না, তাহা কখন বলিতে পারা যায় না। সাধারণতঃ আমাদের ইন্দ্রিয়-সাহায্যেই প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু সে প্রত্যক্ষ যোগজ প্রত্যক্ষ ও ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ হইতে ভিন্ন।

অতএব পরমপুরুষ পরমেশ্বর সম্বন্ধে "পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" এই মন্ত্রের অর্থ আমরা বুঝিতে পারি। তিনি প্রতি জীবের অন্তরে অন্তর্যামিরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আমাদের সকলকে দর্শন-গমনাদি কর্ম্মে নিয়োজিত করেন, আমাদের দ্বারা এই সকল কর্ম্ম সম্পাদন করান, এবং আমাদের দর্শন দ্বারা তিনিও দর্শন করেন, আমাদের গমনের দ্বারা তিনিও গমন করেন, এ কথা আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু গীতায় এ স্থলে যে পরমব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে যে এ ভাবে এ কথা প্রযোজ্য হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহার জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-ভেদ নাই। এজন্য নিরুপাধিক ব্রহ্মকে জ্ঞাতা বলা যায় না, সর্ব্বজ্ঞ বলা যায় না। এরূপ সর্ব্বজ্ঞ হইতে হইলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়মধ্যে ভেদ-স্থাপন করিয়া সর্ব্বজ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞাতা হইতে হয়। অতএব এই সর্ব্বজ্ঞত্ব—নিরু-

পাধিক ব্রহ্মের নহে, ইহা সোপাধিক সগুণ ব্রহ্মের পরমেশ্বরভাবের শক্তি। অতএব এ স্থলে অর্থ—পরব্রহ্ম নিরুপাধিক, নির্গুণ ভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত, আর সোপাধিক ভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয় ও সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণ-যুক্ত। ইহা আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। অতএব এ স্থলে শঙ্করের অর্থই গ্রাহ্য।

এই ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের সহিত পরমেশ্বরের সম্বন্ধ বিষয়ে অনেক শ্রুতি আছে। পূর্ব্বে তাহার কতক উদ্ধৃত হইয়াছে। এ স্থলে আরও দুই একটি শ্রুতি মাত্র উদ্ধৃত হইল।

"শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং, মনসো মনো, যৎ বাচো হ বাচং স উ
প্রাণস্য প্রাণঃ, চক্ষুষশ্চক্ষুঃ··· ।" (কেন ২)

"ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ।" (কেন ৩)

"যৎ বাচানভ্যুদিতং যেন বাক্ অভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি······॥ (কেন ৪)

যন্মনসা ন মনুতে, যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি···॥ (কেন, ৫)

যৎ চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি···॥ (কেন, ৬)।

যৎ শ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রম্ ইদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি...॥ (কেন ৭)

"যঃ বাচি···চক্ষুষি···শ্রোত্রে···মনসি...ত্বচি...বিজ্ঞানে...রেতসি··· তিষ্ঠন (এতেষাম্·· অন্তরং, যস্য···(এতে) শরীরং, যঃ (এতান্...অন্তরো যময়তি এষ ত আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ।" (বৃহদারণ্যক, ৩।৭।১৭-২২)

"যঃ অদৃষ্টো দ্রষ্টা, অশ্রুতঃ শ্রোতা, অমতো মন্ত', অবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা, নান্যতোঽস্তি দ্রষ্টা, নান্যতোঽস্তি শ্রোতা, নান্যতোঽস্তি মন্তা, নান্যতোঽস্তি বিজ্ঞাতা, এষ ত আত্মা... ।" (বৃহদারণ্যক, ৩.৭।২৩)।

ব্রহ্মের অন্তর্যামী পরমাত্মস্বরূপ সম্বন্ধে এই সকল শ্রুতি উক্ত হইয়াছে। তিনিই সর্ব্বজীবের সকল চক্ষু দ্বারা দর্শন করেন, সকল শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ করেন, সকল মনের দ্বারা মনন করেন, সকলের বিজ্ঞান দ্বারা বিজ্ঞাতা হন। তিনি সকলের অন্তরে অবস্থিত, সকলের অন্তর্যামী, সকল জীবের শরীর, সমুদায় জগৎরূপ শরীর যাঁহার শরীর, যিনি সর্ব্বান্তরাত্মা, কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না; জানিতে পারে না। ইহা ব্রহ্মের সোপাধিক স্বরূপ। নিরুপাধিক প্রপঞ্চাতীতরূপে তিনি এ সকলের অতীত।

অসক্ত হইয়া সর্ব্বভর্ত্তা।—"সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম সর্ব্বকরণবর্জ্জিত বলিয়া অসক্ত—অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার সংশ্লেষরূপে সংযোগ-বিরহিত। যদিও ব্রহ্ম সর্ব্বসঙ্গবর্জ্জিত, তথাপি তিনি সকল পদার্থের একমাত্র আশ্রয়, তিনি সকল বস্তুকে ধারণ করিয়া আছেন। এ জগতের সকল বস্তু সেই 'সৎ'কে বা ব্রহ্মসত্তাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। কারণ, সকল বুদ্ধির সহিত সৎবুদ্ধি সর্ব্বদা অনুগত আছে। মৃগতৃষ্ণিকা 'অসৎ' হইলেও একেবারে অসৎ বুদ্ধির বিষয় নহে, তাহাতেও সৎবুদ্ধি অনুগত থাকে। সত্তাহীন কোন বস্তুই ধারণা করা যায় না। সুতরাং সৎস্বরূপ ব্রহ্ম বা আত্মা, সকল বস্তুই ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। এজন্য ব্রহ্ম সর্ব্বভৃৎ। (শঙ্কর)।*

* বলা যাইতে পারে যে, যে হেতু, ব্রহ্ম সর্ব্বভৃৎ এ জন্য এ জগৎ যে সত্তাযুক্ত, বাস্তব তাহা প্রমাণিত হয়। আমি বহু হইব—ব্রহ্মের এই ঈক্ষা বা সংকল্প হইতে যে 'বহুর' কল্পনা নামরূপ দ্বারা ব্যাকৃত হইয়া এ জগতের সৃষ্টি হয়, ব্রহ্ম তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হন বলিয়া তাহা তাঁহার সত্তায় সত্তাযুক্ত হয়। জগতে যখন যেখানে যে বস্তু আমাদের প্রত্যক্ষ হয়, এই ব্রহ্মসত্তা হেতু তাহা সত্তাযুক্ত ভাবে আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়, এই জন্য ব্রহ্মকে সর্ব্বভৃৎ বলা যায়; এজন্য বলিতে হয় যে, এই ব্রহ্মকল্পিত জগৎ ব্রহ্মসত্তায় সত্তাযুক্ত হইয়া আমাদের জ্ঞেয় হয়। তাহা অলীক স্বপ্নময় নহে। এই ব্রহ্মজ্ঞান (absolute Reason ও absolute power) সম্বন্ধেই thought is being বলা যায়। আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও শক্তিহেতু আমাদের কল্পনা কদাচিৎ সত্তাযুক্ত (realised) হইতে পারে।

সর্ব্বসঙ্গরহিত হইয়াও তিনি সর্ব্বাধিষ্ঠান, তিনি নিজ সত্তামাত্র দ্বারা কেবল অধিষ্ঠান হইতেই সকলকে পোষণ করেন (গিরি)। স্বভাবতঃ ব্রহ্ম দেহাদিসঙ্গরহিত, অথচ তিনি দেবাদি-দেহ-ভরণ-সমর্থ (রামানুজ) "সঃ একধা ভবতি দ্বিধা ভবতি ত্রিধা ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতিঃ (ছান্দোগ্য ৭।২৬।২)। ব্রহ্ম সঙ্গশূন্য, তথাপি সকলের আধারভূত (স্বামী)। ব্রহ্ম পরমার্থতঃ অসক্ত বা সর্ব্বসম্বন্ধশূন্য অথচ মায়া দ্বারা তিনি সকলের ভরণকারী বা ধারয়িতা। সদাত্মা দ্বারা সমুদায় কল্পিত জগৎ ধারণ করেন, পোষণ করেন। মায়া হেতু সর্ব্বভূত তাঁহাতে অধিষ্ঠিত—ইহা ভ্রম হয়, বাস্তবিক তাহা নহে, (মধু)। ব্রহ্ম সর্ব্বতত্ত্বধারক হইয়াও অসক্ত। কেবল সংকল্প দ্বারা ধারণ করেন, অথচ তাহার স্পর্শ রহিত। (বলদেব)।

গীতায় অসক্ত হইয়া নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবার ও পরহিতার্থ কর্ম্ম করিবার উপদেশ আছে। যথা—

"অসক্তঃ স বিশিষ্যতে।" ৩।৭

"কর্ম্ম...মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।" ৩।৯

"তস্মাৎ অসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।" ৩।১৯

"কুর্য্যাৎ বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্। ৩।২৫

মানুষ এইরূপে অসক্ত হইয়া কার্য্য কর্ম্ম করিতে পারে। ভগবান্‌ও বলিয়াছেন, তিনি অসক্ত হইয়া কর্ম্ম করেন, তাঁহার জন্মও দিব্য—অলৌকিক। যথা—

"ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু॥" ৯।৯

অতএব ভগবান্ স্বপ্রকৃতিতে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক জগতের সৃষ্টিস্থিতি, রক্ষা ও লয় কার্য্য করেন, অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মরক্ষা ও অধর্ম্মবিনাশ কর্ম্ম করেন, অথচ সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে অসক্তভাবে অবস্থান করেন। ব্রহ্ম অসক্ত;

হইয়াও সর্ব্বভৃৎ—সর্ব্বধারণকর্ত্তা হন। সগুণ ঈশ্বররূপে ব্রহ্ম এইরূপ অসক্ত হইয়া সর্ব্বভৃৎ হন, ইহা বলা যাইতে পারে।

কিন্তু এ স্থলে আরও এক অর্থ হইতে পারে। ভগবান্ অসক্ত হইয়াও কেন কর্ম্ম করেন, কেন লোক রক্ষা করেন, তাহা তিনিই বলিয়াছেন—

"ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি।
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।"

(গীতা ৩।২২-২৪)

অতএব ভগবান্ কিরূপে অসক্ত হইয়া 'কর্ম্ম' দ্বারা সর্ব্বভৃৎ হন, তাহা এস্থলে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। কিন্তু পরমব্রহ্ম কিরূপে অসক্ত হইয়া সর্ব্বভৃৎ-রূপে জ্ঞেয়, তাহা ইহা হইতে বুঝা যায় না। পরমব্রহ্ম অনন্ত জ্ঞানরূপ ও মায়াখ্যা পরাশক্তির আধার। এই অনন্ত জ্ঞান ও শক্তিস্বরূপে স্বভাবতঃই জগতের সৃষ্টি স্থিতি-লয় নিত্য তাঁহার স্থান-কাল-রূপ আধারে প্রকাশিত হয়। ইহাতে সেই অনন্ত জ্ঞানস্বরূপের কোন প্রচ্যুতি হয় না। সান্ত জগৎ সে অনন্ত জ্ঞানে কোন বিক্ষোভ উৎপাদন করে না। তাঁহার প্রপঞ্চাতীত নির্ব্বিশেষ ভাবের কোন ব্যত্যয় হয় না। সেই অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপে তিনি অসঙ্গ। এ কথা আমাদের জ্ঞানের ক্রিয়া হইতেও বুঝা যাইতে পারে। আমাদের অনেক কর্ম্ম আছে, যাহা স্বাভাবিক, অনায়াস-সাধ্য। ইংরাজীতে তাহাকে Instinctive কর্ম্ম বলে। সে কর্ম্ম সম্পাদন জন্য জ্ঞানের কোন চেষ্টা বা আয়াস করিতে হয় না। জ্ঞানকে তাহার কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য স্থির করিতে হয় না, তাহা কি উপায়ে সম্পাদন করিতে হইবে, তাহা বিচারপূর্ব্বক স্থির করিতে হয় না। তাহা unconscious cerebration হইতে কৃত হয়। অনেক কর্ম্ম প্রথমে

আয়াসসাধ্য থাকে, তাহা সম্পাদন জন্য অনেক চেষ্টা করিতে হয়। পরে অভ্যাসের ফলে তাহা সহজ হইয়া যায়। আর তাহার জন্য আমাদের জ্ঞান বা বুদ্ধির কোন চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। 'ক' অক্ষর লেখা অভ্যাস করিতে বালকের কত যত্ন কত আয়াসের প্রয়োজন হয়। পরে 'ক' লিখিতে আর কোন ভাবনা হয় না।

এইরূপ অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ ও শক্তিস্বরূপ ব্রহ্মে যে জগৎ-সৃষ্টি-রক্ষাদি কর্ম্ম বিবর্ত্তিত হয়, তাহা তাঁহার স্বাভাবিক। তাহার জন্য ব্রহ্মের কোন আয়াসের প্রয়োজন হয় না, কোন বিচার বা চিন্তা করিতে হয় না। সে জ্ঞানে জগৎ কল্পনা স্বাভাবিক—স্বতঃসিদ্ধ; এবং সে কল্পনাকে সৎরূপে বিবর্ত্তিত করাও তাহার স্বভাবসিদ্ধ। আমরা কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিতে গেলে, প্রথমে তাহা কিরূপে ও কি উপায়ে করিতে হইবে, তাহা ভাবিয়া স্থির করিয়া লই। আমাদের জ্ঞান ও শক্তি সীমাবদ্ধ বলিয়া এরূপ হয়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান—অনন্ত, অপরিচ্ছিন্ন। সে জ্ঞানে এ জগৎ-সৃষ্টি-রক্ষা কর্ম্ম জন্য সেই অনন্ত জ্ঞানের কোন ক্রিয়া হয় না, জ্ঞানের ক্রিয়া না হইলে, তাহার বিচলন না হইলে, তাহার স্বরূপ আমরা বুঝিতে পারি না সত্য, কিন্তু আমাদের জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ অনুমেয় নহে। আমাদের জ্ঞান এইরূপ ক্রিয়াশীল হইলে, তাহা চেতনাযুক্ত—conscious হয়। জ্ঞান ক্রিয়াবস্থায় না আসিলে তাহা unconscious থাকে। ব্রহ্মজ্ঞান—আমাদের জ্ঞানের ন্যায় concious নহে। জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন না হইলে—দেশকালাদি সীমাবদ্ধ না হইলে, তাহা unconscious হয় না। এজন্য ব্রহ্মজ্ঞান—unconcious। * চেতনা ক্ষেত্রের ধর্ম্ম, চেতনাযুক্ত জ্ঞান বুদ্ধিরই অবস্থাবিশেষ। তাহাও ক্ষেত্রের ধর্ম্ম (গীতা, ১৩,৫-৬)। এই চেতনাযুক্ত জ্ঞান ক্ষেত্রজ্ঞের ধর্ম্ম নহে, সুতরাং তাহা জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের ধর্ম্ম

---

* 'যাঁহারা এই তত্ত্ব বিশেষরূপে বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা জর্ম্মান দার্শনিক Hatan কৃত The Philosophy of the unconcious' পুস্তক পাঠ করিবেন।

হইতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞানে যে কল্পনা বা ঈক্ষণ হইতে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হয়, সে কল্পনা (Idea) ও চেতনাযুক্ত নহে। তাহা unconscious। জ্ঞানের চেতনাযুক্ত অবস্থায় (conscious অবস্থায়) তাহাতে 'সঙ্গ' সম্ভব হয়। যে জ্ঞান ক্রিয়াশীল নহে বা চেতনাযুক্ত নহে (যাহা unconcious), যাহা আমাদের নিদ্রাবস্থার কতক অনুরূপ; তাহাতে কোনরূপ 'সঙ্গ' সম্ভব হয় না।* যে কর্ম্ম স্বাভাবিকভাবে আপনা আপনি সম্পাদিত হয়, তাহাতে কাহারও প্রয়োজন অপ্রয়োজন বোধ থাকে। নিশ্বাস-প্রশ্বাসাদি প্রাণনকর্ম্মে আমাদের কোন প্রয়োজনবোধ নাই, তাহাতে কোন আসক্তিও নাই।

এইরূপে ব্রহ্ম সর্ব্বভৃৎ হইয়া—সমস্ত জগদ্‌ব্যাপার-নির্ব্বাহক হইয়াও 'অসক্ত।' ব্রহ্মশক্তি অনন্ত আধারে স্থিত হইয়া স্বতঃই কার্য্যকরী হয়। সেই অনন্ত জ্ঞানে অবস্থিতি হেতু সে শক্তির কার্য্যাবস্থায় পরিণতিতে কোন ভুলভ্রান্তি নাই, কোথাও কোন ইতস্ততভাব নাই, কোথাও বিচার-বিতর্ক পূর্ব্বক জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হইতে হয় না। তাহা অভ্রান্ত। তাহা আমাদের আসক্তিযুক্ত সীমাবদ্ধ চেতনাযুক্ত (consious) জ্ঞানে পরিচালিত কর্ম্মের ন্যায় সীমাবদ্ধ, ভ্রমপূর্ণ বা খণ্ডিত নহে। ব্রহ্মশক্তি জগদ্রূপ কার্য্যবিকাশ হেতু সেই অনন্ত প্রজ্ঞা অপ্রজ্ঞার অতীত (unconcious) জ্ঞান স্বরূপে কোন বিচলন বা প্রচ্যুতি হয় না। যেখানে জ্ঞানের ক্রিয়া নাই, নিদ্রা বা তুরীয় অবস্থার ন্যায় জ্ঞান যেখানে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-রূপে পৃথক্ হইয়া প্রকাশিত না হয়, সেখানে জ্ঞাতার জ্ঞেয় বস্তু ভোগের জন্য কিছুমাত্র আসক্তি আসিতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানে কোন আসক্তি থাকিতে পারে না।

গুণভোক্তা নির্গুণ হইয়া (নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ)—ব্রহ্ম নির্গুণ

---

* "সমাধিসুষুপ্তিমোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা "সাংখ্যদর্শন।"

অথচ গুণভোক্তৃরূপে জ্ঞেয়। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণ। ব্রহ্ম এই গুণত্রয়-বিরহিত। তথাপি ব্রহ্ম গুণভোক্তা। অর্থাৎ শব্দস্পর্শাদি বিষয় দ্বারা সুখ-দুঃখ-মোহরূপে পরিণত এই সত্ত্ব রজঃ তম—ত্রিগুণের ভোক্তা আত্মারূপে অথবা তাহার উপলব্ধা বা প্রকাশয়িতারূপে জ্ঞেয়, (শঙ্কর)। নির্গুণ অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণ-রহিত, অথচ সত্ত্বাদি গুণের ভোগ-সমর্থ (রামানুজ)। গুণভোক্তা অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণের পালক (স্বামী)। পরমার্থতঃ ব্রহ্ম নির্গুণ বা সত্ত্বরজস্তমোগুণরহিত ও শব্দাদি বিষয় দ্বারা সুখ-দুঃখ-মোহাকারে পরিণত ত্রিগুণের ভোক্তা বা উপলব্ধা (মধু)। নির্গুণ—শ্রুতিতে আছে, "সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।" (শ্বেতাশ্বতর, ৬।১১)। নির্গুণ, অথচ মায়াগুণ দ্বারা অস্পৃষ্ট। গুণভোক্তা, অর্থাৎ সদ্‌গুণ-ভোক্তা (বলদেব)।

ব্রহ্ম যে গুণভোক্তা, সে সম্বন্ধে শ্রুতি এই—

"যচ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ
পচ্যাংশ্চ সর্ব্বান্ পরিণাময়েৎ যঃ।
সর্ব্বমেতদ্বিশ্বং অধিতিষ্ঠত্যেকো
গুণাংশ্চ সর্ব্বান্ বিনিযোজয়েৎ যঃ॥

*　*　*　*

গুণান্বয়ো যঃ ফলকর্ম্মকর্ত্তা
কৃতস্য তস্যৈব স চোপভোক্তা।
স বিশ্বরূপস্ত্রিগুণস্ত্রিবর্ত্মা
প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্ম্মভিঃ॥"

(শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৫।৫,৭)।

অতএব ব্রহ্ম গুণ সকলকে—এই প্রকৃতির ত্রিগুণকে স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত করেন, তিনি এই ত্রিগুণের সহিত অন্বিত বা যুক্ত হইয়া ফলবৎ (অর্থাৎ সুখ-দুঃখাদি ফলবৎ) কর্ম্ম করেন, এবং সেই কর্ম্মের

ফলভোগ করেন, তিনি বিশ্বরূপ, ত্রিগুণ, ত্রিবর্ত্ম, (ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এবং জ্ঞান-রূপ মার্গে বিচরণকারী) হইয়া প্রাণের অধিপতি হইয়া স্বকর্ম্মরূপে সঞ্চরণ করেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ব্রহ্ম জীবাত্মরূপে এবং জীবাত্মা হিরণ্যগর্ভরূপে এই প্রকারে গুণভোক্তা হন। নির্গুণ ব্রহ্ম গুণভোক্তা-রূপে সগুণভাবে জ্ঞেয় হন।

ব্রহ্ম নির্গুণ, নির্গুণরূপে তাঁহাতে কোন ভোক্তৃত্ব সম্ভব হয় না। প্রকৃতির ত্রিগুণ হইতে সুখ—দুঃখ-মোহাত্মক ভোগ হয়। ব্রহ্মে যে পরমা মায়াশক্তি আছে—যাহা হইতে প্রকৃতিতে সত্ত্বঃ রজঃ ও তমঃ এই ত্রিভাবের বিকাশ হয়,সেই প্রকৃতি ব্রহ্মে স্থিত। ব্রহ্ম এই সত্ত্ব,রজঃ তমোযুক্ত প্রকৃতির আধার বলিয়া, সেই প্রকৃতির গুণক্রিয়া হইতে যে সুখ-দুঃখাদি-ভোগ উপস্থিত হয়, তাহা ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ব্রহ্মে আরোপিত হয়। অনন্ত জ্ঞান ও শক্তিস্বরূপ ব্রহ্ম আধারে প্রকৃতির ক্রিয়া হইতে এই ভোক্তৃ-ভাব বিকাশ হইলেও সেই অনন্ত ব্রহ্মজ্ঞানে কোন প্রচ্যুতি হয় না। এই জগৎসম্বন্ধ হেতু জগৎকারণ ব্রহ্মে ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরয়িতা ভাব হয়, তাহা পরে উক্ত হইয়াছে। জীবাত্মা—

"আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ।"

(কঠ, ৩।৪)

আত্মাই ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত হইয়া ভোক্তা হয় বা প্রকৃতিবদ্ধ হইয়া অজ্ঞান-বশে প্রকৃতির সুখ-দুঃখ-মোহাদি ভোগ করে। ব্রহ্ম সেরূপ গুণ-ভোক্তৃভাবে জ্ঞেয় নহেন। জীবাত্মাই সেইরূপ গুণভোক্তা ভাবে জ্ঞেয়। তবে ব্রহ্মের ফলভোক্তৃত্ব কিরূপ? যে কারণে সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত ব্রহ্ম সর্ব্বতঃ পাণিপাদাদি সর্ব্বেন্দ্রিয়যুক্ত, এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়-গুণাভাসযুক্তরূপে জ্ঞেয় হন, সেই কারণে তিনি নির্গুণ হইয়াও গুণ-ভোক্তৃরূপে জ্ঞেয়। সাগরে ফেন-তরঙ্গ-বরফস্তূপ আদি ভাসমান থাকিলে, সাগর সেই ফেন-তরঙ্গ-হীন হইয়াও ফেন-তরঙ্গ দ্বারা জ্ঞেয় হয়।

ব্রহ্মও সেইরূপ প্রকৃতিজ গুণ ও গুণফলভোক্তৃরূপে জ্ঞেয় হন। গুণ ও গুণক্রিয়া হেতু জ্ঞান ব্রহ্ম আধারে প্রকাশমান বলিয়া তাঁহাকে সর্ব্ব গুণভোক্তৃরূপে প্রতীয়মান করা হয়। এই প্রকৃতিজ গুণভোক্ত ব্রহ্ম কারণ হইতে প্রবর্ত্তিত হইলেও ব্রহ্মজ্ঞান তাহাতে বিক্ষুব্ধ হয় না। ব্রহ্ম নির্গুণ, অসক্তই থাকেন। তাঁহাতে অজ্ঞানের কোন ক্রিয়া বা আবরণ নাই। অবশ্য প্রত্যগাত্মার স্বরূপ অনুভব হইতে পরমাত্মা পরব্রহ্ম সম্বন্ধে এই জ্ঞান হয়। এই 'একাত্মপ্রত্যয়' হইতে পরিলব্ধ জ্ঞানে ব্রহ্ম নির্ম্মল অথচ গুণভোক্তৃরূপে জ্ঞেয় হন।

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৫

সর্ব্বভূতদের তিনি বাহির অন্তর,
তিনিই চর তিনিই অচর; অবিজ্ঞেয়—
সূক্ষ্ম হেতু, তিনি দূরে তিনিই নিকটে। ১৫

১৫। সর্ব্বভূতদের তিনি বাহির অন্তর (বহিরন্তশ্চ ভূতানাং)—অমানিত্বাদিরূপ নির্ম্মল জ্ঞানে আত্মরূপ অনুভূতির সহিত ব্রহ্ম কিরূপে জ্ঞেয় হন, তাহা পূর্ব্বে দুই শ্লোকে যেরূপে উক্ত হইয়াছে; এস্থলেও তাহা সেইরূপে উক্ত হইতেছে। আমাদের অজ্ঞানজড়িত জ্ঞানে ত্বক্ পর্য্যন্ত দেহকে অবিচার কল্পনায় আত্মা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সেই দেহকে অপেক্ষা করিয়া তাহাকে অবধিস্বরূপ ধরিয়া তাহার মধ্যে আত্মার প্রতীতি হয়, আর নির্ম্মল জ্ঞানে আত্মাকে দেহ দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, দেহের অন্তরে ও দেহের বাহিরে সর্ব্বগতরূপে ব্রহ্মরূপে জ্ঞেয় হয়। আত্মভাবে প্রতীয়মান দেহের অন্তরে ও বাহিরে ব্রহ্ম অবস্থিত। এ স্থলে প্রত্যগাত্মাকে অপেক্ষা করিয়া সেই

দেহকে অবধি ধরিয়া 'অন্তর' ও 'বহিঃ'শব্দ এ স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে (শঙ্কর)। বাহিরে অর্থাৎ সমুদায় বাহ্য বিষয়াদিস্বরূপে বিষয়াত্মক হইয়া আর অন্তরে (অন্তঃ) বা সর্ব্বভূতমধ্যে প্রত্যগাত্মরূপে। আর বাহ্য বিষয় ও প্রত্যগাত্মা উভয়ের মধ্যে নানাবিধ দেহরূপে ভাসমান। (গিরি)। ব্রহ্ম পৃথিব্যাদি ভূত সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর হইতে বাহিরে, এবং তাহার অন্তরে অবস্থান করেন। 'ব্রহ্ম ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা পানৈর্বা' ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধ (ছান্দোগ্য, ৮।১২।৩)। স্বচ্ছন্দ বৃত্তিতে বিচরণ করেন (রামানুজ)।

স্বকার্য্য চরাচর ভূতগণের বাহির ও অন্তর। কটক-কুণ্ডলাদির সুবর্ণই যেমন কারণরূপে তাহার বাহির অন্তর, জলতরঙ্গের যেমন জল অন্তর ও বাহির, সেইরূপ ব্রহ্ম চরাচর সর্ব্বভূতের অন্তর ও বাহির (স্বামী)। ভবন বা উৎপত্তিধর্ম্মযুক্ত যাহারা, তাহারা ভূত; কল্পিত সমুদায় ভূত; কার্য্যের ব্রহ্মই অকল্পিত একমাত্র অধিষ্ঠান। একা তিনিই সকলের অন্তরে বাহিরে স্থিত। সর্পভ্রম যেমন রজ্জুকে অবলম্বন করিয়া স্থিত, সেইরূপ এই মায়াকল্পিত সর্ব্বভূত সেই ব্রহ্ম আধারে স্থিত। তিনি সর্ব্বাত্মস্বরূপে সর্ব্বব্যাপক (মধু)। চিৎ-জড়াত্মক সমুদায় তত্ত্বের বাহ্যে ও অন্তরে স্থিত, নারায়ণ সেই সমুদায় ব্যাপিয়া অবস্থিত (বলদেব)। ভূতগণের শরীরের মধ্যে ও শরীর হইতে বাহিরে স্থিত (হনু)। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"তৎ অন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।" (ঈশ উপনিষদ্ ৫)। ভগবান্ যে সর্ব্বভূতের অন্তরে বাহিরে অবস্থিত, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছেন। গীতায় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃৎ নচ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥" ৯।৪-৫।

ভগবানের যাহা অব্যক্ত মূর্ত্তি—তাহা সগুণ ব্রহ্মরূপ। সেইরূপে তিনি সর্ব্বজগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত। এজন্য সর্ব্বভূত ভগবানের অন্তরে অবস্থিত। ভূত—ব্যাপ্য আর ভগবানের এই অব্যক্ত মূর্ত্তি—ব্যাপক। এই ব্যাপকরূপে তিনি যেমন জগতের সহিত—সর্ব্বভূতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত এবং সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থিত, সেইরূপ জগদতীত অব্যক্ত হইতেও অব্যক্তরূপে তিনি জীবগণমধ্যে জগৎমধ্যে অবস্থিত নহেন। ব্রহ্ম পরমেশ্বররূপে 'ঐশ্বরীয়' যোগবলে ভূতভর্ত্তা ও ভূতস্থ এবং আত্মস্বরূপে ভূতভাবন হইলেও নির্গুণরূপে জগদতীতরূপে তাঁহার মধ্যে ভূতগণ অবস্থান করে না। এই কথার অর্থ আমরা উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। ভগবান্ এই তত্ত্ব পরবর্ত্তী শ্লোকে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছেন—

"যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥" ৯।৬।

আকাশরূপ ব্যাপক আধারে যেমন সর্ব্বত্রগামী মহান্ বায়ু নিত্য আধেয়রূপে ব্যাপ্য ভাবে অবস্থিত, সর্ব্বভূতও সেইরূপ ব্রহ্মে অবস্থিত। আকাশের মধ্যে বায়ু অবস্থিত হইলেও আকাশ বায়ুর সহিত সংশ্লিষ্ট নহে। সর্ব্বভূতের সহিত ব্রহ্মও সেইরূপ সংশ্লিষ্ট নহে। আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের কথায় বলিতে পারি যে, ইথর (Ether) বা আকাশভূত যেমন সমুদায় স্থূলজড় (ponderable matter) ভৌতিক পদার্থের অন্তরে ও বাহিরে অসংশ্লিষ্টভাবে অবস্থিত এই আকাশের কারণ, আত্মাও সেইরূপ সর্ব্বভূতের অন্তরে বাহিরে অবস্থিত।

শ্রুতিতে আছে,—

"তৎ অন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।"

(ঈশ উপনিষদ, ৫)।

অন্যত্র আছে,—

"স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।" (মুণ্ডক উপনিষদ, ২।১।২)।

ভগবান্ যেরূপ সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত, ব্রহ্মও সেইরূপ সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত বটে। কিন্তু আরও কিছু বিশেষ আছে। ব্রহ্ম নির্গুণ নিরুপাধিকরূপে প্রপঞ্চাতীত জগতের বাহিরে অবস্থিত। সগুণরূপে তিনি জগতের আধার ; জগতে সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট। এই সগুণরূপে ব্রহ্ম সর্ব্বভূতের—জীবজড়ময় সমুদায় জগতের অন্তরে বাহিরে অবস্থিত। তিনি পরমেশ্বররূপে ঐশ্বরীয় যোগপ্রভাবে সকলের নিয়ন্তা হইয়া সর্ব্বান্তর্যামিরূপে সর্ব্বভূতময় জগতের অন্তরে অবস্থিত। সর্ব্বাত্মরূপে সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত, অথচ তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থিত নহেন। সর্ব্বকারণরূপে সর্ব্বাধাররূপে তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে বাহিরে অবস্থিত। ব্রহ্মই জগতের সৎকারণ। সর্ব্বভূত তাঁহাতে কল্পিত হইলেও তিনি সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত বলিয়া সর্ব্বভূতের চিত্তে বা উপাধিতে তিনিই আত্মরূপে প্রতিবিম্বিত হন বলিয়া, এই প্রতিবিম্বরূপে তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থান করেন এবং স্বরূপে তিনি সর্ব্বভূতের বাহিরে থাকেন বলিতে পারা যায়। অথবা আপনার অংশরূপে, বিম্বরূপে, স্ফুলিঙ্গরূপে তিনি জীবাত্মা হইয়া,পরিচ্ছিন্ন হইয়া সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থান করেন। পূর্ণস্বরূপে তিনি সর্ব্বভূতের বাহিরে অবস্থান করেন। এইরূপে তিনি সর্ব্বভূতের বাহ্য ও অন্তর। যাহা হউক, জগৎ কল্পিত হইলেও তাহা মায়াময় অলীক নহে। তাহা ব্রহ্মসত্তায় সত্তাযুক্ত। সেই সত্তাধিষ্ঠান হেতু ব্রহ্ম সর্ব্বভূতের বাহিরে ও অন্তরে স্থিত। শঙ্করের অর্থ যেরূপ গিরি বুঝাইয়াছেন, তাহার মায়াবাদ ত্যাগ করিলে, সেই অর্থই বিশেষ সঙ্গত বোধ হয়। জীবাত্মা, জীবচিত্ত, জীবদেহ ও জীবের নিকট প্রতিভাত বাহ্যজগৎ এই কয়রূপে সগুণ ব্রহ্ম জ্ঞেয়, নির্গুণস্বরূপে তিনি সকলেরই বাহিরে, সর্ব্বপ্রপঞ্চাতীত।

তিনি চর—তিনিই অচর।—(অচরং চরমেব চ)—ব্রহ্ম সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে—তাহাদের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত,ইহা বলা হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, তবে কি 'মধ্যে' অর্থাৎ উভয়ের মাঝামাঝি দেশে তাঁহার অবস্থিতি নাই? এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্ত বলা হইয়াছে যে, তিনি 'চর'ও বটেন, অচরও বটেন। এ সংসারে যাহা কিছু 'চর' (জঙ্গম) ও যাহা কিছু 'অচর' (স্থাবর)—এই চরাচর সেই ব্রহ্মেই আত্মভাবে আরোপিত, তাহা সকলই আত্মা। রজ্জুতে যেমন সর্পের আভাস, আত্মাতেও সেইরূপ 'চরাচরের' আভাস হয়। চরাচর সমুদায় ব্যবহারের বিষয় ব্যবহারিক ভাবে সত্য, পরমার্থতঃ তাহা ব্রহ্মরূপে জ্ঞেয় (শঙ্কর)। ব্রহ্ম স্বভাবতঃ অচর হইয়াও দেহিরূপে চর (রামানুজ)। অচর=স্থাবর, চর=জঙ্গম। চরাচর—সমুদায় ভূতজাত পদার্থ। সেই চরাচর কার্য্যরূপের কারণস্বরূপ যিনি—তিনি ব্রহ্ম (স্বামী)। এই স্থাবর-জঙ্গমের অধিষ্ঠানস্বরূপ ব্রহ্ম। সকলই ব্রহ্মে কল্পিত, ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত আর কিছুই বা কোন সত্তাই নাই (মধু)। অচর অর্থাৎ অচল, চর অর্থাৎ চল। ব্রহ্ম স্থির, অচল আর তিনিই অস্থির, গতিশীল। "আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ" ইতি শ্রুতিঃ।" (বলদেব)।

পূর্ব্বে "ভূতানাং বহিরন্তশ্চ" বলা হইয়াছে, সুতরাং আবার 'চরাচর' শব্দের দ্বারা সেই ভূতগণকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ইহা বলা যায় না। সুতরাং এ স্থলে বলদেবের অর্থই অধিক সঙ্গত। শ্রুতিতে আছে,—

অনেজৎ একং মনসো জবীয়ো, নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ, তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥
তৎ এজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বদন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥ (ঈশ উপনিষদ্, ৪।৫)।

অর্থাৎ তিনি অচল, এক, মন হইতেও বেগবান্‌, ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় না; তিনি তাহাদের অগ্রগামী, তিনি স্থির থাকিয়াও দ্রুতগামী অন্য সকলকে অতিক্রম করেন, তাঁহাতেই অবস্থিত থাকিয়া বায়ু 'অপ্‌' বা প্রাণকর্ম্ম ধারণ করে। তিনি কম্পিত হন বা চলেন, তিনি কম্পিত হন না—বা চলেন না, অর্থাৎ অচল থাকিয়াও চলিতরূপে প্রতিভাত হন, তিনি দূরে, তিনিই নিকটে, তিনিই এই সমুদায়ের অন্তরে, তিনিই সকলের বাহিরে। বোধ হয়, এই উপনিষদের শ্লোক হইতে গীতার এই শ্লোক গৃহীত হইয়াছে। * এই শ্লোকের অনুসারে গীতায় এ স্থলে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম সর্ব্বভূতের অন্তরে বাহিরে স্থিত, তিনি চর এবং তিনিই অচর, তিনি দূরে আর তিনিই অতি নিকটে। অতএব এই বেদমন্ত্র হইতে 'চর' ও 'অচর' শব্দের অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত। আত্মা অচল সনাতন (গীতা ২।২৪) ব্রহ্ম কূটস্থ অচল ধ্রুব (গীতা ১২।৩) ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। চল ও স্থির—ইহা সগুণ ব্রহ্মসম্বন্ধে বলা যায়। নির্গুণ ব্রহ্ম 'চল'ও নহেন, স্থিরও নহেন—

"চল স্থিরো ভয়াভাবৈরাবৃণোত্যেব বালিশঃ।"

(ইতি গৌড়পাদকারিকা)।

সূক্ষ্ম হেতু অবিজ্ঞেয়।—(সূক্ষ্মত্বাৎ তৎ অবিজ্ঞেয়ং)—যদি ব্রহ্ম চরাচর সকল বস্তুই হইলেন, তবে এই ভাবে সকলে তাঁহাকে বুঝিতে পারে না কেন? ইহারই উত্তরে বলা হইয়াছে যে, সেই ব্রহ্মস্বরূপ আত্মা সকল প্রতিভাসেই স্ফুরিত হন বটে, কিন্তু আকাশ যেমন সর্ব্বব্যাপী হইয়াও সূক্ষ্ম বলিয়া প্রত্যক্ষ হয় না, সেইরূপ সূক্ষ্ম বলিয়াই আত্মা

* এই ঈশোপনিষদ্‌ বা বাজসনেয়-সংহিতা উপনিষদ—শুক্ল যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত—যজুর্ব্বেদ-সংহিতারই অংশ। সুতরাং ইহা অন্য সকল উপনিষদ্‌ অপেক্ষা প্রাচীন ও সমধিক প্রামাণ্য। ইহা গীতোক্ত 'ব্রহ্মসূত্র পদের' অন্তর্গত মনে হয়। সুতরাং গীতায় এই মন্ত্র গৃহীত হওয়াই সম্ভব।

ধীরূপে জ্ঞেয় হইয়াও অজ্ঞেয় থাকেন। অবশ্য যাহারা অবিদ্বান্, তাহাদের নিকটেই আত্মা অবিজ্ঞেয়, যাঁহারা বিদ্বান্ তত্ত্বদর্শী, তাঁহাদের নিকট আত্মা আত্মভাবেই সর্ব্বদা প্রকাশমান। 'আত্মাই এ সমুদায়' এইরূপ বেদান্তবাক্যরূপ প্রমাণের দ্বারা বিদ্বান্ আত্মস্বরূপ ব্রহ্মকে সর্ব্বত্র সর্ব্বস্বরূপে দেখিয়া থাকেন (শঙ্কর)। সূক্ষ্ম অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় (গিরি)। সেই আত্মতত্ত্ব সর্ব্বশক্তিযুক্ত, সর্ব্বজ্ঞ। আত্মা এই ক্ষেত্রে বর্ত্তমান থাকিলেও অতি সূক্ষ্ম হেতু পৃথক্‌রূপে সংসারী লোকের বিজ্ঞেয় নহেন (রামানুজ)। রূপাদিহীন হেতু তাহা অবিজ্ঞেয়, ইহাই সেই আত্মা, এরূপ স্পষ্টভাবে তিনি জ্ঞানার্হ হন না (স্বামী)। তিনি সর্ব্বাত্মা হইলেও সূক্ষ্ম বা রূপাদিবিহীন বলিয়া, ইহাই সেই—এরূপ স্পষ্ট জ্ঞানের যোগ্য নহেন। যাহারা আত্মজ্ঞানসাধনশূন্য, তাহারা বহু সহস্র কোটি বর্ষেও তাঁহাকে জানিতে পারে না (মধু)। ভগবানের চিৎসুখ মূর্ত্তি সূক্ষ্ম হেতু অবিজ্ঞেয় (বলদেব)।

শ্রুতিতে আছে,—

"বৃহৎ চ তৎ দিব্যম্ অচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাৎ চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্॥"

(মুণ্ডকোপনিষদ্, ৩।৭)।

অন্যত্র আছে,—

"সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলস্য মধ্যে
বিশ্বস্য স্রষ্টারং অনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি॥"

(শ্বেতাশ্বতর, ৪।১৪)।

অতএব আত্মা বৃহৎ, দিব্য, অচিন্ত্যরূপ অথচ সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর-রূপে স্বপ্রকাশিত; তিনি দূর হইতে সুদূরে এবং এখানে নিকটেও

আছেন, এবং জ্ঞানবানের হৃদয়গুহায় তিনি নিহিত। আত্মাকে বা ব্রহ্মকে যেরূপ সূক্ষ্ম বলা হইয়াছে, তেমনি অণুও বলা হইয়াছে।

"এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো।" (মুণ্ডক ৩।১।৯)।

"অণোরণীয়ান্।" (কঠ, ২।২০; শ্বেতাশ্বতর ৩২০)।

যাহা হউক, এই 'সূক্ষ্ম' অণুরূপ ব্রহ্মের সগুণ রূপ। নির্গুণরূপে তিনি অনণু, অহ্রস্ব (বৃহদারণ্যক, ৩।১।৮)। তিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর (মুণ্ডক, ৩।৭)। তিনি সূক্ষ্ম হইয়া সগুণ হইতে শরীরে অধিষ্ঠান করেন—

"সূক্ষ্মো ভূত্বা শরীরাণি অধিতিষ্ঠতে।" (অথর্ব্বশিরাঃ উপনিষদ, ৪)

অতএব শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্ম আত্মস্বরূপে সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম—অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যে বাহ্যবস্তু জ্ঞান হয়, সে বস্তু স্থূল। যাহা সূক্ষ্ম, তাহা ইন্দ্রিয়গোচর নহে। ব্রহ্ম আত্মস্বরূপে ইন্দ্রিয়গোচর নহেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের ন্যায় জ্ঞেয় নহেন। যাহা হউক, নির্গুণ ব্রহ্ম এই 'সূক্ষ্ম শব্দ দ্বারাও নির্দ্দেশ্য হয়েন না। নির্গুণরূপে তিনি সূক্ষ্মও নহেন। ব্রহ্মের এই আত্মস্বরূপ সূক্ষ্মরূপে যে অবিজ্ঞেয় অর্থাৎ বিশেষরূপে স্পষ্টভাবে জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না, তাহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"বিজ্ঞাতং বিজিজ্ঞাস্যম অবিজ্ঞাত এত এব" (বৃহদারণ্যক ১।৫।৮)।

ব্রহ্ম যে অবিজ্ঞেয়, তাহার তত্ত্ব ইতিপূর্ব্বে ১৩।১২ শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

তিনি দূরে তিনিই নিকটে—যাহারা অবিদ্বান্, তাহাদের নিকট আত্মা দূরস্থ, অর্থাৎ বর্ষ সহস্র কোটিতেও তাহারা আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু বিদ্বান্‌গণের নিকট আত্মা অতি নিকটে; কেন না, তাঁহারা আপনাদিগকেই সেই আত্মস্বরূপে অনুভব করেন (শঙ্কর)। অমানিত্বাদি পূর্ব্বোক্ত গুণ সকল-রহিত পুরুষের স্বদেহে বর্ত্তমান থাকিলেও আত্মা অতি দূরস্থ। যাঁহারা উক্ত অমানিত্বাদি গুণযুক্ত, তাঁহাদের কাছে

আত্মা অতি নিকটে, অচরে বর্ত্তমান বা প্রকাশিত থাকেন (রামানুজ)। আত্মা সবিকার প্রকৃতির অতীত—এজন্য অজ্ঞানীর নিকট আত্মা লক্ষযোজনেরও অধিক দুরস্থ বোধ হয়। আর জ্ঞানীর নিকট প্রত্যগাত্ম-স্বরূপে আত্মা নিত্য সন্নিহিত জ্ঞান হয়, (স্বামী, মধু)। অনন্যভক্তি দ্বারাই ভগবান্‌কে 'অন্তিকে' বা অতি নিকটস্থ বোধ হয়, ভক্তি বিনা তিনি অতি দুরে স্থিত জ্ঞান হয় (বলদেব) গীতা। ১১।৫৪ দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্ম যে দূরে ও অন্তিকে—তৎসম্বন্ধীয় শ্রুতি ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—

"তদ্দূরে তদন্তিকে চ।"(ঈশ উপঃ ৫)।

"দূরাৎ সুদূরে তদন্তিকে চ।" (মুণ্ডক, ৩।৭)।

ব্রহ্ম ও আমার মধ্যে ব্যবধান আছে, আমার দেহ আর এই বাহ্য জগৎ। যতক্ষণ এই ব্যবধান থাকে, ততক্ষণ তিনি অতি দূরে। যদি এই ব্যবধান কোনরূপে দূর করা যায়, তবে 'ব্রহ্ম ও আমি' ইহার মধ্যে কোন ভেদ থাকে না, তখন ব্রহ্ম অতি নিকটস্থ হন; ব্রহ্মের সহিত আমি একীভূত হইয়া যাইতে পারি। আমার আত্মা আমার অন্তঃস্থ বটে, কিন্তু তাহা অন্তঃকরণ ও দেহাদি উপাধিতে অধ্যাস হেতু 'আত্মা এই দেহ' এই-রূপ জ্ঞানযুক্ত থাকে, এবং দেহেন্দ্রিয়াদির জ্ঞান হইতে বাহ্যবিষয়-জ্ঞানযুক্তও থাকে। ইন্দ্রিয়গণ বহির্মুখ বলিয়া অন্তরাত্মাকে দেখা যায় না—

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণাৎ স্বয়ম্ভূঃ
তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্। (কঠ, ২।১।১)।

সুতরাং আত্মার সহিতও আমার এই অন্তঃকরণযুক্ত দেহ ও বাহ্য জগৎরূপ ব্যবধান রহিয়া যায়। এ ব্যবধান যতক্ষণ থাকে, তখন আমার আত্মা বা ব্রহ্ম আমা হইতে অতি দূরে। যখন আমার অন্তরে ও বাহ্যে সর্ব্বত্র; ব্রহ্মদর্শন হয়, তখন সে ব্যবধান চলিয়া যায়, তখন আমার আত্মা বা ব্রহ্ম আমার অতি নিকটস্থ হন।

"কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥" (কঠ ২।১।১)

অর্থাৎ যে ধীর জ্ঞানী বিষয় হইতে নিবৃত্তচক্ষু, তিনি অমৃতের ইচ্ছুক হইয়া এই আত্মাকে দেখিয়া থাকেন। যখন এই আত্মস্বরূপ দর্শন হয়, তখন 'আমি জ্ঞাতা ও আমার জ্ঞেয়, এ জগৎ ও দেহ,' এ ভেদ দূর হওয়ায়, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ভেদ থাকে না ; তখন দেশ কাল নিমিত্ত পরিচ্ছেদ দূর হইয়া যায় ; তখন মায়ার আবরণ (principium individuationis) থাকে না ; আমি জ্ঞান সেই আত্মস্বরূপে বা ব্রহ্মস্বরূপে মিলাইয়া যায়, যাহা আমার অতি নিকট, তাহার সঙ্গে এক হইয়া যায়। এস্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, শঙ্কর যে বলিয়াছেন, অজ্ঞানী অবিবেকীর নিকটই ব্রহ্ম সূক্ষ্ম হেতু অবিজ্ঞেয় ও দূরে স্থিত, তাহা সঙ্গত বোধ হয় না। অমানিত্বাদি রূপ নির্ম্মল জ্ঞানে ব্রহ্ম যেরূপে জ্ঞেয় হন, ভগবান্ এ স্থলে তাহাই বলিতেছেন। অবিবেকীর কথা বলিতেছেন না। তাহার জ্ঞানে ত ব্রহ্মতত্ত্ব আদৌ প্রতিভাত হয় না। অতএব জ্ঞানীর নিকট ব্রহ্ম অবিজ্ঞেয় সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও ব্রহ্ম দূরে ও অন্তরে প্রতিভাত হয়। কেন এরূপ প্রতিভাত হয়, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৬

অবিভক্ত তিনি কিন্তু সর্ব্বভূতে যেন
বিভক্ত হইয়া স্থিত ; জ্ঞেয় তিনি আর
ভূতভর্ত্তা, গ্রাসকারী সৃষ্টিকারিরূপে ॥১৬

১৬। অবিভক্ত...বিভক্ত হইয়া স্থিত—সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম

আকাশের ন্যায় সর্ব্বপ্রাণিদেহে এক অবিভক্তভাবে বিদ্যমান থাকিলেও যেন প্রতি দেহভেদে বিভক্তের ন্যায় প্রতীয়মান হন, কেন না, দেহে-তেই তাঁহার বিভাব বা অভিব্যক্তি হয় (শঙ্কর)। আত্মা প্রতিদেহে আকাশের ন্যায় এক, অথচ নানা ভাব হেতু প্রতিদেহে ভিন্ন বোধ হয়। যেমন একই আকাশ ঘটমধ্যস্থ হইয়া ঘটাকাশ, মঠমধ্যস্থিত হইয়া মঠা-কাশ, ইত্যাদি রূপ উপাধিভেদে ভিন্ন বোধ হয়, আত্মাও সেইরূপ এক হইয়াও প্রতিদেহে অবস্থান হেতু ভিন্ন বোধ হয় (গিরি)। দেব-মনুষ্যাদি ভূতে সর্ব্বত্র স্থিত আত্মাবস্তু জ্ঞানীর নিকট একাকার প্রতীয়-মান হইলেও অজ্ঞানীর নিকট বিভক্ত—দেহাদি আকারে ভিন্নবৎ বোধ হয়। আমি দেব, আমি মানুষ, এই জ্ঞানমধ্যে দেহরূপ সমান অধিকরণ-রূপে এক আত্মা অনুসন্ধেয়। জ্ঞাতৃস্বরূপ আত্মাতে দেহ ও বাহ্য বিষয় যে জ্ঞেয় হয়, তাহার অন্তর্ভূত আত্মাকে কেহ জানিতে সমর্থ হয় না, এজন্য আত্মাকে বিভক্ত বা বহু বোধ হয় (রামানুজ)। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিভিন্ন ভূতে কারণরূপে অবিভক্ত, ও কার্য্যরূপে বিভক্ত বা ভিন্ন-

* এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ দার্শনিক Paul Deussen তাঁহার "Elements of Metaphysics গ্রন্থে (p. 126) যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। 'Like plurality, divisibility is also conditioned by space and time (and causality ?). The will as thing-in-itself is indivisible. We must not think of it as divided amongst its phenomena * * * the Bhagabatgita may answer—অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ (XIII, 6) —undivided he dwells in beings and yet, as it were, divided ; and Kant may furnish a key to this enigma, by his doctrine that space and time do indeed separate the *manifestation* but not the *manifested*......and hence it is that the regerate extends his ego to all reality ; he knows himself in everything."

রূপে স্থিত প্রতীয়মান হয়। সমুদ্রজাত কেন, তরঙ্গ প্রভৃতি সমুদ্র হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ ব্রহ্মসাগরে উদ্ভূত দেবমনুষ্যাদি ভূতগণ, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন (স্বামী)।

মধু বলেন, এই স্থলে প্রতিদেহে আত্মা ভিন্ন, এই যে বহু আত্মবাদ বহু পুরুষবাদ, তাহার এস্থলে স্পষ্ট নিরাস হইয়াছে। আত্মা বা ব্রহ্ম প্রতিদেহে এক অবিভক্ত অভিন্ন। প্রতিদেহভেদে আত্মা ভিন্ন নহে। আত্মা ব্যোমবৎ সর্ব্বব্যাপী। তবে দেহে তাদাত্ম্য অধ্যাস হেতু প্রতি দেহে আত্মা ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়। এ ভেদ উপাধিগত, এ ভেদ আভাস মাত্র। ইহা পারমার্থিক নহে। বিভিন্ন জীবে ব্রহ্ম এক অবিভক্ত, কিন্তু প্রতিজীবে বিভক্তের মত, বা ভিন্নরূপে স্থিত।

শ্রুতিতে আছে,—

"একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।" (কঠ, ৫।৯, ১০)।

অর্থাৎ 'এক সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা নানা ভূতদেহে, সেই সেই ভূতরূপ হইয়াছেন, এবং সে সমুদায়ের বাহিরেও আছেন।' অগ্নি যেমন সর্ব্বভূতে প্রবিষ্ট হইয়া দাহ্যবস্তুর রূপভেদে নানারূপ হয়, বায়ু যেমন ভুবনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নানারূপে প্রকাশিত হয়, পরমাত্মাও সেইরূপ রূপভেদে বহুরূপে প্রতীয়মান হন।

সর্ব্বলোকচক্ষু সূর্য্য যেমন চক্ষুগ্রাহ্য বাহ্যবস্তুতে লিপ্ত হন না, সেইরূপ সর্ব্বভূতান্তরাত্মাও বাহ্য দুঃখে লিপ্ত হন না—

"একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ।" (কঠ, ৫।১১)।

আরও উক্ত হইয়াছে যে,—

একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
"একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" (কঠ, ৫।১২, ১৩)।

যিনি এক অবিভক্ত সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, তিনি 'তৎ'শব্দবাচ্য অনির্দ্দেশ্য—তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম,—

"তদেতৎ ইতি মন্যন্তে অনির্দ্দেশ্যম্।" (কঠ, ৫।১৪)।

তিনি এক দ্যুতিমান্ ও সর্ব্বভূতমধ্যে গূঢ়ভাবে অবস্থিত।

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ।" (শ্বেতাশ্বতর ৬।১১)।

ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, "যখন অমানিত্বাদিস্বরূপ নির্ম্মল সাত্ত্বিক প্রকাশস্বরূপ জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই ব্রহ্ম এইরূপে জ্ঞেয় হন; তখন ব্রহ্ম সর্ব্বভূতের অন্তরে বিভক্তরূপে প্রতীয়মান হইলেও তিনি অবিভক্তরূপে সে জ্ঞানে জ্ঞেয় হন।" এ কথা সাত্ত্বিক জ্ঞান সম্বন্ধে পরেও উক্ত হইয়াছে—

"সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥"

(গীতা ১৮।২০)।

অতএব ভূত বা ক্ষর পুরুষ বহু হইলেও, তাহাদের সকলের অন্তর্ভূত অক্ষর আত্মা বা ব্রহ্ম একই। সাংখ্যের বহু পুরুষবাদ পরম তত্ত্ব নহে। জীবাত্মার সহিত ব্রহ্মের ঐক্যবাদ গীতায় প্রতিষ্ঠিত। মধুসূদন ইহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। গীতায় এ স্থলে আরও উক্ত হইয়াছে যে, অমানিত্বাদিরূপ নির্ম্মল সাত্ত্বিক জ্ঞানের এই স্বভাব যে, তাহা বহুর মধ্যে একত্ব দর্শন করে, একেরই বহুরূপে বিকাশ বুঝিতে পারে। সে জ্ঞান Principle of contradiction এর মধ্যে Principle of Identity দেখিতে পায়; এবং সেই এক অদ্বিতীয় যে ব্রহ্ম, তাহা জানিতে পারে।

জ্ঞেয় তিনি ভূতভর্ত্তা, গ্রাসকারী সৃষ্টিকারিরূপে।—সেই ব্রহ্ম স্থিতিকালে প্রাণিগণকে ধারণ করিয়া থাকেন, প্রলয়কালে সকলকেই গ্রাস করেন এবং সৃষ্টিকালে সকলকে সৃষ্টি করেন। এইরূপে তিনি জ্ঞেয় হন। প্রকৃত রজ্জুতে যেমন ভ্রম (illusion) হেতু সর্প-

জ্ঞানের উৎপত্তি, স্থিতি ও ভ্রম দূর হইলে সে মিথ্যা জ্ঞানের লোপ হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় প্রতীয়মান হয় (শঙ্কর)। ব্রহ্ম অবিভক্তরূপে সর্ব্বভূতে বিভক্তের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও তিনি এই সকল ভূত হইতে পৃথক্। তিনি দেহরূপে সংহত ভূতগণের ভর্ত্তা বা ভরণকারী, ভৌতিক সকল গ্রস্যমান বস্তুরই গ্রাসকারী, এবং তিনি প্রভব বা উৎপত্তি প্রভৃতির হেতু। যাহা গ্রাস করা যায়, সেই অন্নাদি আকারে পরিণত সমুদায়ের প্রভব বা উৎপত্তি-হেতু সেই ব্রহ্ম। এই প্রকারে ব্রহ্মকে সর্ব্বভৌতিক পদার্থ হইতে পৃথক্‌ভাবে জ্ঞেয়। মৃত শরীরে 'গ্রসন' (আহার গ্রহণ) ও প্রভবন (স্থিতি বৃদ্ধি প্রভৃতি ভাববিকার) দেখা যায় না। অতএব ভূত-সংঘাতরূপ ক্ষেত্রেই ব্রহ্ম (জীবাত্মা) গ্রসন, প্রভব ও ভরণ হেতু, ইহা বুঝিতে হইবে। (রামানুজ)।

স্থিতিকালে ভূতগণের পোষক, প্রলয়কালে গ্রসনশীল ও সৃষ্টিকালে নানা কার্য্যাকারে প্রভবনশীলরূপে ব্রহ্ম জ্ঞেয় (স্বামী)। ব্রহ্ম সর্ব্বভূতে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে এক হইতে পারেন—কিন্তু জগৎকারণরূপে ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে ভিন্ন বলা হইতে পারে না? এই প্রশ্নের অপেক্ষায় উত্তরে বলা হইয়াছে যে, না, তাহা নহে। স্থিতিকালে তিনি সর্ব্বভূতকে ভরণ করেন, প্রলয়কালে তিনি গ্রসনশীল এবং উৎপত্তিকালে প্রভবনশীল হন। রজ্জুতে সর্পকল্পনার ন্যায়, এ জগৎ তাঁহার উৎপত্তি, স্থিতি, লয়কারণ ব্রহ্মে মায়া হেতু কল্পিত। সেই ব্রহ্মই প্রতি দেহে একই ক্ষেত্রজ্ঞরূপে জ্ঞেয় (মধু)।

ব্রহ্ম স্থিতিকালে ভূতগণের পালক, প্রলয়ে কালশক্তি দ্বারা তাহাদের গ্রাসকারী বা সংহারক, এবং সৃষ্টিকালে প্রধান প্রাণশক্তি দ্বারা নানা কার্য্যাত্মকরূপে প্রভবনশীল।

এ স্থলে প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারগণ এইরূপে ব্রহ্মকে এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণরূপে বুঝিয়াছেন। কেবল রামানুজ ব্রহ্ম

অর্থে জীবাত্মা বুঝাইতে গিয়া এ স্থলে ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। তাহা গ্রাহ্য নহে। ব্রহ্ম যে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ, তাহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে।—

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্।" (ছান্দোগ্য, ৩।১৪।১)।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব—তৎ ব্রহ্ম ইতি।"

(তৈত্তিরীয় উপঃ, ৩।১।১)।

অতএব শ্রুতি অনুসারে এই সমুদায়ই ব্রহ্ম, তাঁহা হইতে এই সমুদায়ের জন্ম (জ) লয় (ল) ও স্থিতি (অন্) হয়। ব্রহ্ম হইতেই এই সমুদায় ভূতগণের জন্ম হয়, তাঁহা হইতেই জীবিত থাকে ও প্রয়াণ করিয়া তাঁহাতেই প্রবেশ করে।

এই শ্রুতি হইতেই জিজ্ঞাসিতব্য ব্রহ্ম সম্বন্ধে বেদান্ত-দর্শনের সূত্র—

"জন্মাদ্যস্য যতঃ।" (শারীরক সূত্র, ১।২)।

এই বেদান্ত-সূত্রের ব্যাখ্যায় শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যাকারগণ ব্রহ্ম কিরূপে জগতের সৃষ্টি প্রভৃতির কারণ হন, সেই ব্রহ্মতত্ত্ব বিস্তারিতভাবে বুঝাইয়াছেন। জিজ্ঞাসু পাঠক তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিবেন।

ব্রহ্ম নির্গুণ-স্বরূপে প্রপঞ্চাতীত। তিনি সগুণরূপে জগৎ-কারণ। এই জন্য কারণরূপ তটস্থ লক্ষণ দ্বারা তিনি জ্ঞেয় হন, এবং তাহা হইতে তাঁহার নির্গুণ স্বরূপ জ্ঞেয় হয়। ব্রহ্ম সগুণরূপে কি প্রকারে জগৎ-কারণ হন? ইহার এক উত্তর—তাঁহাতেই এই জগৎ-কারণ-বীজ অবশ্য আছে। সে কারণ-বীজ কি? অদ্বৈতবাদ অনুসারে সে কারণ-বীজ 'মায়া'। মায়া দ্বারাই জগৎ কল্পিত হয়—জগতের বাস্তবিক সত্তা নাই। যাহা হউক, শঙ্কর বলিয়াছেন যে, এই মায়া ব্রহ্মশক্তি। সে শক্তি কিরূপ, তাহা শ্রুতি হইতে জানা যায়;—

"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ"।
(শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৬।৮)

ব্রহ্মের পরাশক্তি বিবিধ—সে শক্তি স্বাভাবিকী জ্ঞানক্রিয়া ও বল-ক্রিয়াস্বরূপ। এই জ্ঞানক্রিয়া হেতু ব্রহ্মে জগৎ-কল্পনা স্বভাবতঃই প্রকাশিত হয়, এবং সেই ব্রহ্মের 'সত্তা' হইতে বলক্রিয়া দ্বারা সেই কল্পনা সৎরূপে পরিণত হয়। ইহা হইতেই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হয়; সর্ব্বভূতের উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশ হয়। এই শক্তি সৎরূপা বলিয়াও জগৎ সেই ব্রহ্ম-সত্তায় সত্তাযুক্ত হয়, তাহা অলীক, স্বপ্নময়, কেবল কল্পনা মাত্র হয় না। এ কথা পূর্ব্বে নানা স্থলে উক্ত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শন অনুসারে প্রকৃতিই জগৎকারণ, ব্রহ্ম জগৎকারণ নহে। শ্রুতিতে এই প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র বলা হয় নাই, তাহা ব্রহ্মেরই এই মায়াশক্তি। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৪।১০ শ্লোকে) আছে—

"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥"

জড় স্বতন্ত্রা প্রকৃতি যে জগৎ-কারণ হইতে পারে না, তাহা বেদান্ত-দর্শনের "ঈক্ষ্যতে না শব্দং" ইত্যাদি সূত্রে (১।৫) ও তাহার শাঙ্কর ভাষ্যে বিবৃত হইয়াছে। শ্রুতি অনুসারে এ সৃষ্টি ঈক্ষণ—কল্পনামূলক। এ সৃষ্টির শৃঙ্খলা, নিয়ম, মঙ্গলময় বিধান প্রভৃতি সকলই জ্ঞানমূলক। কোন জড় কারণ হইতে এরূপ সৃষ্টির সম্ভব হয় না। অতএব এই জড়জগৎ ও ভূতগণে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হইতে ব্রহ্মই জ্ঞেয় হন।

পূর্ব্বে গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, অব্যক্তই জগৎ-কারণ।

"অব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥" ৮।১৮

"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥" ২।২৮

এই অব্যক্তই প্রকৃতি (গীতা ১৩।৫)। সেই দুইরূপ প্রকৃতি—পরাপ্রকৃতি ও অপরাপ্রকৃতি ভগবানেরই (গীতা ৭।৪,৫)। এই অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত যে পরম সনাতন নিত্যভাব, তাহা 'অব্যক্ত অক্ষর'; তাহা ভগবানের পরমধাম (গীতা ৮।২১)। ইহাই ব্রহ্ম। ইহাই জগৎ-কারণ। ব্রহ্মই মায়াশক্তি বা অব্যক্ত প্রকৃতি হেতু জগৎ-কারণ হন। ব্রহ্মই সগুণ পরমেশ্বররূপে নিয় জ্ঞান বা কল্পনা দ্বারা নিয়মিত করেন বলিয়া তাঁহার অব্যক্ত প্রকৃতি জগৎ প্রসব করে। (গীতা ৯।১০)। অতএব গীতায় এ সম্বন্ধে পূর্ব্বাপর কোন বিরোধ নাই। ব্রহ্মই যে এই জড় জীবময় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ, ইহাই সঙ্কলিতার্থ।

এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সম্বন্ধে ব্রহ্মের মায়াখ্য শক্তি বা প্রকৃতিই কারণ। এই আধারে ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্ম কার্য্যরূপে পরিণত হয়। এ সৃষ্টি কার্য্য। আমরা এই কার্য্য ব্যাপার বিশ্লেষণ করিলে জানিতে পারি যে, ক্রিয়া মাত্রেই কর্ত্তৃকর্ম্মাদি কারকসাপেক্ষ। অতএব এক অর্থে আমরা প্রকৃতিকে কর্ম্ম, করণ, অপাদান কারক ও একভাবে কর্ত্তৃকারকও বলিতে পারি। আর ব্রহ্মকে অধিকরণ, সম্বন্ধ ও এক অর্থে সম্প্রদান কারক বলিতে পারি। আর কর্ম্মের যাহা কারণ, তাহা সাংখ্য-শাস্ত্রে পাঁচ প্রকার (গীতা ১৮।১৩)। যথা—অধিষ্ঠান (অধিকরণ কারক) কর্ত্তা (কর্ত্তৃকারক) বিবিধকরণ (instrument—করণ কারক) বিবিধ চেষ্টা এবং দৈব। ভূতগণ যে কর্ম্ম করে, ইহারা, তাহারই কারক। জগৎ-কারণকে ঠিক সেইরূপে বুঝা যায় না। জগৎ-কারণ সাধারণতঃ নিমিত্ত ও উপাদান-কারণরূপে উক্ত হয়। জগৎ-কর্ম্মে অন্য কোন কারকের আবশ্যক না থাকিতে পারে। তাহাতে 'বাহুল্য দোষ' হইতে পারে।

এজন্য ব্রহ্মকেই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণমাত্র বলা হয়। যাহা হউক, এ কারণ-তত্ত্ব এ স্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই।

এই শ্লোক হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, ব্রহ্মই জগৎ ও ভূতগণের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের কারণ। যাহা হউক, এ স্থলে এই কথা আরও বিশেষ ভাবে বুঝিতে হইবে। এ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম ভূতভর্ত্তা, গ্রসিষ্ণু ও প্রভবিষ্ণুরূপে জ্ঞেয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তিনি অসক্ত হইয়াও ভূতভর্ত্তা। এ স্থলেও বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্ম অসক্ত হইয়াও ভূতভর্ত্তা, গ্রসিষ্ণু ও প্রভবিষ্ণু। অসক্ত হইয়াও ব্রহ্ম কিরূপে প্রভবিষ্ণু হন, তাহা পূর্ব্বে ১৪শ শ্লোকে অসক্ত হইয়াও ভূতভর্ত্তা এই কথার ভূতভর্ত্তা, গ্রসিষ্ণু ও ব্যাখ্যা হইতে বুঝিতে হইবে। এ স্থলে গ্রসিষ্ণু ও প্রভবিষ্ণু শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা চিন্তা করিতে হইবে। গ্রসিষ্ণু অর্থে গ্রসনশীল অর্থাৎ নিয়ত গ্রাস করাই যাঁহার স্বভাব। ব্রহ্ম কালাখ্য পরমেশ্বররূপে নিয়ত লোকক্ষয় করিতে প্রবৃত্ত। সেইরূপ তিনি প্রভবিষ্ণু বা প্রভবনশীল অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে ভবন বা ভূতগণকে উৎপন্ন করিতে নিয়ত নিরত। ভূতগণকে নিয়ত উৎপন্ন করাই যেন ব্রহ্মের স্বভাব। অর্থ এই যে, ব্রহ্ম অসক্ত হইয়াও সর্ব্বদা ভূতগণকে উৎপন্ন করিতে—উৎপত্তির পর ভবন বা রক্ষা করিতে এবং যথাকালে নাশ করিতে নিরত। ব্রহ্ম যে কেবল প্রলয়ের পর জগৎকে সৃষ্টি করেন, সৃষ্টির পর রক্ষা করেন ও সৃষ্টি অন্তে প্রলয়ারম্ভে লয় করেন, তাহা নহে। জগতে ব্রহ্মের সৃষ্টিরক্ষণ ও লয় ব্যাপার নিয়ত চলিতেছে। সর্ব্বস্থানে সর্ব্বকালে এই ব্যাপার সর্ব্বদা চলিতেছে। ভূতগণ যে নিয়ত সৃষ্ট হইতেছে, রক্ষিত হইতেছে ও বিনষ্ট হইতেছে—তাহার কারণ ব্রহ্ম। আর এই নিয়ম কেবল জীব সম্বন্ধেই নহে, জীবের শরীর যেমন সৃষ্ট হইয়া নিয়ত পরিবর্দ্ধিত হইতেছে ও শেষে নষ্ট হইতেছে, সেইরূপ জড়বস্তুর সংঘাত ও এই সৃষ্ট স্থিতি পরিবর্ত্তন ও লয় ব্যাপারের অধীন। জগতে সর্ব্বত্র এই নিয়ম

জগৎ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। স্রোতস্বিনী নদীর জল যেমন আসিতেছে, ভাসিতেছে ও চলিয়া যাইতেছে, অথচ স্রোতস্বিনীর রূপ একই প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ এ জগতের ভূতাদি সৃষ্ট হইতেছে, সৃষ্ট হইয়া চালিত হইতেছে, পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ও শেষে বিনষ্ট হইতেছে, অথচ জগতের রূপ একই থাকে,—একই রূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। এই যে জগতে নিত্য পরিবর্ত্তন, নিত্য সৃষ্টি স্থিতি লয় ব্যাপার আমরা দেখিয়া জগৎকে পুনঃপুনঃ গতিশীল বলিয়া জগৎ আখ্যা দিয়া থাকি, ইহার মূল আধার যাহা—ইহার নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় কারণ যাহা—তাহা ব্রহ্ম।

ব্রহ্মই প্রভবিষ্ণু—প্রভবনশীল। প্রকৃষ্টরূপে যে ভবন বা যে হওয়া, তাহাতেই ভাবের আরম্ভ। সতেরই ভাব হইয়া থাকে। 'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ' ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই ভাব দুইরূপ হইতে পারে,—নিত্য ও বিকারী। বিকারী ভাব ষড়্ভাব-বিকারযুক্ত, তাহাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে জন্ম, স্থিতি ও নাশ প্রধান। ব্রহ্ম হইতে বা ব্রহ্মরূপ সৎকারণ হইতে জগতের ও সর্ব্বভূতের এই ভাববিকার হয়, এই উৎপত্তি, রক্ষণ ও নাশ হয়। ব্রহ্মরূপ আধারেই সর্ব্বভূতগণ এই জন্ম-স্থিতি-নাশের মধ্য দিয়া নিয়ত গতাগতি করে। ইহাতে পরিদৃশ্যমান জগতের বিশেষ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় না। বলিয়াছি ত, একদিকে যেমন জন্ম, অন্য দিকে সেইরূপ নাশ—যোগ ও বিয়োগ, ফলে কোন পরিবর্ত্তন হয় না। তাহা না হইলেও এই জন্মস্থিতিনাশরূপ নিত্য পরিবর্ত্তনযুক্ত জগৎকে আমরা 'জগৎ'-কল্পনামাত্র ধারণা করি, অথবা সত্য বলিয়া ধারণা করি—ইহার মূলে আধাররূপে,—অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য কারণরূপে এক অনন্ত শক্তিমান্ সদ্‌বস্তুর ধারণা না করিলে, এই জন্ম-স্থিতি-লয়রূপ নিত্য পরিবর্ত্তন আমরা বুঝিতে পারি না। সেই 'সৎ'ই ব্রহ্মরূপে জ্ঞেয়। সেই 'সৎ' (Being) হইতে স্বভাবতঃ সর্ব্বভূত ভাবরূপের,

উদ্ভব ও বিকাশ (Becoming) হইয়া, আবার তাহাতেই মিলাইয়া (Nought হইয়া) যায়—অব্যক্ত হয়, সেই সংকারণেই লীন হয়। ইহাই জগতের কর্ম্মচক্র (process)। ইহা নিত্য। পূর্ব্বে ৯।১০ম শ্লোকে "জগৎ বিপরিবর্ত্ততে" এই কথার ব্যাখ্যা এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য। এই যে জগতের ও ভূতগণের নিয়ত বিপরিবর্ত্তন (এই যে infinite procession) ইহাই সকলকে উৎপত্তির পর বিকাশ, বৃদ্ধি ও অপক্ষয়ের মধ্য দিয়া মৃত্যুমুখে লইয়া যায় (জগৎকে Evolution ও Involution এর মধ্য দিয়া Dissolutionএর দিকে লইয়া যায়)। এই বিপরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া জীবের ক্রম আপূরণ হয়। যাহা হউক, এই নিয়ত বিপরিবর্ত্তনমধ্যে এক নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় অবিকারী সত্তার ধারণা না করিলে, আমরা এই পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারি না। এই নিত্য পরিবর্ত্তনমধ্যে—এই নিয়ত জন্ম-স্থিতি-লয়ের মধ্যে যে অপরিবর্ত্তনীয়, অচল, সনাতন 'ভাব' বিদ্যমান, যে আধারে, যাঁহার বুকে মহাকালের এই জন্মস্থিতিনাশরূপ নিত্য ক্রিয়া, তিনিই অবিক্রিয় ব্রহ্ম। তিনিই এই প্রকারে সর্ব্বভূতের ভর্ত্তা, গ্রসিষ্ণু ও প্রভবিষ্ণুরূপে জ্ঞেয়।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্ ॥ ৭

জ্যোতিঃ সকলের জ্যোতিঃ, তিনি তমঃ-পারে
অবস্থিত ; জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞানগম্য রূপে,
তিনি হন সবাকার হৃদে অবস্থিত ॥ ১৭

১৭। জ্যোতিঃ সকলের জ্যোতিঃ (জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ)—

ব্রহ্ম—সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি দীপ্তিময় বস্তু সকলের জ্যোতিঃ। আত্মস্বরূপ চৈতন্যের জ্যোতির্দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়াই তাহারা প্রকাশ পায়। শ্রুতিতে আছে—"যেন সূর্য্যস্তপতি জ্যোতিষেদ্ধঃ।" (শঙ্কর)। দীপ, আদিত্য, মণি প্রভৃতির তিন জ্যোতিঃ বা প্রকাশক। আত্মপ্রভারূপ জ্ঞানই দীপ-সূর্য্যাদি সকলকে প্রকাশ করে। দীপ-সূর্য্যাদির জ্যোতিঃ কেবল বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ হইলে, বিষয়-প্রকাশের বিরোধী অন্ধকারকে মাত্র নষ্ট করিয়া দিয়া বাহ্যবস্তুকে জ্ঞানের নিকট প্রকাশ করে। (রামানুজ)। ব্রহ্মজ্যোতির্দ্বারা অবভাসক বাহ্য আদিত্যাদির ন্যায় অন্তরে বুদ্ধি প্রভৃতিও আত্মচৈতন্য জ্যোতির্দ্বারা প্রকাশিত হয়। চৈতন্য-জ্যোতিঃ জড় বস্তুর জ্যোতির অবভাসক (মধু)। ব্রহ্মই সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কগণের প্রকাশক (স্বামী, বলদেব)।

শ্রুতিতে আছে—

ব্রহ্ম—"জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" (বৃহদারণ্যক, ৪।৪।১৬)।

অন্যত্র আছে—

"হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তৎ শুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ॥"

(মুণ্ডক, ২।২।৯)।

এ স্থলে শঙ্কর অর্থ করেন যে, হিরণ্ময় অর্থে বিজ্ঞান-প্রকাশযুক্ত। ব্রহ্ম-জ্যোতিকে জ্ঞানস্বরূপ প্রকাশক জ্যোতিঃ বলা হইয়াছে।

শ্রুতিতে অন্যত্র আছে—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥"

(কঠ, ৫।১৫; মুণ্ডক, ২।২।১০; শ্বেতাশ্বতর, ৬।১৪)।

বৃহদারণ্যকে জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে (৪।৩।২-৯) এইরূপ আছে—

জনক। "যাজ্ঞবল্ক্য কিং জ্যোতিরয়ং পুরুষঃ?"

যাজ্ঞবল্ক্য। "আদিত্যজ্যোতিঃ সম্রাট্!" আদিত্যেনৈব জ্যোতিষা তে পলায়ন্তে কর্ম্ম কুরুতে..."

জনক। আদিত্যে অস্তমিতে কিং জ্যোতিরেব অয়ং পুরুষঃ?

যাজ্ঞবল্ক্য। "চন্দ্রমা এবাস্য জ্যোতির্ভবতি..."

জনক। "অস্তমিতে আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্যস্তমিতে কিং জ্যোতিরেবায়ং পুরুষঃ?"

যাজ্ঞবল্ক্য। "অগ্নিরেব অস্য জ্যোতির্ভবতি...।"

জনক। অস্তমিতে আদিত্যে চন্দ্রমস্যস্তমিতে শান্তেঽগ্নৌ কিং জ্যোতিরেবায়ং পুরুষঃ?"

যাজ্ঞবল্ক্য। "বাগেবাস্য জ্যোতির্ভবতি...।" * * *

জনক। অস্তমিতে আদিত্যে চন্দ্রমস্যস্তমিতে শান্তেঽগ্নৌ শান্তায়াং বাচি কিং জ্যোতিরেবায়ং পুরুষঃ?"

যাজ্ঞবল্ক্য। "আত্মৈবাস্য জ্যোতির্ভবতি... ।"

ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩।১৭।৭) আছে—

"আদিৎ প্রত্নস্য রেতসঃ উদ্বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিঃ পশ্যন্ত উত্তরং স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরং দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্ ইতি।" অর্থাৎ "আদি বা পুরাণ কারণের (ব্রহ্মের) জ্যোতিঃ তমঃ অতীত (অপ্রাকৃত)। জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মার স্বীয় জ্যোতিঃ উহা হইতেও উৎকৃষ্ট। এই আত্ম-জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া আমরা দেবগণের মধ্যে সূর্য্যস্বরূপ দেবকে প্রাপ্ত হইয়াছি। উহা উত্তম জ্যোতিঃ।"

ইহা হইতে জানা যায় যে, আত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ—সর্ব্বপ্রকাশক। আত্মার জ্যোতিতে অন্তঃকরণ জ্যোতির্যুক্ত হইয়া প্রকাশক হয়, আত্মার জ্যোতিতেই বাহ্য বিষয় প্রকাশিত হয়। বাহ্যবস্তু সকল অবশ্য সূর্য্যাদি

কোন জ্যোতিষ্মান্ বস্তুর আলোকে আলোকিত না হইলে, চক্ষু তাহার রূপাদি গ্রহণ করিয়া অন্তঃকরণের নিকট প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কের সাহায্যেই বাহ্যবিষয় বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়গোচর হয়। ইহাই আপাততঃ মনে হয়। কিন্তু সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কগণ এই প্রকাশ-শক্তি—এই আলোক কোথা হইতে পায়? ইহার উত্তর এই যে, ইহারা ব্রহ্মের জ্যোতির্দ্বারাই প্রকাশক হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥" (১৫।১২)

ব্রহ্মজ্যোতির্দ্বারা সূর্য্য-চন্দ্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডল তাপ ও আলোকযুক্ত হইলে, সেই আলোক এ জগৎকে উদ্ভাসিত করে, এজন্য এই বাহ্যজগৎ আমাদের চক্ষুগ্রাহ্য হয়। আমরা তাহার রূপ, আকার, বর্ণ প্রভৃতি গ্রহণ করিতে পারি। সাধারণভাবে আমরা ইহা বুঝিতে পারি। কিন্তু শ্রুতি বলিয়াছেন—আত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ। আমাদের জ্ঞানে আত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ, এই তত্ত্ব প্রতিভাত হইলে ব্রহ্ম যে জ্যোতিঃস্বরূপ, সর্ব্বজ্যোতিষ্কের জ্যোতিঃ, তাহা বুঝিতে পারিব। আত্মা অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হইয়া বুদ্ধি ও মনের প্রকাশক হয়। এই আত্মজ্ঞান ও চৈতন্যের প্রতিবিম্ব হেতু বুদ্ধি জ্ঞান-স্বরূপ হয়, চৈতন্যযুক্ত হয়। ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া যখন বাহ্য-বিষয় অন্তরে প্রবেশ করে, অথবা ইন্দ্রিয়গণ যখন স্ব স্ব বিষয়কে আহরণ করিয়া মনকে উপহার দেয়, এবং জ্ঞান তাহা গ্রহণ করে, তখন যে জ্ঞানের ক্রিয়া হয়, তাহাতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দুই ভাব জ্ঞানে প্রকাশিত হয়। আত্মজ্যোতিঃ বা আত্মার স্বরূপ যে জ্ঞান, তাহা দ্বারা উদ্ভাসিত জ্ঞাতা তখন সমুদায় জ্ঞেয় বিষয়কেও প্রকাশ করে, এবং সেই জ্ঞেয় বিষয়ের আধাররূপে বাহ্যজগৎকে প্রকাশ করে। এইরূপে আত্ম-জ্যোতিঃ দ্বারাই জ্ঞানে বাহ্যজগৎ 'জ্ঞেয়' হয়। আধুনিক দর্শনের ভাষায়

subjectই সমুদায় objectএর প্রকাশক, এবং সেই সঙ্গে আপনাকেও প্রকাশ করে। যাহা প্রকাশক, তাহাই জ্যোতিঃস্বরূপ।

যদি বাহ্য-জগতের কোন 'জ্ঞাতা' না থাকিত, তবে বাহ্য-জগৎ আদৌ প্রকাশিত হইত না, এবং তাহা হইলে বাহ্য-জগৎ আদৌ আছে কি নাই, তাহা জানা যাইত না। 'জ্ঞেয়' হয় বলিয়াই বাহ্য-জগতের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। শুধু তাহাই নহে। বাহ্য-জগৎ আমাদের জ্ঞেয় হয় বলিয়াই আমরা জ্ঞাতা হই। জ্ঞেয় না থাকিলে জ্ঞাতাও থাকিত না। উভয়ে পরস্পর আপেক্ষিক। জ্ঞেয় না থাকিলে অন্তঃকরণে আমি জ্ঞাতারূপে প্রকাশিত হইতাম না। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, আত্মজ্যোতিতেই বুদ্ধি প্রকাশক হয়, ও জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দ্বৈতকে যুগপৎ প্রকাশ করে। সেজন্য আমি আছি ও এই বাহ্য-জগৎ জানিতেছি—এই অনুভব হয়।

এই আত্মজ্যোতিঃ যেরূপ জীব-হৃদয়ে স্ফুরিত হইয়া প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়কে প্রকাশ করে, সেইরূপ সর্ব্বজীব-হৃদয়ে সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠিত এক পরমাত্মজ্যোতিতে এই সমুদয় জগৎ প্রকাশিত হয়। তাহারই জ্যোতিতে সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় জগৎ (ক্ষেত্র) প্রকাশিত হয়। তিনিই আদিত্যে, চন্দ্রে, নক্ষত্রে সর্ব্বত্র অধিষ্ঠিত থাকিয়া সকলকে স্বীয় জ্যোতিতে জ্যোতির্যুক্ত করেন, এবং সেই জ্যোতির্দ্বারা সর্ব্ব-জগৎকে প্রকাশিত করিয়া সর্ব্বজীবের চক্ষুগ্রাহ্য করিয়াছেন। অতএব আমাদের জ্ঞানে যিনি এই জগৎ-প্রকাশক জ্যোতিষ্কগণের জ্যোতির কারণ, তিনি অবশ্য স্বপ্রকাশ স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ। যাহা কারণে নাই, তাহা কার্য্যে থাকিতে পারে না। এইরূপে আমাদের নির্ম্মল জ্ঞানে জ্যোতির জ্যোতিস্বরূপে ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন।

পরমাত্মা চৈতন্যজ্যোতির্দ্বারা সর্ব্বভূতের অন্তরে 'জ্ঞাতা' ও তাহার 'জ্ঞেয়' সূর্য্যাদিকে জ্যোতীরূপে প্রকাশ করেন, এই জন্য সূর্য্য, চন্দ্র

প্রভৃতিকে আমরা জ্যোতীরূপে জানিতে পারি। সূর্য্য-চন্দ্রাদির যে জ্যোতিঃ—যে তেজ, তাপ বা আলোক—আমাদের জ্ঞানে জ্ঞেয়রূপে প্রকাশ পায়, তাহার কারণ এই আত্মজ্যোতিঃ বা ব্রহ্মজ্যোতিঃ। আত্ম-জ্যোতিতে প্রভাসিত আমাদের জ্ঞান সূর্য্যচন্দ্রাদিকে যে প্রকার রূপ দিয়া, যে আলোক-বসন পরাইয়া জ্ঞাতার কাছে প্রকাশ করে, তাহারা সেইরূপেই প্রকাশিত হয়। তাহাদের তাহাই স্বরূপ বলিয়া আমাদের জ্ঞান হয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহাদের স্বরূপ কি, তাহা কি আমরা বুঝিতে পারি?

আধুনিক বিজ্ঞান সূর্য্যাদির সেই আলোক ও তাপাদিকে জড়শক্তি বলেন, এবং তাহা এক অনন্ত জড়শক্তির বিভিন্ন প্রকার বিকাশ বলিয়া কল্পনা করেন। বিজ্ঞান এই অনন্ত শক্তির আধারকে জড় ভৌতিক পরমাণু বা সূক্ষ্ম আকাশ (Ether) রূপে গ্রহণ করেন। আবার সেই জড় পরমাণুও যে সেই শক্তিরই বিকাশের বিভিন্ন অসংখ্য কেন্দ্র মাত্র (Centres of forces), তাহাও বলিয়া থাকেন। শক্তির আধার শক্তি—এ কল্পনা নিরর্থক। শক্তির অবশ্য আধার থাকিবেই থাকিবে। নিরাধার শক্তির ধারণাই হয় না। সে আধার যদি জড় পরমাণু বা জড় ভূত না হয়, জড়ই যদি শক্তিরই ক্রিয়াবিশেষ হইতে উৎপন্ন বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়, তবে তাহার যাহা নিত্য এক সৎ আধার, সেই 'শক্তিমান্' জড় ও শক্তি হইতে অন্য। তিনিই ব্রহ্মরূপে জ্ঞেয়।

অতএব পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম আমাদের অন্তরে জ্ঞাতাকে প্রকাশ করিয়া দিয়া, সেই জ্ঞাতা দ্বারাই জ্ঞাতার নিকট সূর্য্যাদিকে জ্যোতী-রূপে প্রকাশ করেন, এবং এই সকল জ্যোতিষ্ককে প্রকাশ করিয়া তাহাদের আলোক দ্বারা জ্ঞেয় জগতের সকল জ্যোতিহীন পদার্থকে ব্যবহার-ক্ষেত্রে সর্ব্বভূতের জ্ঞানে তাহাদের দর্শনেন্দ্রিয় বিকাশ করিয়া

দিয়া, সেই ইন্দ্রিয়-সাহায্যে প্রকাশ করেন। এইরূপে আত্মজ্যোতির্দ্বারা সমুদায় জ্যোতিষ্কগণ, ও তাহাদের আলোকে আলোকিত পদার্থ সকল আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত হয়। সর্ব্বভূতজ্ঞানে জ্যোতীরূপে যাহা কিছু প্রকাশিত হয়, সে প্রকাশের কারণ—এই পরমাত্মা। আর আমাদের সীমাবদ্ধ পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের বাহিরে যদি সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কের অস্তিত্ব থাকে, জ্ঞাতার অপেক্ষা না রাখিয়া যদি 'কোন' জ্ঞেয় বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভব হয়, তবে সে অস্তিত্ব সেই পরম জ্ঞাতা পরমেশ্বরের জ্ঞানে 'জ্ঞেয়'রূপেই তাহা সম্ভব। জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মেই পরম জ্ঞাতা ও পরম জ্ঞেয় কল্পিত হইতে পারে। অতএব আমরা যে ভাবেই হউক, বলিতে পারি যে, জ্ঞানস্বরূপ ও শক্তিস্বরূপ ব্রহ্মের কল্পনাতেই সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক কল্পিত, এবং ব্রহ্মশক্তিতেই সূর্য্যাদি শক্তিযুক্ত, ব্রহ্মজ্যোতিঃতেই সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক জ্যোতির্যুক্ত। জ্যোতির জ্যোতীরূপে ব্রহ্ম জ্ঞেয়।

তিনি তমঃপারে অবস্থিত (তমসঃ পরমুচ্যতে)—পূর্ব্ব-শ্লোকে ব্রহ্মকে সূক্ষ্ম হেতু অবিজ্ঞেয় বলা হইয়াছে। তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান অথচ উপলব্ধ হন না, তাহাও বলা হইয়াছে। ইহাতে সন্দেহ হইতে পারে যে, তবে তিনি 'তমঃ' হইবেন। এই সন্দেহ নিরাস জন্য উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, ও অজ্ঞানরূপ তমঃ বা অন্ধকারের অতীত, অজ্ঞান তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না (শঙ্কর)। তমঃ অর্থে সূক্ষ্মাবস্থার প্রকৃতি। ব্রহ্ম (জীবাত্মা) এই প্রকৃতির অতীত (রামানুজ)। তমঃ অর্থাৎ অজ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ (স্বামী)। তমঃ অর্থাৎ জড়বর্গ। ব্রহ্ম তাহা হইতে পর, অর্থাৎ তাহা দ্বারা অসংস্পৃষ্ট। অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য সকল অপারমার্থিক। পারমার্থিক তত্ত্ব ব্রহ্ম সে সকল হইতে অসংস্পৃষ্ট। সৎ বা অসৎ—ইহাদের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধযোগ নাই। তিনি জড়ের সহিত অসংস্পৃষ্ট থাকিয়াও স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ (মধু)। তমঃ অর্থ প্রকৃতি দ্বারা অস্পৃষ্ট (বলদেব)।

ব্রহ্ম যে তমঃ হইতে অতীত, সে সম্বন্ধে শ্রুতি যথা—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥” (শ্বেতাশ্বতর ৩।৮)।

‘ব্রহ্ম তমসঃ পরম্ অপশ্যৎ। (মৈত্রায়ণী, ৬।২৪)।

‘প্রত্নস্য রেতসঃ তমসঃ পরি জ্যোতিঃ।’ (ছান্দোগ্য ৩।১৭।৭)।

“যস্তমসি তিষ্ঠন্ তমসোঽন্তরো যং তমো ন বেদ যস্য তমঃ শরীরং যস্তমোঽন্তরো যময়তি স আত্মা।”

(বৃহদারণ্যক, ৩।৭।১৩)।

স্মৃতিতে আছে—

“নিঃসঙ্গস্য সসঙ্গেন কূটস্থস্য বিকারিণা।
আত্মনোঽনাত্মনো যোগো বাস্তবো নোপপদ্যতে॥”

(মধুসূদনধৃত বচন)।

এই সকল প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, এই তমঃ সৃষ্টির বীজ অবিদ্যা বা অজ্ঞান হইতে পারে অথবা সৃষ্টির মূল উপাদান কারণ হইতেও পারে। তমঃ অর্থে যে অজ্ঞান, তাহা শ্রুতির ‘তমসঃ পারং দর্শয়তি’ (ছান্দোগ্য ৭।২৬।২), ‘তমসো মা জ্যোতির্গময়’ (বৃহদারণ্যক ১।৩।২৮), ‘অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি’ (বৃহদারণ্যক ৪।৪।১০), ‘অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসা বৃতাঃ’ (ঈশ ৩), ‘পারায় তমসঃ পরস্তাৎ’ (মুণ্ডক, ২।২।৬)··· ইত্যাদি মন্ত্র হইতে জানা যায়। তাহা হইলে, অর্থাৎ তমঃ অর্থে যদি অজ্ঞান বা অবিদ্যা হয়, তবে তাহার বিপরীত ‘জ্যোতিঃ’ অর্থে জ্ঞানের জ্যোতিঃ—ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকাশ মাত্র বুঝিতে হয়। আর তমঃ অর্থে যদি প্রকৃতি বা জড় বর্গ বা জড় জগৎ কারণকে বুঝিতে হয়, তবে এই জড় অপ্রকাশ জ্যোতিহীন বলিয়া জ্যোতিঃ অর্থে আলোক, প্রভা, দীপ্তি, বা জড়ের বিপরীত ধর্ম্মযুক্ত পদার্থ বুঝিতে হয়। তাহা দ্বারাই জড়

সূর্য্যমণ্ডল জ্যোতির্মুক্ত, আর সে জ্যোতিঃ ব্রহ্মের,—এইরূপ অর্থ করিতে হয়। কিন্তু সে অর্থ তত সঙ্গত হয় না। তমঃ অর্থে যে জগতের অতি জড় কারণ, সে সম্বন্ধে শ্রুতি যথা—

"তমো বা ইদমগ্র আসীৎ" (মৈত্রায়ণী, ৫।২)।

এই শ্রুতি অনুসারে জগতের আদি কারণ 'তমঃ'; সেই তমঃ হইতে রজঃ (ক্রিয়া) উৎপন্ন হয়, (তৎপরেণেরিতং বিষমত্বং প্রয়াতৈ রজসঃ রূপম্ ইতি মৈত্রায়ণী শ্রুতি) এবং এই রজঃ হইতে সত্ত্বের উৎপত্তি হয়। এই তমঃ রজঃ ও সত্ত্ব মিলিয়া প্রকৃতি। যে প্রকৃতি সাংখ্যের মূল তত্ত্ব, এই শ্রুতি অনুসারে তাহা মূলতত্ত্ব নহে, তাহা আদি তমঃ হইতে উৎপন্ন। সে আদি তমঃ কতকটা chaos এর অনুরূপ। ঋগ্বেদেও এই তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে। যথা সৃষ্টির আগে—

'তম আসীৎ তমসা গূঢ়ম্ অগ্রে
অপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বম্ আ ইদম্।
তুচ্ছ্যেন আ ভু অপিহিতং যৎ আসীৎ
তপসঃ তৎ মহিনা অজায়ত একম্॥'

(১০ম মণ্ডল ১২৯ সূক্ত ৩ মন্ত্র)।

এই সূক্ত অনুসারে সৃষ্টির পূর্ব্বে 'সৎ'ও ছিল না, 'অসৎ'ও ছিল না। ... কিছুই ছিল না—কেবল পরম 'এক' ছিলেন (এই সূক্তের ১২ ঋক্)। এই সৃষ্টি তখন ঘোর অন্ধকারে আবৃত ছিল। সেই এক সেই অন্ধকার অতিক্রম করিয়া প্রকাশিত হইলেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে সেই 'এক' তমঃ দ্বারা গূঢ় ছিলেন, (আবৃত ছিলেন)। এই তমঃ সম্বন্ধে সায়ণ অর্থ করেন যে, যেমন নৈশ অন্ধকার সর্ব্বপদার্থজাতকে আবৃত করিয়া রাখে, সেইরূপ আত্মতত্ত্বের আবরক হেতু মায়া বা রূপবাচ্যভাবরূপ অজ্ঞানই এস্থলে তমঃশব্দবাচ্য। সেই তমঃ জগৎ-কারণভূত। তাহা দ্বারা নিগূঢ়ভাবে সেই 'এক' আচ্ছাদিত ছিলেন। সেই আচ্ছাদক তমঃ

হইতে নামরূপের দ্বারা জগৎ বিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা হইতেই জগতের সৃষ্টি।" অতএব সায়ণের অর্থানুসারে এই তমঃ মূল অজ্ঞান বা মায়া। ইহাই জগৎ-কারণ। ব্রহ্ম তাহার অতীত।

জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞানগম্য—জ্ঞান অত্যন্ত দুর্ল্লভ ভাবিয়া যদি কোন সাধক অবসাদযুক্ত হন, তবে তাঁহাকে উৎসাহ দিবার জন্য বলা হইতেছে যে, এই জ্ঞেয়ই জ্ঞান, অর্থাৎ অমানিত্ব প্রভৃতি সাধন যে জ্ঞান, তাহাই এই জ্ঞেয় ব্রহ্ম, তাহাই সেই জ্ঞানে জ্ঞেয়; 'জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি' বলিয়া তাহা আরব্ধ হইয়াছে, উপসংহারে তাহাই বলা হইতেছে। এই জ্ঞেয়ই জ্ঞানগম্য, জ্ঞেয় যখন জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাই জ্ঞানের ফল বলিয়া বুঝিতে হয়। জ্ঞানের বিষয়কে জ্ঞেয় বলে, যাহা 'জ্ঞায়মান', তাহা জ্ঞেয়। (শঙ্কর)। যাহা জ্ঞেয়, তাহা জ্ঞানের সহিত এক আকার, তাহাই অমানিত্ব প্রভৃতি উল্লিখিত জ্ঞানসাধনের দ্বারা প্রাপ্য (রামানুজ)। সেই ব্রহ্মই বুদ্ধিবৃত্তিতে অভিব্যক্ত জ্ঞান, তাহাই রূপাদি আকারে জ্ঞেয়, তাহাই পূর্ব্বোক্ত অমানিত্বাদিলক্ষণ জ্ঞানসাধনের দ্বারা প্রাপ্য (স্বামী)। তাহা জ্ঞান অর্থাৎ প্রমাণজন্য চিত্তবৃত্তিতে অভিব্যক্ত সংবিৎ-রূপ, তাহাই অজ্ঞাত বলিয়া জানিবার যোগ্য। জড় অজ্ঞাত নহে, এজন্য তাহা জানিবার যোগ্য নহে। ব্রহ্ম যদি অজ্ঞাত হন, জ্ঞানের যোগ্য না হন, তবে তাঁহাকে জানিতে পারা যায় কিরূপে? ইহারই উত্তরে বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম জ্ঞানগম্য। অর্থাৎ অমানিত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন পর্য্যন্ত যে জ্ঞানের হেতু বিভিন্ন সাধন সকলকে জ্ঞান বলা হইয়াছে, সেই জ্ঞানেরই ইহা গম্য। এই সকল সাধন ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ব্রহ্ম জ্ঞানগম্য হন না (মধু) জ্ঞান=চিদেকরস। 'বিজ্ঞানমানন্দঘনং ব্রহ্ম'—ইতি শ্রুতিঃ। জ্ঞেয়—মুমুক্ষুর একমাত্র শরণ্য বলিয়া জানিবার যোগ্য। "তং হ দেবম্ আত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষু র্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে" ইতি শ্রুতিঃ। ব্রহ্মই জ্ঞানগম্য। "তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি"—ইতি

শ্রুতিঃ। (বলদেব) জ্ঞান=অমানিত্বাদি। জ্ঞেয়=অনাদিমৎপরং ব্রহ্ম। জ্ঞানগম্য=জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্য ফল। (হনু)।

এ স্থলে ব্রহ্মকে জ্ঞান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, চিৎস্বরূপ বা সংবিৎস্বরূপ। শ্রুতিতে ইহা বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে. যথা—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" (তৈত্তিরীয়, ২।১।১)।

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।" (মুণ্ডক, ১।১।৯)।

ব্রহ্ম যে বিজ্ঞানস্বরূপ, তাহাও শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম।" (বৃহদারণ্যক, ৩।৯।২৮)।

"যো বিজ্ঞানং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে।" (ছান্দোগ্য, ৭।৭।২)।

"যস্য বিজ্ঞানং শরীরম্।" (বৃহদারণ্যক ৩।৭।২২)।

"বিজ্ঞানং ব্রহ্ম ইতি ব্যজনাৎ। বিজ্ঞানাৎ হি এব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি, বিজ্ঞানং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি—ইতি।" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ৩।৫)।

"সর্ব্বং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতম্…প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।" (ঐতরেয়, ৩।৫)।

ব্রহ্মই যে একমাত্র বিজ্ঞাতা, তাহাও শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে।

"নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতা।" (বৃহদারণ্যক, ৩।৭।২৩)।

"যেন সর্ব্বমিদং বিজানাতি…অরে বিজ্ঞাতারং কেন বিজানীয়াৎ।" (ছান্দোগ্য ৩।৪।৩৪)।

জ্ঞান—ব্রহ্ম যে জ্ঞানরূপ, তাহা আমরা কিরূপে ধারণা করিব? নানাভাবে মনন ও চিন্তা করিয়া ইহার উপলব্ধি হইতে পারে। ব্রহ্ম যে জগৎকারণরূপে জ্ঞেয়, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। জগতের যে এক অদ্বিতীয় মূল কারণ আছে এবং তাহাকে যে সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বাধার বলিয়া 'ব্রহ্ম' বলা যায়, তাহা শ্রুতির উপদেশ বিনাও অনেক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিত, তাঁহাদের জ্ঞানে ধারণা করিয়াছেন।

তাঁহাদের এই একত্ববাদের নাম Monism। কিন্তু কেহ সেই আদি কারণকে জড় বলেন, কেহ জড়শক্তি বলেন, কেহ আকাশ বা ether বলেন, কেহ অচৈতন্য ইচ্ছাশক্তি বলেন। কেহ বলেন, সেই আদি কারণে কোনরূপ জ্ঞান বা চৈতন্য নাই; কেহ বলেন, তাহাতে জ্ঞান বীজভাবে থাকিতে পারে; কেহ বলেন, তাহা অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপ; কেহ বলেন, তাহা জ্ঞান ও অজ্ঞানের অতীত তত্ত্ব।

যাঁহারা "জ্ঞানপ্রসাদে বিশুদ্ধসত্ত্ব' (মুণ্ডক, ৩।১।৮) তাঁহারাই সেই অনাদিমৎ অদ্বিতীয় জগতের পরম কারণকে অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মরূপে জানিতে পারেন। প্রথমতঃ জগতে সর্ব্বপ্রাণীর মধ্যে যে জ্ঞানের ক্রমবিকাশ হইয়া থাকে, এবং মানুষের মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ অবস্থায় যে সেই জ্ঞানের বিশেষ অভিব্যক্তি হয়, তাহা হইতে জগতের যাহা আদিকারণ, তাহা যে পূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি। যাহা কারণে নাই, তাহা কার্য্যে থাকিতে পারে না। যাঁহারা সৎকারণবাদ সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহাদের মতে কারণ-গুণ কার্য্যে অভিব্যক্ত হয়। অতএব জগতে এই যে সর্ব্বভূতের অন্তরে জ্ঞানের অভিব্যক্তি দেখা যায়, সেই জ্ঞান অবশ্য সেই আদি কারণেই নিহিত আছে। কিন্তু এ সিদ্ধান্তে এই আপত্তি হইতে পারে যে, সেই জ্ঞান কারণে বীজভাবে নিহিত থাকে মাত্র; তাহাতে জ্ঞান যে পূর্ণ অভিব্যক্ত, তাহা বলা যায় না।

তাহার পর জগতে আমরা শৃঙ্খলা, নিয়ম, বিবর্ত্তন ও পরিণতি প্রভৃতি দেখিয়া, তাহার মূলে যে অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান নিহিত আছে, তাহার ধারণা করি। জড়ের স্বভাব বা 'যদৃচ্ছায়' পরিণতি হইতে, অন্ধ শক্তির উদ্দেশ্যহীন, অভিসন্ধিহীন ক্রিয়াফলে যে এরূপ শৃঙ্খলাযুক্ত ও সুনিয়ত জগতের বিকাশ হইতে পারে, তাহা জড়বাদী পণ্ডিতগণও সিদ্ধান্ত করিতে পারেন না। এ জগতে সমুদায়ই পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে অবস্থিত, সকলই এক সূত্রে গ্রথিত, একই নিয়মে নিয়মিত। সবই যেন এক

বিরাট্ নিয়মের শাসনে থাকিয়া কি এক গূঢ় উদ্দেশ্যসাধনের জন্য জ্ঞান-বশে অগ্রসর হইতেছে। অতএব জগতের যাহা আদিকারণ, তাহা কেবল উপাদান-কারণ নহে, তাহা নিমিত্ত-কারণও বটে। সেই আদি-কারণ অনন্ত অব্যাকৃত জ্ঞানের দ্বারা সকলকে পরিচালিত করিতেছেন, সকলকে শাসন করিতেছেন, সকলকেই একই নিয়মে পরিণত করিয়া কোন অজ্ঞেয় উদ্দেশ্যসাধন জন্য নিয়মিত করিতেছেন। এ জগৎ-সৃষ্টির মূলে জ্ঞান, ইহার রক্ষা ও পরিণতির মূলে জ্ঞান, ইহার ধ্বংসেও সেই জ্ঞান নিহিত। এ জগতে প্রত্যেক বস্তুর উৎপত্তি, স্থিতি, পরিণতি ও নাশের মূলে সেই জ্ঞানেরই নিত্য অবস্থিতি। সেই বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের "বিজ্ঞানাৎ খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি,বিজ্ঞানং প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি।" সেই জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের বিজ্ঞান হইতেই এই সকল ভূতগণের উৎপত্তি, সেই বিজ্ঞান দ্বারাই জাত জীবগণ বিধৃত ও রক্ষিত হয়, এবং বিনাশকালে সেই বিজ্ঞানেই অনুপ্রবেশ করে। জগতের মূলে এই বিজ্ঞান না থাকিলে, এ সৃষ্টি আদৌ হইত না, হইলেও তাহা সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা, অনিয়ম, অমঙ্গল উপস্থিত করিয়া অচিরেই জগৎকে বিনাশের মুখে লইয়া যাইত,—সৃষ্টি থাকিত না।

জগতে সর্ব্বত্র এই যে জ্ঞানপূর্ব্বক ক্রিয়ার অভিব্যক্তি, এই যে জ্ঞান দ্বারা সমুদায় নিয়মিত, পরিচালিত, পালিত, সে জ্ঞান অবশ্য অনন্ত, অপরি-চ্ছিন্ন, অজ্ঞানসাধনাবিহীন। জগতে তাহা অনেক স্থলে পরিচ্ছিন্ন, অপ্রকট, অজ্ঞানযুক্ত মনে হয়। কেন না, কারণ কার্য্যরূপে পরিচ্ছিন্ন হয়; কার্য্য ব্যাপ্য, কারণ ব্যাপক। কারণের দ্বারা কার্য্য সীমাবদ্ধ; কিন্তু কারণ কাহারও দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় না, তাহার কেহ ব্যাপক নাই। এজন্য জগৎকারণ যে জ্ঞান, তাহা অবশ্য অপরিচ্ছিন্ন অনন্ত বলিতে হইবে।

এই জ্ঞান হইতেই জগতের সৃষ্টি। অজ্ঞান হইতে সৃষ্টি হয় না।

"ঈক্ষতে নাশব্দম্" বেদান্ত-দর্শনের এই (১।৫) সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রুতিতে আছে—'স অকল্পয়ৎ বহু স্যাং প্রজায়েয়।' এইরূপ কল্পনা, ঈক্ষণ বা ভাবনা হইতেই জগতের সৃষ্টি, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই কল্পনা বা ঈক্ষণ,—জ্ঞানেরই স্বভাব। শ্রুতি সর্ব্বত্র ব্রহ্মকে বিজ্ঞানস্বরূপ বলিয়াছেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে সেই জ্ঞানে 'জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এই দ্বৈত তত্ত্বের বিকাশ হয়।' "আমি" এইরূপ বহু জ্ঞেয় কল্পনা বা ঈক্ষণ করিতেছি—এইরূপ জ্ঞানের অভিব্যক্তি হয়। এ অভিব্যক্তিতেই জ্ঞানে এ জগৎ কিরূপ হইবে, কি নিয়মে পরিচালিত হইবে, কি উদ্দেশ্যে কি শক্তি হইবে, ইহাতে জীব-জগতের সংস্থান ও পরিণতি কিরূপ হইবে, সমুদায়ই যুগপৎ, বিনা চেষ্টায় ঈক্ষিত বা দৃষ্ট হয়। তাহা না হইলে, এরূপ শৃঙ্খলা ও নিয়মিত জগতের কদাচ অভিব্যক্তি হইতে পারিত না। এজন্য ব্রহ্মকে কামস্বরূপ বলিতে হয়।

সেই ব্রহ্মজ্ঞান নিরবচ্ছিন্ন। তাহা কোন ক্রিয়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। তাহা 'জ্ঞাতা' ও 'জ্ঞেয়' রূপ দ্বৈত দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। সৃষ্টিতে সে জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন বোধ হইলেও সৃষ্টির পূর্ব্বে সে জ্ঞান অপরিচ্ছিন্ন শুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ মাত্র। সৃষ্টির প্রারম্ভে কল্পনা, ঈক্ষণ বা 'কাম' হেতু তাহা জ্ঞাতা হইয়া সেই জ্ঞানের জ্ঞেয় বিষয় কল্পিত হয় মাত্র। নতুবা সূর্য্যের প্রকাশের স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান নিত্য। * নির্ম্মল চিত্তে সেই জ্ঞান প্রতিবিম্বিত হয় এবং তাহা হইতে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞেয় হয়।

যাহা হউক, নির্ম্মল জ্ঞানে জ্ঞেয় ব্রহ্ম যে জ্ঞানস্বরূপ, তাহা উক্ত প্রকার বিচার ব্যতীত, আমরা অন্যরূপে বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমরা আমাদের জ্ঞানের স্বরূপ বুঝিতে পারিলে, এ তত্ত্ব জানিতে পারিব।

---

* শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-দর্শনের ১।১।৫ সূত্র-ভাষ্যে এই তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন।

আমাদের জ্ঞান সাত্ত্বিক নির্ম্মল বুদ্ধিরই রূপ। একথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। যাহার বুদ্ধি যেরূপ, তাহার জ্ঞানও সেইরূপ। বুদ্ধি সাত্ত্বিক রাজসিক, তামসিক ভেদে বহুরূপে ভিন্ন হয়। জ্ঞানও তদনুসারে ভিন্ন হয়। যে জ্ঞান নির্ম্মল পরিশুদ্ধ অজ্ঞান-মলা-হীন তাহা অমানিত্বাদি রূপযুক্ত তাহা ক্ষেত্রের ধর্ম্ম। এ জ্ঞান আত্মার নহে। ইহা বৃত্তি জ্ঞান, ইহা বুদ্ধিরই এক রূপ, তাহা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। চিত্ত এরূপ চৈতন্য ও জ্ঞান-স্বভাব হয় কি প্রকারে? ইহার একমাত্র গ্রাহ্য উত্তর এই যে, আত্ম বা ব্রহ্ম জ্ঞান ও আত্ম-চৈতন্য আমাদের চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া, বুদ্ধিতে চৈতন্য ও জ্ঞানের আভাস হয়। চিত্ত যত নির্ম্মল হয়, তত এই জ্ঞানের স্পষ্ট আভাস গ্রহণ করে। এই জন্য বিভিন্ন চিত্তে জ্ঞান বিভিন্ন হয়। এই জ্ঞান বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই তিন রূপে ভিন্ন হয়। এই 'জ্ঞাতা' রূপে আমাতে আত্ম-ভাব বা স্ব-ভাব প্রকাশিত হয় এবং জ্ঞাতার এই আত্মভাব বা স্বভাব হইতে আমি কর্ত্তা জ্ঞাতা ভোক্তা ইত্যাদি রূপে বা অহঙ্কার তত্ত্ব চিত্তে প্রকাশিত হয়। আর এই 'জ্ঞেয়' হইতে চিত্তে 'ইদং' 'ত্বম্' ইত্যাদি বাহ্য জগৎ জ্ঞান ইন্দ্রিয় ও মনের সহায়তায় বিকাশিত হয়। জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় যখনই এই চিত্তে জ্ঞানের বিকাশ হয়, তখনই এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় জ্ঞানে প্রকাশিত হয়। সুষুপ্তি অবস্থায় বা তাহার অতীত তুরীয় অবস্থায় চিত্তে এইরূপ বৃত্তি জ্ঞানের বিকাশ হয় না। সে বৃত্তিনিরোধ অবস্থায় হয়ত আত্মজ্ঞান চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয় না। এইজন্য আত্মজ্ঞান—এই জ্ঞাতা জ্ঞেয়রূপ দ্বন্দ্বের অতীত, তাহা জ্ঞান-স্বরূপ, ইহা নির্ম্মল জ্ঞানে স্বতঃসিদ্ধ হয়।

তোমার আমার—সকলের চিত্তেই এইরূপ আত্মস্বরূপ প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া, জ্ঞাতা আমি এই জ্ঞেয় জগৎ জানিতেছি, এইরূপ অনুভব হয়। তোমার আমার—সকলের আত্মা এক; নতুবা সকলের চিত্তেই

সে জ্ঞান, একরূপ জ্ঞাতাকে ও একরূপ জ্ঞেয় জগৎকে প্রকাশ করিতে পারিত না। তুমি এই চিত্তবৃত্তির জ্ঞানে যেরূপ রূপ রস গন্ধাদি অনুভব কর, আমিও সেইরূপ অনুভব করি। যে আকাশ-তরঙ্গ (Ether waves) তোমার কাছে শুভ্র নির্ম্মল আলোকের জ্যোতিঃ প্রকাশ করে, আমার কাছেও সেইরূপ প্রকাশ করে। তুমি যে পরমাণু বিশেষ সংঘে ও যে শক্তি ক্রিয়ার আধারে—বিশেষ রূপরসাদি-বিশিষ্ট ঐ আম্রবৃক্ষ দেখিতেছ, সেখানে থাকিলে আমিও সেইরূপ ঐ আম্রবৃক্ষ দেখিব। অতএব যে আত্মজ্ঞান চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া তাহাতে এইরূপে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়কে একই প্রকারে প্রকাশ করে, সে আত্মজ্ঞান, তোমার বা আমার একার নহে। তাহা সকল ক্ষেত্রে, সকলের চিত্তে সমভাবে একই নিয়মে একই প্রকারে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়কে প্রকাশ করে। সৃষ্টির আদিতে, আমি বহু হইয়া উৎপন্ন হইব— এই কল্পনার হেতু বা ব্রহ্মজ্ঞানে যেরূপ জ্ঞেয় জগৎ অভিব্যক্ত ও বিধৃত, সেই জ্ঞানই আমার চিত্তে ও তোমার চিত্তে প্রতি-বিম্বিত হইয়া একই ভাবে আমাদের জ্ঞানে জ্ঞাতাকে জ্ঞেয় জগৎকে প্রকাশ করে। আমরা এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞানে কল্পিত জগৎকে একই ভাবে জানিতে পারি। সেই ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান, আমাদের চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া একই রূপ জ্ঞেয় জগৎ প্রকাশ করে। এজন্য অবশ্য বলিতে হয় যে তোমার, আমার ও সকলের আত্মা এক, তিনিই ব্রহ্ম। তিনিই পরমাত্মা। একই পরমাত্মা সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থিত, সেই একই পরমাত্মার জ্ঞান বিভিন্ন ভূতের চিত্তে প্রতিফলিত, তাহাদের চিত্ত বা বুদ্ধি একই প্রকারের বৃত্তি জ্ঞানযুক্ত। বৃত্তির মালিন্য হেতু সে জ্ঞান মলিন হইলে আত্মা তাহাতে পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় না। চিত্ত নির্ম্মল হইলেই তাহাতে এই পরমাত্ম-জ্ঞান প্রকাশিত হয়। পরমাত্মজ্ঞান চিত্তে পূর্ণরূপে প্রকাশিত না হইলেও, যতটুকু প্রতিবিম্বিত হয়, তাহাতেই আমি ও আমার জ্ঞেয় জগৎ আমার কাছে ব্যক্ত হয়। সেই পরমাত্মার জ্ঞান হইতেই এ জগৎ আমার জ্ঞানে

প্রকাশিত হয়। সেই জ্ঞানই আমার জ্ঞানে প্রকাশিত জগতের কারণ; অতএব অধ্যাত্ম যোগে শুদ্ধজ্ঞানে আমরা পরমাত্মাকে জ্ঞানস্বরূপ ও জগৎ-কারণ রূপে জানিতে পারি। নির্ম্মল পরিশুদ্ধ জ্ঞানে, এই প্রকারেই ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপে জ্ঞেয় হন।

ইহা হইতেও আমরা বুঝিতে পারি যে, ব্রহ্ম অবিভক্ত এক হইয়াও কেন সর্ব্বভূতে বিভক্তের ন্যায় প্রতীয়মান হন। সর্ব্বভূতের চিত্ত বিভিন্ন বলিয়া, ব্রহ্মজ্ঞান তাহাতে বিভিন্নরূপে প্রতিফলিত বা প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়াই প্রতি জীবে বিভক্তের ন্যায় তাঁহাকে বোধ হয়। আমাদের, এই প্রতি-বিম্বিত জ্ঞানে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় একরূপে প্রকাশিত হইলেও চিত্তের বিভিন্ন রূপ মলিনতা হেতু পার্থক্য জন্য জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিভিন্ন রূপে উভয়েই প্রতীয়মান হয়। কেবল যে দেশকাল নিমিত্ত পরিচ্ছেদ হেতু ভূতগণকে পৃথক্ বোধ হয় বলিয়া, তাহাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত ব্রহ্ম বা পরমাত্মা পৃথক্ বোধ হয়, তাহা নহে। এই বিভিন্ন ভূত জ্ঞানে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয় বলিয়া জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে বিভক্তের ন্যায় বোধ হয়। কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম পরমাত্মারূপে সর্ব্বহৃদয়ে অবিভক্ত ভাবে অধিষ্ঠিত থাকেন।

জ্ঞেয়—ব্রহ্ম যেমন জ্ঞানস্বরূপ সেই প্রকার 'জ্ঞেয়' স্বরূপও বটেন। আমাদের জ্ঞানে জ্ঞেয় রূপে যাহা কিছু প্রকাশিত হয়, তাহা ব্রহ্ম। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" ব্রহ্ম সৃষ্টির প্রারম্ভে 'আমি' বহু হইব, এই কল্পনা বা ঈক্ষণ করিয়া যে জগৎ সৃষ্টি করেন. এবং তাঁহার জ্ঞেয় রূপে যে জগৎ জ্ঞানে ধারণ করেন, আমাদেরও সেই জ্ঞান প্রতিবিম্বিত বুদ্ধিতে—বা বৃত্তি জ্ঞানে সেইরূপ 'জগৎ' সীমাবদ্ধ হইয়া দেশকাল নিমিত্ত পরিচ্ছিন্ন হইয়া জ্ঞেয় হয়। ব্রহ্ম জ্ঞানে যাহা জ্ঞেয়, তাহা ব্রহ্মের জ্ঞানেরই রূপ। সুতরাং আমাদের জ্ঞানে বা বৃত্তি জ্ঞানে যাহা জ্ঞেয়, তাহা সেই জ্ঞানেরই রূপ; তাহাই আমাদের বৃত্তি জ্ঞানে প্রতিফলিত জ্ঞেয় রূপের আংশিক

পরিচ্ছিন্ন বিকাশ। এই ব্রহ্ম জ্ঞান দ্বারাই আমরা এই সকল—অর্থাৎ এই জ্ঞেয় জগৎ আমাদের বৃত্তি জ্ঞানে জানিতে পারি। তিনি জ্ঞেয়-রূপ হইয়া জগৎ-রূপ হইয়া আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত হন বলিয়া, আমরা জগৎকে জানিতে পারি। শ্রুতিতে আছে—

"যেন সর্ব্বমিদং বিজানাতি।" (ছান্দোগ্য ৩-৪,১৪)।

অদ্বৈত বিজ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম যে দ্বৈত—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় রূপ হন, তাহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। যত্র অদ্বৈতভূতং বিজ্ঞানং দ্বৈতীভূতম্।" (মৈত্রায়ণ ৬।৪) গৌড়পাদ কারিকায় আছে (৩,৩১)।

"অকল্পকম্ অজং বিজ্ঞানং জ্ঞেয়াভিন্নম্"। ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্ম নির্ম্মল জ্ঞানে সমুদয় 'জ্ঞেয়' রূপেই জ্ঞেয়। তিনি ব্যতিরিক্ত অন্য কোন জ্ঞেয় নাই। সকল জ্ঞেয়ই তাঁহাতে অভিব্যক্ত। আমাদের জ্ঞানে ভ্রম হেতু যেমন রজ্জুতে সর্প কল্পিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মেতেই সমুদায় জগৎ কল্পিত—সমুদায় জ্ঞেয় বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ এই ব্রহ্ম। তাঁহার সত্তাতেই সমুদায় জ্ঞেয় সত্তাযুক্ত ও প্রতিষ্ঠিত, ভ্রান্তি দূর হইলে জ্ঞান পরিশুদ্ধ হইলে আমরা ইহা বুঝিতে পারি। শঙ্করের অনুবর্ত্তী হইয়া আমরা একথাও বলিতে পারি।

জ্ঞানগম্য।—জ্ঞান নির্ম্মল হইলে, অমানিত্বাদি লক্ষণযুক্ত হইলে ব্রহ্মই তাহার একমাত্র জ্ঞেয় হয়, তখন ব্রহ্মই একমাত্র জ্ঞেয়রূপে সে জ্ঞানে প্রকাশিত হয়, এজন্য ব্রহ্ম সেই জ্ঞানগম্য। এই জ্ঞানেই ব্রহ্ম প্রাপ্তব্য। এই ব্রহ্মেই জ্ঞানের স্থিতি হয়। ব্রহ্মই তাহার ধাম (goal) তাহার একমাত্র গন্তব্য, প্রাপ্তব্য (ideal), ও শেষ বিশ্রাম স্থান তাহার পরম পুরুষার্থ। নির্ম্মল জ্ঞানে ব্রহ্ম জ্ঞেয় বটে, কিন্তু যাহা কেবল জ্ঞেয়রূপ তাহাতে জ্ঞানের স্থিতি হয় না, তেমনি জ্ঞেয় স্বরূপ ব্রহ্ম জ্ঞানের বিশ্রাম স্থান হন না। জ্ঞাতা-স্বরূপেই জ্ঞানের স্থিতি। সমাধি অবস্থায় যখন চিত্ত বৃত্তির নিরোধ হয়, তখন আত্মা কেবল দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা-স্বরূপে অব-

করেন (পাতঞ্জল দর্শন ১।১, ২ সূত্র)। তখন স্বতন্ত্র জ্ঞেয় থাকে না, জ্ঞাতার মধ্যে জ্ঞেয় বিলীন হইয়া যায়। তখন জ্ঞান কেবল জ্ঞাতা-স্বরূপেই আপনাকে প্রতিষ্ঠা করে। সেই শুদ্ধ জ্ঞাতা-স্বরূপ আত্মাই ব্রহ্ম। প্রমাতা-রূপে, বিজ্ঞাতারূপে ব্রহ্ম জ্ঞানে প্রতিভাত হন। এই পরম বিজ্ঞাতারূপেই ব্রহ্ম জ্ঞানগম্য। ব্রহ্মই জ্ঞান, ব্রহ্মই জ্ঞাতা, ব্রহ্মই জ্ঞেয়। ব্রহ্মই প্রমাতা চৈতন্য, প্রমাণ চৈতন্য ও প্রমেয় চৈতন্য। এই ত্রিপুটী ব্রহ্ম একীভূত। ব্রহ্মজ্ঞান—এইরূপে জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞানস্বরূপ। সেই জ্ঞান আমাদের চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া, তাহাতে জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞান এ তিনের প্রকাশ হয়। তিনি ব্যতীত আর কেহ জ্ঞাতা নাই—"নান্যদস্তি বিজ্ঞাতা" তিনিই একমাত্র বিজ্ঞাতা, আর কিছু দ্বারা সে বিজ্ঞাতাকে জানা যায় না—'বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ' (ছান্দোগ্য ৩।৪।৩৪)। অতএব এই জ্ঞানগম্য শব্দের দ্বারা সেই বিজ্ঞাতাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। নির্ম্মল জ্ঞানে ব্রহ্মই একমাত্র বিজ্ঞাতা-রূপে প্রকাশিত হন। তখন সাধক আর আপনাকে পরিচ্ছিন্ন বিজ্ঞাতা বলিয়া বোধ করে না। চিত্তে প্রতিবিম্বিত তাহার পরিচ্ছিন্ন বিজ্ঞাতারূপের অন্তরালে যে ব্রহ্মস্বরূপ—পরমাত্মাস্বরূপে বিজ্ঞাতা অবস্থিত থাকিয়া, তাহাকে বিজ্ঞাতা করিয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারে। জ্ঞান তাহাতেই বিলীন হইতে চায়। অতএব ব্রহ্ম নির্ম্মল জ্ঞানে বিজ্ঞাতা রূপেই গম্য।

ব্রহ্মই যে আমার মধ্যে বিজ্ঞাতা, তাহা মলিন জ্ঞানে ধারণা হয় না। যেমন আত্মজ্ঞান চিত্তে প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ সে চিত্তও আত্মাতে প্রতিবিম্বিত হয়। এই প্রতিবিম্ব হেতু আমাদের আত্মাতে চিত্তের ছায়া পড়ে। চিত্ত যদি নির্ম্মল হয়, তবে তাহাতে কেবল আত্মারই ছায়া পড়ে, আত্মা সেই প্রতিবিম্বেই আত্মাকে দর্শন করে। চিত্ত মলিন হইলে আত্মার ছায়াও তাহাতে মলিন হয়, চিত্তে আর আত্মদর্শন হয় না।

আত্মাও সেই মলিন চিত্তের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া আপনাকে মলিন বোধ করে। এজন্য যাহার চিত্ত যত মলিন, তাহার আত্মাও তত মলিন রূপে তাহার নিকট প্রতিভাত হয়। এই মলিন জ্ঞানে আত্মা পরিচ্ছিন্ন— সীমাবদ্ধ বোধ হয়। এইরূপে পরিচ্ছিন্ন—চিত্তবদ্ধ আত্মা, আপনাকে জ্ঞাতা রূপে, পৃথক্ বোধ করে। যখন চিত্ত নির্ম্মল হইয়া তাহাতে আত্ম-স্বরূপ প্রকাশিত হয়, তখন আত্মাকে অপরিচ্ছিন্ন নির্ম্মল সর্ব্বগত সর্ব্বাত্মা রূপে অনুভব হয়। তখন সেই জ্ঞানে আপনাতে ও সর্ব্বভূতে একমাত্র বিজ্ঞাতার দর্শন লাভ হয়। তাই বলিতেছি, ব্রহ্ম নির্ম্মল জ্ঞানে বিজ্ঞাতারূপে প্রাপ্য।

সবাকার হৃদে অবস্থিত।—মূলে দুইরূপ পাঠ আছে 'সর্ব্বস্য হৃদি বিষ্ঠিতম্' আর 'সর্ব্বস্য হৃদি ধিষ্ঠিতম্।' 'বিষ্ঠিতং' অর্থাৎ বিশেষ ভাবে অবস্থিত, সন্নিহিত (রামানুজ)। বিশেষ ভাবে অপ্রচ্যুতরূপে নিয়ন্তা-স্বরূপে অবস্থিত (স্বামী, বলদেব)। বিশেষভাবে স্থিত (শঙ্কর)। ধিষ্ঠিত—অর্থাৎ অধিষ্ঠান পূর্ব্বক স্থিত (স্বামী, কেশব)।

সবাকার।—অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণীর (স্বামী, মধু, শঙ্কর)। মনুষ্যাদি সকলের (রামানুজ কেশব)। হৃদি হৃদয়ে অর্থাৎ বুদ্ধিতে (মধু, শঙ্কর)।

শঙ্কর বলেন, এই জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্য—এই তিনই সকল প্রাণীর বুদ্ধিতে বিশেষভাবে স্থিত। এই তিনটি বিভাগই বুদ্ধিতে প্রতিভাত হইয়া থাকে। স্বামী বলেন,—ব্রহ্ম নিয়ন্তারূপেই সকলের হৃদয়ে অবস্থিত। মধুসূদন বলেন,—ব্রহ্ম সামান্য ভাবে সর্ব্বত্র স্থিত হইলেও বিশেষ ভাবে তিনি যেরূপে স্থিত ও অভিব্যক্ত, তাহাই উক্ত হইয়াছে। তিনি বিশেষভাবে জীবহৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে স্থিত। সূর্য্যকান্ত মণিতে যেমন সৌরতেজ অবস্থিত, সেইরূপ স্থিত। অজ্ঞান হেতু বস্তু ভ্রম হয়। অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এস্থলে যে হৃদি বা হৃদয়ে উক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ কি? ঐতরেয় উপনিষদে তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা—

"যদেতৎ হৃদয়ং তৎ মনশ্চৈতা—সংজ্ঞানং অজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টিঃ ধৃতিঃ মতিঃ মনীষা ইতিঃ স্মৃতিঃ সংকল্পঃ ক্রতুঃ অসুঃ কামো বশ ইতি।" (৩।২)।

অতএব এই হৃদয় মন বুদ্ধিরূপ চিত্ত। ব্রহ্ম সর্ব্বভূতের চিত্তে বা অন্তঃকরণে অবস্থিত। ব্রহ্ম যে সর্বভূতের হৃদিস্থিত তাহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, যথা—

"হৃদা মনীষা মনসাভিকৢপ্তঃ।" (কঠ উপঃ ৬।৯; শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৪।১৭; ৩।১৩)।

অর্থাৎ হৃৎস্থিত অবিকল্পিত, সংশয়রহিত মননদ্বারা ব্রহ্ম অভিপ্রকাশিত হন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে অন্যত্র (৫।২০) আছে "হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এনং বিদুঃ—" অর্থাৎ হৃদয়ে মনন দ্বারা হৃদিস্থিত ইঁহাকে যাঁহারা জানেন...।" অন্যত্র আছে—

"স বা এষ আত্মা হৃদি তস্য এতদেব নিরুক্তং—হৃদি অয়ম্ ইতি, তস্মাৎ হৃদয়ম্।" (ছান্দোগ্য, ৮।৩ (৩)।

"সদা জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ। (কঠ উপ ৬।১৭)
শ্বেতাশ্বতর, ৪।১৭, ৩।১২)।

"যশ্চায়ং হৃদয়ে যশ্চাসাবাদিত্যে স এষ একঃ।"
(মৈত্রায়ণী, ৬।১৭)।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে—

"হৃদয়ং বৈ ব্রহ্ম।" (৪।১।৭)।

"তা স্মৃতিতা...হৃদয়মেব...হৃদয়ং বৈ আয়তনম্...
হৃদয়ং বৈ প্রতিষ্ঠা...হৃদয়ে হ্যেব সর্ব্বাণি ভূতানি
প্রতিষ্ঠিতানি।" (৪।২।৭)।

"হৃদয়ং বৈ পরমং ব্রহ্ম" (ঐ)।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে—

স য এষোঽন্তর্হৃদয়াকাশঃ তস্মিন্নয়ং পুরুষো মনোময়ঃ অমৃতো হিরণ্ময়ঃ।"

শ্রুতিতে এই হৃদয়কে ব্রহ্মপুর বলিয়াছেন। দহর বিদ্যায় ইহা বিবৃত হইয়াছে পূর্ব্বে ৮ম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে এই দহরবিদ্যা বিবৃত হইয়াছে। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সে যাহা হউক, আমাদের অন্তরে হৃদয়াকাশে স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থায় যে দেশকাল আধারে এই জগৎ প্রকাশিত হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই হৃদয়ে অবস্থিত থাকেন বলিয়া এই প্রকাশ সম্ভব হয়। হৃদয়-পুণ্ডরীকে এইজন্য ব্রহ্ম ধ্যান করিবার উপদেশ আছে। ভগবান্ যে সর্ব্বজীব-হৃদয়ে অবস্থান করেন, এবং হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বজীবকে নিয়মিত করেন, তাহা বলিয়াছেন। যথা—

"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।" (গীতা, ১৫।১৬)

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।

ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ (গীতা, ১৮।৬১)

ব্রহ্ম কিরূপে সর্ব্বভূত-হৃদয়ে অধিষ্ঠিত।—ব্রহ্ম সর্ব্বভূত-হৃদয়ে অবস্থিত, এ তত্ত্ব আমরা কিরূপে বুঝিতে পারি? (১) আমাদের অন্তরে যিনি আত্মারূপে অবস্থিত, তিনিই ব্রহ্ম। যিনি আমাদের 'অন্তরাত্মা' (কঠ, ২।১; শ্বেতাশ্বতর ৩।১৫; মুণ্ডক, ২।১।৯), যিনি আমাদের 'অন্তরতর' (বৃহদারণ্যক ১।৪ ৮), যিনি সর্ব্বজন্তুর হৃদয়গুহায় নিহিত (কঠ, ২।২০); (শ্বেতাশ্বতর, ৩।২০) যিনি আত্মারূপে সকলের অন্তরে স্থিত (বৃহদারণ্যক ৩।৪।১) তিনিই ব্রহ্ম (মুণ্ডক ২), তিনিই অমৃত ব্রহ্ম (ছান্দোগ্য ৮।১৪।১); তিনি বিশ্বরূপ বৈশ্বানর (ছান্দোগ্য ৫ ১৩ ১)। সেই আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে আকাশাদিক্রমে ভূতগণের উৎপত্তি হইয়া জগতের সৃষ্টি (তৈত্তিরীয়

২।১।১)। সেই ব্রহ্মই 'বহু' কল্পনা করিয়া, আত্মরূপের দ্বারা সেই কল্পিত জীবাদি সৃষ্টি করিয়া আত্মরূপে সেই জীবমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হন (ছান্দোগ্য ৬।৩।২)। এইরূপে শ্রুতি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ব্রহ্মই আত্মরূপে সর্ব্বজীব-হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত আছেন। তিনিই সর্ব্বান্তর্ভূত আত্মা।

(২) অক্ষর নির্গুণ নিরুপাধিক ব্রহ্ম সর্ব্বজীবহৃদয়ে তাহার আধার-রূপে, তাহার কারণরূপে অবস্থিত। ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই কাহারও কারণ নহে। যাহা কিছু কার্য্য, ব্রহ্ম তাহার কারণ, আর এই কারণরূপে ব্রহ্ম সকল কার্য্যের অন্তরালে অবস্থিত, আমাদের হৃদয়, যাহাকে বুদ্ধি, অহঙ্কার, মনোযুক্ত চিত্ত বা অন্তঃকরণ বলা যায়, তাহা কার্য্য। প্রকৃতি তাহার কারণ হইলেও প্রকৃতি ব্রহ্মেরই মায়াশক্তি। ব্রহ্মই শক্তিমান্ হইয়া সর্ব্বভূতচিত্তের কারণ হন। এই কারণরূপে, এই ব্যাপক আধাররূপে, কূটস্থ অক্ষররূপে ব্রহ্ম অচল স্থিরভাবে সর্ব্বভূত-হৃদয়ে অবস্থিত।

(৩) ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ। কেননা, তিনিই জ্ঞানরূপে, সত্তারূপে, আনন্দরূপে আমাদের অন্তরে প্রতিবিম্বিত হইয়া, সেই প্রতিবিম্বের আধাররূপে অবস্থান করেন। চিত্ত সেই প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে বলিয়াই চিত্ত চৈতন্যযুক্ত হয়, আমরা জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তা হই। ব্রহ্মজ্ঞান আমাদের চিত্তে প্রতিফলিত হয় বলিয়াই আমাদের বুদ্ধি জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই ত্রিপুটীযুক্ত হয়। ব্রহ্ম-সত্তা আমাদের চিত্তে প্রতিফলিত হয় বলিয়াই 'আমি আছি' এইরূপে আমার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, এবং আমি কর্ত্তা হইয়া কর্ম্ম করিতে পারি। ব্রহ্মানন্দ আমার চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া, আমরা দুঃখ পরিহারপূর্ব্বক সুখভোগের জন্য লালায়িত হই। পরিশেষে ভূমা ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিবার জন্য সকল ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন সুখলিপ্সা ত্যাগ করি। অতএব ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপে আমাদের

অন্তরে অবস্থিত হইয়া, আমাদের চিত্তে সেই সচ্চিদানন্দরূপ প্রতিবিম্বিত করিয়া আমাদিগকে জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তা করেন।

(৪) "ব্রহ্ম সত্যং শিবং সুন্দরম্।" তাঁহার এই ভাব আমাদের চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া আমরাও সত্যকাম সত্যসঙ্কল্প হই। আমরা যাহা শিবময় মঙ্গলময়, তাহার অনুষ্ঠান করি। আমাদের জ্ঞানে 'I ought' এইরূপ কর্ত্তব্যবুদ্ধি বিকশিত হয়। সেই 'বিবেকবাণী দ্বারা পরিচালিত হইয়া 'সদ্‌ভাবে' 'সাধুভাবে' পরহিতার্থে কর্ম্মনিরত হই। সেই 'সুন্দরের' সৌন্দর্য্য আমাদের চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া, আমাদের সৌন্দর্য্যানুভূতিবৃত্তির বিকাশ হয়—অন্তরে বাহিরে সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, মঙ্গল দর্শন করিতে পারি।

(৫) ব্রহ্মকল্পনা হইতে সৃষ্টির আরম্ভে যে জাতি প্রভৃতি কল্পনামূলে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয়, মনুষ্যজাতি সেই কল্পনাপ্রসূত। তিনি মনুষ্যপিণ্ড সৃষ্টি করিয়া দেবতাগণের নিকট উপস্থিত করিলে, দেবতাগণ তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। সেই মনুষ্যজাতির যাহা চরম আদর্শ কল্পনা, সেই কল্পনা বা highest ideal রূপে ব্রহ্ম আমাদের অন্তরে সর্ব্বদা অনুপ্রবিষ্ট থাকেন, এবং সেই আদর্শ কল্পনা অনুসারে আমাদিগকে পরিণত করেন। তাহাতে মানুষের জন্মের পর জন্ম এইরূপ কত জন্ম ধরিয়া ক্রমে পরিণতি ও অভ্যুদয় হয়।

(৬) ইহা ব্যতীত ভগবান্ বলিয়াছেন যে, তিনি পরমেশ্বররূপে অন্তর্য্যামী হইয়া, নিয়ন্তা হইয়া, সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ হইয়া সর্ব্বজীব-হৃদয়ে অবস্থান করেন। ব্রহ্ম সগুণ পরমেশ্বর রূপেই এইভাবে সকলের নিয়ন্তা, সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বহৃদয়দ্রষ্টা হন।

যাহা হউক, নির্ম্মল পরিশুদ্ধ বুদ্ধিতে, অমানিত্বাদিরূপ গুণযুক্ত জ্ঞানে জ্ঞান-জ্ঞেয় জ্ঞানগম্য ও সর্ব্বহৃদিস্থিতরূপে ব্রহ্মকে আমরা জানিতে পারি। ব্রহ্ম এইরূপে আমাদের এই জ্ঞানে জ্ঞেয় হন। এ স্থলে বলা বাহুল্য যে,

ব্যাখ্যাকারগণ জ্ঞান, জ্ঞেয় প্রভৃতির যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই।

এইরূপে এই অধ্যায়ে যে ব্রহ্মতত্ত্ব সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে, সে তত্ত্বার্থ আমরা বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। ইহার সংক্ষেপ অর্থ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", ইহার অর্থ তৎ-ত্বম্-অসি, ইহার অর্থ ব্রহ্মই এ সমুদায়, অথচ ব্রহ্ম সমুদায়ের অতীত। তিনি সগুণ (immanent) এবং নির্গুণ (transcendent)। তিনি অবিভক্ত হইয়াও সর্ব্বত্র বিভক্তের ন্যায় স্থিত—সকলের অন্তরে বাহিরে তিনিই অবস্থিত। ব্রহ্ম ভিন্ন আর জ্ঞেয় কোন তত্ত্ব নাই। তিনি 'সর্ব্ব'।*

৭ম অধ্যায় হইতে ১২শ অধ্যায় পর্য্যন্ত "সমগ্র" ঈশ্বরতত্ত্ব বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু এ স্থলে অতি সংক্ষেপে কেবল ছয়টি মাত্র শ্লোকে এই অতি দুর্জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহার কারণ কি? আমরা এই কথা এ স্থলে বুঝিতে চেষ্টা করিব এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয় ব্রহ্মবিষয়ক যে তত্ত্ব সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, সেই তত্ত্ব, এবং তাহাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ আমরা আরও একটু বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় ব্রহ্ম এই তিন বিষয়ে সংক্ষেপে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই সকল বেদের সার অর্থ, এই গীতায়ও তাহাই প্রধানতঃ প্রতিপাদ্য অর্থ। কিন্তু ইহা গীতায় সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব যাহা কে

* এইরূপে বেদান্তের মায়াবাদ বুঝিতে হইবে। মায়া অসৎ নহে, ইহা ব্রহ্মের পরাশক্তি। সেই শক্তি হইতে জগতের অভিব্যক্তি বলিয়া জগৎ মিথ্যা নহে—ব্রহ্মই জগৎ, এইরূপে Idealism ও Realism সামঞ্জস্য হয়। প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণপণ্ডিত পালডুসেন বলিয়াছেন—

By accomodation to the empirical consciousness, which regards the universe as real, it (the fundamental idealistic view) passes over into the pantheistic doctrine which is the prevailing one in the Upanishads. (Philosophy of the Upanishads, p 162)

অর্থে ব্রহ্মতত্বের অন্তর্গত, তাহা প্রাচীন ঋষিগণ দ্বারা বিস্তারিত বিচার পূর্ব্বক "ব্রহ্মসূত্রপদে" বিবৃত হইয়াছে, এস্থলে গীতায় সংক্ষেপতঃ তাহা উপদিষ্ট হইবে। যাঁহারা বিস্তারিতভাবে এই ব্রহ্মতত্ব জানিতে চাহেন, তাঁহারা প্রাচীন ব্রহ্মসূত্রপদ অধ্যয়ন করিবেন। এজন্য গীতায় তাহা বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয় নাই। আরও এক কথা। জ্ঞানের যে অমানিত্বাদিরূপ অবস্থায় ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন, যে ঈশ্বরে অনন্য অব্যভিচারিণী ভক্তিরূপ, অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্যস্থিতিরূপ ও তত্বজ্ঞানার্থ দর্শনরূপ অতি নির্ম্মল ও পরিশুদ্ধ জ্ঞানে ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন, সে জ্ঞান কদাচিৎ কোন সাধনাসিদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হইতে পারে। প্রকৃত জিজ্ঞাসুর সংখ্যা অতি অল্প এবং জিজ্ঞাসু হইবার অধিকারী ব্যক্তির মধ্যেও ভগবান্‌কে বা ব্রহ্মকে জানিতে পারে, এরূপ লোকের সংখ্যা আরও অল্প। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ (৭।৩)

কোটি মানুষের মধ্যে একজনও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত কি না, তাহাও বলা যায় না। এজন্য গীতায় এই ব্রহ্মতত্বের ইঙ্গিত করা হইয়াছে মাত্র—বিস্তারিতরূপে বিবৃত হয় নাই। যাঁহারা গীতা-পাঠের অধিকারী, তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই এই ব্রহ্মতত্ব জানিবার উপযুক্ত হইতে পারেন। তাঁহাদের জন্য এই ইঙ্গিতই যথেষ্ট। আরও বলা যাইতে পারে যে, ভগবান্ এ স্থলে অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া গীতা উপদেশ দিতেছেন। তখন অর্জ্জুন যেরূপ শোকমোহযুক্ত, দুঃখে অভিভূত ছিলেন, তাহাতে তিনি ব্রহ্মতত্ব গ্রহণের উপযুক্ত ছিলেন না। এজন্য সংক্ষেপে তাঁহার নিকট এই ব্রহ্মতত্ব একমাত্র জ্ঞেয়রূপে প্রতিষ্ঠাপিত করা হইয়াছে, বিশেষভাবে তাহা উপদিষ্ট হয় নাই।

তাহা হইলেও যে ভাবে ব্রহ্মতত্ব এ স্থলে উপদিষ্ট হইয়াছে—তাহাই

যথেষ্ট। তাহাতেই উপনিষদুক্ত ব্রহ্মতত্ত্বের সম্পূর্ণ আভাষ পাওয়া যায়; এ স্থলে ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন কথা উল্লিখিত হইতে বাকী নাই। কোন কথা বাদ যায় নাই। কেবল তাহা সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে মাত্র। এত সংক্ষেপে অথচ এরূপ বিশদভাবে ও এ প্রকার সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব আর কোথাও উপদিষ্ট হয় নাই। ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে ইহা সর্ব্ব উপনিষদের সার। উপনিষদ্ হইতেই আমরা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

যাহা হউক, এ স্থলে বলা যাইতে পারে যে, মূল উপনিষদে ব্রহ্মকে "বিজ্ঞানানন্দং" বলা হইয়াছে। (যথা—বৃহদারণ্যক, ৩।১।২৮, তৈত্তিরীয় ২।৪।১ ইত্যাদি) আধুনিক (নৃসিংহতাপনীয়, রামতাপনীয়, মুক্তিকোপনিষদ প্রভৃতি) উপনিষদে ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ বলা হইয়াছে; কিন্তু গীতায় ব্রহ্মের এ লক্ষণ উক্ত হয় নাই। ব্রহ্ম যে সত্যস্বরূপ, তাহা উক্ত হয় নাই। প্রথমেই উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মকে সৎ বা অসৎ কিছুই বলা যায় না। তিনি জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞানগম্য বটেন, অর্থাৎ সকলের হৃদয়ে এইরূপে অবস্থিত বটেন; কিন্তু তিনি যে জ্ঞানস্বরূপ, তাহা স্পষ্ট উক্ত হয় নাই। ব্রহ্মের আনন্দময়ত্ব সম্বন্ধেও কিছুই উক্ত হয় নাই। পরে (১৪।২৭) উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান্ ঐকান্তিকসুখের প্রতিষ্ঠা। গীতা অনুসারে যখন ব্রহ্ম কোনরূপে বাচ্য নহেন, তখন তিনি সৎ কি অসৎ, জ্ঞান কি অজ্ঞান (অর্থাৎ চিৎ কি অচিৎ), এবং আনন্দ কি নিরানন্দ কোনরূপে বাচ্য নহেন। তাঁহা হইতে সদসৎ, চিদচিৎ, আনন্দ-নিরানন্দ ভাব সকলই বিবর্জ্জিত। সুতরাং তাঁহাকে নির্ব্বিশেষভাবে জ্ঞানস্বরূপ, সত্যস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ—অথবা নির্ব্বিশেষ সচ্চিদানন্দরূপ বলা যায় না। বিশেষভাবে সগুণ ব্রহ্ম পরমেশ্বরই সচ্চিদানন্দঘন। এজন্য গীতায় ব্রহ্মের এ লক্ষণ উক্ত হয় নাই।

ব্রহ্মতত্ত্ব সংক্ষেপে উক্ত হইলেও গীতায় ঈশ্বরতত্ত্ব অতি বিস্তৃতভাবে

উপদিষ্ট হইয়াছে। কেন হইয়াছে, তাহা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। ঈশ্বরতত্ত্ব কোথাও পূর্ব্বে এরূপভাবে বিবৃত হয় নাই। উপনিষদে সগুণ ব্রহ্মতত্ত্বোপদেশ স্থানে তাঁহাকে সর্ব্বভূতান্তরস্থিত অধিভূত পুরুষরূপে, সর্ব্বদেবান্তর্ভূত অধিদেবপুরুষরূপে এবং জগতের নিয়ন্তা 'ঈশ'রূপে বর্ণিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদেব পুরুষরূপে ব্রহ্মের ধারণাকে 'প্রতীক' বলা হয়; 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই তত্ত্বের ব্যাখ্যারূপে গৃহীত হইয়া থাকে। মায়াশক্তি দ্বারা ব্রহ্ম সগুণ হইলেও, সে ব্রহ্ম প্রকৃতিপুরুষের অতীততত্ত্ব, সুতরাং এক অর্থে ঈশ্বরের অতীত তত্ত্ব। এক উপাস্য পরম পুরুষ পরমেশ্বরের তত্ত্ব উপনিষদে কোথাও স্পষ্ট উপদিষ্ট হয় নাই। এই ঈশ্বরতত্ত্ব পূর্ণরূপে 'সমগ্র'ভাবে স্থাপন করাই গীতার বিশেষত্ব। এজন্য গীতায় এই তত্ত্ব বিস্তারিতরূপে বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। ৭ম হইতে ১২শ অধ্যায় পর্য্যন্ত তাহা নানারূপে নানা ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ব্রহ্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব ঠিক এক নহে। ঈশ্বরতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্বের অন্তর্ভূত হইলেও, ব্রহ্মতত্ত্ব ঈশ্বরতত্ত্বের অন্তর্গত নহে। অনির্বাচ্য, অপ্রমেয়, অবিজ্ঞেয়, নিরুপাধি নির্ব্বিশেষ পরম ব্রহ্মতত্ত্বও আমাদের জ্ঞানে জ্ঞেয় নহে। তবে নির্ম্মল জ্ঞানে আমরা দুই ভাবে পরমব্রহ্মকে ধারণা করিতে পারি—তিনি দুই ভাবে নির্ম্মল জ্ঞানে জ্ঞেয় হন। এক ব্রহ্মের নির্গুণভাব, আর এক সগুণ ভাব। এ উভয় ভাব একই, ব্রহ্ম এক ব্যতীত দুই নহে, অথবা ব্রহ্ম এক, দুই এরূপ কোন সংখ্যা দ্বারা বাচ্য নহেন। এ জন্য এই দুই রূপ ভাব এ স্থলে একত্র উক্ত হইয়াছে। এ সকল কথা আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই সগুণভাবে ব্রহ্ম দুইরূপে জ্ঞেয়:—এক পুরুষ, আর এক প্রকৃতি। সমুদায় জড়বর্গ প্রকৃতি। বুদ্ধি মন হইতে জড়ভূত পর্য্যন্ত ইহার অন্তর্গত। আর পুরুষ গীতা অনুসারে ক্ষর (সর্ব্বভূত), অক্ষর (নিত্য আত্মা) আর

পরম। এই পরম পুরুষই পুরুষোত্তম ঈশ্বর। ভগবান্ এই প্রকৃতি (Nature) ও পুরুষকে (spirit) তাঁহার অন্তর্ভূত তত্ত্ব—প্রকৃতি তাঁহারই, এই কথা বলিয়া, সগুণ ব্রহ্মের সহিত ঈশ্বরের একতত্ত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্ম সগুণভাবেই পরমেশ্বর (Immanent God)—তিনি জগতের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ, সগুণভাবেই ব্রহ্ম জগতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। নির্গুণভাবে ব্রহ্ম জগদতীত (Transcendent)। এজন্য বলিতে হয় যে, ঈশ্বরতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্বের অন্তর্গত। কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্ব ঈশ্বরতত্ত্বের অন্তর্ভূত নহে।

এ সম্বন্ধে আরও এক কথা বুঝিতে হইবে। অধ্যাত্মজ্ঞান সাধনার পরিণামে যে অনন্যভক্তির উদয় হয়, সেই ভক্তি সাধনার ফলে পরমেশ্বর সমগ্ররূপে জ্ঞেয় হন (৭।১)। ব্রহ্ম কখন সমগ্ররূপে জ্ঞেয় হন না; তিনি জ্ঞেয় হইয়াও অজ্ঞেয় থাকেন। শ্রুতিতে আছে—

"যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥"

(কেন উপঃ ১।১১)

ঈশ্বর আমাদের জ্ঞানে পূর্ণ বা সমগ্ররূপে জ্ঞেয় হইয়া আমাদের জ্ঞান দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হন; কিন্তু ব্রহ্ম সেরূপ পরিচ্ছিন্ন হন না। যাহাকে আমাদের জ্ঞানের সীমার মধ্যে আনা যায়, জ্ঞানের সীমায় বদ্ধ করা যায়, তাহা জ্ঞানপরিচ্ছিন্ন হয়, আমাদের জ্ঞান তাহার ব্যাপক হয়। এই জন্য বলা যায় যে, ঈশ্বর আমাদের জ্ঞানপরিচ্ছিন্ন হইতে পারেন। কিন্তু ব্রহ্ম কখন সেরূপ হন না। এজন্য বলিতে হয় যে, ঈশ্বরতত্ত্ব ব্যাপ্য, ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাপক। ঈশ্বরতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্বের অন্তর্গত।

ভগবান্ স্বয়ং ব্রহ্মকেই জ্ঞেয় বলিয়াছেন। ব্রহ্মই একমাত্র তত্ত্ব। ব্রহ্মকে জানিলেই সমুদায় জানা হয়, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মতত্ত্ব জানিলেই ঈশ্বরতত্ত্ব জানা যায়। এজন্য স্বতন্ত্রভাবে ঈশ্বরতত্ত্বকে জ্ঞেয়

বলা হয় নাই। অবশ্য, পূর্ব্বে ভগবান্ ঈশ্বরতত্ত্ব বিস্তারিতভাবে বুঝাইয়াছেন। যাহাতে ঈশ্বরতত্ত্ব "সমগ্র"রূপে জানা যায়, ভগবান্ তাহার নানারূপে উপদেশ দিয়াছেন। কেন না, প্রথমে সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্ব না জানিলে, প্রকৃতরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যায় না। এই ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই সর্ব্বতঃ পাণিপাদ সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাস, সর্ব্বভৃৎ, গুণভোক্তা, চরাচরের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া স্থিত, সর্ব্বভর্ত্তা, সৃষ্টিলয়কর্ত্তা সগুণ ব্রহ্মকে জানা যায়। সগুণ ব্রহ্ম এইরূপে ঈশ্বরতত্ত্ব হইতে জ্ঞেয় হইয়া, তাহা দ্বারাই নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন। এই জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন যে, "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" (১৪।২৭)। এইরূপে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান হইতে সগুণ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানের সহিত সর্ব্বগুণাতীত সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত, অসক্ত, সূক্ষ্ম, জ্ঞানস্বরূপ, 'নেতি নেতি' বাচ্য, নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে।

এই ব্রহ্মতত্ত্ব—সগুণ ও নির্গুণ—ইহা উপনিষদে নানা স্থানে নানাভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। শঙ্করই ইহা প্রথমে বিশেষভাবে বুঝাইয়াছেন। অথচ তিনি নির্গুণ ব্রহ্মকেই পারমার্থিক তত্ত্ব বলেন, সগুণ ব্রহ্ম মায়িক কেবল ব্যবহারিকভাবে সত্য, এই তত্ত্ব স্থাপন করিয়াছেন। নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বই একমাত্র সত্য পারমার্থিক তত্ত্ব বলিলে, ব্রহ্মতত্ত্বমধ্যে পারমার্থিক ভাবে ঈশ্বরতত্ত্বকে অন্তর্ভূক্ত করা যায় না। এইরূপে নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলে, সগুণ ব্রহ্মজ্ঞান বা ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান মায়ার সহিত দূর হইয়া যায়। আর ঈশ্বরজ্ঞান থাকে না। এজন্য শঙ্করের ব্যাখ্যা হইতে ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে বুঝা যায় না। ভগবান্ যে তত্ত্ব বিশেষভাবে স্থাপিত করিয়াছেন, শঙ্করের মত অনুসারে তাহা খণ্ডিত হইয়া যায়।

অন্যদিকে যাঁহারা ঈশ্বরতত্ত্বকে বা সগুণ ব্রহ্মতত্ত্বকে পারমার্থিকভাবে সত্য ও পরম তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করেন, নির্গুণ ব্রহ্ম স্বীকার করেন না, অথবা নির্গুণ ব্রহ্ম অর্থে সমুদায় হেয় গুণ-বর্জ্জিত সগুণ ব্রহ্মকেই বুঝেন,

কিংবা যাঁহারা পরমব্রহ্মতত্ত্ব উড়াইয়া দিয়া জীবাত্মাকেই ব্রহ্ম বলিয়া ধারণা করেন, তাঁহাদের নিকট গীতোক্ত বা উপনিষদুক্ত এই ব্রহ্মতত্ত্ব নিরর্থক হইয়া পড়ে। তাঁহাদের ব্যাখ্যা হইতে গীতার এই ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝা যায় না, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এইজন্য শঙ্কর ও তাঁহার অনুবর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণের দ্বারা যেমন ঈশ্বরতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব সঙ্গতরূপে ব্যাখ্যাত হয় নাই, সেইরূপ রামানুজপ্রমুখ বৈষ্ণব পণ্ডিতগণের দ্বারাও ব্রহ্মতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব প্রভৃতি প্রকৃতরূপে ব্যাখ্যাত হয় নাই।

আমরা বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ব্রহ্মতত্ত্ব কেবল জীবতত্ত্ব নহে, তাহা কেবল সগুণ ব্রহ্মতত্ত্বও নহে, অথবা কেবল নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বও নহে। ব্রহ্ম নির্গুণ ও সগুণ উভয়ই। জীবাত্মা—অথবা চিত্তরূপ আধার বা উপাধিতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মতত্ত্ব—ও ব্রহ্ম এক নহে; তবে আত্মা বা পরমাত্ম-স্বরূপে ব্রহ্ম সর্ব্ব উপাধিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সগুণ হন এবং চিত্তরূপ উপাধিতে নিজ প্রতিবিম্ব দ্বারা জীবাত্মা সকল প্রকাশ করেন। নির্গুণ ব্রহ্ম আত্মস্বরূপেরও অতীত। যাহা হউক, নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম একই—সে ব্রহ্ম পরব্রহ্ম বা পূর্ণ-ব্রহ্ম। কেবল নির্গুণ ব্রহ্ম অবিজ্ঞেয়, জ্ঞানের অধিগম্য নহে। সগুণ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারাই নির্গুণ ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন, সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞানের ভিত্তির উপরই নির্গুণ-ব্রহ্ম-জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। সগুণ-ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়েই নির্গুণ ব্রহ্মভাব জ্ঞেয়, সগুণ ব্রহ্মেই নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। নির্গুণ ব্রহ্মই সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের পরমধাম,—পরম স্বরূপ। নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের অন্তর্ভূত হইয়াই সগুণ ব্রহ্মতত্ত্বের প্রকাশ হয়। এ কারণ ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে না জানিলে, পূর্ণ পরব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান সম্ভব হয় না, পরব্রহ্ম জ্ঞেয় হন না। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, অনন্য অব্যভিচারিণী ভক্তির সহিত ঈশ্বরারাধনা করিলে, ভগবানের প্রসাদে

পরমেশ্বরের সমগ্র স্বরূপ জানা যায় (৭।১)। এই বলিয়াই ঈশ্বরতত্ত্ব, এবং যেরূপে ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞেয় হয়, তাহার উপদেশ আরম্ভ করিয়াছেন, এবং সেই ঈশ্বরতত্ত্ব কিরূপ, তাহা বিস্তারিতভাবে বুঝাইয়াছেন। আর এই অনন্য অব্যভিচারিণী ভক্তিরূপ জ্ঞানে (১৩।১০) ঈশ্বরতত্ত্ব সম্যক্ জ্ঞাত হইলে, তবে সেই জ্ঞানে ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞেয় হয়, তাহাও স্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন।

পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র অনুসারে—ঈশ্বরতত্ত্ববিদ্যাকে Theology বলে। আর পাশ্চাত্য দর্শনে যাহা Philosophy of the Absolute Philosophy of the Unconditioned, Transcendental Philosophy বা Philosophy of the Absolute Reason, Transcendental Logic প্রভৃতি সংজ্ঞায় আখ্যাত হয়, তাহাই ব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্মবিদ্যাকে পরাবিদ্যাও বলে। মুণ্ডক উপনিষদে আছে—

"দ্বে বিদ্যে পরা চৈব অপরা।" (১।১।৪)

বেদাদি সমুদায় শাস্ত্রই অপরাবিদ্যার অন্তর্গত।

"তত্র অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ।
শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষম্ ইতি।" (ঐ ১।১।৫)।

কেননা, এই সকল শাস্ত্রদ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় না। যাহার দ্বারা অক্ষর পরম ব্রহ্মকে (কঠ ৩।২) জানা যায়, তাহাই পরা বিদ্যা,—তাহাই উপনিষদ্।

"অথ পরা যয়া অক্ষরমধিগম্যতে।" (মুণ্ডক, ১।১।৫)।

সেই অক্ষর পরব্রহ্ম যে সগুণ ও নির্গুণ উভয়রূপ, তাহাও মুণ্ডকে উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা—

"অদ্রেশ্যম্ অগ্রাহ্যম্ অগোত্রম্ অবর্ণম্ অচক্ষুঃ অশ্রোত্রম্ অপাণিপাদং নিত্যম্।"

(ইহা নির্গুণ ব্রহ্ম)

আর,—"বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং যৎ অব্যয়ং যৎ ভূতযোনিম্।"

(ইহা সগুণ রূপ)—(মুণ্ডক, ১।১।৬)।

অতএব ব্রহ্মবিদ্যাই সর্ব্ববিদ্যার সার। ব্রহ্মবিদ্যাই একমাত্র পরা-বিদ্যা। ইহাই আমাদের একমাত্র মুক্তিশাস্ত্র। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে, অর্থাৎ নির্ম্মল জ্ঞানে ব্রহ্ম জ্ঞেয় হইলে, এবং ব্রহ্ম জ্ঞানগম্য হইলে, যখন সর্ব্বো-পাধি ঘুচিয়া যায়, তখনই প্রকৃত মুক্তি হয়। পাশ্চাত্য দর্শনে কোথাও এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যা বুঝান হয় নাই। আধুনিক কয়েকজন জর্ম্মান্ দার্শনিক পণ্ডিত তাহার অস্পষ্ট আভাস দিয়াছেন মাত্র।

ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে হইলে প্রথমে বুদ্ধিকে সর্ব্বপ্রকার রজঃ ও তমোমলা হইতে মুক্ত করিয়া, তাহাকে পরিশুদ্ধ ও নির্ম্মল করিতে হয়। সেই নির্ম্মল বুদ্ধিতে যে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয়, যে অধ্যাত্মজ্ঞান ও পরমে-শ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান তাহাতে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতেই ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন। বুদ্ধিকে নির্ম্মল করিয়া তাহাতে প্রকৃত জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা না করিলে, ব্রহ্মবিদ্যালাভের অধিকারী হওয়া যায় না। বুদ্ধি সাত্ত্বিক ও কতকটা নির্ম্মল হইলে, ইহকালে ও পরকালে স্বর্গভোগবিতৃষ্ণারূপ বৈরাগ্য উদয় হয়, এবং মুমুক্ষুত্ব উপস্থিত হয়। তখন কর্ম্মমার্গে, জ্ঞানমার্গে, ভক্তি-মার্গে যাহার যেরূপ অধিকার, সে সেই মার্গে অগ্রসর হইতে পারে। এই-রূপ অধিকারী যদি প্রথমে জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করে, তবে জ্ঞানের সাধনা করিয়া তাহাকে আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। আর যদি ভক্তিমার্গে যায়, তবে ভক্তির সাধনা করিয়া প্রকৃত ভক্ত হইয়া (গীতার দ্বাদশ অধ্যায়োক্ত) তাহাকে ঈশ্বরতত্ত্ব লাভ করিতে হইবে। চিত্ত শুদ্ধ করিয়া জ্ঞান বা ভক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে হইলে, কর্ম্মযোগসাধন করিতে হয়। জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হইতে হইলে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ও ভক্তিমার্গে ঈশ্বরার্থ বা ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে কর্ম্মযোগ সাধন করিতে হয়। তখন ধ্যান-যোগাভ্যাসদ্বারা চিত্ত আরও নির্ম্মল হয়। এইরূপে নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা পরিশুদ্ধচিত্ত-যুক্ত জ্ঞানীর জ্ঞানে যখন এই আত্মতত্ত্বের বিকাশ হয়, এবং জ্ঞান ভক্তের হৃদয়ে যখন ঈশ্বরতত্ত্বের বিকাশ হয়, তখন কর্ম্ম, ভক্তি

ও জ্ঞান একীভূত হইয়া যে নির্ম্মল জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয়, সেই জ্ঞান পরা-বিদ্যালাভ করিবার উপযুক্ত হয়। এই জন্য ভগবান্ গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে আত্মতত্ত্বজ্ঞান, এবং আত্মজ্ঞানে অবস্থান করিবার উপায়ের বা সাধনার উপদেশ দিয়াছেন। আত্মতত্ত্বজ্ঞানই সাংখ্যজ্ঞান,—পুরুষ-প্রকৃতি বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিবেকজ্ঞান। ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহাই প্রকৃত আত্মবিজ্ঞান (Psychology)। তাহার পর যে নিষ্কাম কর্ম্মসাধনা, সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগরূপ কর্ম্মসন্ন্যাসসাধনা দ্বারা চিত্তকে নির্ম্মল করিয়া এই আত্মজ্ঞানলাভের উপযুক্ত হওয়া যায়, তাহা তৃতীয় অধ্যায় হইতে পঞ্চম অধ্যায় পর্য্যন্ত উপদিষ্ট হইয়াছে। এই-রূপে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া, সেই আত্মস্বরূপে অবস্থান জন্য ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগ উপদিষ্ট হইয়াছে। এইরূপে যাহা "অধ্যাত্মজ্ঞান-নিত্যত্ব"রূপ জ্ঞান প্রতিষ্ঠা করিবার উপায়, তাহা গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। ইহাই জ্ঞানের পরানিষ্ঠা (১৮।৫০)। বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে ধ্যান-যোগনিরত হইলে, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম,ক্রোধ, পরিগ্রহ সমুদায় হইতে মুক্ত হইয়া (১৮।৫৩) আত্মাকে সর্ব্বভূতস্থ ও আপনার আত্মাতে সর্ব্বভূত দর্শন পূর্ব্বক সমদর্শী হইয়া, সর্ব্বভূতার্থ নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, ক্রমে সর্ব্বত্র ভগবান্‌কে দর্শন করিতে শিক্ষা করিয়া এবং নিষ্কাম-ভাবে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে ও ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করিবার বুদ্ধিতে কর্ম্মাচরণ করিয়া, ভগবানের প্রতি পরাভক্তিলাভরূপ ফল সিদ্ধ হয় (১৮।৫১)। তাহাতে 'ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী'-রূপ জ্ঞানে স্থিত হওয়া যায় এবং সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান ভগবৎপ্রসাদে লাভ হয়। এই ঈশ্বরতত্ত্ব ও ভক্তিযোগ সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। জ্ঞান যখন এইরূপে ভক্তিরূপ, অধ্যাত্মজ্ঞান-নিত্যস্বরূপ ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনরূপ হয়, তখন সেই জ্ঞানে ব্রহ্ম জ্ঞেয় হয়।

আমাদের বুদ্ধি সাত্ত্বিক হইলে ও যথাসম্ভব রজস্তমোমলবিহীন

হইলে তবে তাহাতে এইরূপ পরিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশ সম্ভব হয়। যতক্ষণ চিত্তে অভিমান, অহঙ্কার, দম্ভ, হিংসা, অ-ঋজুতা, ক্রোধ প্রভৃতি মলা থাকে, চিত্ত নিগৃহীত ও স্থির না হয়, মন শুদ্ধ না হয়, বৈরাগ্যের ভাব চিত্তে উদয় না হয়, জগৎকে জরা, ব্যাধি প্রভৃতি দোষযুক্ত দুঃখময় বলিয়া ধারণা বদ্ধমূল না হয়, যতক্ষণ বিষয়ে আসক্তি থাকে, সর্ব্বত্র সমদর্শন সিদ্ধ না হয়,—এক কথায় যতক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্তের এ সকল মলা না দূর হয়, ততক্ষণ প্রকৃত জ্ঞান হয় না, ততক্ষণ সে জ্ঞান—অজ্ঞানমাত্র; এজন্য সে জ্ঞানে ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন না। অতএব এই জ্ঞানসাধনই সাধকের প্রথম-কর্ত্তব্য। বেদান্ত শাস্ত্র অনুসারে যাহারা শমদমাদি ষট্-সম্পত্তিযুক্ত, ও মুমুক্ষুত্বাদি চতুর্ব্বর্গসাধনযুক্ত, তাঁহারাই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী। এইরূপ অধিকারী না হইলে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় কোন ফল নাই,—ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন না। সে জিজ্ঞাসা নিরর্থক। পাতঞ্জল-দর্শন অনুসারে চিত্তবৃত্তিনিরোধ বা চিত্তের অধঃস্রোতো-নিরোধরূপ যোগ অভ্যাস করিতে হইলে, প্রথম 'যম' ও 'নিয়মে'র সাধনা করিতে হয়। "অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ ইহাই যম" (পাতঞ্জলসূত্র ২।৩০)। আর 'শৌচ সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধান' ইহাই নিয়ম (পাঃ সূ, ২।৩২)। এই যম ও নিয়মসাধনা দ্বারা সত্ত্বশুদ্ধি হয়, সৌমনস্য বা চিত্তপ্রসন্নতা লাভ হয়, চিত্তের একাগ্রতাসিদ্ধি হয়, ইন্দ্রিয়-জয় হয়, এবং আত্মদর্শনে যোগ্যতা লাভ হয়। (পাতঞ্জল দর্শন, ২।৪১)। আর এইরূপে সত্ত্বশুদ্ধি হইলে, ঈশ্বরপ্রণিধানরূপ যোগ দ্বারা ঈশ্বরে পরাভক্তি হয় এবং তাহাতে ঈশ্বরতত্ত্বদর্শনযোগ্যতা লাভ হয়—শ্রেষ্ঠ যোগী হওয়া যায়। (গীতা ৬।৪৭)।

চিত্ত যখন নির্ম্মল হয়, যখন তাহাতে আর দম্ভ, দর্প, অভিমানাদি থাকে না, যখন সাধক চতুর্ব্বর্গ সাধনযুক্ত হয়, তখন ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার উদয় হয়। ইহা নির্ম্মল জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ-আকাঙ্ক্ষা। এই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে,

তত্ত্বদর্শী আচার্য্যের নিকট উপগমন করিয়া, সেবাদি দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া, তাঁহার নিকট বসিয়া 'উপনিষদ' বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হয় (গীতা ৪।৩৪); উপনিষদ্ 'শ্রবণ' করিতে হয়। ইহাই 'আচার্য্যোপাসনম্' (১৩।৭)। এইরূপে শ্রবণ হইলে মনন ও নিদিধ্যাসন বা ধ্যানযোগদ্বারা আত্মতত্ত্বজ্ঞানে নিত্যস্থিতিরূপ জ্ঞান লাভ করিতে হয়। ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই মনন ও নিদিধ্যাসন সাধন জন্য ও ভক্তির বিকাশ জন্য 'নির্জ্জনে' একাকী থাকিতে 'অভ্যাস করিতে হয়। তাহাতে 'বিবিক্ত-দেশসেবিত্ব' ও 'অরতিজ্জনসংসদি'-রূপ জ্ঞানে স্থিত হওয়া যায়। চিত্ত এইরূপে নির্ম্মল হইলে, তাহাতে জ্ঞান সূর্য্যের ন্যায় আপনি প্রকাশিত হয়। (গীতা ৫।১৬)।

এইরূপে কর্ম্মমার্গে, জ্ঞানমার্গে ও ভক্তিমার্গে সাধনা করিলে, তবে পূর্ব্বোক্ত অমানিত্বাদি বিংশতিরূপ গুণযুক্ত জ্ঞানের বিকাশ হয়। উক্তরূপ সাধনায় জ্ঞানের যাহা চরমস্বরূপ, তাহা ঈশ্বরে ভক্তি, অধ্যাত্মজ্ঞান-নিত্যত্ব ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শন। এই বিংশতি প্রকার জ্ঞানমধ্যে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ও ধ্যানযোগ প্রভৃতির কথা উক্ত হয় নাই। বলিয়াছি ত, তাহারা জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ লাভ করিবার জন্য ইহাতে সিদ্ধ হইবার জন্য অনুষ্ঠেয়। জ্ঞানযোগে চিত্তকে স্থির করিয়া আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। আর ভক্তিযোগ দ্বারা চিত্তকে স্থিরভাবে ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। চিত্তকে স্থির করিবার উপায় 'কর্ম্মযোগ'। আর স্থিরভাবে আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত করিবার উপায় ধ্যানযোগ'। এজন্য এই কর্ম্মযোগ ও ধ্যানযোগ ফলে যে জ্ঞানের বিকাশ হয়, সেই জ্ঞানের স্বরূপ ইহারা নহে। এই জ্ঞানে যখন ঈশ্বরে 'ভক্তি' অধ্যাত্ম-জ্ঞাননিত্যত্ব ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়—তখন সেই জ্ঞানে ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন। ঈশ্বরে ভক্তি হইতে সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্ব জানা যায়, সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞেয় হয়, এবং তাহা হইতে নিগুর্ণ ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞেয় হয়, তাহা

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মই একমাত্র জ্ঞেয়, ইহা ভগবান্‌ বলিয়াছেন বটে, কিন্তু ঈশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞানের মধ্য দিয়াই ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন। এই সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব না জানিলে নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যায় না, এবং সগুণ নির্গুণ উভয়রূপ ব্রহ্মতত্ত্ব না জানিলে, পূর্ণ পরব্রহ্মকে জানা যায় না। পরব্রহ্মকে কেহ পূর্ণরূপে জানিতে পারে না। তিনি জ্ঞেয় হইয়াও অজ্ঞেয় থাকেন, বিজ্ঞাত হইয়াও অবিজ্ঞাত থাকেন। যাঁহারা কেবল নির্গুণ ব্রহ্মবাদী, তাঁহারা সগুণ ব্রহ্মতত্ত্বকে বা ঈশ্বরতত্ত্বকে মায়াময়, অপারমার্থিক বলেন, তাঁহারা কেবল আত্মতত্ত্বের মধ্য দিয়া অথবা পরমাত্ম-তত্ত্বের মধ্য দিয়া ব্রহ্মকে জানিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা একদেশদর্শী। তাঁহারা নির্ব্বাণমুক্তি বা সালোক্যাদিরূপ মুক্তিলাভ করিতে পারিলেও পূর্ণ পরব্রহ্ম-তত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারেন না।

ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব দ্বারা পরব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞেয় হন। তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। আত্মতত্ত্ববিকাশদ্বারা বা অধ্যাত্মজ্ঞান দ্বারাও ব্রহ্ম যেরূপে জ্ঞেয় হইতে পারেন, তাহাও বলিয়াছি। আমাদের শাস্ত্রে ব্রহ্মবিদ্যা ও আত্মবিদ্যা এক অর্থে একই। শ্রুতিতে 'আত্মা' অনেক স্থলে ব্রহ্ম অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। সে স্থলে ব্রহ্মবিদ্যা ও আত্মবিদ্যা একই। অথবা আত্মবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্গত। আত্মজ্ঞান না হইলে ঈশ্বরজ্ঞানও পরিস্ফুট হয় না—ব্রহ্মজ্ঞানও লাভ হয় না। এজন্য শ্রুতিতে বিশেষ-ভাবে আত্মতত্ত্বের উপদেশ আছে এবং সেই আত্মাই যে ব্রহ্ম, তাহা উক্ত হইয়াছে।

গীতার আরম্ভেও এই আত্মতত্ত্বের উপদেশ আছে, তাহা বলিয়াছি। অতএব ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে হইলে, যেমন ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে হয়, সেইরূপ আত্মতত্ত্বও জানিতে হয়। শুধু তাহাই নহে। আত্মতত্ত্বজ্ঞান না হইলে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানও পরিস্ফুট হয় না এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞান ও ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান উভয়ই না প্রতিষ্ঠিত হইলে পরব্রহ্ম জ্ঞেয় হন না।

নির্ম্মল জ্ঞানে আত্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব প্রতিভাত ও প্রতিষ্ঠিত হইলেও ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন না ; সেই জ্ঞানে এই আত্মজ্ঞান ও ঈশ্বরজ্ঞানের সহিত তত্ত্ব-জ্ঞানার্থ দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তবে সে জ্ঞানে ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন। তাহা গীতায় উক্ত হইয়াছে ; আমরা দেখিয়াছি। তত্ত্বজ্ঞানার্থ কি, তাহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। মূলতত্ত্ব, জীব জগৎ ও ঈশ্বর ও ইহাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ। এক অর্থে এই তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন আত্মতত্ত্বদর্শন এবং ঈশ্বরতত্ত্বদর্শন উভয়ই হইতে পারে। পাশ্চাত্য দর্শন অনুসারে এই তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনকে Metaphysics বলে। গীতায় এই তত্ত্বজ্ঞান ১৩শ হইতে ১৮শ অধ্যায়ে স্থানে স্থানে বিবৃত হইয়াছে। অতএব নির্ম্মল পরিশুদ্ধ, রজস্তমোমলবিহীন জ্ঞান যখন শ্রবণাদি সাধন দ্বারা অধ্যাত্ম-জ্ঞানে স্থিত হইবে, ভক্তিদ্বারা ঈশ্বরতত্ত্বে স্থিত হইবে এবং তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন করিতে পারিবে, তখনই প্রকৃতরূপে পরব্রহ্ম জ্ঞেয় হইবেন। তখনই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইবে। পাশ্চাত্যদর্শনে যাহাকে Psychology বা Philosophy of the Spirit বলে, তাহা অধ্যাত্মশাস্ত্র, যাহা Theology তাহা ঈশ্বরতত্ত্ববিদ্যা, আর যাহা Metyphasics তাহা তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন। এই তিন শাস্ত্র অধিগত হইলে, তবে জ্ঞানে পরাবিদ্যা বা Philosophy of the Absolute or Unconditioned লাভ হইতে পারে। ব্রহ্মজ্ঞানলাভের আর অন্য উপায় নাই। ইহাই গীতার উপদেশ।

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্‌বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৮

এইরূপে ক্ষেত্র জ্ঞান আর জ্ঞেয় যাহা
কহিনু সংক্ষেপে ; ইহা বিজ্ঞাত হইয়া
মম ভক্ত মম ভাব পারে লভিবারে ॥ ১৮

১৮। এইরূপে...সংক্ষেপে—১ম হইতে ৬ষ্ঠ শ্লোকে ক্ষেত্রতত্ত্ব সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। ১ম ও ২য় শ্লোকে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিবেক জন্য ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্বের উল্লেখ আছে মাত্র, তাহা সে স্থলে বিবৃত হয় নাই। এই অধ্যায় শেষে ও ১৫শ অধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইয়াছে। ৭ম হইতে ১১শ শ্লোকে জ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে এবং ১২শ হইতে ১৭শ শ্লোক পর্য্যন্ত জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে।

ইহা বিজ্ঞাত হইয়া মম ভক্ত মম ভাব পারে লভিবারে—এই ক্ষেত্রজ্ঞান ও জ্ঞেয় তত্ত্বের সম্যগ্‌দর্শনে কে অধিকারী, তাহাই এক্ষণে উল্লিখিত হইয়াছে। আমি পরমেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ এবং সকলেরই গুরু—এই প্রকার বাসুদেবস্বরূপ আমাতে যে সর্ব্বাত্মভাবকে সমর্পণ করিতে পারে, অর্থাৎ যাহা কিছু দেখে, শ্রবণ করে, স্পর্শ করে, তাহা সকলই বাসুদেব, এই প্রকার দৃঢ় বিশ্বাসে যাহার জ্ঞান পরিণত হইয়াছে, সেই মদ্ভক্ত। যে ব্যক্তি এইরূপ মদ্ভক্ত, সে সম্যগ্‌দর্শনের তত্ত্ব বুঝিতে সমর্থ হয়, এবং বুঝিয়া আমার ভাব অর্থাৎ পরমাত্মভাবকে লাভ করিতে পারে, অর্থাৎ সে মোক্ষলাভ করে (শঙ্কর)। 'ত্বম্' পদার্থশুদ্ধি জন্য যে সবিকার ক্ষেত্র-তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, তদ্‌বাচ্যার্থ বিবেকসাধন অমানিত্বাদি যে উক্ত হইয়াছে এবং তৎ-পদার্থ সাধন জন্য যে ব্রহ্মতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, সেই তত্ত্ব-বিজ্ঞানের ফল কি, তাহাই এ স্থলে উপসংহারে উক্ত হইয়াছে। যাহার সর্ব্বাত্মভাব ঈশ্বরে সমর্পিত, সেই মদ্ভক্ত, (গিরি)। আমার ভক্ত,—এই ক্ষেত্রযথাত্ম্যতত্ত্ব ক্ষেত্র হইতে পৃথক্ আত্মস্বরূপপ্রাপ্তির উপায় জ্ঞানের তত্ত্ব এবং ক্ষেত্র হইতে পৃথক্ আত্মস্বরূপ ও যাথাত্ম্য বিশেষভাবে জানিয়া

আমার যে অসংসারিস্বভাব, তাহা প্রাপ্তির জন্য উপপন্ন হয় (রামানুজ)। আমার ভক্ত এই তত্ত্ব জানিয়া আমার ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তির যোগ্য হন (স্বামী)। পূর্ব্বে দ্বাদশ অধ্যায়োক্ত মদ্ভক্তই এই ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার অধিকারী। যাঁহার সর্ব্বাত্মভাব, পরমগুরু বাসুদেব আমাতে সমর্পিত, যিনি মদেকশরণ, তিনিই এই ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়তত্ত্ব বিবেকপূর্ব্বক জ্ঞাত হইয়া সর্ব্বানর্থশূন্য পরমানন্দস্বরূপ যে আমার ভাব বা মোক্ষ, তাহা পাইবার যোগ্য হন (মধু)।

আমার ভক্ত এই তিন তত্ত্ব বিবেক-পূর্ব্বক অবগত হইয়া, আমার ভাব বা আমার অসংসারিত্ব স্বভাব লাভ করিবার যোগ্য হন (বলদেব)।

আমার ভক্ত আমার এই অক্ষরাত্মক বিভূতি বিশেষরূপে জানিয়া, আমার ভজনশীল হইয়া, আমার ভাবাত্মকস্বরূপ লাভের যোগ্য বা সমর্থ হন। (বল্লভ)। আমার ভাব অর্থাং জন্মমরণরাহিত্য ভাব পাইবার যোগ্য হন (কেশব)।

এ স্থলে মদ্‌ভক্ত অর্থে দ্বাদশাধ্যায়োক্ত আমার অর্থাৎ ভগবান্ বাসুদেবের উপাসক। মধুসূদনের এই অর্থই সঙ্গত। শঙ্কর 'মদ্-ভাবের' অর্থে এই সকল ভাব যে পরমাত্মা বাসুদেব, এই বুদ্ধিতে সেই সকল ভাবকে বাসুদেবে সমর্পণ দ্বারা পরমাত্মভাবপ্রাপ্তির জন্য যোগ্যতা বুঝিয়াছেন, ও 'মদ্'ভাবকে মোক্ষও বলিয়াছেন। এ অর্থ তত সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ঈশ্বরের যে বিভিন্ন ভাব, তাহা সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার যে পরমভাব, (৯।১১)—যে ভূতমহেশ্বর ভাব অথবা যাহা তাঁহার পরমধাম, সেই ব্রহ্মভাব, যাহা অব্যয়, অক্ষর,—যাহা পরমগতি (৮।২১), তাহাই এস্থলে উক্ত হইয়াছে বোধ হয়। যিনি ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তিনিই ভগবানের এই পরমভাব লাভ করিবার যোগ্য হন।

ভগবানের ভক্ত এই ভাব লাভ করিবার যোগ্য, ইহা এস্থলে উক্ত হইয়াছে। তবে কি যিনি আত্মজ্ঞানী, অথবা যাঁহারা কর্ম্মমার্গে ও জ্ঞানমার্গে সাধক, তাঁহারা এ ভাব লাভ করিতে পারেন না? এই আশঙ্কায় জ্ঞান-বাদী শঙ্কর ভক্তের জন্য অন্য অর্থ বলিয়াছেন। তিনি বলেন,—বাসুদেবই সমুদায়,—এই জ্ঞান যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহারাই বাসুদেবভক্ত। এইরূপ অর্থ করিলে, দ্বাদশাধ্যায়ে যে ভক্তি ও ভক্তের লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে, তাহার সহিত বিরোধ হয়। এজন্য বলিয়াছি যে, দ্বাদশাধ্যায়ে বিবৃত লক্ষণযুক্ত ভক্তকেই এ স্থলে মদ্ভক্ত বলা হইয়াছে এবং সেই ভক্তই যে ভগবদ্ভাব লাভ করিতে পারেন, ইহাই এ স্থলে উক্ত হইয়াছে। এই কথারই অর্থ ১৮শ অঃ ৫৪, ৫৫শ শ্লোকেও বুঝান আছে। যিনি অহঙ্কারাদি ত্যাগ করিয়া নির্ম্মল ও শান্ত হন, তিনি স্থির অচল ব্রহ্মভাব লাভ করেন,—তিনি আপনাকে সর্ব্বান্তর্ভূত আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করেন। তিনি সেই অধ্যাত্মজ্ঞানে বা আত্মস্বরূপ ব্রহ্মভাবে অবস্থান করিলে সর্ব্বভূতে, সমদর্শী হইয়া, চিত্তপ্রসাদ লাভে ভগবানে পরাভক্তি লাভ করেন। তিনি 'মদ্ভক্ত' অর্থাৎ ঈশ্বরে ভক্তিমান্ হন, এবং ভক্তিদ্বারাই সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্ব তাঁহার অধিগত হয়, এবং তদনন্তর সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরকে 'তত্ত্বতঃ' জানিয়া তিনি এই সগুণ ব্রহ্মে প্রবেশ করিতে পারেন। প্রথমে আত্মস্বরূপে অবস্থিতি হইতে নির্গুণ ব্রহ্মভাব হয়, পরে সর্ব্বাত্মভূত পরমাত্মস্বরূপে অবস্থিতি হইতে ঈশ্বরে পরাভক্তি হয়, তাহাতে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান হইলে তাহার ফলে সগুণ ব্রহ্মে বা পরমেশ্বরে অবস্থিতি হয়। তখন ভক্ত ঈশ্বরভাব লাভ করেন।

তাই এ স্থলে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যিনি তাঁহার ভক্ত, তিনি এই ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব বিজ্ঞাত হইয়া অর্থাৎ বিজ্ঞান সহিত সেই জ্ঞান লাভ করিয়া, ভগবানের ভাব লাভকরিবার যোগ্য হইতে পারেন। 'মদ্ভাবায় উপপদ্যতে' ইহার অর্থ আমার ভাব লাভ করিবার

জন্য সেই ভক্ত উপপন্ন হন অর্থাৎ ভগবানে প্রপন্ন হন, তিনি ভগবানের পরম ভাব লাভ করিবার অধিকারী হন।

জ্ঞানফল মুক্তি কিরূপ—এই অধ্যায়েও ঈশ্বরে অনন্যভক্তি, অধ্যাত্মজ্ঞান নিত্যত্ব ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনরূপ জ্ঞানের কথা উক্ত হইয়াছে—এবং সেই জ্ঞানেই ব্রহ্ম জ্ঞেয়, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। অতএব অধ্যাত্মজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে যে পরাভক্তির উদয় হয়, সেই ভক্তিমান্ সাধকই ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব বিশেষরূপে জানিতে পারেন। বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা ৭ম অধ্যায়ের ১ম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। সেই বিজ্ঞানের ফল কি? সে ফল অবশ্য মোক্ষ। কিন্তু সে মোক্ষ সর্ব্বব্যাপী বা সর্ব্বগত, স্থির, অচল, সনাতন, নির্গুণ, প্রপঞ্চাতীত ব্রহ্মভাবে অবস্থিতিরূপ নির্ব্বাণমুক্তি নহে। সে মোক্ষ নির্গুণ ও সগুণ উভয় ভাবযুক্ত পরম ব্রহ্মভাবে অবস্থিতি। সেই মুক্তিতে নির্গুণ ব্রহ্মভাবের সহিত পরমাত্মা পরমেশ্বরভাবের ঐক্য অনুভূতি থাকে। নির্গুণ ব্রহ্মরূপ পরমধামে—পরমেশ্বর ভাবে আপনাকে বিলীন করিয়া দিয়া সর্ব্বস্বরূপ ব্রহ্মের অনুভূতি থাকে। জগৎ মায়াময়, অসৎ হইলে, নির্গুণ ব্রহ্মভাবই মুক্তির পারমার্থিক স্বরূপ হইত। জগৎ যদি সত্য হয়, তবে নির্গুণ ও সগুণ এই উভয় ব্রহ্মভাবই পারমার্থিক তত্ত্ব। এই উভয় ভাব ধারণা করিয়া মোক্ষ লাভ করিয়া, সাধক বলিতে পারেন—'সোহহং' বা 'অহং ব্রহ্মাস্মি'। সোহহং এই স্থলে সঃ—নির্গুণব্রহ্ম বা 'তৎ' নহে, তিনি সগুণ ব্রহ্ম পরমেশ্বর—পুংলিঙ্গে 'সঃ' দ্বারা বাচ্য।

যাঁহারা কেবল আত্মজ্ঞানী বা সাংখ্যজ্ঞানী, সমদর্শী, স্থিরবুদ্ধি, তাঁহারা ব্রহ্মভাবে স্থিত হন (৫।১৯,২০), ব্রহ্মযোগযুক্ত হন (৫।২১), অন্তঃসুখ, অন্তর্জ্যোতির্যুক্ত হইয়া ব্রহ্মভূত হন, ও ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন (১৫,২৪)। এইরূপে আত্মজ্ঞানীই সর্ব্বতঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন। (অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্—গীতা, ৫।২৬)। এবং

তাঁহারা অব্যক্ত অক্ষরের উপাসক হইয়াও ভগবান্‌কেই প্রাপ্ত হন (১২।৪)। যদি এই ব্রহ্মনির্ব্বাণই শেষ তত্ত্ব হইত, তবে আর ষষ্ঠ অধ্যায়ের পরে গীতায় অন্য উপদেশ প্রয়োজন হইত না, ঈশ্বরতত্ত্ব উপদেশের প্রয়োজন হইত না, এবং ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় পরমব্রহ্মের উপদেশও প্রয়োজন হইত না। পরম ব্রহ্ম যখন জ্ঞানে বিশেষরূপে জ্ঞাত বা বিজ্ঞাত হন, তখন পরমব্রহ্মস্বরূপই লাভ হয়। সেই পরম ব্রহ্মস্বরূপই নির্গুণ ব্রহ্মের অন্তর্ভূত পরমেশ্বর রূপ। * সেই জন্য নির্গুণ ব্রহ্মভাবের সহিত পরমেশ্বর-ভাব-লাভেই পরম মোক্ষ। সেই ভাবে যোগযুক্ত হইয়াই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই উপদেশ দিয়াছেন। এইরূপে 'মদ্ভক্তো মদ্ভাবায় উপপদ্যতে' ইহার অর্থ আমরা বুঝিতে পারি।

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ১৯

—•০✦০•—

প্রকৃতি পুরুষ জান' উভয়ই অনাদি,
বিকার সকল আর গুণ সমুদায়
উৎপন্ন প্রকৃতি হ'তে, জানিও নিশ্চয় ॥ ১৯

এই জগৎ যে সত্য নিত্য প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগে বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগে জাত এবং জগৎকারণ যে মায়াখ্য শক্তিযুক্ত সগুণ ব্রহ্ম পারমার্থিক সত্য তত্ত্ব, তাহা এই অধ্যায়ে এই শ্লোক হইতে বিবৃত হইয়াছে।

১৯। প্রকৃতি পুরুষ জান' উভয়ই অনাদি—সাংখ্যদর্শনে (৫।৭২) সূত্রে আছে—

---

* এই তত্ত্ব পূর্ব্বে ১২।৩ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে।

"প্রকৃতিপুরুষয়োরন্তৎ সর্ব্বমনিত্যম্।"

এই স্থলে উক্ত হইয়াছে—প্রকৃতি পুরুষ অনাদি। এই প্রকৃতি পুরুষ ও তাহাদের অনাদিত্ব—এই সকল কথার মর্ম্ম বুঝিতে হইবে, প্রথমতঃ ভাষ্যকারগণের অর্থ উল্লেখ করা প্রয়োজন।

শঙ্কর বলিয়াছেন,—"পূর্ব্বে সপ্তম অধ্যায়ে ৪র্থ ৫ম শ্লোকে, ভগবান্ স্বকীয় দুইটি প্রকৃতির কথা বলিয়াছেন—পরা প্রকৃতি ও অপরা প্রকৃতি। এই অধ্যায়ে পরাপ্রকৃতিকে ক্ষেত্রজ্ঞ ও অপরা প্রকৃতিকে ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আরও উক্ত হইয়াছে যে, এই দুই প্রকৃতিই সর্ব্বভূতযোনি। "এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণি"—৭।৬। এ অধ্যায়েও পরে উক্ত হইয়াছে যে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ হইতে স্থাবর জঙ্গম সমুদায় সত্ত্বের উৎপত্তি (গীতা ১৩।২৬শ শ্লোক)। সেই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ প্রকৃতিদ্বয় কিরূপে এই সর্ব্বভূতযোনি বা ভূতগণের উৎপত্তির কারণ হয়, তাহাই এ স্থলে প্রতিপাদন করিবার জন্য এই শ্লোকের অবতারণা করা হইয়াছে।"

"প্রকৃতি (ক্ষেত্র) এবং পুরুষ (ক্ষেত্রজ্ঞ) এই উভয়ই ঈশ্বরের প্রকৃতি, উভয়েই অনাদি; কেন না, ইহাদিগের আদি নাই। যে কারণে ঈশ্বরের নিত্যত্ব সিদ্ধ, সেই নিত্য সিদ্ধ ঈশ্বরের প্রকৃতিদ্বয়ও সেই কারণে নিত্য। প্রকৃতিদ্বয় আছে বলিয়াই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। সেই প্রকৃতিদ্বয়ের সাহায্যেই ঈশ্বর জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ হন। অতএব সেই প্রকৃতিদ্বয় অনাদি হইয়াই সংসারের কারণ হইয়া থাকে।"

"কোন কোন ব্যাখ্যাকারগণ অর্থ করেন যে, * "অনাদিশব্দের অর্থ

---

* শঙ্করোক্ত এই ব্যাখ্যাকারগণ অবশ্য শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু এক্ষণে শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ব্যাখ্যাকারের নাম পাওয়া যায় না, সেরূপ কোন ব্যাখ্যাকারের গীতা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। রামানুজ প্রভৃতির ভাষ্য তাঁহাদের মধ্যে কাহারও ব্যাখ্যার অনুবর্ত্তী বোধ হয়। রামানুজ, শ্রীভাষ্যে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী তাঁহার মতানুযায়ী বেদান্ত-দর্শনের ব্যাখ্যাকার বৌধায়ন প্রভৃতির নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যাহা আদি নহে, তাহা অনাদি। (ন+আদি ইহা তৎপুরুষ সমাস হইতে অনাদি; যাহার আদি নাই, তাহা অনাদি এস্থলে এরূপ বহুব্রীহি সমাস হয় নাই)। অতএব পুরুষ ও প্রকৃতি, বা ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র ইহারা আদি নহে,—কেননা, ইহারা কারণ নহে, ইহারা কার্য্য। এই পুরুষ ও প্রকৃতি-রূপ কার্য্যের যাহা কারণ, তাহাই ঈশ্বর; ঈশ্বরই ইহাদের এবং সমুদায় জগতের আদি বা মূল কারণ। যদি প্রকৃতি ও পুরুষ নিত্য হইত, তবে ইহারাই জগৎকারণ হইত, তাহা হইলে ঈশ্বর জগতের কর্ত্তা হইতেন না।"

"এই প্রকার ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে। এইরূপ অর্থ হইলে প্রকৃতি ও পুরুষ সৃষ্টির পূর্ব্বে কোন ঈশিতব্য বস্তু না থাকায়, ঈশ্বরে তৎকালে (অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষ সৃষ্টির পূর্ব্বে) কোন ঈশ্বরত্বই থাকিত না, তৎকালে তাহা লোপ পাইত। তিনি নিত্য ঈশ্বর হইতে পারিতেন না। আর সংসারের সম্বন্ধেও কোন নিমিত্ত না থাকিলে, সংসার সর্ব্বদাই থাকিবার সম্ভাবনা হয়, জীবের মোক্ষ কোন কালে সম্ভব হয় না। বন্ধ মোক্ষ সম্বন্ধে শাস্ত্র বৃথা হয়, এবং বন্ধ ও মোক্ষ সিদ্ধান্তের অভাব হয়। এই-রূপ অর্থে এই প্রকার নানা দোষ হয় বলিয়া অনাদি অর্থে যাহা আদি নহে, ইহা সিদ্ধান্ত হয় না। অতএব যাহার আদি নাই, তাহা অনাদি, ইহাই এ স্থলে অর্থ করিতে হয়। ঈশ্বরের প্রকৃতিদ্বয় নিত্য হইলে বন্ধ-মোক্ষ-ব্যবস্থা প্রভৃতি সকলই উপপন্ন হয়। কি প্রকারে উপপন্ন হয়, তাহা এই শ্লোকে পরে উক্ত হইয়াছে। এই প্রকৃতি কি? ইহা ঈশ্বরের বিকার; কারণ (বা সৃষ্টির অনুকূল শক্তি)—ইহা ত্রিগুণাত্মিকা মায়া।"

রামানুজ বলেন যে,—"প্রকৃতি ও আত্মা অত্যন্ত বিরুদ্ধ-স্বভাব। ইহাদের সংসর্গ বা পরস্পর যোগও অনাদি। এই সংসৃষ্ট উভয়ের কার্য্য-ভেদই এই সংসারের হেতু। এই তত্ত্ব এ স্থলে উক্ত হইয়াছে। অন্যন্ত-সংসৃষ্ট প্রকৃতি পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিও। (রামানুজ।)

গিরি বলেন,—"প্রকৃতি ও পুরুষকে যে অনাদি বলা হইয়াছে, তাহার কারণ কি? ইহারাই সর্ব্বভূতযোনি বা ভূতগণের আদি কারণ। ভূতগণের কারণ প্রকৃতি, তাহার কারণ অপরা প্রকৃতি, ইত্যাদিরূপ সিদ্ধান্ত করিলে অনবস্থা (regresus ad infinitum) দোষ হয়। এ জন্য ভূতগণের এক অনাদি কারণ সিদ্ধান্ত করিতে হয়। সেই অনাদি কারণই প্রকৃতি ও পুরুষ। আরও অকৃতাভ্যাগমাদি দোষ নিবারণ জন্য, বন্ধনের নিদান জ্ঞানার্থ, এবং আত্মার বিক্রিয়াবত্বাদি দোষ নিবারণ জন্য প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই অনাদি তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। (যাহা 'অকৃত' বা করা হয় নাই, তাহার 'অভ্যাগম' বা বন্ধনরূপ ফল স্বীকার করিলে, অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। এজন্য আমাদের এই যে কর্ম্মরূপ বন্ধন, ইহার আদি কারণ পুরুষের সহিত প্রকৃতি-সংযোগ স্বীকার করিতে হয়। এজন্য প্রকৃতিপুরুষ—দুই-ই মূলতত্ত্ব)।"

স্বামী বলেন,—"পূর্ব্বে ক্ষেত্র 'যৎ চ যাদৃক্ চ' ইহাই উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে 'যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ, স চ যো যৎপ্রভাবঃ' পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞাত এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব, এই সংসার হেতু প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব এই শ্লোকে হইতে বিবৃত হইয়াছে। অনবস্থাদোষ নিবারণ জন্য উভয়কে অনাদি বলা হইয়াছে। ঈশ্বরের শক্তি হেতু প্রকৃতি অনাদি। তাঁহারই অংশ হেতু পুরুষ অনাদি। পরমেশ্বর এবং তাঁহার শক্তিদ্বয় পরা ও অপরাপ্রকৃতি যে অনাদি, তাহা ভাষ্যকার শ্রীমৎশঙ্কর ভগবান্ বিশেষভাবে বুঝাইয়াছেন।"

মধুসূদন, শঙ্কর ও স্বামীর অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—পূর্ব্বে ক্ষেত্র 'যৎ চ, যাদৃক্ চ' ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এস্থলে প্রকৃতি পুরুষের সংসার-হেতুত্ব নিরূপণ জন্য দুই শ্লোকে (১৯।২০) সেই ক্ষেত্র 'যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ' ইহাই বুঝান হইয়াছে, এবং তাহার পর দুই শ্লোকে (২১।২২) সেই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ 'যৎপ্রভাব' ইহা বুঝান হইয়াছে।

প্রথমে ভগবানের পরাপ্রকৃতি জীবরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ, এবং তাঁহার অপরা প্রকৃতি জড়রূপ ক্ষেত্র—এই উভয়ই যে অনাদি, তাহা উক্ত হইয়াছে। এই প্রকৃতি মায়াখ্যা ত্রিগুণাত্মিকা পারমেশ্বরী শক্তি। প্রকৃতি-পুরুষরূপা এই ভগবৎশক্তি অনাদি।

কেশব বলিয়াছেন,—"পূর্ব্বে ৭ম অধ্যায়ে ভগবানের যে পরা ও অপরা এই দুই প্রকৃতির কথা অভিহিত হইয়াছে, তাহাই এই অধ্যায়ে ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র এই দুই শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। এ স্থলে সেই ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্রকে যথাক্রমে পুরুষ ও প্রকৃতি শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ত্রিগুণাত্মিকা, অচেতন ক্ষেত্র লক্ষণ যে অপরাশক্তি, তাহাই প্রকৃতি; আর যাহা তাহা হইতে ভিন্ন চেতনরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ লক্ষণ যে পরা প্রকৃতি, তাহাই এ স্থলে পুরুষরূপে উক্ত হইয়াছে।" অর্থাৎ পুরুষ=ক্ষেত্রজ্ঞ=পরা প্রকৃতি আর প্রকৃতি=ক্ষেত্র=অপরা প্রকৃতি। ইহাদের আদি কারণ নাই, এজন্য ইহারা অনাদি।

এই প্রকৃতি ও পুরুষ—এবং এ উভয়ের অনাদিত্ব সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল। এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আমাদের বুঝিতে হইবে।

প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকই তত্ত্বজ্ঞান। পূর্ব্বে যে তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শনের কথা উক্ত হইয়াছে, এই প্রকৃতিপুরুষ তত্ত্বই এই তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়। প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব বা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্বই জ্ঞানের বিষয়। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান, তাহাই জ্ঞান। (১৩।২) এইরূপে পূর্ব্বে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্বজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহা পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্বের অন্তর্গত। সমষ্টিভাবে যাহা প্রকৃতি-পুরুষ, ব্যষ্টিভাবে তাহা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ। প্রতি জীব-সম্বন্ধে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব আর এই জীবজড়ময় সর্ব্বজগৎ-সম্বন্ধে প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব বুঝিতে হইবে। এ তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হইলে যে জ্ঞান পরিশুদ্ধ হয় না, এবং ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন না,

তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই প্রকৃতি ও পুরুষ জগতের কারণ, এই প্রকৃতি এবং তাহার গুণ ও বিকারের সহিত পুরুষের সংযোগ হইতে সংসারের উৎপত্তি, স্থিতি ও পরিণতি হয়। এই প্রকৃতির ত্রিগুণে ও প্রকৃতির বিকৃতি জড় শরীরে বদ্ধ হইয়া জীবগণের সংসারভোগ হয়। ভগবান্ একাংশে জীবরূপেই এই জগৎ ধারণ করেন। প্রকৃতিবদ্ধ পুরুষই জীবভাবাপন্ন হয়। এই প্রকৃতিবদ্ধ পুরুষ ভোক্তা আর স্থূল জগৎ তাহার ভোগ্য। অতএব এই প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্বই এক অর্থে জগৎ-তত্ত্ব। এই জগৎতত্ত্ব গীতায় এই স্থান হইতে অষ্টাদশাধ্যায় পর্য্যন্ত বিবৃত হইয়াছে। ইহাই গীতার Cosmology। এই অধ্যায়ে প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক, বা উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য, উভয়ের যে স্বরূপ এবং উভয়ের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ হয়, ও সম্বন্ধহেতু যে ফল হয়,তাহা বিবৃত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে জগৎসৃষ্টিকারণ প্রকৃতির ত্রিগুণ-তত্ত্ব, এবং কিরূপে ত্রিগুণবদ্ধ পুরুষ সেই ত্রিগুণাতীত হইতে পারে, তাহা বিবৃত হইয়াছে। পঞ্চদশ অধ্যায়ে সংসারবৃক্ষতত্ত্ব এবং তাহার সহিত ভগবানের সম্বন্ধ-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। ষোড়শ অধ্যায়ে প্রকৃতির এই ত্রিগুণের সহিত সম্বন্ধ হেতু মানুষের দৈবী ও আসুরী সম্পদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই ত্রিগুণের ফলে মানুষের গুণ, কর্ম্ম ও ধর্ম্মাদি কিরূপে পৃথক্ হইয়া যায়, তাহা বিবৃত হইয়াছে এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষে যাহা সারতত্ত্ব, তাহা সংক্ষেপে উক্ত হইয়া, গীতায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এইরূপে এই ১৩শ হইতে ১৮শ অধ্যায়ে প্রথমে যে জ্ঞান সর্ব্ববিজ্ঞান-লাভের উপযুক্ত, তাহার স্বরূপ উপদিষ্ট হইয়া, সেই জ্ঞানে জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে, এবং সেই জ্ঞানের যে তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন-স্বরূপত্ব উক্ত হইয়াছে, সেই তত্ত্ব অর্থাৎ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব, প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব, প্রকৃতি পুরুষ-সংযোগ-তত্ত্ব, জগৎ-তত্ত্ব, জগতের সহিত ব্রহ্মের বা পরমেশ্বরের এবং জীবের সম্বন্ধ-তত্ত্ব এবং প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ হেতু জীবের উৎপত্তি ও পরিণতিতত্ত্ব—

এক কথায় যাহা দর্শন-শাস্ত্রের (Metaphysics এর) সার, তাহা সংক্ষেপে উপদিষ্ট হইয়াছে।

প্রকৃতি ও মায়া।—এই জগতের আদি বা নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ অনাদি প্রকৃতি পুরুষ ও তাহাদের সংযোগ। সেই প্রকৃতি-পুরুষ কি, তাহার তত্ত্ব বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। প্রকৃতি ও মায়াকে একই অর্থে গ্রহণ করা যায়। যাহা সংখ্যদর্শনের প্রকৃতি, তাহাই বেদান্তদর্শনের মায়া। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে—'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ' (৪।১৩)। এই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ব্যতীত কোন প্রাচীন উপনিষদে 'মায়া' বা প্রকৃতির বিশেষ উল্লেখ নাই। কেবল ঋগ্বেদে ও বৃহদারণ্যকে 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপম্' (বৃহদারণ্যক ২।৫।১০) ইত্যাদি মন্ত্রে এই মায়ার উল্লেখ আছে। সে স্থলে মায়া অর্থে বলশক্তি। তাহা ঐন্দ্র-জালিক মায়াও হইতে পারে। প্রাচীন প্রামাণ্য উপনিষদে সুতরাং মায়াবাদ বা প্রকৃতিবাদের কোন আভাষ পাওয়া যায় না। এই সব উপনিষদে সগুণ ও নিগুর্ণ ব্রহ্মতত্ত্বই উপদিষ্ট হইয়াছে এবং ব্রহ্মের বলের কথা উক্ত হইয়াছে। এই বলের দ্বারা পৃথিবী প্রভৃতি লোক সকল বিধৃত। বলই ব্রহ্ম, বলই প্রাণ, বলেই সমুদায় প্রতিষ্ঠিত। (ছান্দোগ্য ৭।৮।১-২)। বৃহদারণ্যক (৫।১৪।৪)। দেবতাদের বল ব্রহ্মেরই (কেন ২) একজন্য সর্ব্বদেবতার অসুরত্ব বা বল একই (ঋগ্বেদ)। শ্রুতিতে এই কথা আছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ব্রহ্মের পরাশক্তিকে জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়াযুক্ত বলা হইয়াছে। ইহা হইতেই জীব জড়ময় জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতএব এই মায়াবাদ বা প্রকৃতিবাদ কোথা হইতে আসিল?

ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, শ্রুতিমূলক হইলেও প্রকৃতিবাদ সাংখ্যদর্শনের নিজস্ব, আর মায়াবাদ শঙ্করাচার্য্যব্যাখ্যাত বেদান্ত-দর্শনের নিজস্ব। এই মায়াবাদ অনেকের মতে বৌদ্ধ দর্শনের সম্পত্তি, এবং শঙ্কর

এই মায়াবাদ গ্রহণ করায় পুরাণে তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলা হইয়াছে। এজন্য বেদান্তের মায়াবাদ শঙ্করের নিজস্ব, অনেকের এই মত। যাহা হউক, গীতায় এই মায়া ও প্রকৃতি উভয়ের কথাই আছে। গীতায় ভগবান্ মায়াকে, তাঁহারই মায়া বলিয়াছেন। যথা,—"সম্ভবামি আত্মমায়য়া" (৪।৬), "মম মায়া দুরত্যয়া" "(৭।১৪), "ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া" (১৮।৬১)। ভগবান্ আরও বলিয়াছেন যে, জীবগণ "মায়য়া উপহৃতজ্ঞানাঃ" ('৭।১৫) এবং তাঁহার শরণ লইলে, তাঁহার কৃপায় জীবগণ মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে (৭।১৪)। ভগবান্ এই মায়াকে দৈবী, এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণময় ভাবরূপাও বলিয়াছেন (৭।১৩,১৪)। এইরূপে মায়া ও প্রকৃতি যে 'এক', উভয়েই ত্রিগুণাত্মিকা, (প্রকৃতের্গুণাঃ—৩।২৯) ইহা গীতায় উক্ত হইয়াছে, তবে গীতায় মায়া ও প্রকৃতিতে পার্থক্যও ইঙ্গিত করা আছে। ৪।৬ শ্লোকে যে আছে—"ভগবান্ আত্মমায়া দ্বারা স্বীয় প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হন"—তাহা হইতে জানা যায় যে, মায়া ভগবানের পরাশক্তি। শক্তি ও শক্তিমানে প্রভেদ নাই (শ্বেতাশ্বতর); এজন্য ভগবানের মায়াতে তাদাত্ম্য আছে, মায়া তাঁহার আত্মস্বরূপ। কিন্তু প্রকৃতিতে সে তাদাত্ম্য নাই, তাহাকে ভগবান্ 'আমার'—এই মাত্র বলিয়াছেন। পরাশক্তির যে প্রকৃষ্ট রূপ কৃতি বা কার্য্য করার অবস্থা, যাহা জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া অবস্থা, তাহাই সে প্রকৃতি। মায়া হেতুই প্রকৃতির জগৎকারণত্ব। মায়াতে ও প্রকৃতিতে এই মাত্র প্রভেদ। শঙ্কর প্রকৃতিতে ঈশ্বরের সৃষ্টি অনুকূল শক্তি বা ত্রিগুণাত্মিকা মায়া বলিয়াই বুঝিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। শঙ্কর প্রথম প্রচারিত বেদান্তদর্শনের ভাষ্যে মায়াকে অবিদ্যারূপা অসদাত্মিকা বলিয়াছেন সত্য, এবং তাহার আধার যে ব্রহ্ম, ইহাও স্পষ্ট স্বীকার করেন নাই সত্য, কিন্তু পরবর্ত্তী গীতাভাষ্যে তাঁহার পরিণত চিন্তার ফলে মায়াকে ব্রহ্মের পরাশক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাহাই যে

ভগবানের প্রকৃতি, তাহা বলিয়াছেন। চণ্ডীতেও মহামায়া দেবী ভগবতীকে বৈষ্ণবী শক্তি পরমা মায়া বলা হইয়াছে, এবং তিনিই যে আদ্যা প্রকৃতি—সকলের প্রকৃতি, তাহাও উক্ত হইয়াছে।

যাহা হউক, প্রকৃতি ও মায়া উভয়ই গীতায় প্রায় একরূপ এক অর্থে ব্যবহৃত। তবে মায়া—ঈশ্বরের পরাশক্তি—আপনাকে সীমাবদ্ধ করিয়া জীব ও জগৎরূপে স্থান, কাল, নিমিত্ত পরিচ্ছিন্ন করিয়া অভিব্যক্ত হইবার শক্তি (মীয়তে পরিমীয়তে অনয়া ইতি মায়া), আর প্রকৃতি জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া দ্বারা সেই শক্তির কার্য্যরূপ বা কার্য্যারম্ভরূপ, গীতায় এইমাত্র বিশেষ করা হইয়াছে। ভগবান্ এই জন্য প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া আত্মমায়া দ্বারা মানুষী প্রকৃতি রূপে অবতীর্ণ হন, ইহা বলিয়াছেন, তাহা দেখিয়াছি (৪।৬)। তাহা হইলেও মায়া প্রকৃতি হইতে ভিন্নতত্ত্ব নহে। এ জন্য গীতায় এস্থলে প্রকৃতিতত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে। মায়াতত্ত্ব স্বতন্ত্রভাবে বিবৃত হয় নাই।

প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব ও সাংখ্যদর্শন।—এই প্রকৃতি ও পুরুষবাদের মূল উপনিষদ হইলেও সাংখ্য দর্শনে ইহা প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে। ভগবান্ সাংখ্যশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক সিদ্ধশ্রেষ্ঠ ঋষি কপিলকে তাঁহারই বিভূতি বলিয়াছেন (১০।২৬)। তিনি গীতার প্রথমেই সাংখ্য জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীভাগবতে ঋষি কপিলকে ভগবানের ষোড়শ অবতারের মধ্যে এক অবতার বলা হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যাকারগণ তাঁহাকে ব্রহ্মার মানস পুত্র বলিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে "যঃ অগ্রে প্রসূতং ঋষিং কপিলং জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি" (৫।২)—এই মন্ত্রে ঋষি কপিলের উল্লেখ আছে। ব্যাখ্যাকারগণ কিন্তু এস্থলে কপিল অর্থে সর্ব্বজ্ঞানপ্রবর্ত্তক হিরণ্যগর্ভ বুঝিয়াছেন। সাংখ্যদর্শনের সাংখ্যজ্ঞানের প্রবর্ত্তক বলিয়াই কপিল মুনির এইরূপ স্তুতিবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু সাংখ্যদর্শনই এই পুরুষপ্রকৃতিবাদের আদি নহে।

বলিয়াছি ত, সাংখ্যদর্শনের মূল ভিত্তি যে তাহার পুরুষপ্রকৃতিবাদ, তাহারও প্রধান প্রমাণ শ্রুতি। তবে শ্রুতির পুরুষ প্রকৃতিবাদ ও বর্ত্তমান সাংখ্যদর্শনের পুরুষ-প্রকৃতিবাদ মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। গীতার পুরুষ-প্রকৃতিবাদই শ্রুতি-সম্মত। উপনিষদের মধ্যে কঠোপনিষদে এই পুরুষ-প্রকৃতিবাদের উল্লেখ আছে। এক অর্থে কঠোপনিষৎ এবং শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বর্ত্তমান সাংখ্যদর্শনের মূল ভিত্তি। কঠোপনিষদ্ হইতে সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের প্রমাণ যাওয়া যায়। কঠোপনিষদে আছে—

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসশ্চ পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্তম্ অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥"

(কঠ উপঃ ৩।১০।১১)।

অন্যত্র আছে—

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতো ব্যক্তমুত্তমম্॥
অব্যক্তাত্তু পরং পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।
যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি॥"

(কঠ উপঃ ৬।৭-৮)।

অতএব কঠোপনিষদ অনুসারে তত্ত্বের ক্রম এই:—(১) পুরুষ, (২) অব্যক্ত, (৩) মহান্ আত্মা, (৪) বুদ্ধি বা সত্ত্ব, (৫) মন, (৬) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, (৭) বিষয়। এই মহান্ আত্মাকে জ্ঞানাত্মা বা বিজ্ঞানাত্মাও বলা হয়। (কঠ উপঃ ৩।১৩)। ইহা সাংখ্যের মহত্তত্ত্ব বা সমষ্টি বুদ্ধিতত্ত্ব ইহাই বেদান্তের হিরণ্যগর্ভ। ইহার সম্বন্ধে মধুসূদন এক স্থলে বলিয়াছেন (৬।২৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) যে, ইহা সামান্য

নির্ব্বিশেষ অস্তিত্ব জ্ঞান 'আমি আছি' এইমাত্র বোধ। ইহা সর্ব্বভূতে সামান্যভাবে বর্ত্তমান। আর 'আমি' অমুক, অমুকের পুত্র—এইরূপ 'আমি' সম্বন্ধে যে বিশেষ ব্যষ্টি বা ব্যক্তিত্ব জ্ঞান, তাহাই অভিমানাত্মক অহঙ্কার। ইহাই এস্থলে বুদ্ধি বা সত্তা নামে অভিহিত। ইহাই সংসারের অহঙ্কার। এইরূপে কঠোপনিষদ হইতে পুরুষ, অব্যক্ত, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, মন, দশ ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের অর্থ বা বিষয় পাওয়া যায়। এই বিষয় সূক্ষ্ম ও স্থূলভেদে দ্বিবিধ। তাহা অবশ্য এস্থলে উক্ত হয় নাই। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পঞ্চ সূক্ষ্ম বিষয়—বেদান্তের সূক্ষ্মভূত, আর সাংখ্যের পঞ্চ তন্মাত্র, আর পঞ্চ স্থূল বিষয়, বেদান্তের পঞ্চ মহাভূত, আর সাংখ্যের পঞ্চ স্থূলভূত; এস্থলে অর্থ = বিষয় মাত্র উক্ত হইয়াছে। এই বিষয় এই দশরূপ ধরিলে, আমরা কঠোপনিষদ হইতেই সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব পাইতে পারি।

যাহা হউক, এস্থলে পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বই আমাদের বুঝিতে হইবে। উক্ত মন্ত্রে যাহা অব্যক্ত, তাহাই সাংখ্যের মূল প্রকৃতি। অব্যক্তকেই সাংখ্যদর্শনে প্রধান বা মূল প্রকৃতি বলে। অতএব শ্রুতি হইতেই এই পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব পাওয়া যায়। কিন্তু সাংখ্যদর্শনেই এই তত্ত্ব বিশেষভাবে স্থাপিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গীতায় পুরুষ-প্রকৃতিবাদ যেরূপে বিবৃত হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

অতএব বলিতে পারা যায় যে, সাংখ্যদর্শন হইতেই গীতায় এই প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব গৃহীত হয় নাই। তাহা বেদান্তের ব্রহ্মবাদের অন্তর্গত। তাই গীতায় সাংখ্য ও বেদান্তের সামঞ্জস্য হইয়াছে। যাহা হউক গীতোক্ত প্রকৃতি-পুরুষবাদের সহিত বর্ত্তমান প্রচলিত সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি পুরুষবাদ ভিন্ন। তাহা হইলেও, প্রথমে আমাদের এই প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব সাংখ্যদর্শন হইতেই বুঝিতে হইবে, এবং তাহার পরে গীতোক্ত প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব হইতে এই সাংখ্যশাস্ত্রের প্রকৃতি পুরুষ-তত্ত্বের প্রভেদ বুঝিতে হইবে।

গীতায় পুরুষবাদ।—প্রথমে পুরুষের কথা বলিব। পুরুষতত্ত্ব বেদান্তে স্থানে স্থানে বিবৃত হইয়াছে। সগুণ ব্রহ্মের আদি পুরুষরূপ ঋগ্বেদে পুরুষ সূক্তে (১০।৯০) উক্ত হইয়াছে ও অধিদৈবত পুরুষরূপ এবং অধিভূত ও অধ্যাত্ম পুরুষরূপ—এ সমুদায়ই বিশেষভাবে উপনিষদে বিবৃত হইয়াছে। গীতায় (১৫।১৬ শ্লোকে) ক্ষর অক্ষর ও উত্তম পুরুষের তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। এই ক্ষর পুরুষ সাংখ্যদর্শনের বদ্ধ পুরুষ। গীতা অনুসারে সে পুরুষ প্রকৃতিবদ্ধ হইয়া প্রকৃতিগুণ ভোগকরে (১৩।২১) সাংখ্যের মুক্ত পুরুষ গীতার অক্ষর পুরুষ। সাংখ্যদর্শনে পুরুষ বদ্ধ ও মুক্ত ভেদে দ্বিবিধ। সাংখ্য দর্শনে এই মুক্ত ও বদ্ধ দুই রূপ পুরুষ স্বীকৃত। সাংখ্যদর্শনে পরম পুরুষ বা নিত্য পরমেশ্বর স্বীকৃত হয় নাই। সেশ্বর সাংখ্য বা পাতঞ্জল দর্শনে নিত্য ঈশ্বর বা ক্লেশ-কর্ম্ম-বিপাক আশয় দ্বারা অপরামৃষ্ট বিশেষ পুরুষ স্বীকৃত হইয়াছে। গীতায়ও পরম পুরুষ বা উত্তম পুরুষ স্বীকৃত হইয়াছে। গীতায় এই পুরুষ—ক্ষর অক্ষর ও উত্তম ভাবে ত্রিবিধ হইলেও সাংখ্যের বহু পুরুষ-বাদ স্বীকৃত হয় নাই, তাহা পরে বিবৃত হইবে।

সাংখ্য দর্শনের যাহা বদ্ধ পুরুষ—তাহা গীতায় দেহী (দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। তাহাই গীতার ক্ষর পুরুষ। এই ক্ষর পুরুষের কথা এই শ্লোকে ও পরে ২০শ ২১শ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। এ শ্লোকে প্রথমে সামান্য ভাবে পুরুষ উক্ত হইয়াছে। পরে ক্ষর পুরুষের কথা ও সেই পুরুষ প্রকৃতিজ গুণসঙ্গ হেতু সুখদুঃখ-ভোক্তা, সদসৎ যোনিতে জন্ম ভোগ-কারী—ইহা উক্ত হইয়াছে। তাহার পরে এ অধ্যায়ে—পরমাত্মা, পরম-পুরুষ পরমেশ্বরের উল্লেখ আছে। (২২ প্রভৃতি শ্লোকে দ্রষ্টব্য)। এ জন্য এ স্থলে পুরুষ অর্থে জীবাত্মা, পরমাত্মা ও পরম পুরুষ—পুরুষের এই তিন অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। পুরুষ একই—বহু নহে, ইহাও বলা হইয়াছে। কিন্তু কোন ব্যাখ্যাকারই পুরুষকে এ অর্থে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা

পুরুষ অর্থে ভোক্তা কর্ত্তা জীবকেই বুঝিয়াছেন। অর্থাৎ এস্থলে পুরুষ যে গীতোক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ পরাপ্রকৃতি (৭।৫) এবং এই শ্লোকে প্রকৃতি যে অপরা প্রকৃতি (৭।৪) বা ক্ষেত্র, তাঁহারা তাহাই বুঝাইয়াছেন। পুরুষ কখন প্রকৃতি হইতে পারে না, এবং প্রকৃতিও কখন পুরুষ হইতে পারে না। সুতরাং যাহা পরাপ্রকৃতি তাহা পুরুষ বা ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে পারে না। পুরুষের এস্থলে যে অর্থ, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রকৃতিতত্ত্ব পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব। তাহার পূর্ব্বে অন্য কথা বুঝিতে হইবে।

সাংখ্যের পুরুষবাদ।—সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছি। এস্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সাংখ্যদর্শন অনুসারে পুরুষ বহু, প্রকৃতি এক। এই বহু পুরুষমধ্যে যাহারা অজ্ঞানযুক্ত, তাহারা প্রকৃতিবদ্ধ হয়। প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইলে, সেই অধিষ্ঠান হেতু—সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণের বা শক্তির যে সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতি, তাহার গুণক্ষোভ হয়। এই গুণ-ক্ষোভ হইতে সেই পুরুষ-সংসৃষ্ট প্রকৃতিতে মহত্তত্ত্বাদিক্রমে পূর্ব্বোক্ত ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের উৎপত্তি হয় এবং তাহা হইতে পুরুষের ক্ষেত্র বা শরীর উৎপন্ন হয়। পুরুষ সেই ক্ষেত্রের দ্বারা বদ্ধ হইয়া পড়ে—এজন্য পুরুষ প্রকৃতির গুণ আপনাতে আরোপ করে, আপনি সুখ-দুঃখ-মোহযুক্ত হয় এবং আপনাকে জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তারূপে অনুভব করে। নতুবা পুরুষ স্বরূপতঃ শুদ্ধ বুদ্ধ, মুক্ত'জ্ঞ'-স্বভাব। অবিদ্যাহেতু পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ হয়। প্রকৃতি ও পুরুষসংযোগে, প্রকৃতিতে পুরুষের অধিষ্ঠান হেতু প্রকৃতি চৈতন্যযুক্ত হয়। যখন পুরুষ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্রভাবে আপনাকে জানিতে পারে বা প্রকৃতির দ্রষ্টা হয়, তখন প্রকৃতি তাহাকে ত্যাগ করে, পুরুষ মুক্ত হয় ও তাহার সংসারদশা দূর হয়।

প্রকৃতি পুরুষ অনাদি।—সাংখ্যদর্শন অনুসারে এইরূপে প্রকৃতি

পুরুষের সংযোগে সংসারের উৎপত্তি, স্থিতি ও পরিণতি হয়। এই প্রকৃতি পুরুষই শেষ তত্ত্ব—ইহার অতীত আর কোন তত্ত্ব নাই—ইহার অতীত কোন ঈশ্বর নাই, এবং প্রকৃতি ও পুরুষ ঈশ্বরের শক্তি নহে, প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর স্বতন্ত্র—প্রকৃতি স্বাধীনা। এজন্য প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ে অনাদি ও মূলতত্ত্ব।

"প্রকৃতিপুরুষয়োরন্যৎ সর্ব্বম্ অনিত্যম্।"

—সাংখ্যসূত্র, ৬।৭৩

গীতা অনুসারে প্রকৃতি পুরুষ অনাদি হইলেও তাহারা মূলতত্ত্ব নহে। প্রকৃতি স্বাধীনা বা স্বতন্ত্রা নহে, প্রকৃতি ভগবানেরই, তাহা পরমেশ্বরের মায়াখ্যা পরাশক্তি। কার্য্যকালে বা জগতের ব্যক্তাবস্থায় প্রকৃতি বা ভগবানের এই শক্তি দুই রূপে ভিন্ন হয়। এক পরা প্রকৃতি, আর এক অপরা প্রকৃতি। এই অপরা প্রকৃতি আবার বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন ও পঞ্চ-তন্মাত্রভেদে আট প্রকারে বিভক্ত। ইহাই সাংখ্যদর্শনে 'লিঙ্গ' অর্থাৎ লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্মশরীরের মূল উপাদান। ইহার সহিত অহ-ঙ্কারের বিকার দশ ইন্দ্রিয় মিলিত হইয়া সূক্ষ্ম-শরীর (বা ক্ষেত্রের সূক্ষ্মাংশ) সৃষ্টি করে। এই মায়া বা প্রকৃতি এক নহে,—বহু হইয়া ব্যক্ত হয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে—"পরাস্য শক্তিবিবিধৈব শ্রূয়তে" (৬।৮)। ইহাতে আরও আছে যে, এই প্রকৃতি অষ্ট-রূপা, (৬।৬) তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ঋগ্বেদে ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে,—'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপঃ'। এস্থলে মায়া বহুবচনে উক্ত হইয়াছে। অতএব এই প্রকৃতি ব্রহ্মের মায়াখ্যা পরাশক্তি বলিয়া ইহা অনাদি। আর পুরুষ, তাহা ও ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সগুণভাবেই পরম পুরুষ, অক্ষর পুরুষ ও ক্ষর পুরুষ। ব্রহ্ম সগুণভাবে স্ব-মায়া-শক্তিতে অধিষ্ঠিত বলিয়াই তিনি পুরুষ। এই অধিষ্ঠানের পার্থক্য হেতু পুরুষের এই তিন ভাব। অতএব পুরুষ ব্রহ্ম বা ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া অনাদি।

সাংখ্যের প্রকৃতিতত্ত্ব।—এক্ষণে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব। সাংখ্যমতে প্রকৃতি স্বাধীনা,—স্বতন্ত্র-তত্ত্বাত্মিকা। ইহা এক বটে, কিন্তু ইহার মূল উপাদান সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি। ইহাই জগতের নানাত্বের মূল। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিপর্য্যয় ও তারতম্য অনুসারে ইহাদের বিভিন্নরূপে মিশ্রণ হেতু প্রকৃতি ব্যক্তাবস্থায় বহু—এমন কি, অভিন্ন হইয়া এই জগৎরূপে পরিণত হয় (কারিকা ১৬)। কেহ বলেন,—অনন্ত সত্ত্ব, অনন্ত রজঃ, ও অনন্ত তমঃ ইহাদের সমবায়ই প্রকৃতি। ইহাদেরই বিভিন্ন সংযোগ হইতে প্রকৃতির বহু পরিণাম হয়। এই জন্য অনন্তসংখ্যক বদ্ধ পুরুষের সহিত অনন্তরূপে ভিন্ন প্রকৃতির বিভিন্ন ভাবে সংযোগ হইয়া বিভিন্ন পুরুষের বিভিন্ন সূক্ষ্মশরীর সৃষ্ট হয়। এই জন্য প্রত্যেক বদ্ধ পুরুষের অবিদ্যা অনুসারে, তাহার ক্ষেত্র ভিন্ন হয়।

কেহ বলেন,—একই প্রকৃতির পরিণাম হইতে প্রথমে একই মূলবুদ্ধি অহঙ্কার ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রযুক্ত সূক্ষ্মশরীর সৃষ্ট হয়। ইহাই কারিকায় উক্ত হইয়াছে (সাংখ্যকারিকা ৪০); তদনুসারে লিঙ্গশরীর সৃষ্টির পূর্ব্বে উৎপন্ন, অসক্ত, নিয়ত (নিত্য), অষ্টরূপ, ভেদরহিত, ও ধর্ম্মাদি ভাব দ্বারা অধিবাসিত। বিজ্ঞানভিক্ষুও বলিয়াছেন,—'সপ্তদশৈকং লিঙ্গম্' এই সাংখ্যসূত্রের (৩।৭) বিজ্ঞানভিক্ষু-ভাষ্য দ্রষ্টব্য। অতএব সাংখ্যদর্শন-মতে এই লিঙ্গশরীর এক। এই এক লিঙ্গশরীর প্রকৃতির বিভুত্ব-যোগ হইতে নটের ন্যায় কার্য্যকরণের ব্যবস্থা সম্পাদিত হয় (সাংখ্য-কারিকা, ৪২)। এই লিঙ্গশরীর প্রতি পুরুষে তাহার অবিদ্যা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। প্রতি পুরুষের এই লিঙ্গ বা সূক্ষ্মশরীর ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায়, সেই বিভিন্ন সূক্ষ্ম শরীর অনুসারে তদুপযোগী স্থূল শরীর গঠিত হয় বলিয়া পুরুষ নানাজাতীয় জীবদেহ গ্রহণ করে, প্রত্যেকের ক্ষেত্র পৃথক্ হয়।

এইরূপ ব্যাখ্যা অনুসারে স্বতন্ত্রা স্বাধীনা প্রকৃতির এইরূপ অনন্তরূপে ভিন্ন হইয়া পরিণত হওয়া ঠিক বুঝা যায় না। সাংখ্যদর্শন ইহা যেরূপে বুঝাইয়াছেন, তাহা পরে উল্লিখিত হইবে। যাহা হউক, বহু পুরুষের সন্নিধানভেদ হেতু প্রতি পুরুষের সন্নিহিত প্রকৃতি যে ভিন্ন হয়, তাহা বলা যায় না; কেন না, মূলতঃ প্রকৃতি দেশকালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। আর এইরূপে প্রতি পুরুষের ক্ষেত্র এক প্রকৃতি হইতে বিভিন্নরূপে উৎপন্ন হইয়াছে স্বীকার করিলেও, তাহা দ্বারা স্থূল পাঞ্চভৌতিক জগৎ-সৃষ্টি বুঝা যায় না। প্রতি পুরুষের সন্নিধানে প্রকৃতি পরিণত হইয়া পঞ্চভূত পর্য্যন্ত রূপে বিকৃত হইলে, প্রতি পুরুষের সন্নিধানে সৃষ্ট লিঙ্গ শরীর ও পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীর ও বাহ্য জগৎ পৃথক্ হইত। এই সমষ্টিভাবে পাঞ্চভৌতিক জগতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কোন কোন সাংখ্য-পণ্ডিত হিরণ্যগর্ভাখ্য সিদ্ধ পুরুষ স্বীকার করেন, এবং এই হিরণ্যগর্ভই সামান্যভাবে প্রকৃতির ভূত পর্য্যন্ত পরিণামের কারণ বলেন, এবং বদ্ধ পুরুষ তাহার কারণ নহে, ইহাই সিদ্ধান্ত করেন। হিরণ্যগর্ভ হইতে একই সূক্ষ্ম শরীর সৃষ্ট হইয়া, তাহাই বিভিন্ন পুরুষের কর্ম্ম বা সংস্কার ভেদে বা অবিদ্যাভেদে পৃথক্ হইয়া যায়, এবং দেখা যায়, সমষ্টি পঞ্চভূত হইতে উপাদান গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন পুরুষের বিভিন্নরূপ স্থূল শরীর সৃষ্ট হয়, তাঁহারা এ কথাও বলেন।

যাহা হউক, সাংখ্যদর্শন অনুসারে এই প্রকার কোন একরূপে অনন্ত বদ্ধ পুরুষগণ প্রত্যেকে তাহার উপযুক্ত সূক্ষ্ম শরীরে আবদ্ধ হয়। এই প্রকারে বহু প্রকৃতিবদ্ধ সংসারী পুরুষের (যাহাকে জর্ম্মাণ দার্শনিক Leibnitz Monad বলিয়াছেন তাহাদের) সমষ্টিই এই সংসার। এইরূপে বহুপুরুষ ও বহুপ্রকৃতির পরিণাম স্বীকার করিলে জগতের মধ্যে কোন একত্ব বা একতত্ত্ব সিদ্ধান্ত করা যায় না। বহু পুরুষমধ্যে কোনরূপ সম্বন্ধ না থাকায়, এ জগতের মধ্যে একটা সম্বন্ধ বা একত্ব

(organised whole) ধারণা করা যায় না। জগৎটা কেবল দুঃখময় অমঙ্গলময়, পরস্পর মধ্যে যদি কোন সম্বন্ধ থাকে, তাহা বিরোধের সম্বন্ধ; কেবল পরস্পর মধ্যে কাটাকাটি, মারামারি, বিবাদ-বিসংবাদ, প্রত্যেকে অপরকে অভিভূত করিতে, নিজ স্বার্থ রক্ষা করিতে নিরত, ইহাই সিদ্ধান্ত হয়; সংসার হইতে মুক্ত না হইলে এ অনন্ত দুঃখ ক্লেশের বিরাম নাই, ইহাই ধারণা হয়। এক কথায় দুঃখবাদ (বা Pessimism) আসিয়া পড়ে। বহুত্বজ্ঞানই অজ্ঞান; সুতরাং তাহাই দুঃখের কারণ। *

গীতোক্ত পুরুষ—জীব বা ব্রহ্ম প্রকৃতি নহে।—বলিয়াছি ত, গীতায় এই অর্থে সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব গৃহীত হয় নাই। গীতা অনুসারে পুরুষ এক, তিনি পরম পুরুষ, পরমেশ্বর। ব্রহ্মই অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের ন্যায় স্থিত। তিনিই পরমেশ্বররূপে অন্তর্যামী; নিয়ন্তৃরূপে

---

* এ স্থলে উল্লেখ করা উচিত যে, ঋষি কপিলের প্রচারিত কোন মূলগ্রন্থ পাওয়া যায় না। অনেকে সাংখ্যতত্ত্ব-সমাসকে মূল সাংখ্যগ্রন্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তাহাতে বহু পুরুষের কথা নাই; ঈশ্বর অস্বীকৃত হন নাই। সাংখ্যসূত্রেও 'ব্রহ্ম' অঙ্গীকৃত হন নাই। সুতরাং ঋষি কপিলের মূল মত কি ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই, এবং তাহা যে গীতোক্ত সাংখ্যজ্ঞান হইতে ভিন্ন, তাহাও বলিবার কোন উপায় নাই। কপিল ঋষির পরে সাংখ্যজ্ঞানপ্রবর্তক আসুরি পঞ্চশিখ প্রভৃতির কোন প্রামাণ্য গ্রন্থও পাওয়া যায় না' যে, এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা যাইবে। সাংখ্যসূত্র ও সাংখ্যকারিকা আধুনিক গ্রন্থ। বৌদ্ধ দর্শন যেমন বুদ্ধের মূলমত হইতে ভিন্ন হইয়া চারি প্রকার হইয়াছে, আধুনিক সাংখ্য-পণ্ডিতগণ সেইরূপ কপিল-মত ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করেন বলা যায়। সুতরাং ত্রিকালদর্শী ঋষি কপিল যে ঋগ্বেদোক্ত "একত্বদাসীৎ" (১০।১২৯) এই একত্ব তত্ত্বের বিরোধী মত প্রচার করিয়াছেন, ইহা বলা সঙ্গত হয় না। অতএব ইহা বলা যাইতে পারে যে, গীতায় ও শ্রীভাগবতে সাংখ্যজ্ঞান যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাই মূল সাংখ্য মত।

সর্ব্বজীব-হৃদয়ে অবস্থিতি করেন। পরমাত্মরূপে এক হইয়াও তিনিই প্রতি জীবে পৃথক্ জীবাত্মার ন্যায় অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনিই সর্ব্বক্ষেত্রে এক ক্ষেত্রজ্ঞ। তিনিই পরমেশ্বররূপে আপনার অপরা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া, অধ্যক্ষ হইয়া, প্রকৃতিকে এই জগৎ প্রসব করান ও প্রকৃতিকে সর্ব্বজীবক্ষেত্ররূপে পরিণত করান; এবং এই বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভক্তের ন্যায় অধিষ্ঠিত হইয়া বহু জীবাত্মরূপে বহু পুরুষরূপে প্রতীয়মান হন এবং সেই ক্ষেত্র সকলকে অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন জীবভাব প্রকাশ (manifest) করেন। গীতা অনুসারে এই পুরুষ ত্রিবিধ;—ক্ষর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ ও উত্তম পুরুষ। এই পুরুষতত্ত্ব পরে ১৫।১৬-১৭ শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা এস্থলে দ্রষ্টব্য।

পরম পুরুষ পরমেশ্বর সর্ব্বভূতক্ষেত্রে অবিভক্ত হইয়াও প্রতিভূতে বিভক্তের ন্যায় প্রতীয়মান হন, বহু ক্ষর পুরুষরূপে আপনাকে অজ্ঞানীর জ্ঞানে প্রকাশ করেন। তিনিই সর্ব্বভূত-হৃদয়ে কূটস্থ অক্ষর আত্মা-রূপে সর্ব্বদেহীর অন্তরে 'এক' অবিভক্তরূপে অবস্থিত থাকেন। ভগবান্ আপনার পরাশক্তি-বলে, এই প্রকারে বহুত্বপূর্ণ জীবজড়ময় জগৎরূপে প্রকাশিত হন।

এজন্য গীতায় 'পুরুষ' অর্থে পরম পুরুষ পরমেশ্বর এবং প্রকৃতি অর্থে তাঁহারই মায়াখ্য পরাশক্তিকে বুঝিতে হইবে। সগুণব্রহ্ম নিত্য এই পরম পুরুষ ও পরমা শক্তিরূপ, সগুণব্রহ্ম আপনার জ্ঞানস্বরূপকে প্রপঞ্চ সম্বন্ধে এই পরম জ্ঞাতা-পরমেশ্বর বা পরমপুরুষ এবং পরম জ্ঞেয় স্বশক্তি রূপা পরমা প্রকৃতি ভাবে এই জগৎকারণ হন। এই পরমেশ্বর-রূপ পরম পুরুষ এবং তাঁহার এই পরাশক্তি অনাদি। জগতের মূল কারণ এক; তাহা বহু হইতে পারে না। ব্রহ্ম অনাদিমৎ (১৩।১২) ভগবান্ অনাদি (১০।৩) এবং প্রকৃতি ও পুরুষ অনাদি—এইরূপ চারিটি স্বতন্ত্র অনাদি বস্তু থাকিতে পারে না। অতএব বলিতেই হইবে যে; পরব্রহ্মই

একমাত্র 'অনাদিমৎ'এবং পরমেশ্বর পরম পুরুষ এবং প্রকৃতিরূপা পরাশক্তি একমাত্র তাঁহারই স্বরূপ, এবং শক্তি ও শক্তিমানে কোন ভেদ থাকিতে পারে না বলিয়া এই প্রকৃতি পুরুষ অনাদি। ব্রহ্ম এই প্রকৃতি-পুরুষ রূপেই জগৎ-কারণ হন; এ জন্য এই জগৎ সম্বন্ধে এই প্রকৃতি পুরুষ অনাদি। পরব্রহ্ম আপনিই সগুণ পরমেশ্বররূপ হন এবং আপনিই মহদ্ব্রহ্মরূপা প্রকৃতি হইয়া পরমেশ্বরের জ্ঞানরূপ বীজ-নিষেক গ্রহণ করিয়া সেই জগদ্বীজ ধারণ করেন এবং তাহা হইতে জগৎ প্রসব করেন।

অতএব এস্থলে পুরুষ অর্থে ব্যাখ্যাকারগণ যে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ বা ভগবানের পরা প্রকৃতি বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। পরবর্ত্তী ২২শ শ্লোকের সহিত এ অর্থের বিরোধ হয়। যাহাকে একস্থলে পুরুষ বলা হইয়াছে, তাহাকেই আবার প্রকৃতি বলা যাইতে পারে না। ইহাতে পরস্পরবিরোধী বাদ আসিয়া পড়ে। তবে চিত্তে আত্মার যে প্রতিবিম্ব পড়ায় চিত্ত চৈতন্যযুক্ত হইলে তাহাতে জ্ঞাতা প্রভৃতি ভাবের বিকাশ হয়, এবং যাহা আত্মাতে পুনঃ প্রতিবিম্বিত হয়, তাহা প্রকৃতি হইলেও অজ্ঞান হেতু তাহাতে পুরুষের অধ্যাস হয় বলিয়া, তাহাকে পুরুষ বলা যাইতে পারে। কিন্তু সে প্রতিবিম্ব অনাদি নহে। তাহা বস্তুও নহে। তাহা বস্তুর (আত্মার) আভাস মাত্র। এজন্য তাহা ক্ষর।

গীতোক্ত প্রকৃতি এস্থলে অপরা নহে—গীতা অনুসারে প্রকৃতি অনাদি হইলেও তাহা এক নহে। প্রকৃতি সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধ গুণ বা ভাবযুক্ত বটে; কিন্তু এই গুণ প্রকৃতি হইতেই জাত (তাং, ১৩।২১)। এই প্রকৃতি স্বাধীনা নহে। ইহা পরমেশ্বরেরই প্রকৃতি-ব্রহ্মের মায়াখ্যা পরাশক্তি ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। প্রকৃতি দুইরূপ;—অপরাও পরা। অপরা প্রকৃতিই বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন ও পঞ্চ মহাভূতরূপে

ভিন্না হয়। তাহাদের সমবায়ই লিঙ্গ। আর পরা প্রকৃতি উপনিষদুক্ত প্রাণরূপ, ইহা ৭ম অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকের ব্যাখায় উক্ত হইয়াছে। তাহা হইতেই জীবভাবের প্রকাশ হয়, ইহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। এই জীব প্রকৃতি বলিয়া ইহা ক্ষর বা অক্ষর কোনরূপ পুরুষ হইতে পারে না। ইহা প্রকৃতিই। এই জীবরূপা পরা প্রকৃতি ভূতও হইতে পারে না; কেন না, তাহা ও অপরা প্রকৃতি উভয়ে মিলিয়া সর্ব্বভূতযোনি হয় (৭।৬)। তবে এ পরা প্রকৃতি কি? ইহা জীব বা জীবত্বের আধার জীবন—ইহা প্রাণ। সাংখ্যদর্শনে প্রাণকে করণের সামান্য বৃত্তি বলা হইয়াছে। কিন্তু বেদান্ত-দর্শনে তাহা মূল তত্ত্ব। প্রাণ—ব্রহ্ম, প্রাণই এই সমুদায়, ইহাই শ্রুতির উপদেশ। ইহাই ব্রহ্মের পরা শক্তির আদি রূপ, প্রথম নিঃসৃত। পরা প্রকৃতি—এই প্রাণ, আর অপরা প্রকৃতি এক অর্থে রয়ি। জগতে এই প্রাণ ও রয়ি এই দুই মূল তত্ত্ব। এই প্রাণ (পরা প্রকৃতি) লিঙ্গের (অপরা প্রকৃতি) সহিত যুক্ত হইয়াই ভূতযোনি হয়। তাহাতে পুরুষ-অধিষ্ঠিত হইয়া বা বীজপ্রদ পিতা হইয়া সর্ব্বভূতের উৎপত্তি-কারণ হন। ইহাও পরে বিবৃত হইবে।

অতএব গীতা অনুসারে এই প্রকৃতি পুরুষ ব্রহ্মের সগুণ ভাব হেতু পরমতত্ত্ব এবং তাহা অনাদি জগতের আদি কারণ। জর্ম্মাণ দার্শনিক পণ্ডিত সেলিং যাহার তত্ত্ব Philosophy of the Spirit এবং Philosophy of Nature গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন, এবং যাহা তাঁহার Philosophy of the Absolute এর অন্তর্গততত্ত্ব বলিয়াছেন। সেই Nature ও Spirit এক অর্থে এই অনাদি প্রকৃতি ও পুরুষ।

আমরা গীতার ও প্রচলিত সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি-পুরুষবাদ-মধ্যে যে প্রভেদ এস্থলে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা সংক্ষেপে এ স্থলে বিবৃত হইল।

সাংখ্য।	গীতা।
১। পুরুষ বহু-অনন্ত, বদ্ধ মুক্ত ভেদে তাহা দুইরূপ। ইহা ব্যতীত সিদ্ধ পুরুষও আছে।	পুরুষ—এক, ক্ষর অক্ষর ও পরমভেদে ত্রিবিধরূপে প্রতীয়মান।
২। মূল প্রকৃতি এক ত্রিগুণাত্মক।	প্রকৃতি দুইরূপ—পরা ও অপরা। প্রকৃতি ভগবানের বা পরম পুরুষের মায়াখ্যা পরা শক্তির মূল কার্য্যরূপ।
৩। প্রকৃতি স্বাধীনা, স্বতন্ত্রা। ৪। পুরুষ, প্রকৃতি পরস্পর স্বতন্ত্র দুই ভিন্ন মূলতত্ত্ব।	পুরুষ প্রকৃতি—স্বতন্ত্র নহে, তাহা পরব্রহ্মের সগুণ রূপ। প্রকৃতি পরম পুরুষেরই—অর্থাৎ তাঁহারই অধীন।
৫। পুরুষ প্রকৃতি অনাদি।	যাহা জগৎকারণ সগুণ ব্রহ্মের পরম পুরুষ ও পরমাপ্রকৃতিরূপ তাহাই কেবল অনাদি।
৬। বহুপুরুষ ও ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিই শেষতত্ত্ব।	পরম ব্রহ্মই জ্ঞেয়, সগুণ ব্রহ্ম বা পরমপুরুষ ও তাঁহার পরমা প্রকৃতি বা বল-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মিকা বিবিধ শক্তিই শেষতত্ত্ব। এই প্রকৃতি হইতেই ত্রিগুণের উৎপত্তি।

পুরুষ প্রকৃতি সম্বন্ধে অন্য কথা আমরা ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত করিব।

বিকার...আর গুণ উৎপন্ন প্রকৃতি হ'তে—বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া দেহ ও ইন্দ্রিয় পর্য্যন্ত বিকার এবং সুখ-দুঃখ-মোহরূপ প্রত্যয়াকারে পরিণত গুণ সকল—ইহারা ঈশ্বরের বিকার ; কারণ শক্তি ত্রিগুণাত্মিকা মায়াখ্যা প্রকৃতি হইতে জাত—বা প্রকৃতির পরিণাম ইহা জান,

(শঙ্কর, হনু)। দেহ ইন্দ্রিয়াদি বিকার, এবং গুণ-পরিণাম সুখদুঃখ-মোহাদি প্রকৃতি-সম্ভূত, (স্বামী)। একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত—এই ষোড়শ বিকার, আর সত্ত্ব-রজঃ-তমোরূপ ত্রিগুণ—ইহারা প্রকৃতি-সম্ভব, অর্থাৎ প্রকৃতিই ইহাদের কারণ (মধু)। বন্ধনের হেতুভূত ইচ্ছা-দ্বেষাদি বিকার, আর অমানিত্বাদি মোক্ষ—মোক্ষহেতুভূত গুণ-সকল প্রকৃতি হইতে সম্ভূত। পুরুষদ্বারা সংসৃষ্ট বা সম্বন্ধযুক্ত হইয়া অনাদি-কাল-প্রবৃত্ত যে ক্ষেত্রাকারে পরিণত প্রকৃতি, তাহা নিজ বিকার ইচ্ছা দ্বেষ প্রভৃতি দ্বারা পুরুষের বন্ধন-হেতু হয়, সেই প্রকৃতিই আবার স্ববিকার অমানিত্বাদি দ্বারা পুরুষের অপবর্গ হেতু হয়। ইহাই অর্থ (রামানুজ)। দেহেন্দ্রিয়াদি বিকার ও সুখদুঃখ মোহ এই গুণ প্রকৃতি হইতে জাত, তাহারা জীব হইতে জাত নহে। ক্ষেত্ররূপে পরিণত প্রকৃতি হইতে জীব ভিন্ন (বলদেব)। বিকার অর্থাৎ জীবগণের বন্ধ-হেতুভূত ইচ্ছা দ্বেষ আদি, গুণ অর্থাৎ অমানিত্বাদি জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ-হেতুভূত গুণ। এই বিকার ও গুণ প্রকৃতি হইতে সম্ভূত। অনাদি কর্ম্মাত্মক অবিদ্যার নিমিত্ত জীব সংসৃষ্ট প্রকৃতি ক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়া নিজ বিকারভূত ইচ্ছা-দ্বেষাদি দ্বারা পুরুষের সংসারে বন্ধনের কারণ হয়, আর সেই প্রকৃতিই অমানিত্বাদি গুণ দ্বারা পুরুষের মোক্ষের কারণ হয়। (কেশব)।

প্রকৃতির কারণত্ব :—এই স্থলে এবং পরবর্ত্তী কয়েক শ্লোকে প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জন্য, প্রকৃতির ধর্ম্ম ও পুরুষের ধর্ম্ম পৃথক্‌ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। এ শ্লোকে প্রকৃতি কারণ হইতে যে কার্য্য বা কার্য্যাত্মক জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা উক্ত হইয়াছে। মূল প্রকৃতি হইতে সমুদায় "বিকার" ও "সমস্ত-গুণ" উৎপন্ন হইয়াছে। এই 'বিকার' ও গুণের অর্থ কি? মূলকারণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, বিকার এবং ত্রিগুণতত্ত্ব সাংখ্যদর্শনে উক্ত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শন অনুসারে প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—সেই তিন গুণ। এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ" (সাংখ্যসূত্র, ১।৫৯)। পুরুষের সান্নিধ্যে এই ত্রিগুণের ক্ষোভ হইয়া (অর্থাৎ equillibrium নষ্ট হইয়া) প্রকৃতির বিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। প্রকৃতি কেবল কারণ। প্রকৃতি—অব্যক্ত। এই প্রকৃতি হইতে ২৩ তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। সাংখ্যদর্শনে আছে—"প্রকৃতের্মহান্ মহতো হহঙ্কারঃ অহঙ্কারাৎ পঞ্চ তন্মাত্রাণি উভয়ম্ ইন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি" (১।৫৬) কারিকা এই শ্লোকও দ্রষ্টব্য।) প্রকৃতি হইতে প্রথম যে কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহাই কারণ হইয়া যে অন্য কার্য্য উৎপন্ন করে, তাহাদিগকে প্রকৃতি-বিকৃতি বলে। এই প্রকৃতি-বিকৃতি কোন কোন মতে সাতটি, কোন কোন মতে আটটি। বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র—এই সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতি, কোন কোন সাংখ্যব্যাখ্যায় এবং গীতায় মনকেও এই প্রকৃতি-বিকৃতিমধ্যে ধরা হইয়াছে। এমতে প্রকৃতি-বিকৃতি আটটি। ইহাই অষ্টধা ভিন্না অপরা প্রকৃতি (৭।৪)। এই প্রকৃতি-বিকৃতি হইতে পঞ্চদশবিধ বিকৃতির উৎপত্তি হয়। তাহা হইতে আর কিছু উৎপন্ন হয় না বলিয়া, তাহা কেবল বিকৃতি। অতএব জীবের সম্বন্ধে দেহ ও ইন্দ্রিয়গণকেই বিকৃতি বলা যায়। গীতায় অষ্ট প্রকৃতি-বিকৃতিকে অপরা প্রকৃতি বলা হইয়াছে। এস্থলে দশ ইন্দ্রিয় ও পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহকে প্রকৃতিজাত 'বিকৃতি' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রকৃতি-বিকৃতি ও বিকৃতি লইয়া সাংখ্যের ত্রয়োবিংশতিতত্ত্ব।

গীতা অনুসারে যে অষ্টধা ভিন্না অপরাপ্রকৃতি উক্ত হইয়াছে, তাহা লিঙ্গশরীরের উপাদান। সমষ্টিভাবে তাহা এক, এই জগতের লিঙ্গশরীর। ব্যষ্টিভাবে তাহা প্রকৃতি জীবের লিঙ্গশরীর। ইহা হইতে যে বিকৃতি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার মধ্যে দশটি ইন্দ্রিয় এই লিঙ্গশরীরেরই অন্তর্গত হয়। অবশিষ্ট পাঁচটি স্থূলভূতই এই বাহ্য জড়-জগতের উপাদান।

এই মূল প্রকৃতির ত্রিগুণ হইতে ক্ষেত্রে যে সুখ দুঃখ মোহ উৎপন্ন হয়, যে রজোগুণ হইতে রাগ-দ্বেষাদি জন্মে, ব্যাখ্যাকারগণের মতে এ সমুদায়ই প্রকৃতি-সম্ভূত গুণ। কিন্তু সাংখ্য দর্শন অনুসারে গুণ quality নহে, ইহা দ্রব্য (substance) ইহাই প্রকৃতির উপাদান। গুণ প্রকৃতির সত্ত্বরজস্তমো গুণ,—ইহা জগতের উপাদান। এই ত্রিগুণ-জাত সুখদুঃখাদিকে যদি গুণ বলা যায়, তাহা লিঙ্গশরীরের বা চিত্তের গুণ। এজন্য তাহারাও প্রকৃতি-সম্ভূত।

এই যে বিকার-সমূহ ও গুণ-সমূহ, ইহারা ভগবানের সেই মায়াখ্যা পরাশক্তি প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন। গীতা অনুসারে ত্রিগুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ প্রকৃতির উপাদান নহে, ইহারা প্রকৃতি হইতে জাত। গীতায় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে,—

"যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥" ৭।১২

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন যে, এই ত্রিগুণময় ভাবের দ্বারাই সমুদায় জগৎ মোহিত থাকে এবং তাহাই তাঁহার দৈবী গুণময়ী মায়া। সুতরাং মায়াই এই ত্রিগুণময়ী এবং তাহা হইতে এই ত্রিগুণময় ভাবের উৎপত্তি হয়। ভগবান্ পরে ১৪শ অধ্যায়ে বলিয়াছেন,—

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো! দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥" ৫ ১৪

অতএব গীতা অনুসারে এই ত্রিগুণ ভগবানের প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন। এবং ভগবান্ হইতেই এই ত্রিগুণের বিভিন্ন ভাবের উৎপত্তি হয়। সুতরাং এই শ্লোকের গুণ অর্থে এই ত্রিগুণ। এই ত্রিগুণের ভাব রাগ-দ্বেষাদি নহে। সাংখ্যদর্শন অনুসারে ত্রিগুণকে যে প্রকৃতির উপাদান বলা হইয়াছে তাহা গীতায় স্বীকৃত হয় নাই।

———

কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২০

—•—

কার্য্যও কারণ আর কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে
প্রকৃতিকে কহে হেতু ; কহে পুরুষেরে
সুখ আর দুঃখাদির ভোক্তৃত্বের হেতু ॥ ২০

২০। এই শ্লোকে 'কারণ' শব্দের পরিবর্ত্তে 'করণ' এই পাঠান্তর আছে।

কার্য্য করণের কর্ত্তৃত্বে প্রকৃতি হেতু—পূর্ব্বে যে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন গুণ ও বিকারের কথা উক্ত হইয়াছে, সেই গুণ ও বিকার কি, তাহা এস্থলে বলা হইতেছে। (শঙ্কর)।

কার্য্য=দেহ। করণ=শরীরস্থ ত্রয়োদশ প্রকার করণ, বুদ্ধি অহঙ্কার ও মন এই তিন অন্তঃকরণ, আর পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এই দশটি বহিঃকরণ,—সর্ব্বশুদ্ধ করণ ত্রয়োদশ প্রকার। "করণং ত্রয়োদশবিধং" (সাংখ্যকারিকা, ৩২)। ইহা ব্যতীত দেহের আরম্ভক যে পঞ্চভূত ও শব্দস্পর্শাদি বিষয়, এবং প্রকৃতি-সম্ভূত গুণ যাহা পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে, তাহারা কার্য্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া কার্য্যরূপে ইহাদের গ্রহণ করা যায়। এজন্য এস্থলে কার্য্য অর্থে দেহ, পঞ্চভূত ও বিষয়।

এইরূপে সুখ-দুঃখ ও মোহ এই প্রকৃতি-সম্ভূত গুণত্রয়কেও 'করণ' শব্দের অন্তর্গত বলিয়া এস্থলে বুঝিতে হইবে।

কর্ত্তৃত্ব—এই কার্য্য ও করণ সমূহের উৎপাদকত্ব।

প্রকৃতিই এ সকল বস্তুর আরম্ভক অর্থাৎ উপাদানকারণ, সেই সেই আকারে পরিণত হইবার হেতু। 'করণ' স্থলে 'কারণ' এই

পাঠ গ্রহণ করিলে, কার্য্যকারণ-কর্ত্তৃত্বে—এই কথার এইরূপ অর্থ করিতে হয় যে, যাহা যাহার পরিণাম, তাহাও তাহার কার্য্য। বিকার কার্য্য, এবং বিকারী কারণ। সেই কার্য্য ও কারণ, অর্থাৎ বিকার ও বিকারী এই দুইরূপ পদার্থের উপাদান-বিষয়ে প্রকৃতিই হেতু। অথবা কার্য্য-পূর্ব্বোক্ত ষোড়শ বিকার (একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চস্থূলভূত) আর কারণ শব্দের অর্থ সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতি (বুদ্ধি-অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র বা সূক্ষ্মভূত)। এই ত্রয়োবিংশতি পদার্থই কার্য্য-কারণরূপে গৃহীত। সেই কার্য্য ও কারণের কর্ত্তৃত্বে প্রকৃতিই হেতু, অর্থাৎ প্রকৃতি তাহার আরম্ভক কারণ। প্রকৃতি এইরূপে সংসারের কারণ হন।

শঙ্কর এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে শেষ অর্থ সাংখ্যদর্শন-সম্মত। 'করণ' পাঠ গ্রহণ করিলেও, ত্রয়োদশ কারণ, এবং পঞ্চস্থূলভূত ও তাহাদের উৎপাদক পঞ্চসূক্ষ্মভূত বা তন্মাত্র, এই দশটি কার্য্য—এই ত্রয়োবিংশতিটির উপাদান ও আরম্ভক কারণ প্রকৃতি—এইরূপ অর্থ সাংখ্যদর্শন অনুসারেও করা যাইতে পারে। প্রকৃতির এইরূপে ত্রয়ো-বিংশতি কার্য্যকারণরূপ পরিণাম—সাংখ্যশাস্ত্র হইতে সর্ব্বশাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছে।

কেশব ও রামানুজ বলেন,—প্রকৃতি-পুরুষ-সংসর্গ হেতু যে কার্য্যভেদ হয়, তাহা এস্থলে উক্ত হইয়াছে। কার্য্য—শরীর, আর 'কারণ' মন সহিত ইন্দ্রিয়গণ। তাহাদের কার্য্যকারিত্বে পুরুষ অধিষ্ঠিত প্রকৃতিই হেতু। পুরুষ-অধিষ্ঠিত প্রকৃতি ক্ষেত্রাকারে পরিণত হইয়া, পুরুষের আশ্রয় ও ভোগসাধনের কারণ হয়। পুরুষের অধিষ্ঠান হেতুই প্রকৃতির আপেক্ষিক কর্ত্তৃত্ব। আর শরীর অধিষ্ঠান প্রযত্ন হেতু পুরুষের কর্ত্তৃত্ব।

স্বামী বলেন,—এ স্থলে পুরুষের সংসার-হেতুত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। কার্য্য = শরীর, কারণ = সুখদুঃখসাধন ইন্দ্রিয়। তাহাদের কর্ত্তৃত্বে অর্থাৎ তদাকারে পরিণত প্রকৃতিই হেতু। প্রকৃতি অচেতন হেতু তাহার স্বতঃ

কর্ত্তৃত্ব সম্ভব না হইলেও চেতন পুরুষের অধিষ্ঠান ও দৃষ্টি হেতু তাহার ক্রিয়ানির্ব্বর্ত্তকত্ব সম্ভব হয়—অচেতন চেতনধর্ম্মযুক্ত হয়।

:.মধুসূদন এস্থলে শঙ্করের অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন—'করণ' ও 'কারণ' এ উভয় পাঠে অর্থ একই।

কহে (উচ্যতে) অর্থে মধুসূদনের মতে মহর্ষিগণ, স্বামীর মতে কপিলাদি ঋষিগণ এইরূপ কহিয়াছেন। এই ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যা যে সাংখ্যশাস্ত্র-সম্মত, তাহা আমরা দেখিয়াছি।

কার্য্য কারণাত্মক জগৎ। যাহা হউক, এ স্থলে 'কার্য্যকরণ' (কারণ) কর্ত্তৃত্বে অর্থে 'কার্য্য ও কারণের বা করণের কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে,'—ব্যাখ্যাকারগণ এইরূপ বুঝাইয়াছেন এবং কার্য্যকরণ বা কার্য্যকারণ, যেরূপই পাঠ গ্রহণ করা হউক, ইহার অর্থ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ত্রয়োবিংশতিতত্ত্ব দ্বারা সংহতক্ষেত্র বা স্থূল পাঞ্চভৌতিক শরীর ও লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর—ইহাও বুঝাইয়াছেন। যাহা হউক, কার্য্য-করণ (কারণ) কর্ত্তৃত্ব অর্থে কার্য্য কারণ এবং কর্ত্তৃত্ব এ তিনও হইতে পারে এবং কার্য্য করণ বা কার্য্যকারণ অর্থে এই কার্য্যকারণাত্মক জগৎ ও হইতে পারে।

অবশ্য, এই শ্লোকের পরবর্ত্তী অংশ হইতে কার্য্য-কারণ (করণ) কর্ত্তৃত্ব শব্দের অর্থ কার্য্য ও করণের বা কারণের কর্ত্তৃত্ব—অধিক সঙ্গত, এবং শঙ্করের অর্থই গ্রহণীয়। তথাপি এই শ্লোকাংশের অন্যরূপ যে অর্থ হইতে পারে, তাহা চিন্তা করা উচিত। তাহাও সাংখ্যদর্শন-সম্মত। অতএব সাংখ্যদর্শন হইতে আমরা এ অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব। সাংখ্যদর্শনে সৎ-কার্য্যবাদ স্বীকৃত। এজন্য কার্য্যে কারণ-গুণ থাকে। কারণগুণত্বাৎ কার্য্যস্য (ইতি সাংখ্যকারিকা ১৪)।

আর এই কার্য্যকারণ-বিভাগ হইতে এই বিচিত্র কার্য্যাত্মক অথচ এক অবিভক্ত (বা organised) জগতের মূলকারণ যে এক অব্যক্ত

প্রকৃতি তাহা সিদ্ধ হয়। কারিকায় আছে, 'কারণ-কার্য্য-বিভাগাৎ অবিভাগাৎ বৈশ্বরূপস্য।' (ইতি কারিকা ১৫)।

ইহার ব্যাখ্যায় কৌমুদীকার বলিয়াছেন,—

"কারণেসৎকার্য্যমিতি স্থিতম্।...কারণাৎ কার্য্যাণি...হেমপিণ্ডাৎ কটককুণ্ডলমুকুটাদিত্যেব...আবির্ভবন্তি বিভজ্যন্তে অয়ং কারণাৎ পরমব্যক্তাৎ সাক্ষাৎ পারম্পর্য্যেণ অন্বিতস্য বিশ্বস্য কার্য্যস্য বিভাগঃ।"

গৌড়পাদ বলিয়াছেন—"করোতি ইতি কারণম্। ক্রিয়ত ইতি কার্য্যম্। কার্য্যস্য কারণস্য চ বিভাগো যথা—ঘট...পয়সাং ধারণে সমর্থং ন তথা তৎ কারণং মৃৎপিণ্ডঃ। অস্তি বিভক্তং তৎকারণং যস্য বিভাগঃ ইদং ব্যক্তম্।"

সাংখ্যদর্শন অনুসারে প্রকৃতি হইতে মহান্ (বুদ্ধিতত্ব), মহান্ হইতে অহঙ্কার ও অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র, মন ও দশ:ইন্দ্রিয় এবং তন্মাত্র হইতে পৃথিব্যাদি ভূত-সৃষ্টি হয়। (সাংখ্যসূত্র ১।৫৬, কারিকা, ২২) ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই অব্যক্ত প্রকৃতি মূল-কারণ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও তন্মাত্র পরস্পরা ভাবে কারণ; আর সমুদায় তত্ত্ব কেবল কার্য্য।

অতএব সাংখ্যদর্শন অনুসারে এস্থলে 'কার্য্যকারণ' পাঠই অধিক সঙ্গত; এবং এই কার্য্যকারণ-বিভাগ—এই কার্য্যাত্মক বিশ্বের বা সমুদায় জগতের বিভাগ। কার্য্য-কারণ অর্থে কেবল প্রতি পুরুষের ক্ষেত্র পৃথক্‌ভাবে না বুঝিয়া সমষ্টিভাবে সমুদায় ক্ষেত্র বা এই সমুদায় জগৎকে বুঝিলে সঙ্গত ও সাংখ্যদর্শন-সম্মত অর্থ হয়। কিন্তু সংখ্যদর্শনে বহুপুরুষ স্বীকৃত হইয়াছে। তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কারিকায় আছে।—

"জন্মমরণকরণানাং প্রতি নিয়মাৎ যুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্য্যয়াচ্চৈব॥" (১৮)

প্রতি পুরুষকে কেন্দ্র করিয়া সেই পুরুষের অধিষ্ঠান হেতু সেই পুরুষের ভোগমোক্ষার্থ যে প্রকৃতির বৎস দৃষ্টে গাভীর দুগ্ধ স্বভাবতঃ স্ফুরণের ন্যায় প্রকৃতি পরিণত হইয়া তাহার ক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া তাহার আপূরণ ও

পরিণতি করে,—সাংখ্যদর্শনের এই সিদ্ধান্ত হইতে এই জ্ঞেয় ও ভোগ্য বাহ্য জগতের উৎপত্তি ও পরিণতি বুঝা যায় না। প্রতি পুরুষ সম্বন্ধে তাহার জ্ঞেয় ও ভোগ্য জগৎ পৃথক্ ও অন্যের জ্ঞেয় ও ভোগ্য জগতের সহিত অসম্বন্ধ, এইরূপ ধারণা হয়। সকল পুরুষের নিকট প্রকাশিত জগৎ যে একরূপ তাহা সিদ্ধান্ত করা যায় না। এবং প্রতি পুরুষের সন্নিহিত প্রকৃতি যে মহদাদি হইতে স্থূলভূত পর্য্যন্ত সৃষ্টি করে,তাহার যে বাহ্য অস্তিত্ব আছে, তাহাও সিদ্ধান্ত করা কঠিন হয়। অথচ সাংখ্যমতে জগৎ সত্য। এ জন্য ব্যাখ্যাকারগণ সকল পুরুষের সান্নিধ্যে একই প্রকৃতি একই কালে একই রূপে পরিণত হয়, ইহা সিদ্ধান্ত করেন। কেহ বা এই প্রকৃতির পরিণতি ও ভৌতিক জগৎ-সৃষ্টির কারণ 'সিদ্ধ' ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভের অধিষ্ঠানসাপেক্ষ, ইহা সিদ্ধান্ত করেন। এই হিরণ্যগর্ভ-সান্নিধ্যে একই প্রকৃতি হইতে মহদাদি ক্রমে একই লিঙ্গশরীর উৎপন্ন হয়, এবং একই বাহ্য স্থূল পাঞ্চভৌতিক জগৎ উৎপন্ন হয় এবং প্রতি পুরুষের অবিদ্যা-ভেদে প্রতি পুরুষ-সন্নিধানে সেই এক লিঙ্গশরীর পৃথক্ হইয়া যায়, অনেকে এ কথা বলেন। এ সকল কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

অতএব সিদ্ধ ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভই প্রকৃতির পরিণামের হেতু, ইহা স্বীকার না করিলে বাহ্য জগতের সত্যতা সিদ্ধ হয় না। গীতায় এই প্রকৃতির পরিণাম ও তাহা হইতে জগতের উৎপত্তির হেতু যে পরমেশ্বর, তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে।

গীতায় আছে—

> "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
> হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥" (৯।১০)

অতএব গীতা অনুসারে প্রকৃতির এই পরিণাম বা কার্য্যরূপে অভিব্যক্তিতে বিভিন্ন পুরুষের অধিষ্ঠান মাত্র হেতু নহে। ইহা মনে রাখিয়া আমাদের এই কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে প্রকৃতি যে হেতু, এই কথা বুঝিতে হইবে।

এই কার্য্য-কারণ অর্থে এ জন্য এই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল কার্য্যকারণরূপে বিভক্ত এই বিশ্ব বা জগৎ—এইরূপ অর্থও গ্রহণ করা যায়। উপাদান-কারণরূপ প্রকৃতিবক্ষে যে এই কার্য্যজাত জগতের নিয়ত পরিণাম ও পরিবর্ত্তন হয়, সাধারণ অর্থে যাহা কোন কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাপার, তাহাই সে কার্য্যের কারণ। সমষ্টিভাবে এই মুহূর্ত্তে যে জগৎ আমাদের সকলের জ্ঞানে প্রকাশিত, অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী মুহূর্ত্তের জগৎ তাহার কারণ। অতএব এই অর্থে ও সমষ্টিভাবে—এই কার্য্য-কারণ-সংঘাতই এই জগৎ। আমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্র বা শরীর সেই জগতেরই অন্তর্গত। অতএব কার্য্য-কারণ অর্থ—এই ব্যক্ত বাহ্য-জগৎ, ইহা বলা যাইতে পারে। আমাদের শরীর এই জগতের অন্তর্ভূত। এ জন্য ব্যষ্টিভাবে কার্য্য-কারণ অর্থে আমাদের ক্ষেত্রও বটে। তবে এই শেষ অর্থে সমস্ত জগৎ-তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয় না।

এই জগৎ কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলাবদ্ধ। বলিয়াছি ত, সাংখ্যদর্শনে সংকার্য্য-বাদ স্বীকৃত। কার্য্য কারণের অন্তর্ভূত। কার্য্য-কারণ-নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। যে সব কারণ হইতে এখন কোন কার্য্য উৎপন্ন হইল, সেইরূপ কার্য্য সে সব কারণে পরে হইতে পারে ও হইবে। এ নিয়মের ব্যভিচার নাই। ইহাকে Uniformity of nature বলে। একই প্রকৃতি মূল কারণরূপে থাকায় এই কার্য্য-কারণ-সূত্র অবিচ্ছিন্ন, এ জগৎ একই রূপ কার্য্য-কারণ-সূত্রে গ্রথিত।

কার্য্য-কারণ-কর্ত্তৃত্ব। এক্ষণে কার্য্য কারণ-কর্ত্তৃত্ব কথার অর্থ কি, তাহা বুঝিতে হইবে। সাংখ্যদর্শনে কার্য্য কারণ-কর্ত্তৃত্বের কথা নাই বটে, কিন্তু গুণ-কর্ত্তৃত্ব—অর্থাৎ মহদাদির কর্ত্তৃত্ব এই কথা আছে। পুরুষ এই গুণ কর্ত্তৃত্বহেতু-কর্ত্তার ন্যায় হন, ইহা উক্ত হইয়াছে। কারিকায় আছে:—

"গুণকর্ত্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তা ইব ভবতি উদাসীনঃ" ॥২০

এই কর্ত্তৃত্বের অর্থ কি? কর্ত্তৃত্ব ও কৃতিত্ব একই কথা। যাহার কৃতিত্ব আছে—কর্ম্মে বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রযত্ন আছে—আমি করিতেছি, এ অভিমান আছে, সাধারণতঃ তাহাকেই কর্ত্তা বলে, তাহারই কর্ত্তৃত্ব আছে। এই কর্ত্তৃত্ব জ্ঞানপূর্ব্বক হয়। "জ্ঞান হইতে ইচ্ছা, ইচ্ছা হইতে কৃতি, কৃতি হইতে চেষ্টা, ও চেষ্টা হইতে ক্রিয়া হয়।" অতএব প্রকৃতিকে কর্ত্ত্রী বলিলে, তিনি যে চিন্ময়ী, তাহা স্বীকার করিতে হয়। সাংখ্যদর্শনে তাহা স্বীকৃত হয় নাই। সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতি জড়। তবে প্রকৃতি হইতে যে বুদ্ধিতত্ত্বের সৃষ্টি হয়, তাহাতে পুরুষ চৈতন্য-প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া তাহা চেতনবৎ হয়। অতএব সাংখ্যদর্শন অনুসারে বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহত্তত্ত্ব হইতে যে প্রকৃতির পরিণতি, তাহার মূলে এই পুরুষের জ্ঞান ও চৈতন্য প্রতিবিম্বিত আছে বলিয়া প্রকৃতির সৃষ্টি বুদ্ধিপূর্ব্বক হয় বলা যায় এবং এই অর্থে প্রকৃতি কর্ত্ত্রী। এই অর্থে প্রকৃতির কার্য্য-কারণের কর্ত্তৃত্বও আছে বলা যায়। নতুবা প্রকৃতির স্বাভাবিক জড় পরিণাম যে কোন কর্ত্তৃত্ব বা জ্ঞান চালিত প্রযত্ন-সাপেক্ষ, তাহা বলা যায় না। পুরুষের অধিষ্ঠান হেতুই প্রকৃতি কার্য্য-কারণ-কর্ত্তৃত্ব-হেতু হন। গুণ-কর্ত্তৃত্বে হেতু হন। গীতা অনুসারে সেই পুরুষ পরম পুরুষ পরমেশ্বর। তিনি প্রকৃতি-লীন প্রতি জীবের বাসনা বা সংস্কার-বীজ অনুসারে এইরূপে প্রলয়ের পর স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতি দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন, ও প্রতি জীবের উপযোগী ক্ষেত্র সৃষ্টি করেন। ঈশ্বরের অধিষ্ঠানেই প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব। ভগবান্ অসক্ত ভাবে উদাসীনের ন্যায় আসীন থাকেন মাত্র (৯।৯)। সাংখ্যদর্শন কিন্তু ঈশ্বরের কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন না। কেন না, ঈশ্বরই অসিদ্ধ। সাংখ্যসূত্রে উক্ত হইয়াছে—"অহঙ্কারকর্ত্রধীনা কার্য্যসিদ্ধি র্নেশ্বরাধীনা প্রমাণাভাবাৎ" (৬।৬৫)।

যাহা হউক, যদি কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তৃত্ব এই তিনকে পৃথক্‌ভাবে

গ্রহণ করা যায় ও কারণ অর্থে অষ্টধাবিভক্ত অপরা প্রকৃতি ও কার্য্য অর্থে পূর্ব্বোক্ত ষোড়শ বা পঞ্চদশ বিকার ধরা যায়, এবং কর্তৃত্বকে স্বতন্ত্রভাবে ধরা যায়, তাহা হইলে বলা যায় যে, এই মূল প্রকৃতি হইতে মহদাদি ক্রমে প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিণাম হয় ইহাতে প্রকৃতির কোন কর্তৃত্ব বা জ্ঞানপূর্ব্বক নিয়ন্তৃত্ব নাই। যেমন জলীয়বাষ্প হইতে জল ও হিমশিলার পরিণতি স্বাভাবিক বলা যায়, সেইরূপ প্রকৃতির এই পরিণাম স্বাভাবিক। জীবের জ্ঞানেই কর্তৃত্বের বিকাশ হয়। জীবের বুদ্ধিতেই অহঙ্কার বা 'আমি কর্ত্তা' ভাবের বিকাশ হয়। সেই যে কর্তৃত্ব-ভাব, তাহার হেতু প্রকৃতি। প্রকৃতি যেমন কার্য্য-কারণের হেতু, সেইরূপ প্রতি জীব-হৃদয়ে প্রকাশিত কর্তৃত্বভাবেরও হেতু। কেন না, এই কর্তৃত্ব—বুদ্ধিতত্ত্বে প্রতিবিম্বিত পুরুষের জ্ঞান বা চৈতন্য হইতে উৎপন্ন, তাহা বুদ্ধিতত্ত্বেরই গুণ বা ধর্ম্ম অথবা বুদ্ধিতত্ত্বজাত অহঙ্কারের ধর্ম্ম। অতএব এই কর্তৃত্বে প্রকৃতিই হেতু।

হেতু অর্থে কেহ কেহ আশ্রয় বুঝিয়াছেন। এ স্থলে হেতু অর্থে কারণ বটে, কিন্তু আমরা সাধারণতঃ যাহাকে কারণ বলি, তাহা হেতু নহে। কারণের ইংরাজী কথা cause। হেতুর ইংরাজী কথা reason। হেতু অর্থে নিমিত্তকারণও বলা যায়। আমাদের জ্ঞানে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে যে যুক্তি—যে নিয়ম বুঝি, তাহাকে হেতু বলি। হেতু দ্বারা 'কেন ?' এই প্রশ্নের উত্তর বুঝি। জগতে ও আমাদের মধ্যে এই যে কার্য্য-কারণ-কর্তৃত্ব দেখি—তাহা কেন এরূপ হয়, কি নিমিত্ত এরূপ হয়—এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, প্রকৃতিই ইহার হেতু। এ সৃষ্টি জ্ঞানপূর্ব্বক, এজন্য আমাদের জ্ঞানে ইহার হেতু ধারণা করিতে পারি। ব্রহ্মজ্ঞানে বা পরমেশ্বরের জ্ঞানে যেরূপ জগৎ কল্পিত হয়, পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান ও অধ্যক্ষতায় প্রকৃতিই সেই কল্পনা অনুসারে পরিণত হইয়া এই জগৎরূপে প্রকাশিত হয়। প্রকৃতি কার্য্য-কারণ-কর্তৃত্বের হেতু

হয়, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। যুক্তি ও অনুমানপ্রধান সাংখ্যদর্শন অনুসারে প্রকৃতির অস্তিত্ব ও তাহার অনাদিত্ব ও আদি-কারণত্ব আমরা এই প্রকার অনুমান দ্বারা বুঝিতে পারি। জগতের হেতুও অনুসন্ধান করিতে গিয়া ইহা নির্ম্মল শুদ্ধ জ্ঞানে বুঝিতে পারি; এই প্রকার নানা ভাবে গীতায় এই শ্লোকে উক্ত এই তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়।

পুরুষ সুখ-দুঃখাদির-ভোক্তৃত্বের হেতু—প্রকৃতি কিরূপে সংসারের কারণ হয়, তাহা উক্ত হইল। এক্ষণে পুরুষ কি প্রকারে সংসারের কারণ হয়, তাহা বলা হইতেছে। পুরুষ এস্থলে ক্ষর পুরুষ—জীব। ক্ষেত্রজ্ঞ ও ভোক্তা শব্দের দ্বারা জীব বা ভূতগণ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। ভোগ্য সুখ ও দুঃখের ভোগের প্রতি এই পুরুষই হেতু, ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ভোক্তৃত্ব অর্থে উপলব্ধত্ব। কার্য্য-কারণ-কর্তৃত্ব ও সুখ-দুঃখ-ভোক্তৃত্ব সংসারের এই দুইটি রূপ। প্রকৃতি কার্য্যকারণ-কর্তৃত্বরূপে ইহার হেতু, আর পুরুষ সুখ-দুঃখ-ভোক্তৃত্বরূপে ইহার হেতু। কার্য্য বা কারণ এবং সুখ বা দুঃখ, অর্থাৎ হেতু ও ফল এই দ্বিবিধরূপে যদি প্রকৃতির পরিণাম না হইত, এবং কোন চেতন পুরুষ যদি সেই প্রকৃতির পরিণাম বা ভোগ্য বস্তুর উপলব্ধা না থাকিত, তবে সংসার কিরূপে থাকিত? যদি উক্তরূপে পরিণত প্রকৃতি ভোগ্যা হয়, এবং প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র পুরুষ যদি তাহার ভোক্তা হয়, তবে এই ভোগ্য ও ভোক্তার অনাদি সংযোগ হইতে এ সংসার সিদ্ধ হইতে পারে। এই কারণে প্রকৃতিকে কার্য্যকারণকর্তৃত্বের হেতুরূপে ও পুরুষকে সুখ-দুঃখ-ভোক্তৃত্বের হেতুরূপে সংসারের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। এই পরিদৃশ্যমান সংসারের স্বরূপই সুখদুঃখভোগ, এবং এই সুখদুঃখ-ভোক্তৃত্বই পুরুষের সংসারিত্ব।" (শঙ্কর)

পুরুষাধিষ্ঠিত, ক্ষেত্রাকারে পরিণত প্রকৃতির পুরুষের ভোগ-সাধক।

প্রকৃতি-সংসৃষ্ট পুরুষ সুখদুঃখ সকলের ভোক্তা বা অনুভবের আশ্রয়রূপে হেতু হয়। (রামানুজ)।

"পুরুষ অর্থাৎ জীবজন্তু প্রকৃতিকৃত সুখ-দুঃখের ভোক্তৃত্বের হেতু। ইহার ভাব এই যে, প্রকৃতি অচেতন, এজন্য তাহার স্বতঃ কর্তৃত্বসম্ভব নহে; সেইরূপ পুরুষও অবিকারী, তাহারও ভোক্তৃত্ব সম্ভব নহে। তথাপি কর্তৃত্ব অর্থাৎ ক্রিয়ানির্ব্বর্ত্তকত্ব চৈতন্যাধিষ্ঠান এবং চৈতন্যযুক্ত পুরুষের দৃষ্টি হইতে সম্ভব হয়। এইজন্য পুরুষের সন্নিধান হেতু প্রকৃতির কর্তৃত্ব। সেইরূপ সুখ-দুঃখ-বেদনরূপ ভোক্তৃত্ব চেতনধর্ম্ম, প্রকৃতি-সন্নিধান হেতু পুরুষে সম্ভব হয়।"

পুরুষ অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ পরাপ্রকৃতি। পুরুষ সুখ-দুঃখ-মোহরূপ সমুদায় ভোগ্যের ভোক্তৃত্বের বা উপলব্ধির হেতু।" (মধু)

'পুরুষ অজ্ঞানবশে প্রকৃতি-অধিষ্ঠিত হইয়া বা প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে বলিয়া প্রকৃতি সেই পুরুষের সংস্কারানুসারে পরিণত হইয়া তাহার শরীরাদির সৃষ্টি করে, এবং ভোগের জন্য সুখ-দুঃখাদি পুরুষকে অর্পণ করে। এইরূপে পুরুষ সুখ-দুঃখাদির ভোক্তা হয়। সেই ভোগের পুরুষই কর্ত্তা। প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া সুখ-দুঃখাদি ভোগ করা পুরুষেরই কার্য্য।" (বলদেব)। "পুরুষ প্রকৃতি সংসৃষ্টে সুখ দুঃখাদির ভোক্তৃত্বের হেতু অর্থাৎ সুখ দুঃখ অনুভবের আশ্রয়। যে পর্য্যন্ত প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংসর্গ থাকে, সে পর্য্যন্ত সুখ দুঃখভোগ অবর্জ্জনীয়"। (কেশব)

পুরুষ-তত্ত্ব—পূর্ব্ব শ্লোকে পুরুষ সামান্যভাবে উক্ত হইয়াছে। গীতায় পরে পুরুষের ত্রিবিধ ভাবের কথা আছে। যাহাকে 'ক্ষর' পুরুষ বলে, তাহার বিষয় এস্থলে ও পরবর্ত্তী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। পরমাত্মা বা অক্ষর পুরুষের কথা পরে ২২শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে; এবং তাহার পরে পরম পুরুষ পরমেশ্বরের তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে। অতএব এস্থলে পুরুষ যে সাংখ্য-দর্শনোক্ত বদ্ধ পুরুষ ও গীতোক্ত ক্ষর পুরুষ তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। এই

পুরুষই প্রকৃতিস্থ হইয়া বা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া অজ্ঞানবশে সুখ-দুঃখ-ভোক্তা হয়। এই পুরুষ প্রতিক্ষেত্রে বিভক্তের ন্যায় স্থিত ভোক্তা পুরুষ এবং অক্ষর ও পরম পুরুষ বা সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠিত এক অবিভক্ত পরমাত্মা পরমেশ্বর, পারমার্থিক ভাবে এক হইলেও ব্যবহারিক অর্থে ঠিক্ এক নহে, তাহা গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে। পরমাত্মা ও জীবাত্মা—এই দুই রূপে যে পরম পুরুষ পরমেশ্বর প্রতি শরীরে স্বরূপে ও জগদাত্মরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাহা শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে। দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে" (ঋগ্বেদ)। ১৬৪।২১; মুণ্ডক ৩।১।১; ও শ্বেতাশ্বতর ৪।৩ মন্ত্র দ্রষ্টব্য) এই মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া, ইহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। পরমাত্মা প্রতি শরীরে অপরিচ্ছিন্নভাবে সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থান করেন; আর তিনিই জীবরূপে পরিচ্ছিন্ন হইয়া প্রতি দেহে বিভক্তের ন্যায় অবস্থান করেন। গীতায় এই পরমাত্মা পরম পুরুষের কথা পরবর্ত্তী ২২শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, তাহা বলিয়াছি। পারমার্থিক অর্থে ক্ষর পুরুষই এই পরম পুরুষের প্রতিবিম্বিত স্বরূপ। তাহা পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

ক্ষরপুরুষ ভোক্তা—এই প্রতি শরীরস্থ জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা ক্ষরপুরুষ ও পরমপুরুষমধ্যে জীবই ভোক্তা, পরমাত্মা ভোক্তা নহেন, তিনি অন্তর্য্যামিভাবে জীবকে এই ভোগে নিয়োজিত করেন—প্রেরয়িতা হন। পূর্ব্বোদ্ধৃত মন্ত্রের শেষাংশে তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে (১।১২)—

"এতজ্‌ জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরয়িতারঞ্চ মত্বা
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ॥"

অতএব এক ব্রহ্মই ভোক্তা (জীব), ভোগ্য (জড় প্রকৃতি)

প্রেরয়িতা (পরমেশ্বর) রূপে জগতে বিবর্ত্তিত হন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে অন্যত্রও এ কথা আছে, যথা—

"জ্ঞ-অজ্ঞৌ দ্বৌ অজৌ ঈশ-অনীশৌ
অজা হি একা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হি অকর্ত্তা
ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ।" (১।৯)।

অতএব এক ব্রহ্মকে জীব, ঈশ্বর ও প্রকৃতি এই তিন অনাদি (অজ) রূপে জ্ঞেয়। ইহাই সগুণ ব্রহ্মের রূপ, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ঈশ্বরই সর্ব্বজ্ঞ; কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ জীব অজ্ঞ, অজ্ঞানবদ্ধ। সে-ই ভোক্তা। প্রকৃতি এই ভোক্তার ভোগ্য-বিষয়-প্রদায়িনী। ঈশ্বরশক্তি-রূপ প্রকৃতিও অজা (নিত্য, অনাদি)। পরমাত্মাই বিশ্বরূপ হইয়াও অকর্ত্তা।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, জগৎসৃষ্টিকল্পে ব্রহ্মজ্ঞান জ্ঞাতা জ্ঞেয়রূপে বিবর্ত্তিত হয়, আমি বহু হইব, এই কল্পনা হয়, এবং এই কল্পনা অনুসারে ব্রহ্মশক্তি-মায়া বা প্রকৃতি এই জগৎরূপে পরিণত হয়। এই পরিণতির উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন কি? কোন কার্য্য যদি জ্ঞানপূর্ব্বক হয়, তবে তাহার প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য কি—এ প্রশ্ন স্বতই আমাদের জ্ঞানে উদয় হয়। সৃষ্টির সেই প্রয়োজন—ভোগ।

জগৎ ভোগ্য—যেমন জ্ঞেয়রূপে জগতের সৃষ্টি ও জ্ঞাতারূপে জীবের সৃষ্টি হইয়া উভয়ের সংযোগে এই জগৎ বিধৃত হয়, সেই প্রকার ভোগ্যরূপে এ জগতের সৃষ্টি, আর ভোক্তৃরূপে জীবের সৃষ্টি হইয়াই জগৎ বিধৃত হয়। ব্রহ্মই এই ভোক্তা ও ভোগ্যরূপে বিবর্ত্তিত হন। জগৎ কেবল জ্ঞানে জ্ঞেয় হইবার জন্য সৃষ্টি হয় না। তাহা হইলে, সৃষ্টি নিরর্থক হইত। এজন্য অবশ্য বলিতে হয় যে, ভোক্তার ভোগের জন্যই প্রকৃতি "ভোগার্থযুক্ত"। ভোক্তার ভোগের জন্যই জগতের সৃষ্টি।

ব্রহ্ম কেবল জ্ঞানস্বরূপ নহেন। তিনি আনন্দস্বরূপ। আমাদের আনন্দ প্রধানতঃ এই ভোগমূলক। সুখ-দুঃখ-মোহরূপে ভোগ ত্রিবিধ। আমাদের এই আনন্দস্বরূপত্ব জন্য আমরা মোহত্যাগ করিয়া, দুঃখত্যাগ করিয়া কেবল নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ করিতে যত্ন করি। এইরূপে ভোগেচ্ছার ক্রম-আপূরণ হেতু আমাদের জন্মজন্মান্তর ধরিয়া পুরুষকারাখ্য চেষ্টার ফলে আমাদের তামসিক প্রকৃতি ক্রমে রাজসিক হয়, ও পরে সাত্ত্বিক হয়। আমরা মোহকে ও দুঃখকে যথাসাধ্য পরিহার করিয়া সুখ অনুভব করিবার জন্য যত্ন করি। প্রকৃতিই ক্রমে আমাদের স্বভাবকে সাত্ত্বিক করিয়া দেয়। তখন আমরা প্রকৃত সুখ ভোগ করিতে পারি। যতদিন চিত্ত মলিন থাকে, আমাদের প্রকৃতি তামসিক বা রাজসিক থাকে, ততদিন আমরা সুখভোগের চেষ্টা করিয়াও সুখভোগ করিতে পারি না; আমাদের রাজসিক বা তামসিক প্রকৃতি আমাদের দুঃখমোহ ভোগ করায়,—সুখভোগে বাধা দেয়। আমাদের প্রকৃতি যেরূপ সুখ-দুঃখ বা মোহ আনিয়া আমাদের কাছে উপস্থিত করে, আমরা তাহাই ভোগ করি। প্রকৃতির দ্বারা পুরুষ সুখদুঃখাদির ভোক্তা হয়। প্রকৃতি সত্ত্বপ্রধান হইলে আমাদের স্বভাব নির্ম্মল হয়, তখন সুখভোগ হয়।

পুরুষের যে এই ভোগেচ্ছা, বা যে আনন্দস্বরূপত্ব প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহা গ্রহণ করিয়া সেই প্রকৃতি-অধিষ্ঠিত পুরুষ ভোক্তা হয়। প্রকৃতির মলিনতা অনুসারে সেই প্রতিবিম্ব মলিন হয়, তাহা দুঃখাত্মক ও মোহাত্মক হয়। পুরুষ তদনুসারে সুখদুঃখ ভোগ করে। প্রকৃতি সাত্ত্বিক হইলে, তাহার সংযোগে পুরুষ সুখভোগ করে। এইরূপে পুরুষ সুখদুঃখভোক্তৃত্বে হেতু হয়। এই ভোক্তৃভাবের জন্যই অনীশ আত্মা বদ্ধ হন। "অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ।" (শ্বেতাশ্বতর, ১।৮)।

ভোক্তৃত্বের কারণ। দর্শন শাস্ত্রের ভাষায় বলা যাইতে পারে যে,

যেমন ব্রহ্মজ্ঞান—সৃষ্টির প্রারম্ভে জ্ঞান-অজ্ঞান এই দ্বৈতভাব (law of contradiction) যুক্ত হয়, এবং ইহা হইতেই জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-ভাব হয়, সেইরূপ ব্রহ্মানন্দ, আনন্দ ও নিরানন্দ এই দ্বৈতরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া ভোক্তৃভোগ্যভাব হয়। গীতায় ইহাকে দ্বন্দ্ব বা দ্বন্দ্বভাব বলা হইয়াছে (৭।২৭-২৮)। এই দ্বন্দ্ব-ভাব দূর করিয়া দ্বন্দ্বাতীত হওয়াই মুক্তি (৪।২২, ১৫।৫)। জীবজ্ঞান এই দ্বন্দ্বের অধীন। ভোক্তারূপে জীবজ্ঞানে আনন্দ নিরানন্দ উভয়ের ছায়া পড়ে বলিয়া সুখ দুঃখ মোহ ভোক্তারূপে অনন্ত প্রকার ভোক্তা হইবার জন্য অনন্ত জীবরূপে ব্রহ্মই বিবর্ত্তিত হন, এবং জীব ভাবে ব্রহ্মই ভোক্তা হন। ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপ হেতু জীবের এই ভোক্তৃভাব অনাদি।

এক অনন্তব্রহ্ম মায়া হেতু পরিচ্ছিন্ন হইয়া বহু জীব হইলে প্রতি জীবে ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ হয়। আনন্দ বা নিরবচ্ছিন্ন সুখ পরিচ্ছিন্ন হইলেই দুঃখযুক্ত হয়—সুখদুঃখরূপ দ্বন্দ্বযুক্ত হয়। পূর্ণত্বে অপূর্ণত্বই পরিচ্ছিন্নতা। এই অপূর্ণত্ব-বোধই দুঃখ। ইহা পূর্ণ সুখস্বরূপের অভাব বা প্রচ্যুতি-বোধ। এজন্য জীবের ভোক্তৃত্ব সুখ দুঃখ-দ্বন্দ্ব মিশ্রিত। জীব সুখ দুঃখের ভোক্তা হয়, পূর্ণ আনন্দ ভোক্তা হইতে পারে না।

ভোগের মূল কাম বা বাসনা। এই আনন্দস্বরূপ হইতে প্রচ্যুতি হেতু এই অনন্দস্বরূপের পরিচ্ছিন্নত্ব হেতুই সেই আনন্দস্বরূপ পুনর্লাভ করিবার জন্য জীবের অন্তরে আকাঙ্ক্ষা, বাসনা বা কামনা-বীজ উপ্ত থাকে। ইহাকে কাম বলে। এই কাম অজ্ঞাতে অলক্ষ্যে কার্য্যকারী হয়, আমাদের সেই আনন্দস্বরূপে স্থিত করাইবার চেষ্টা করে। প্রথমে এই কাম, দুঃখ পরিহার ও সুখলাভের ইচ্ছারূপে বিকাশ হয়। শেষে ভূমা সুখ ব্যতীত কোন অল্পসুখে আর তাহার চরিতার্থতা হয় না। তখন ক্ষুদ্র সকল সুখের 'কাম' দূর হইয়া যায়।

অতএব এই ভোক্তাভাব—'কাম' 'বাসনা' বা ইচ্ছা-মূলক। ইহার সুখভোগের ইচ্ছা, কাম বা বাসনা। আনন্দ-নিরানন্দ-মিশ্রণে এ বাসনা মলিন হয়। বাসনা যত মলিন হয়, আনন্দ তত নিরানন্দময় হয়, তাহা তত দুঃখভোগের কারণ হয়। শাস্ত্র অনুসারে সর্ব্বজীবের অনন্তরূপ বাসনা বীজ বা কামনাই সৃষ্টির মূল। সে বাসনা অনাদি বলিয়া সৃষ্টিও অনাদি। বাসনা বীজভাবে থাকিলে সৃষ্টি লীন থাকে, আর কামনা অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হইলে সৃষ্টি আরব্ধ হয়। বীজাঙ্কুরের প্রবাহের ন্যায়, এজন্য জগৎ অনাদি।

প্রলয়ের পর যখন ব্রহ্ম পূর্ব্বসৃষ্টির অনুরূপ জগৎ কল্পনা করেন, তখন সেই লীন বাসনা-বীজ, অঙ্কুরোন্মুখ হইলে তিনি কামনা করেন "আমি বহু হইব"—

"স অকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়।" (তৈত্তিরীয়, ২।৬।১)।

এই কাম বা কামনার সম্যক্ অভিব্যক্তির উপরই জগতের প্রতিষ্ঠা—

"কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাম্" (কঠ, (২।১১)

ব্রহ্মই প্রতি জীবের কাম অনুসারে তাহার ভোগ-আয়তন (শরীর) ও ভোগ্য বিষয় সৃষ্টি করেন; জীব সকল নিদ্রিত থাকিলেও তিনিই তাহাদের প্রত্যেকের কাম অনুসারে তাহাদের শরীরকে নির্ম্মাণ করেন, ধারণ করেন, প্রকৃতিশক্তি দ্বারা সেই শক্তিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ব্রহ্মই শরীরাদির নির্ম্মাতা হন। যাহার যেরূপ বাসনা বা কামনা, তাহা সেইরূপ শরীর সৃষ্টি করিয়া দেন ও রক্ষা করেন। শ্রুতিতে আছে—

"য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ।"

... তৎব্রহ্ম ... ॥ (কঠ উপনিষদ ৫।৮)

অতএব এই কামনা বা বাসনাই ভোগের মূল। তাহা হইতেই সংসার। ব্রহ্ম ভোগ্যরূপে এ জগৎ সৃষ্টি করিয়া, প্রতি জীবভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, জীবরূপে ভোক্তা হইয়া তাহা ভোগ করেন, ইহা বলা যাইতে

পারে। এই ভোগবাসনা হইতেই জীব ভোক্তা হয়। তাহা হইতেই প্রকৃতি-সংসর্গে জীব বা পুরুষ সুখ-দুঃখ ভোগ করে ও সুখ-দুঃখ ভোক্তৃত্বের হেতু হয়। শুধু তাহাই নহে। এই ভোগের দ্বারা এই কাম বা বাসনার ক্রম আপূরণ হয়, তাহা ক্রমে শোধিত হইয়া আইসে। বহু জন্ম ধরিয়া ভোগের পর এই কাম শুদ্ধ ও নির্ম্মল হয়। তখন জ্ঞান বিকাশ হইতে পারে। কামদেহ শুদ্ধ না হইলে—কামমানস নির্ম্মল হইয়া মনোময় কোষ শুদ্ধ না হইলে, বিজ্ঞানময় কোষের শুদ্ধি সম্ভব হয় না; এবং আনন্দময় কোষেরও বিকাশ হয় না। বিজ্ঞানময় কোষের বিশেষ বিকাশ না হইলে, জ্ঞানে অমানিত্বাদি গুণ ও বিকাশের সম্ভব হয় না। অতএব জীব রূপে পুরুষ প্রধানতঃ ভোক্তা। এই ভোক্তৃস্বভাবের ক্রম-আপূরণ হইলে সে জ্ঞাতা হয়। অর্থাৎ জ্ঞানে ভোক্তৃভাব ক্ষীণ হইয়া আসে—জ্ঞাতৃভাবের স্ফুরণ হয়। অতএব এই ভোগই পরিণামে মোক্ষের কারণ হয়। ভোগ হইতে ভোগক্ষয় হয়, কামনা বা বাসনা ক্রমে ক্ষীণ হয়, এবং শেষে এই কামনা-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নির্ব্বাণ লাভ হইতে পারে। এজন্য সাংখ্যদর্শনে আছে—পুরুষের ভোগ ও মোক্ষার্থেই প্রকৃতির প্রবৃত্তি। যাহা হউক, আত্মা ভোক্তা হইলেও কর্ত্তা নহে। কর্ত্তৃত্ব প্রকৃতির, ইহাই গীতায় এ স্থলে উপদিষ্ট হইয়াছে।

প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বে পুরুষের ভোক্তৃত্ব। আত্মা যে কর্ত্তা ইহা ন্যায়-দর্শনেরই সিদ্ধান্ত। আত্মার ইচ্ছা প্রযত্ন হইতেই করণ ব্যাপার হয়। কিন্তু শ্রুতি অনুসারে ইচ্ছা-প্রযত্নাদি মনের ধর্ম্ম। সাংখ্যদর্শন অনুসারেও পুরুষ জ্ঞস্বরূপ। প্রকৃতি-সংযোগে সে 'ভোক্তা' হয়। কখনই সে 'কর্ত্তা' নহে। ইহা বেদান্তেরও সিদ্ধান্ত। গীতায়ও এস্থলে পুরুষের অকর্ত্তৃত্ব ও প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতায় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে,—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহহমিতি মন্যতে ॥ (৩।২৭)

প্রকৃতির কর্তৃত্বে অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা আপনাকে কর্ত্তা মনে করে; পুরুষ বাস্তবিক কর্ত্তা নহে। তাহার স্বদেহে বা স্বক্ষেত্রেও তাহার কর্তৃত্ব নাই। অজ্ঞান বা মোহ হেতু তাহার কর্তৃত্ব ভাব হয়। যখন পুরুষ কোন বস্তু গ্রহণাদি করিতে ইচ্ছা করে এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়কে নিয়মিত করিতে চাহে, তখন প্রকৃতিই সেই ইন্দ্রিয়কে পরিচালন করাইয়া এই গ্রহণাদিকার্য্য সম্পন্ন করে। আমাদের দেহে নাড়ী দুইরূপ—জ্ঞান-পরিচালক ও বল-পরিচালক। ইহাদিগকে sensory ও motor nerves বলে। এই জ্ঞাননাড়ীর দ্বারা (sensory nerves দ্বারা) যখন কোন বাহ্যবস্তুর জ্ঞান হয়, তখন কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে (motor nerves দ্বারা) আমরা সে বস্তু গ্রহণাদি ব্যাপারে লিপ্ত হইতে ইচ্ছা করি। এই বাহ্যবিষয় প্রকাশ ও বাহ্যবিষয় গ্রহণাদি সম্বন্ধে কর্ম্ম—ইহার কর্তৃত্ব প্রকৃতির। পুরুষ-সান্নিধ্যে পুরুষের বাসনা অনুসারে অবশ্য প্রকৃতি এইরূপ কর্ত্রী হয়েন। পুরুষের কোন কর্তৃত্ব নাই। পুরুষ কেবল সেই প্রকৃতির কর্তৃত্বহেতু কর্ম্ম হইতে যে সুখদুঃখরূপ অনুভূতি লাভ করে—তাহার ভোক্তা মাত্র হয়। আত্মার 'জ্ঞ'স্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া চিত্তে জ্ঞাতা ও ভোক্তাভাব উৎপন্ন হয়। এই চিত্তবদ্ধ পুরুষ চিত্তের এই প্রতিবিম্ব পুনর্গ্রহণ করিয়া জ্ঞাতা ও ভোক্তা হয়, তাহা বলিয়াছি। তাহাতে তাহার প্রকৃত জ্ঞ ও আনন্দস্বরূপ আবরিত হয়। কিন্তু আত্মার সৎস্বরূপ চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া চিত্তে কর্তৃত্ব বোধ হইলেও আত্মা শক্তিস্বরূপ বা শক্তির আধার হইয়াও অকর্ত্তা বা উদাসীন থাকেন; চিত্তের এই কর্তৃত্বভাব অবশ্য পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয়, নতুবা পুরুষের কর্তৃত্ব-অভিমান হইত না। এই চিত্তের কর্তৃত্বভাব প্রকৃতির; বলিয়াছি ত পুরুষের বাসনা অনুসারে

প্রকৃতির কর্তৃত্ব। প্রকৃতিই ক্ষেত্রের কর্ত্রী পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞমাত্র। পুরুষ কোন কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিলে প্রকৃতি তদনুসারে স্বতই প্রবর্ত্তিত হয়। অথবা ঈশ্বরনিয়ন্ত্রিত অধিষ্ঠাতৃত্বে এইরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়া প্রকৃতি কর্ত্রী হয়। এই শেষ সিদ্ধান্ত গীতার। ইহা বেদান্তদর্শন-সম্মত।

আর প্রথম সিদ্ধান্ত সাংখ্যদর্শনের। সাংখ্যদর্শনের মতে পুরুষ কর্ত্তা নহে, জ্ঞাতা ও ভোক্তা মাত্র। পুরুষের ভোগ ও মোক্ষার্থ প্রকৃতিই স্বতঃ প্রবর্ত্তিত হইয়া কর্ত্রী হয়েন। যাহা হউক, বদ্ধ পুরুষের এই জ্ঞাতা, কর্ত্তা বা ভোক্তাভাব—কিছুই বাস্তব নহে; তাহা ব্যবহারিক (phenomenal)। জ্ঞান ও চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের যে প্রতিবিম্ব, তাহা তদধিষ্ঠিত প্রকৃতির চিত্তে পতিত হয়, তাহা হইতে সেই চিত্তেই এই জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তাজীবভাব হয়। পুরুষ আবার সেই চিত্তের প্রতিবিম্ব প্রতিগ্রহণ করিয়া আপনাকে জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তা মনে করে। আমরা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এইরূপে এই জীবের জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তাভাব হয়। যদি কর্ত্তাভাব একেবারে অলীক হয়, তবে জ্ঞাতা ও ভোক্তাভাবও অলীক। একার্থে জীবের ভোক্তা ও জ্ঞাতাভাব যেমন অলীক নহে, সেইরূপ এ কর্ত্তাভাবও ঠিক অলীক নহে। তবে এই অহঙ্কারপ্রতিষ্ঠিত কর্ত্তাভাব হইতে তাহার যে কর্তৃত্ববোধ—আমিই কর্ম্ম করি—এই যে বোধ, তাহাই অলীক। কিন্তু প্রকৃতির উপর প্রকৃতিবদ্ধ পুরুষের কোন কর্তৃত্ব নাই। প্রকৃতির কার্য্যের সে কর্ত্তা নহে। প্রকৃতি জীবের ভোগ-মোক্ষার্থ প্রবর্ত্তিত হয় বটে, কিন্তু তাহা জীবের কর্তৃত্বে বা তাহার অধীনে হয় না। সাংখ্যদর্শন অনুসারে প্রকৃতি স্বাধীনা স্বতঃই প্রবর্ত্তিত হয়। সাংখ্যদর্শনে আছে যে, আমাদের ক্ষেত্রে যে ত্রয়োদশবিধ করণ, তাহাদের কার্য্য আহরণ, ধারণ ও প্রকাশ, তাহা দশবিধ (সাংখ্য কারিকা ১২)। এই অন্তঃকরণ (চিত্ত) ও বহিঃকরণ

(ইন্দ্রিয়গণই) বিষয় আহরণ করে, প্রকাশ করে, এবং প্রাণন ক্রিয়ার দ্বারা দেহ ধারণ করে। এই করণ সকল পরস্পরের উক্তরূপশক্তি অনুসারে আপন আপন বৃত্তি লাভ করে। পুরুষের ভোগাপবর্গই ইহার হেতু।

"স্বাং স্বাং প্রতিপদ্যন্তে পরস্পরাভূতহেতুকাং বৃত্তিম্।

পুরুষার্থ এব হেতুর্ন কেনচিৎ কার্য্যতে করণম্॥" (কারিকা, ৩১।)

অতএব সাংখ্যদর্শন অনুসারে পুরুষার্থ এই সকল করণ প্রবর্ত্তিত হয়, তাহারা আর কাহারও দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয় না। পুরুষের ভবিষ্যৎ ভোগ মুক্তি লক্ষ্য করিয়া স্বতই, বৎস জন্য গাভীর স্তনঃ দুগ্ধ ক্ষরণের ন্যায়, তাহারা প্রবর্ত্তিত হয়। পুরুষের বা আর কাহারও কর্ত্তৃত্বে তাহারা প্রবর্ত্তিত হয় না।

বেদান্ত ও গীতা অনুসারে পুরুষ (জীব) অকর্ত্তা বটে, এবং প্রকৃতির উপর তাহার কর্ত্তৃত্ব নাই বটে, কিন্তু প্রকৃতি পরমেশ্বরেরই শক্তি। পরমেশ্বরই প্রকৃতিতে নিয়ন্তৃরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পুরুষের ভোগ মোক্ষার্থ তাহাকে প্রবর্ত্তিত করেন, পুরুষের নিজ বাসনারূপ ক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া দেন,—ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

যাহা হউক, এই সকল তত্ত্ব বুঝিতে পারিলে এই শ্লোকোক্ত প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব ও জীবের ভোক্তৃত্ব বুঝিতে পারা যাইবে। এ তত্ত্ব বিশেষভাবে না বুঝিলে প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকজ্ঞান হইতে পারে না। পরবর্ত্তী শ্লোকে এই ভোক্তৃত্বের ফল উক্ত হইয়াছে। সে স্থলে এ তত্ত্ব আরও বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। এজন্য এ স্থলে তাহার আর বিস্তারিত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ ২১

প্রকৃতিতে হয়ে স্থিত, প্রকৃতিজ গুণ—
পুরুষ করয়ে ভোগ ; গুণ-সঙ্গ তার
সদসৎ-যোনি মাঝে জনম কারণ ॥২১

২১। প্রকৃতিতে হয়ে স্থিত প্রকৃতিজ গুণ পুরুষ করয়ে ভোগ—"কি নিমিত্ত পুরুষের ভোক্তৃত্ব বা সংসারিত্ব—এই শ্লোকে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে ; ভোক্তা পুরুষ প্রকৃতিকে আত্মভাবে প্রাপ্ত হইয়াই ভোগ করিতে সমর্থ হয়। এস্থলে প্রকৃতি অর্থে কার্য্য-করণরূপে পরিণত অবিদ্যা। এই প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়া পুরুষ প্রকৃতিজ গুণ-সমূহকেই ভোগ করে অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, মোহ আকারে পরিণত বা অভিব্যক্ত বা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন গুণ, তাহাই ভোগ করে। 'আমি সুখী' আমি দুঃখী, আমি মূঢ় বা আমি পণ্ডিত এই প্রকার যে জ্ঞান,তাহাই পুরুষের প্রকৃতিজাতগুণের ভোগ। ইহাই অবিদ্যা। এই অবিদ্যার বর্ত্তমান দশায় উপভুজ্যমান সুখদুঃখ-মোহ-রূপ গুণে যে সঙ্গ অর্থাৎ আত্মভাব, তাহাই এই সংসারের উৎপত্তির প্রধান কারণ।" (শঙ্কর)।

"পূর্ব্বে পরস্পর-সংসৃষ্ট প্রকৃতি-পুরুষের কার্য্যভেদ উক্ত হইয়াছে। পুরুষ স্বতঃই সুখ স্বরূপ আপন আত্মাতে অনুভূত সুখ-ভোক্তা। তাহা হইলেও সে বৈষয়িক সুখ-দুঃখের উপভোক্তা হয়। কেন হয়, তাহা এস্থলে উক্ত হইয়াছে। পুরুষ এক অবিচ্ছিন্ন সুখস্বরূপ হইয়াও, প্রকৃতি-সংসৃষ্ট হইয়া প্রকৃতিজাত গুণ—অর্থাৎ প্রকৃতি-সংসর্গ হেতু উপাধিরূপ বা ঔপচারিক সত্ত্বাদি গুণ-কার্য্যভূত সুখদুঃখাদি গুণ ভোগ করে বা অনুভব করে।" (রামানুজ)।

অবিকারী অন্যরহিত পুরুষের এ ভোক্তৃত্বের কারণ কি, তাহা এ স্থলে উক্ত হইয়াছে। প্রকৃতিস্থ হইয়া, অর্থাৎ প্রকৃতির কার্য্য যে দেহ, তাহাতে তাদাত্ম্যভাবে স্থিত হইয়া পুরুষ সেই স্থিতিজন্য প্রকৃতিজনিত সুখদুঃখাদি গুণ ভোগ করে (স্বামী)।

প্রকৃতি অর্থাৎ মায়া; তাহা মিথ্যা। তাহাতে তাদাত্ম্যরূপে উপগত হইয়া পুরুষ প্রকৃতিস্থ হয়। সেই হেতু পুরুষ প্রকৃতিজ গুণ উপভোগ করে বা উপলাভ করে। (মধু)।

পুরুষ একেবারে অকর্ত্তা নহে। প্রকৃতির অধিষ্ঠানে এবং সুখাদি-ভোগে তাহার কর্তৃত্ব। এ স্থলে ইহাই বিবৃত হইয়াছে। চিৎসুখ এক-রস হইয়াও পুরুষ অনাদি কর্ম্মবাসনা দ্বারা প্রকৃতি অধিষ্ঠিত হইয়া অর্থাৎ প্রকৃতিকৃত প্রাণবিশিষ্ট দেহ-ইন্দ্রিয়াদিতে অধিষ্ঠিত ও দেহ-প্রাণ-বিশিষ্ট হইয়া, সেই প্রকৃতি জাত গুণ বা সুখদুঃখাদি ভোগ করে বা অনুভব করে। (বলদেব)।

পুরুষের সুখদুঃখাদি ভোক্তৃত্ব যে উক্ত হইয়াছে, তাহা জ্ঞানস্বরূপ হেতু সুখস্বরূপ পুরুষের পক্ষে কিরূপে সম্ভব হয়, তাহাই এস্থলে বুঝান হইয়াছে। স্বরূপতঃ পুরুষ সুখী ও নির্ব্বিকার হইলেও পুরুষ উচ্চ বা নীচ নানারূপ দেহরূপে পরিণত, প্রকৃতির সহিত সম্বদ্ধ হইয়া প্রকৃতিজ গুণ অর্থাৎ প্রকৃতিজ গুণকার্য্যভূত সুখদুঃখাদি ভোগ করে। (কেশব)

গুণ-সঙ্গ তার সদসদ্যোনিমাঝে জনম কারণ—"সংসার-দশায় উপভুজ্যমান সুখদুঃখ-মোহরূপ গুণে যে সঙ্গ আসক্তি বা আত্মভাব, তাহাই তাহার সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মলাভের কারণ। দেবাদি যোনি—সদ্যোনি, পশু প্রভৃতির যোনি—অসদ্যোনি, আর মনুষ্যযোনি—সদসদ্যোনি। এই ত্রিবিধ যোনি এ স্থলে উদ্দিষ্ট বলা যায়। এই স্থলে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতিস্থত্ব অর্থাৎ অবিদ্যাও গুণসঙ্গত্ব অর্থাৎ কাম এই দুইটিই পুরুষের সংসারদশার কারণ। সংসার হইতে মুক্ত হইতে হইলে এই দুইটিই ত্যাগ করিতে হইবে। এই দুইটি নিবৃত্তির কারণ সন্ন্যাস-সংযুক্ত জ্ঞান ও বৈরাগ্য। ইহাই গীতা-শাস্ত্রের উপদেশ। এই জ্ঞান যে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞকে বিষয় করিয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এবং যাহা জানিয়া যে মোক্ষলাভ করা যায়, তাহাও উক্ত

হইয়াছে। এই জ্ঞান লাভ করিবার উপায় দুইটি—অন্যাপোহ ও অতদ্ধর্ম্মারোপ। ব্রহ্ম ব্যতীত আর সকলের সত্তার অপলাপই অন্যাপোহ, এবং ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত জড়ে ব্রহ্মধর্ম্মের আরোপ করা অতদ্ধর্ম্মারোপ।" (শঙ্কর)। "তৎ ন সৎ ন অসৎ" এই জ্ঞানে ব্রহ্মে অন্য নিষেধ পূর্ব্বক, এবং সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ.' ইত্যাদি দ্বারা অতদ্ধর্ম্মাধ্যাস দ্বারা সেই ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের উপায় উক্ত হইয়াছে (গিরি)।

পুরুষ কিরূপে ও কেন প্রকৃতিস্থ হয়, তাহার হেতু এ স্থলে উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকৃতি-পরিণামরূপ দেব-মনুষ্যাদি যোনিবিশেষে স্থিত হইয়া, এই পুরুষ সেই যোনি-প্রযুক্ত সত্বাদি গুণময় সুখাদিতে আসক্ত হয়, এবং তাহার সাধনভূত পুণ্যপাপ-কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয়। তদনন্তর সেই পাপপুণ্যের ফল অনুভব করিবার জন্য অসাধু বা সাধু যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। সেই যোনিতে অবস্থান করিয়া, আবার কর্ম্মারম্ভ করে, আবার সে যোনিত্যাগ করিয়া অন্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যতদিন অমানিত্বাদি আত্মপ্রাপ্তির সাধনভূত গুণ না সেবা করে, ততদিন সে পুরুষ বদ্ধ থাকিয়া সংসারে গতায়াত করে। এই-রূপে গুণসঙ্গই তাহার সদসদ্ যোনিতে জন্মগ্রহণের. কারণ হয় (রামানুজ)।

এই পুরুষের দেবাদি সদ্‌যোনিতে এবং তির্য্যগাদি অসদ্‌যোনিতে যে সকল জন্মলাভ হয়, গুণসঙ্গই তাহার কারণ। গুণ অর্থাৎ শুভা-শুভ কর্ম্মকারী ইন্দ্রিয়গণের সহিত যে সঙ্গ, তাহা গুণসঙ্গ (স্বামী)।

এই প্রকৃতিজ গুণ উপলম্ভহেতু সদসদ্ ও মিশ্র যোনিতে জন্ম হয়। দেবাদির যোনিই সদ্‌যোনি, তাহাতে সাত্বিক ইষ্টফল ভোগ হয়। পশ্বাদির যোনি অসৎ, তাহাতে অহিত অনিষ্টফল ভোগ হয়। সদসদ্-যোনি ধর্ম্মাধর্ম্মমিশ্রিত হেতু তাহা ব্রাহ্মণাদি মনুষ্যযোনি। তাহাতে রাজসিক ইষ্টানিষ্টমিশ্র ফলভোগ হয়। এইরূপ বিভিন্নযোনিতে জন্মের

কারণ গুণসঙ্গ। সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক প্রকৃতিতে তাদাত্ম্যের অভিমানই গুণসঙ্গ। এই গুণসঙ্গ না হইলে স্বতঃ অমল পুরুষের সংসারদশা হইত না। গুণসঙ্গের আর এক অর্থ সুখদুঃখ-মোহাত্মক শব্দাদি বিষয়ে অভিলাষ বা কাম। সেই কাম বা বাসনাই পুরুষের সদসদ্ যোনিতে জন্মের কারণ। প্রকৃতিতে তাদাত্ম্যের অভিমানই এই কাম বা বাসনার মূল কারণ (মধু)।

দেবমানবাদি সাধুকর্ম্মরচিত সদ্যোনিতে ও অসাধু কর্ম্মরচিত পশু পক্ষী প্রভৃতির অসদ্যোনিতে পুরুষের যে সকল জন্ম হয়, তাহাতে সেই সেই যোনিতে পুরুষের কর্ত্তৃত্বভাবে সংসর্গ হয়। আর অনাদি গুণময়স্পৃহাই সে সংসর্গের কারণ (বলদেব)।

পুরুষ কেন প্রকৃতিস্থ হন, তাহার কারণ এ স্থলে উক্ত হইতেছে। এই পুরুষের সদসৎ যোনিতে জন্মের কারণ গুণসঙ্গ। ইহার মধ্যে দেবগণই সত্ত্বগুণকার্য্যভূত সদ্যোনি। রক্ষঃ-পিশাচ-পশু-প্রভৃতি তমোগুণকার্য্যভূত অসদ্যোনি এবং মনুষ্যগণ রজঃকার্য্যভূত সদসদ্যোনি। সেই সেই যোনিতে যথাক্রমে শুভ, অশুভ ও মিশ্র ফল ভোগের জন্য পুরুষের জন্মের কারণ গুণসঙ্গ, অর্থাৎ শব্দ-স্পর্শরূপাদি ইন্দ্রিয়বিষয়ে প্রিয়ভোগ্যত্ব বুদ্ধিতে মনের অভিনিবেশ। সত্ত্বাদিগুণকার্য্য সুখাদিতে আসক্ত পুরুষ তাহার সাধনভূত পুণ্যপাপাত্মক কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয়। তদনন্তর সেই ফলানুভবের জন্য সদসদ্যোনিতে অর্থাৎ উত্তমাধম যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। তদনন্তর সেই দেহে কর্ম্মারম্ভ করে এবং আবার জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে যে পর্য্যন্ত না বিষয় ত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষসাধনভূত বিশুদ্ধবুদ্ধিবৈরাগ্যাদি অনুসেবন করে, সে পর্য্যন্ত সংসারে পুরুষের এইরূপ গতায়াত চলিতে থাকে (কেশব)।

এই শ্লোকে পুরুষের 'প্রকৃতি'স্থ হওয়া, প্রকৃতিজগুণ ভোগ করা, এবং সেই গুণে আসক্তি হেতু নানারূপ যোনিতে জন্মগ্রহণ করার তত্ত্ব

উক্ত হইয়াছে। ব্যাখ্যাকারগণ এ তত্ত্ব কিরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বুঝা গেল। তথাপি এ তত্ত্ব আরও বিশদ করিয়া বুঝা আবশ্যক। আমরা বিশেষভাবে ইহা বুঝিবার চেষ্টা করিব।

বলদেব এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রথমে উল্লেখ করা উচিত। তিনি বলেন, জীব অনাদি ও কর্ম্মরূপ অনাদি বাসনাযুক্ত। জীব ভোক্তা, এজন্য ভোগ্যবিষয় স্পৃহা করিয়া তাহার সন্নিহিত অনাদি প্রকৃতিকে আশ্রয় করে। সৎ-প্রসঙ্গের দ্বারা যতদিন সেই সেই বিষয়ে বাসনা ক্ষয় না হয়, ততদিন বিষয় ভোগ করে। বাসনা ক্ষয় হইলে পরমাত্মধামে সুখ ভোগ করে। শ্রুতিতে আছে, 'স অশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্।' এই অধ্যায়ের ১৯, ২০, ২৯-ও পরের অধ্যায়ে ১৯ শ্লোক হইতে যাঁহারা আপাততঃ অর্থগ্রাহী সাংখ্যপণ্ডিত, তাঁহারা কেবল প্রকৃতিরই কর্তৃত্ব বলিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা রহস্যজ্ঞ, তাঁহারা লোষ্ট্র কাষ্ঠবৎ অচেতন প্রকৃতির কর্তৃত্ব স্বীকার করেন না। প্রত্যক্ষ উপাদানকে অন্য অপরোক্ষরূপে পরিণত করিবার ইচ্ছা জন্য যে কৃতিত্ব, তাহাই কর্তৃত্ব। সে কর্তৃত্ব চেতনেরই সম্ভব। শ্রুতিতে আছে "বিজ্ঞানং...কর্ম্মাণি তনুতে...। এস হি দ্রষ্টা...কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ।" (তৈত্তিরীয়, ২।৫।১)। অনেকে বলেন, পুরুষ-সন্নিধানেই প্রকৃতিতে চৈতন্যাধ্যাস হয় বলিয়া সেই অধ্যাত্ম চৈতন্য হেতু প্রকৃতির কর্তৃত্ব হয়। ইহাও তত্ত্ব নহে। সেই প্রকৃতির তৎসন্নিহিত চৈতন্যযুক্ত পুরুষের কর্তৃত্বের অধ্যাস মাত্র; এই অধ্যাস স্বীকার করিলে, ইহাও বলা যাইতে পারে, তপ্ত লৌহের যে দাহ করিবার শক্তি, তাহার যেমন লৌহ হেতু, সেইরূপ অগ্নিও হেতু। জল চলিতেছে বলিলে জলের কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না। জলে অন্তর্যামী আত্মার অধিষ্ঠান হেতুও তাহার কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না। শ্রুতি স্মৃতিতে যে স্বর্গাদি ফলমোক্ষক জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি কর্ম্ম ও মোক্ষসাধক ধ্যানাদি বিহিত, তাহা জড় প্রকৃতিকে উদ্দেশ করিয়া বিহিত হয় নাই। প্রকৃতি যে চেতন ভোক্তা পুরুষের

উদ্দেশে নিজ কর্ত্তৃত্বে এইরূপ কর্ম্ম করিবে, তাহাও সম্ভব নহে। অতএব পুরুষেরই কর্ত্তৃত্ব। তবে গীতায় প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব উক্ত হইয়াছে কেন? সে কেবল প্রকৃতির এই কর্ম্মবৃত্তির প্রাচুর্য্য জন্য। যেমন বাহুদ্বারা বস্তু গ্রহণকারী পুরুষে—বাহু গ্রহণ করিতেছে, এইরূপ ব্যপদেশ বা ব্যবহার হয়, সেইরূপ প্রকৃতি দ্বারা কর্ম্মকারী পুরুষে প্রকৃতি কর্ম্ম করিতেছে এই-রূপ ব্যপদেশ হয়। অতএব অর্থ এই যে, প্রকৃতি হইতে দেহাদি দ্বারা যুক্ত পুরুষেরই যজ্ঞ যুদ্ধাদি কর্ম্ম কর্ত্তৃত্ব, প্রকৃতি-বিমুক্ত স্বচ্ছ পুরুষে কর্ত্তৃত্ব নাই, ইহা বুঝাইতেই প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে।"

পুরুষ অকর্ত্তা—আমরা পূর্ব্বশ্লোকের ব্যাখ্যায় দেখিয়াছি যে, সাংখ্য, বেদান্ত ও গীতা অনুসারে পুরুষ অকর্ত্তা, প্রকৃতি কর্ত্রী। কেবল ন্যায়-দর্শন অনুসারে পুরুষ বা আত্মা কর্ত্তা। বলদেব এই ন্যায়মতই গ্রহণ করিয়াছেন, ও এই মত সমর্থন করিয়াছেন। গীতা অনুসারে যে পুরুষ অকর্ত্তা—সর্ব্বাবস্থায়ই অকর্ত্তা এবং অকর্ত্তা হইয়াই ভোক্তা, তাহা পূর্ব্বে ১৯,২০শ শ্লোকে ইঙ্গিত করা আছে, কিন্তু পরবর্ত্তী ২৯শ শ্লোকে ও ১৪শ অধ্যায়ের ১৯শ শ্লোকে তাহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। আর প্রকৃতিগুণের দ্বারা সমুদয় কর্ম্ম হইলেও অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা পুরুষ আপনাকে কর্ত্তা মনে করে, ইহাও ৩।২৭শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। অতএব বলদেব যাহাই বলুন, গীতা অনুসারে পুরুষ অকর্ত্তা বটে। সাংখ্যদর্শন অনুসারে পুরুষ অকর্ত্তা। সাংখ্যদর্শনে আছে, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন পুরুষের প্রয়োজনসাধন জন্য নিজ নিজ বৃত্তি আহরণ ধারণ ও প্রকাশরূপ কর্ম্ম করে। অন্তঃকরণ কাহারও দ্বারা কার্য্যকর্ত্তৃত্বে নিয়োজিত হয় না (সাংখ্যকারিকা, ৩১)। সাংখ্যদর্শনে আরও উক্ত হইয়াছে যে, উদাসীন (অসঙ্গ) পুরুষ প্রকৃতির গুণকর্ত্তৃত্বেই কর্ত্তার ন্যায় হয় (কারিকা, ২০)। চিত্তে অহংকারের কর্ত্তৃত্ব পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয়, পুরুষ তাহাতে রঞ্জিত হয় মাত্র। সাংখ্যসূত্রে আছে

'অহঙ্কারঃ কর্ত্তা ন পুরুষঃ" (৯।৫৫)। ও 'উপরাগাৎ কর্ত্তৃত্বং চিৎসান্নিধ্যাৎ।" (১।১৬৫)।

বেদান্ত-দর্শনেও এই কথা আছে। যথা—

"অকর্ত্তা বিজ্ঞাতা ভবতি।" (ছান্দোগ্য, ৭।৯।১)।

"অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপোঽকর্ত্তা।" (শ্বেতাশ্বতর, ১।৯)।

আত্মা অক্রতু (শ্বেতাশ্বতর, ৩।২০)। বেদান্ত অনুসারে ভূতাত্মাই (অহঙ্কার বিমূঢ় আত্মা) কর্ম্ম করে (মৈত্রায়ণী, ৩।৩)। প্রকৃত কর্ত্তা 'প্রধান' বা প্রকৃতি (মৈত্রায়ণী ৬।১০)। বেদান্তে অন্যত্র আছে যে, কামই কর্ত্তা। "কামঃ কর্ত্তা কামঃ কারয়িতা।" (মহানারায়ণ, ১৮।৬) "কামঃ অকার্ষীৎ ন অহং করোমি কামঃ করোতি, কামঃ কর্ত্তা, কামঃ কারয়িতা।" (মহানারায়ণ, ১৮।২) এই কাম মনের স্বরূপ, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে (বৃহদারণ্যক, ১।৫।৬)। এই কাম অনুসারেই কর্ম্ম হয়, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। শ্রুতিতে আছে—'স যথা কামো ভবতি তৎ ক্রতুর্ভবতি, তৎ কর্ম্ম কুরুতে, তদভিসম্পদ্যতে।' (বৃহদারণ্যক, ৪।৪।৫)। অতএব গীতা, বেদান্ত ও সাংখ্যমতে পুরুষ অকর্ত্তা। অবশ্য, উপনিষদে অনেক স্থলে আত্মাকে কর্ত্তা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ আমরা পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব। গীতায় ভগবান্ আপনাকে অনেক স্থলে, কর্ত্তা অর্থাৎ এই জগৎকর্ত্তা বলিয়াছেন, অথচ উপদেশ দিয়াছেন যে, তাঁহাকে অব্যয় অকর্ত্তারূপে জানিতে হইবে (৪।১৩)। তাঁহার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি এই জগৎ প্রসব করে (গীতা ৯।১০)। এজন্য বলিতে পারা যায় যে, পুরুষ স্বরূপতঃ অকর্ত্তা, প্রকৃতিই কর্ম্ম করে, পুরুষে কর্ত্তৃত্ব ঔপচারিক। প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বে সেই কর্ত্তৃত্ব পুরুষে আরোপিত।

যাহা হউক, আমরা পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব যে, এই কর্ত্তৃত্ব ঠিক ঔপচারিক নহে। পুরুষ অর্থাৎ ক্ষর পুরুষ ও পরম পুরুষ স্বরূপতঃ অকর্ত্তা হইয়াও কর্ত্তা। তবে প্রকৃতিবদ্ধ পুরুষ সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব প্রকৃতিরই।

পুরুষ অভিমানবশে আপনাকে কর্ত্তা মনে করে। এই প্রকৃতিবদ্ধ অবস্থায় পুরুষ অকর্ত্তা হইয়াও কিরূপে ভোক্তা হইতে পারে, এবং প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব আপনাতে আরোপ করে, তাহা পূর্ব্ব শ্লোকের ব্যাখ্যাশেষে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। তাহা এ স্থলে আরও বিশদভাবে বুঝার প্রয়োজন।

পুরুষ অকর্ত্তা হইয়াও ভোক্তা।—পুরুষকে অকর্ত্তা বলিলে আপত্তি হইতে পারে যে, পুরুষ যদি কর্ত্তা না হন, তবে কিরূপে ভোক্তা হইতে পারেন, কিরূপে কর্ম্মফল ভোগ করেন? কিরূপে তাঁহার কর্ম্ম-বন্ধন হয়? প্রকৃতি কর্ম্ম করিবে, আর পুরুষ তাহার ফল ভোগ করিবে? একের কর্ম্মে অপরে ভোক্তা হইবে—ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? ইহার বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শন-সম্মত উত্তর এই যে, অবিদ্যা বা অজ্ঞানই ইহার মূল। এই অজ্ঞানহেতু পুরুষ প্রকৃতিবদ্ধ থাকে। প্রকৃতিতে পুরুষের আত্মাধ্যাস হয়। এজন্য পুরুষ প্রকৃতিজ গুণ ভোগ করে, প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব প্রকৃতিজ অহঙ্কারবশে আপনাতে আরোপ করে। আরোপস্থলে বাস্তবের ন্যায় ব্যবহার হয়। ভ্রমহেতু রজ্জুতে সর্পের আরোপ হইলে, তদনুসারে ব্যবহার হয়। আরও এক কথা, অধ্যাসহেতু একের কর্ম্ম ও ভোগ অপরে আরোপিত হইতে দেখা যায়। যাহার পুত্রে আত্মাধ্যাস হয়, সে পুত্রের কর্ম্ম আপনার কর্ম্ম মনে করে, সে পুত্রের সুখ-দুঃখ-ভোগ আপনাতে আরোপ করে। অতএব যদি অবিদ্যা বা অজ্ঞান স্বীকার করা যায়, তবে এই তত্ত্ব বুঝিবার গোল হয় না।

পুরুষ যে প্রকৃতিতে স্থিত হইয়াই ভোক্তা হয় এবং প্রকৃতিজ গুণ ভোগ করে, তাহা শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে।

"আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ।"

(কঠ উপঃ ৩।৪।

এই আত্মা অর্থে এ স্থলে বুদ্ধি। অতএব শ্রুতি অনুসারে বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়সংযোগই পুরুষের ভোক্তৃত্বের হেতু। তাহা হইতে সুখ-দুঃখ-ভোগ হয়। সাংখ্যদর্শন অনুসারেও এই প্রকৃতি-সংযোগই পুরুষের ভোক্তৃত্বের হেতু। এই প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। প্রকৃতির গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, তাহা গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে। সত্ত্বগুণের স্বভাব প্রকাশ, রজোগুণের স্বভাব কর্ম্ম, আর তমোগুণের স্বভাব এই প্রকাশ ও কর্ম্মকে আবরণ বা অভিভূত করা। প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন অন্তঃকরণে বা চিত্তে, এই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ হইতে সুখ, দুঃখ ও মোহ-রূপ গুণের উৎপত্তি হয়। তাহা হইলে সুখ লাভ ও দুঃখ দূর করিবার জন্য প্রধানতঃ মনের ইচ্ছা, সংকল্প প্রভৃতি ধর্ম্মের বিকাশ হয়। তাহা হইতে চঞ্চলস্বভাব রজোগুণবশে কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়। কাম বা ভোগেচ্ছা চরিতার্থ জন্যই কর্ম্মে প্রবৃত্তি। এই ভোক্তৃভাব চৈতন্যের। প্রকৃতিতে পুরুষ অধিষ্ঠিত বলিয়া প্রকৃতি চৈতন্যাভাসযুক্ত হইয়া প্রথমে ভোক্তৃ-ভাবের আভাসযুক্ত হয়। সেই ভাব পুরুষে প্রতিবিম্বিত হইয়া পুরুষ ভোক্তা হয়। পুরুষ ভোক্তা হয় বলিয়া তাহার কর্তৃত্বভাবও হয়। প্রকৃতির কর্তৃত্ব তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া পুরুষে কর্তৃত্বের জ্ঞান হয়। প্রকৃতিজ চিত্তের কাম, অথবা ভোক্তৃত্ব, কর্তৃত্ব সকলই পুরুষে প্রতিবিম্বিত হইলে, পুরুষ তাহা গ্রহণ করে। প্রতিবিম্বিত হইলেও যাহার চিত্ত নির্ম্মল, যে জ্ঞানী, সে তাহাতে আসক্ত হয় না; কিন্তু যাহার চিত্ত মলিন, যে অজ্ঞানযুক্ত, তাহার তাহাতে আসক্তি হয়। এই আসক্তিই সংসারের কারণ। তাহা পরে বুঝিব। এইরূপে পুরুষে যে প্রকার কাম বা বাসনার অধ্যাস হয়, যেরূপ কর্তৃত্বের ইচ্ছা হয়, প্রকৃতি তদনু-সারে কর্ম্ম করে বা কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয়। এজন্য অহঙ্কারবশে পুরুষ আপনাকে কর্ত্তা মনে করে। এইরূপে ভ্রান্ত কর্তৃত্ব-বুদ্ধিতেই পুরুষ কর্ম্মফলভোক্তা হয়। আবার এই ভোক্তৃত্বভাব হয় বলিয়াও তাহার

কর্তৃত্বভাব হয়। তাহার উক্তরূপে চিত্তে অভিব্যক্ত কোনরূপ কাম বা বাসনা উৎপন্ন হইবামাত্র প্রকৃতি তদনুরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় বলিয়াই পুরুষের কর্তৃত্ব-বোধ হয়। আর সেই কর্ম্ম সাধিত হওয়ায় যে সুখ-দুঃখ বা মোহ হয়, তাহা সে ভোগ করিয়া আপনাকে নিজকৃত কর্ম্মের ফল-ভোক্তাও মনে করে।

সাংখ্যদর্শন অনুসারে প্রকৃতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পুরুষের জন্য কর্ম্ম করে এবং সেই কর্ম্ম দ্বারা পুরুষকে বদ্ধ রাখে। যদি আমার কোন বন্ধু বা ভৃত্য আমার অভিপ্রায় জানিয়া আমার প্রয়োজনার্থ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কর্ম্ম করে, তবে সে কর্ম্মফল আমার। সেনাগণের জয়ে সেই সেনাপতি বা রাজারই জয় গণ্য হয়। যেমন একজন অপরের জন্য পাক করে এবং সেই অপর তাহা ভোগ করে, (সাংখ্য সূত্র, ৩।১০৩) সেইরূপ প্রকৃতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পুরুষের ভোগমোক্ষার্থ কর্ম্ম করে বলিয়া পুরুষই সে কর্ম্মফল ভোগ করে। বৎসের পানের জন্য গাভীর স্বাভাবিক যে দুগ্ধ ক্ষরণ হয়, গাভী যে তৃণাদি আহার করে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ দুগ্ধে পরিণত হয়, আর সে দুগ্ধ সেই বৎসই ভোগ করে, গাভী তাহা ভোগ করে না। এইরূপে প্রকৃতির কর্ম্ম হইতে যে ফল হয়, তাহা পুরুষে ভোগ করিতে পারে। সাংখ্যদর্শনে আছে,—উপকারিণী গুণবতী প্রকৃতি নানা উপায় দ্বারা নিত্য নির্গুণ পুরুষের ভোগ মোক্ষার্থ প্রয়োজন, নিজ প্রয়োজন বিনাও সাধন করে (কারিকা, ৬০)।

আরও এক আপত্তি। চৈতন্যই যেমন ভোক্তা হয়, জড়ে ভোক্তৃত্ব থাকিতে পারে না, সেইরূপ চৈতন্য ব্যতীত কর্ম্মে প্রবর্ত্তনা থাকিতে পারে না। সাংখ্যদর্শন অনুসারে পুরুষের চৈতন্য প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহা বলিয়াছি। অন্তঃকরণে পুরুষের চৈতন্যে চৈতন্যযুক্ত হইয়া কর্তৃত্বের ও কর্ম্মের হেতু হয়। এই প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই প্রকৃতির কর্ম্মপ্রবর্ত্তক, তাহা দ্বারাই প্রকৃতির কর্তৃত্ব। প্রকৃতিকৃত কর্ম্মের ফল বা কর্ম্মবন্ধন

সেই অন্তঃকরণকেই আশ্রয় করে। চিত্তেই সংস্কার-বীজ উপ্ত হয়। পুরুষে সেই অন্তঃকরণেরই প্রতিবিম্ব পড়ে এবং পুরুষ তাহা গ্রহণ করে বলিয়া অন্তঃকরণের ধর্ম্ম আত্মাতে আরোপ করে। এইরূপে সে প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বে যে কর্ম্ম হয়, তাহার ফল ভোগ করে। এইরূপে পুরুষ অকর্ত্তা হইয়াও কর্ত্তা ও কর্ম্মফলভোক্তা হয়। পুরুষ অকর্ত্তা হইয়াও অবিবেক হেতু ভোক্তা হয় (সাংখ্য সূত্র ১।১০৪)। সে প্রকৃতিজ গুণ ভোগ করে। চিত্ত সাত্ত্বিক হইলে পুরুষকে সাত্ত্বিক বলে, চিত্ত রাজসিক হইলে পুরুষকে রাজসিক বলে, আর চিত্ত তামসিক হইলে, পুরুষকে তামসিক পুরুষ বলে। গীতায় পরে ইহা বিবৃত হইয়াছে। সাত্ত্বিক পুরুষ প্রধানতঃ সুখ ভোগ করে, রাজসিক পুরুষ প্রধানতঃ দুঃখ ভোগ করে। অতএব এই কর্ম্মফল হেতু অন্তঃকরণে যে সুখদুঃখাদি গুণ উৎপন্ন হয়, পুরুষই তাহা ভোগ করে।

পুরুষ-প্রকৃতি-যোগ—অতএব পুরুষ অকর্ত্তা, উদাসীন ও অসঙ্গ হইলেও প্রকৃতিস্থ বা প্রকৃতি সংযুক্ত হইয়া প্রকৃতিজ গুণ ভোগ করে। এস্থলে কথা হইতেছে, পুরুষ কিরূপে প্রকৃতিস্থ হয়? এই প্রকৃতির অর্থ গীতা অনুসারে অষ্টধা ভিন্ন অপরা প্রকৃতি ও পরাপ্রকৃতি। এই প্রকৃতিতে বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন ও রূপরসাদি পঞ্চতন্মাত্র—ইহাই অষ্টধা অপরা প্রকৃতি। আর প্রাণই পরাপ্রকৃতি, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। পুরুষ এই প্রকৃতিতে স্থিত হয়। সাংখ্যদর্শন অনুসারেও বুদ্ধি, অহঙ্কার ও অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন মন ও পঞ্চতন্মাত্র—এই আটটি লিঙ্গশরীরের উপকরণ। "মহদাদি সূক্ষ্ম-পর্য্যন্তং লিঙ্গম্" (সাংখ্যকারিকা ৪০)। ইহার অর্থ "মহদাদি বুদ্ধিরহংকারো মন ইতি, পঞ্চতন্মাত্রাণি সূক্ষ্মপর্য্যন্তম্ ইতি তন্মাত্রপর্য্যন্তম্' (গৌড়পাদ কারিকা)। এ স্থলে এ অষ্টধা অপরা প্রকৃতিই—বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন ও পঞ্চতন্মাত্রযুক্ত (বা ভূমি, অপ্, অনল, বায়ু, আকাশ—এই পঞ্চভূতের যাহা সূক্ষ্ম অবিশেষ রূপ তাহা যুক্ত)—এই লিঙ্গশরীর। দশ

ইন্দ্রিয় এই মনেরই বিকার বা মনেরই পরিণাম। এজন্য উক্ত আটটির সহিত এই দশ ইন্দ্রিয়—সর্ব্বশুদ্ধ এই অষ্টাদশটি সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীরের অন্তর্গত লিঙ্গশরীরের উপাদান। পুরুষ পরাপ্রকৃতিযুক্ত হইয়া ইহাতেই অবস্থিত হয়। এই প্রকৃতিতে বা লিঙ্গশরীরে অধিষ্ঠিত পুরুষই জীব (monad)। এবং এই লিঙ্গশরীরই সংসার-দশায় জীবত্বের বীজ (neucleus)। ইহাই পরাপ্রকৃতি যোগে পিতামাতা হইতে দৈহিক উপাদান গ্রহণ করিয়া স্থূল-শরীর-যুক্ত হইয়া, জন্মগ্রহণ করে এবং এই শরীরের দ্বারা কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ভোগ করে; আর সেই কর্ম্মফলই সংস্কাররূপে লিঙ্গশরীরে উপ্ত হয়, ও প্রতি পুরুষের লিঙ্গশরীরকে অন্য পুরুষের লিঙ্গশরীর হইতে ভিন্ন করিয়া দেয়। এইরূপে স্থূলশরীরে কৃতকর্ম্ম হইতে সূক্ষ্মশরীর সংস্কারযুক্ত হইয়া বিশিষ্ট হয়, এবং সেই সংস্কারযুক্ত লিঙ্গশরীরই আবার সেই সংস্কারানুযায়ী স্থূলশরীর গ্রহণ করে। আবার সে স্থূলশরীর ত্যাগ করিয়া আবার সেই স্থূলশরীরের কর্ম্ম অনুসারে সংস্কার লইয়া লিঙ্গশরীর আরও বিবর্ত্তিত হয়, এবং তদনুসারে আবার নূতন শরীরগ্রহণ হয়। এইরূপে সংসারে পুনঃ পুনঃ নানা জাতীয় স্থূলশরীর গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু বরাবর সূক্ষ্মশরীর একই থাকে, কেবল তাহা বিভিন্ন জন্মের সংস্কার দ্বারা কিছু রূপান্তরিত—রঞ্জিত হয় এইমাত্র। ইহারই ফল এই প্রকৃতির বা লিঙ্গশরীরের আপূরণ অর্থাৎ লিঙ্গ-শরীর উপযুক্তরূপ নানা স্থূলশরীর ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করিয়া ক্রম-আপূরিত হইতে থাকে, এবং তাহার ফলে জাত্যন্তরপরিণাম হয় (পাতঞ্জল দর্শন)। এইরূপে তৃণ হইতে ক্রমে পক্ষী প্রভৃতির যোনি, ক্রমে জন্তু প্রভৃতির যোনি বা স্থূলশরীর গ্রহণ হয়, এবং যখন পশুযোনি লাভ করিয়া সূক্ষ্মশরীরের এরূপ সংস্কার উৎপন্ন হয়, যে তাহা মানবযোনি ব্যতীত উপযুক্তরূপে অঙ্কুরিত ও পরিণত হইতে না পারে, তবে ক্রমে

সেই লিঙ্গশরীর মানবশরীরই গ্রহণ করে। মানবজন্ম ও পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করিতে করিতে লিঙ্গশরীরের সংস্কাররাশি ক্রমে শুদ্ধ হইতে থাকে, ক্রমে উন্নত মানবযোনি-গ্রহণ হয়, শেষে এই সংস্কার-শোধিত হইয়া সূক্ষ্ম-শরীর বা চিত্ত নির্ম্মল হইলে, উচ্চতর ব্রাহ্মণাদির কুলে জন্মগ্রহণ হয়—এবং জ্ঞান লাভ হইলে মুক্তির পথ উন্মুক্ত হইয়া যায়।

অতএব এই পূর্ব্বোৎপন্ন অসক্ত নিয়ত নিত্য লিঙ্গশরীরই জ্ঞান, অজ্ঞান, ধর্ম্মাধর্ম্ম, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অনৈশ্বর্য্য এই অষ্টবিধ ভাবের দ্বারা 'অধিবাসিত' হইয়া সংসারে গতায়াত করে (সাংখ্যকারিকা, ৪০)। এই সকল ভাব বিনা লিঙ্গশরীর থাকিতে পারে না, আর লিঙ্গশরীর ব্যতীতও ভাবের নিবৃত্তি হয় না। এজন্য অর্থ দ্বিবিধ;—লিঙ্গাখ্য ও ভাবাখ্য (কারিকা ৫২)। এই সকল ভাব লিঙ্গশরীরেরই ধর্ম্ম। এই সকল ভাবের মধ্যে শেষ সাতটি বন্ধন কারণ; কেবল জ্ঞানই মুক্তির কারণ (কারিকা, ৬৩)।

সদসদ্ যোনিতে জন্ম—এ স্থলে যে সদসদ্ যোনিতে এইরূপ পুরুষের জন্মগ্রহণের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা এইরূপে বুঝিতে হইবে। সাংখ্য-দর্শন অনুসারে এই যোনি ত্রয়োদশ প্রকার। উর্দ্ধে সত্ত্ববিশাল লোকে দেবযোনি অষ্টবিধ। মধ্যে রজোবিশাল মনুষ্যলোকে মনুষ্যযোনি এক প্রকার, এবং তমোবিশাল অধোলোকে পশুপক্ষ্যাদির যোনি পঞ্চবিধ (সাংখ্যকারিকা, ৫৩, ৫৪)। সাংখ্যদর্শন অনুসারে প্রকৃত পক্ষে বা পারমার্থিক অর্থে এই লিঙ্গশরীরেরই সংসরণ বা উক্তরূপে সংসারে গতাগতি হয়। পরন্তু পুরুষের কোনরূপ গতাগতি নাই। তবে এই লিঙ্গশরীরস্থিত বলিয়া পুরুষের এই সংসরণ বোধ হয়। ইহা অজ্ঞানের ফল। নতুবা পুরুষ বদ্ধ হয় না, মুক্ত হয় না, সংসরণ করে না। নানা আশ্রয়যুক্ত প্রকৃতিই (লিঙ্গশরীরই) এইরূপে সংসরণ করে, বদ্ধ হয়, মুক্ত হয়। (সাংখ্য-কারিকা, ৬২)। এইরূপে চৈতন্যযুক্ত পুরুষ

প্রকৃতিস্থ হইয়া জরামরণাদিজনিত দুঃখ ভোগ করে। যে পর্য্যন্ত লিঙ্গশরীরের নিবৃত্তি না হয়, সেই পর্য্যন্ত বার বার জন্ম ও দুঃখভোগ স্বাভাবিক (কারিকা, ৫৫)।

সদসদ্‌ যোনিতে জন্মের কারণ যে কর্ম্ম ও কর্ম্মজ সংস্কার, তাহা উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। যথা,—তদ্‌ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাসো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিম্‌ আপদ্যেরন্‌ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়-যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা অন্য য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাসো হ যত্তে কপূয়াং যোনিম্‌ আপদ্যেরন্‌ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চাণ্ডালযোনিম্‌।' (ছান্দোগ্য উপঃ, ৫।১০।৭)।

কিরূপে মৃত্যু হয় ও কিরূপে বিভিন্ন যোনিতে জন্ম হয়, তাহা উপনিষদে দহর বিদ্যা ও পঞ্চাগ্নি বিদ্যার উপদেশস্থলে বিবৃত হইয়াছে। দহর বিদ্যা পূর্ব্বে অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। পঞ্চাগ্নি বিদ্যার উল্লেখও অনাবশ্যক। যাঁহারা ইহা জানিতে চাহেন, তাঁহারা ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম ব্রাহ্মণের চতুর্থ হইতে নবম খণ্ড দেখিবেন।

এইরূপে পুরুষের সহিত অপরা প্রকৃতির সংযোগ যতদিন থাকে, যতদিন পুরুষ এই অন্তঃকরণ বা চিত্ত ও পঞ্চতন্মাত্র বা সূক্ষ্মভূতরূপ অষ্টধা অপরা প্রকৃতি বা লিঙ্গশরীরযুক্ত থাকে, ততদিন এই প্রকৃতিজ গুণে যে কর্ম্ম হয়, এবং তদনুসারে যে ভোগ হয়, তাহা আপনাতে গ্রহণ করিয়া ভোক্তা হয়। যতদিন জ্ঞান না হয়, ততদিন এই ভোগে আসক্তি থাকে, তাহার গুণসঙ্গ থাকে, এবং তাহাই তাহার সদসৎ যোনিতে জন্মের প্রতি কারণ হয়। যখন জ্ঞানরূপ ভাব লিঙ্গশরীরে বুদ্ধিতত্ত্বে বিকাশিত হইয়া, সেই জ্ঞানের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া, পুরুষ আপনার স্বরূপ দেখিতে পায়, তখন আর এই ভোগে আসক্তি থাকে না; তখন আর গুণে সঙ্গ হয় না; পুরুষ আপনাকে

অকর্ত্তা, অভোক্তা, উদাসীনরূপে দেখিতে পায়। তখন পুরুষ প্রকৃতির স্বরূপ বুঝিতে পারে, তখন প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকভাব তাহার লাভ হয়। সেই জ্ঞান হইলে পুরুষ কর্ত্তৃক প্রকৃতি দৃষ্ট হইলে প্রকৃতি পুরুষকে ত্যাগ করে, আর প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ থাকে না (কারিকা ৬১)। এজন্য আর জন্মগ্রহণ হয় না,—মুক্তি হয়।

পাতঞ্জল দর্শন অনুসারে ক্লেশমূল কর্ম্মাশয় বা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মের সংস্কার, এবং তাহার বিপাকই বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ, আয়ু ও ভোগের মূল। "ক্লেশ-মূলঃ কর্ম্মাশয়ঃ ...... সতি মূলে জাত্যায়ুর্ভোগঃ।" (পাতঞ্জলদর্শন, ২।১২-১৩) ব্যাসভাষ্যে আছে—কর্ম্মাশয়—কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ-প্রসূত। ইহারাই বিভিন্ন যোনিতে জন্মের কারণ।

অতএব পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজ গুণ ভোগ করে, ও প্রকৃতিজ গুণে আসক্ত হয় এবং এই ভোগে আসক্তিহেতু, অর্থাৎ লিঙ্গশরীরের সহিত তাদাত্ম্যহেতু তাহার সদসদ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ হয়, এবং এইরূপে সংসারে বার বার গতায়াত করিতে হয়।

পুরুষের প্রকৃতিস্থ হইবার কারণ।—এই প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ কিরূপে হয়, পুরুষ কিরূপে প্রকৃতিস্থ হয়, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। সাংখ্যদর্শন অনুসারে পুরুষ নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব, অকর্ত্তা, অভোক্তা, উদাসীন এবং সর্ব্বরূপ প্রকৃতিধর্ম্মবিরহিত হইলেও, অনাদি-কাল হইতেই প্রকৃতিবদ্ধ। প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ অনাদিকাল হইতে স্বতঃসিদ্ধ। পুরুষ পরিণামে অজ্ঞানমুক্ত হইয়া জ্ঞানবলে প্রকৃতি হইতে বিমুক্ত হইয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার এ প্রকৃতি সহ সংযোগ অনাদি। যাহা অনাদি, তাহার আর কোন কারণ অনুসন্ধান নিরর্থক। এই প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগই জগতের মূল কারণ, ইহার অন্য কারণ নাই। এ সংসার অনাদি; কেন না, এ প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ অনাদি। অতএব পুরুষ প্রকৃতির সহিত অনাদিকাল হইতে বদ্ধ। সাংখ্য-

দর্শন অনুসারে এই প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ অন্ধপঙ্গুবৎ—পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিবার জন্য। পুরুষকে আপনার স্বরূপ দেখাইবার জন্য, পুরুষের ভোগ প্রদান জন্য এবং গুণ-আপূরণ দ্বারা তাহার অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স-সাধন জন্য প্রকৃতি প্রবর্ত্তিত হয় (কারিকা ২১)। প্রকৃতির এ কার্য্য স্বার্থের ন্যায় হইয়াও পরার্থ।

"ইত্যেব প্রকৃতিকৃতো মহদাদিবিশেষভূতপর্য্যন্তঃ।
প্রতিপুরুষবিমোক্ষায় স্বার্থ ইব পরার্থ আরম্ভঃ॥"

(কারিকা, ৫৬)।

প্রকৃতি লোকের ন্যায় উৎসুক হইয়া পুরুষের ভোগ-মোক্ষার্থই প্রধানতঃ প্রবর্ত্তিত হয় (কারিকা, ৫৭, ৫৮)। প্রকৃতি নানারূপ উপায়ে পুরুষের উপকার করে, নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও পুরুষের প্রয়োজন সাধন করে (কারিকা, ৬০)। ক্রমে পুরুষের নিকট নির্ম্মল জ্ঞান প্রকাশ করে। তখন পুরুষ জানিতে পারে যে, 'ন অস্মি, ন মে, ন অহং' (কারিকা, ৬৪)। তখন অভিমান দূর হয়, অষ্টভাবের মধ্যে সপ্তভাব নিবৃত্ত হয় (কারিকা, ৬৫), কেবল জ্ঞান হেতু মুক্তি হয়। অতএব প্রকৃতিই যেমন পুরুষের বন্ধনের কারণ, সেইরূপ পুরুষের মুক্তিরও কারণ। প্রকৃতি পুরুষকে মুক্ত করিবার জন্যই প্রবর্ত্তিত। যাহা হউক, এরূপে কদাচিৎ কোন পুরুষ মুক্ত হইতে পারে। কাজেই অনন্ত বদ্ধ পুরুষের মুক্তির জন্য সংসার অনন্তকাল থাকিবে, প্রকৃতি অনন্তকাল প্রবর্ত্তিত হইবে। "আত্মার্থ প্রকৃতি যে সৃষ্টি করে" (সাংখ্য সূত্র, ২।১১) তাহাতে প্রকৃতির স্বার্থ যে একেবারে নাই, তাহা বলা যায় না। তাহা হইলে প্রকৃতি পুরুষের অন্ধপঙ্গুবৎ সংযোগ নিরর্থক হয়। পুরুষের সন্নিধানে চৈতন্যযুক্ত হইয়া, প্রকৃতি পুরুষকে আপনার অঘটনঘটন-পটীয়সী শক্তি, তাহার কর্তৃত্বাদি অনন্তরূপে দেখাইতে চাহে। দ্রষ্টার দর্শনেই দৃষ্টের চরিতার্থতা। দ্রষ্টার দর্শনহেতু আনন্দ লাভ করাই

দৃষ্টের স্বার্থ। তাহার আর অন্য স্বার্থ থাকিতে পারে না। কিন্তু সাংখ্য-সূত্রে আছে যে, স্বভাবতঃ মুক্ত পুরুষ যে বদ্ধ হইয়াছে, তাহাকে মুক্ত করাই প্রকৃতির স্বার্থ (২।১)।

অতএব সাংখ্যদর্শন হইতে জানা যায় যে, পুরুষ অনাদি কাল হইতেই প্রকৃতিবদ্ধ, প্রকৃতিস্থ। যদি আদিতে পুরুষ মুক্ত থাকিয়া পরে প্রকৃতিবদ্ধ হইত, তবে মুক্তির সার্থকতা থাকিত না। মুক্ত হইয়াও আবার পুরুষ বদ্ধ হইতে পারিত। অতএব এই প্রকৃতি-পুরুষ-যোগ অনাদি। তাহার অন্য কারণ নাই।

"ন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য তদ্যোগং তদ্যোগাদৃতে।

(সাংখ্য সূত্র, ১।১৮)।

সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্ত এইরূপ। প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর অনাদি কাল হইতে সংযুক্ত থাকায়, পুরুষের প্রকৃতি হইতে নিজের পার্থক্য বোধ থাকে না। ইহাই অবিবেক। ইহাও সুতরাং অনাদি বিবেক-জ্ঞানের উদয় পর্য্যন্ত স্থায়ী। কিন্তু বেদান্তদর্শন অনুসারে, এবং গীতা অনুসারেও, প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ অজ্ঞান বা অবিদ্যাজনিত। এই জ্ঞান বা অজ্ঞান সাংখ্যোক্ত বুদ্ধিজ্ঞান বা অজ্ঞান নহে এবং ইহা বুদ্ধির ধর্ম্ম বা স্বরূপও নহে। এই চিত্তস্থ অজ্ঞান, পুরুষে প্রতিবিম্বিত হইয়া তাহাকে অজ্ঞানযুক্ত করে না। প্রকৃতিবদ্ধ হইয়া পুরুষ এই অজ্ঞানযুক্ত হইতে পারেন। কিন্তু তাহা পুরুষের প্রকৃতি সহযোগের কারণ হইতে পারে না। তাহা সে সংযোগের পরে উৎপন্ন। অতএব যে অজ্ঞান প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগের কারণ, তাহা অনাদি। নিত্য অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম মায়া হেতু বিকাশোন্মুখ অবস্থায় পরিচ্ছিন্ন হন, এবং পরিচ্ছিন্ন হইয়া জীব হন। মায়াশক্তি হেতু ব্রহ্মজ্ঞান, দ্বৈত হইয়া তাহার বিপরীত অজ্ঞানযুক্ত হন। (by law of contradiction)। অনন্তকে আমরা অনন্ত প্রকার সান্তের সমষ্টি ও তাহার অতীত রূপে ধারণা

করিতে পারি। নতুবা অনন্তের ধারণা হয় না।* অনন্ত ব্রহ্মজ্ঞান ও অনন্তরূপ সান্ত পরিচ্ছিন্ন অনন্তরূপে অজ্ঞানযুক্ত ভাবে এবং তাহার অতীত শুদ্ধরূপে ধারণা করিয়া, তবে ব্রহ্মজ্ঞান যে অনন্তস্বরূপ, তাহার ধারণা করিতে পারা যায়; এ জন্য ব্রহ্মজ্ঞান স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়াও পরিচ্ছিন্ন-জ্ঞান হইয়া বা অজ্ঞানযুক্ত হইয়া বহু জীব বা পুরুষরূপে বিবর্ত্তিত হন। এবং স্বীয় পরিচ্ছিন্ন স্বভাব মায়া বা প্রকৃতির অধীন হন। ইহাই পুরুষের প্রকৃতিস্থ হইবার কারণ। এ দুর্ব্বোধ্য তত্ত্ব এ স্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই।

পুরুষ অকর্ত্তা হইয়াও কর্ত্তা—এক্ষণে পুরুষ অকর্ত্তা হইয়াও কেন ভোক্তা হয়, এবং নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, এ সম্বন্ধে আর এক গুরুতর আপত্তি বলদেব উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া এই শ্লোকের ব্যাখ্যা শেষ করিব। বলদেব বলিয়াছেন যে, প্রকৃতিই যদি কর্ত্রী হন, তবে সেই জড় প্রকৃতিকে উদ্দেশ করিয়া স্বর্গাদি ফলপ্রদ জ্যোতিষ্টোমাদি ও মোক্ষপ্রদ ধ্যানাদি শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে। ইহা অসম্ভব। আমরা আরও বলিতে পারি যে, পুরুষ যখন অকর্ত্তা, তখন ভগবান্ যে অর্জ্জুনকে স্বধর্ম্ম যুদ্ধ কর্ত্তব্য বলিয়া বারংবার উপদেশ দিয়াছেন এবং কর্ম্মযোগের উপদেশ দিয়াছেন, সে সমুদায়ই নিরর্থক এবং পুরুষ অকর্ত্তা-স্বরূপ হইলে মোক্ষার্থীর পক্ষে সর্ব্ব-কর্ম্মসন্ন্যাসরূপ যোগই ত একমাত্র অবলম্বনীয়। অর্জ্জুন পূর্ব্বে ভগবান্‌কে বার বার প্রশ্ন করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে একবার বলিয়াছিলেন, যে কর্ম্ম হইতে যদি জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তবে আমায় এ ঘোর কর্ম্মে কেন নিযুক্ত করিতেছ?

---

* ইংরাজী দর্শনের ভাষায় বলা যায় যে, The Infinity is more than the summation or integration of infinite series of the finites. The Infinite cannot be conceived without relation to the finite.

কিন্তু অর্জ্জুন এক্ষণে বিশ্বরূপ দেখিবার পর স্তম্ভিত হইয়াছেন,—ভগবানের পরম রূপ দেখিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া গিয়াছেন। আর তাঁহার পক্ষে কোন প্রশ্ন করা সম্ভব বা সঙ্গত নহে। এজন্য এ স্থলে অর্জ্জুন কোন প্রশ্নই করেন নাই; এই ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে আর তিনি কোন প্রশ্নই করেন নাই। কিন্তু বলদেবের ন্যায়, আমাদের এ প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে, এবং ইহার মীমাংসাও প্রয়োজন হইতে পারে।

সাংখ্যদর্শন ইহার যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। পুরুষ প্রকৃত অকর্ত্তা হইলেও, যতদিন সে প্রকৃতিস্থ বা প্রকৃতিবদ্ধ থাকে, ততদিন, তাহার কর্ত্তৃত্ববোধ অবশ্যম্ভাবী। অহঙ্কার হইতে কর্ম্মে কর্ত্তৃত্ববোধ হয়। সেই অহঙ্কার—সেই 'আমি জ্ঞান' যতদিন না যায়, ততদিন পুরুষ সেই চিত্তের ধর্ম্ম অহঙ্কারকে অবশ্যই আরোপ করিবে। এই জন্য প্রকৃতি হইতে মুক্ত না হইলে, পুরুষ আপনার স্বরূপে অধিষ্ঠিত হইতে পারে না, তাহার কর্ত্তৃত্ব-বোধও যায় না। তাহার জ্ঞান হইলেও,—সে আপনাকে অকর্ত্তা বলিয়া জানিতে পারিলেও, ব্যবহারক্ষেত্রে তাহার সে জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন অজ্ঞানে আবরিত হইয়া যায়, সে আপনাকে কর্ত্তা বোধ করে। এই জন্য ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

"যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি॥
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥" (১৮।৫৯,৬০)

এই তত্ত্ব শ্রীশ্রীচণ্ডী হইতেও জানা যায়। যথা—

"তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়াপ্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণঃ॥

* * * *

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥"

(প্রথম মাহাত্ম্য, ৫৮।৫০ মন্ত্র)।

অতএব সংসার-স্থিতিকারী ভগবান্ সংসারস্থিতির জন্য তাঁহার মহামায়া দ্বারা জ্ঞানীকেও মায়ামোহে বদ্ধ করেন, ও বলপূর্ব্বক তাহাকে কর্তৃত্ব-ভার দিয়া তাহাকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করান। গীতা অনুসারে এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র উপায় ভগবানে অনন্যভক্তিবলে ভগবদনুগ্রহ লাভ। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

(গীতা, ৭।১৩,১৪)।

যখন মায়া হইতে বা প্রকৃতি-বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়, তখন অংশ পুরুষে কর্তৃত্ববোধ থাকে না। যতক্ষণ তাহা না হয় (আর মুক্তি কদাচিৎ কাহারও পক্ষে সম্ভব হইলেও হইতে পারে) এই কর্তৃত্বাভিমান দূর হয় না। এজন্য পুরুষ স্বরূপতঃ অকর্ত্তা হইলেও প্রকৃতিবদ্ধ অবস্থায় প্রকৃতির কর্ম্মে কর্তৃত্বের অভিমান পুরুষের অবশ্যম্ভাবী। আর এক অর্থে প্রকৃতির কর্ম্ম তাঁহারই কর্ম্ম। কেন না, প্রকৃতি পুরুষের ভোগ-মোক্ষার্থ যেরূপ কামনা বাসনা ইচ্ছা পুরুষের চিত্তে উদ্রেক করিয়া দেয়, তদনুসারে পুরুষে সেই ইচ্ছা প্রতিবিম্বিত হয় এবং সেই ইচ্ছার উদ্রেক মাত্র তদনুসারে প্রকৃতি কর্ম্ম করে বলিয়া, সে কর্ম্মে তাহার কর্তৃত্ব-বোধ অবশ্যম্ভাবী। ঈশ্বরই সংসার-স্থিতির জন্য সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান পূর্ব্বক মায়ায় অধিরূঢ় সর্ব্বজীবকে যন্ত্রের মত মায়াদ্বারা ভ্রমণ করান, তাহা ভগবান্ বলিয়াছেন (গীতা, ১৮।৬১)। ভগবান্ই পুরুষের অন্তরে কর্তৃত্ববোধ

উৎপাদ করান এবং সেই কর্তৃত্ব-বুদ্ধি অনুসারে প্রকৃতিকে তদনুরূপ কর্ম্মে নিয়োজিত করান। তিনিই অন্তর্যামী,—জীবের নিয়ন্তা। জীব এক অর্থে ভগবানের নিয়ন্তৃত্বে কর্ম্ম করে, এবং ভগবানের নিমিত্তমাত্র হয়। এই কর্ম্ম করিতে করিতে, অর্থাৎ তাহার যেরূপ ইচ্ছা বা বাসনা হয়,তদনুসারে প্রকৃতি কর্ম্ম করিয়াই জীবের ক্রমোন্নতি সাধন করে, তাহার অভ্যুদয় ও মুক্তির কারণ হয়। জ্ঞান অনেক সময় অবাধ্য হয়, পুরুষ আপনাকে অকর্ত্তা জানিয়া কর্ম্ম-সন্ন্যাস করিতে যায়, কিন্তু পারে না ; তাহার কর্ম্ম-সন্ন্যাস চেষ্টাও প্রকৃতি-গুণজ, সে চেষ্টা নিরর্থক হইয়া পড়ে। জ্ঞান হইলেই মুক্তি হয় না। তজ্জন্য পরে জ্ঞানবান্ ভগবান্‌কে প্রপন্ন হয়, তবে সে মায়াবন্ধন হতে মুক্ত হইতে পারে। অতএব অর্জ্জুনকে জ্ঞান উপদেশ দিলে এবং তাঁহাকে প্রকৃত অকর্তৃত্বস্বরূপ বুঝাইলেও অর্জ্জুন,সেই উপদেশ মত সহসা মুক্ত হইয়া 'অকর্ত্তা'-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারিবেন না, ইহা জানিয়াই ভগবান্ তাঁহাকে 'কর্ত্তা'-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া কর্ম্ম করিবার কৌশল বা কর্ম্মযোগ উপদেশ দিয়াছেন। সেই কৌশলে কর্ম্ম করিলে, কর্ম্মবন্ধন হয় না, এবং পরিণামে 'অকর্ত্তা'-স্বরূপে অধিষ্ঠান করিতে পারা যাইতে পারে ; এজন্য ভগবান্ অর্জ্জুনকে স্বধর্ম্মপালনের উপদেশ দিয়াছেন।

প্রকৃতিস্থ হইয়া পুরুষের যে কর্তৃত্বভাব হয়, এবং তদনুসারে যে কর্ম্ম হয়, তাহা দুইরূপ। এক প্রকৃতির বশে কর্ম্ম করা, আর এক প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া ত্রিগুণাতীত হইয়া কর্ম্ম করা। সিদ্ধগণ ত্রিগুণাতীত হইয়া প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া কর্ম্ম করেন। তাঁহারা কর্ম্মবদ্ধ হন না। ভগবান্ অকর্ত্তা হইয়াও জগৎরক্ষার্থ এইরূপে স্বপ্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া কর্ম্ম করেন, তাহা বুঝাইয়াছেন। অতএব অর্জ্জুনের জ্ঞান হইলেও এবং আপনাকে অকর্ত্তা জানিয়া সেই 'অকর্ত্তা'-স্বরূপে স্থিত হইলেও, তিনি এই ভগবানের দৃষ্টান্তে কিরূপে কর্ম্ম করিতে পারেন, ভগবান্ তাহারও

উপদেশ দিয়াছেন। অসক্ত অকর্ত্তা হইয়াও এরূপ কর্ত্তৃত্ব কিরূপে সম্ভব হয়, কিরূপে প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া কর্ম্ম করা যায়, মায়াকে বা প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে পারিলেই কিরূপে ঈশ্বরত্ব সিদ্ধ হয়, ভগবান্ তাহাও বলিয়াছেন। শ্রুতিতে আছে—

"স ঈশো যৎ বশেৎ মায়া, স জীবঃ যস্তয়ার্দ্দিতঃ।"

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্)

অতএব শ্রুতি ও গীতা অনুসারে প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া অপেক্ষা অন্ত এক উৎকৃষ্ট অবস্থা আছে। তাহা প্রকৃতিকে বশীভূত করা, প্রকৃতিকে নিজের করিয়া লইয়া নিয়মিত করা; ঈশ্বর অকর্ত্তা হইয়াও এইরূপে স্বপ্রকৃতি দ্বারা কর্ম্ম করেন।

এ অবস্থা ঈশ্বরের।—মানুষ সাধনাবলে, এবং ভগবদনুগ্রহে এই অবস্থা লাভ করিতে পারে। নিষ্কাম কর্ম্ম, লোকহিতার্থ কর্ম্ম, ঈশ্বরে অর্পণ বুদ্ধিতে কর্ম্ম, ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম—যাহা কিছু উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া তাহাকে স্ববশে আনিয়া তাহাকে নিয়মিত করিবার সাধনা সিদ্ধ হয়। রাজা যেমন স্বয়ং অকর্ত্তা ও অসঙ্গ হইয়াও কেবল অধিষ্ঠান দ্বারাই রাজর্ষি জনকের ন্যায় স্বজনকে বা স্বসৈন্যকে বশীভূত করিয়া নিয়মিত করিতে পারে, সেইরূপ প্রকৃতির উপর পুরুষ স্বীয় অধিকার বা স্বরাজ্য স্থাপন করিতে পারে। গীতায় প্রধানতঃ তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রকৃতির বশে থাকিয়া প্রকৃতির কর্ম্মে নিজ কর্ত্তৃত্বের অভিমান অজ্ঞান-মূলক; কিন্তু প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া, তাহার কর্ম্ম নিয়মিত করায় যে কর্ত্তৃত্ব, তাহা অজ্ঞান-মূলক নহে। সে অবস্থায় পুরুষ অকর্ত্তা হইয়াও প্রকৃত পক্ষে কর্ত্তা হয়। কিন্তু প্রকৃতি ঈশ্বরের; প্রকৃতির উপর সেই এক ঈশ্বরেরই কর্ত্তৃত্ব। পুরুষ সেই ঈশ্বরের সহিত মিলিত বা একীভূত না হইলে তাহার এ কর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয় না। তখন প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব আপনাতে আরোপ না করিয়া সে কর্ত্তা হয়।

কাম বা বাসনা যে কর্ম্মের মূল, যাহা রাগ-দ্বেষ-পরিচালিত, তাহার কর্ত্তৃত্ব প্রকৃতির। পরমেশ্বরের নিয়ন্তৃত্বে তাঁহার প্রকৃতিরই সে কর্ত্তৃত্ব। সে কর্ত্তৃত্ব কার্য্য, কারণ, নিয়ম বা নিমিত্তবদ্ধ। তাহা Law of Causation বা Necessityর অধীন। পুরুষ প্রকৃতি-বদ্ধ থাকিলে, তাহাতে যে কর্ত্তৃত্বের ছায়া পড়ে, তাহাতে পুরুষের স্ব-কর্ত্তৃত্ব আবরিত থাকে। পুরুষের এ অধীনতা দূর হইলে, তাহার কর্ত্তব্য জ্ঞান, I ought এই ঈশ্বরের বাণী তাহার বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হয়। সে বাণী অনুসরণ করিয়া স্বাধীনভাবে প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া সে লোকহিতার্থ—ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করে। তখন সে অকর্ত্তা হইয়াও কর্ত্তা হয়।

যাহা হউক, প্রকৃতি সংসর্গে পুরুষের দুই অবস্থা কল্পনা করা যায়। এক প্রকৃতির অধীন অবস্থা, আর এক স্বাধীন অবস্থা। এই স্বাধীন অবস্থাও এক অর্থে প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্ত অবস্থা; এ অবস্থায় প্রকৃতি কর্ম্ম করিয়া সেই কর্ম্মের অভিমান দ্বারা আর পুরুষকে অজ্ঞানবদ্ধ করিতে পারে না। তখন পুরুষ আপনি 'অকর্ত্তা'-স্বরূপে থাকিয়া ও প্রকৃতিকে নিয়মিত করিয়া কর্ম্ম করাইতে পারে। ইহাই তাহার কর্ত্তৃত্ব। কিন্তু এক আপত্তি হইতে পারে যে, এক প্রকৃতির যদি বহু স্বাধীন কর্ত্তা থাকে, তবে পরস্পরের বিরুদ্ধরূপ কর্ত্তৃত্বে জগতে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। জগতে শৃঙ্খলা নিয়ম দেখিয়া এককর্ত্তৃত্ব নিয়ন্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। অতএব পুরুষ প্রকৃতিস্থ থাকিয়াও যদি সেই একের সহিত একীভূত হইতে পারে, অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের I ought বাণী শুনিয়া কেবল কর্ম্ম করিতে পারে, তখন তাঁহার কর্ত্তৃত্বে কর্ম্ম ও ঈশ্বরকর্ত্তৃত্বে কর্ম্ম এক হইয়া যাইতে পারে। এরূপে জগতে একই অভিপ্রায়, একই কর্ত্তৃত্ব অবিভক্ত হইয়াও এই সব পুরুষে বিভক্তের ন্যায় কার্য্যকারী হয়।

মায়াবাদী পণ্ডিতগণ প্রকৃতি বা মায়ার উপরে, এ কর্ত্তৃত্ব এবং নিয়ন্তৃত্বও যে অজ্ঞানমূলক, তাহা বলিতে পারেন, এবং প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণরূপে

মুক্তিলাভই পরম নিঃশ্রেয়স, ইহা বলিতে পারেন; কিন্তু গীতার তাহা উপদেশ নহে; এবং উপনিষদেরও তাহা উপদেশ নহে, ইহা বলিতে পারা যায়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ অনুসারে ব্রহ্মের মায়াখ্য পরাশক্তি আছে এবং তাহাই প্রকৃতি, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই পরাশক্তি বিকাশ (manifestation) বা ক্রিয়া অবস্থার দুইরূপ—জ্ঞান-ক্রিয়া ও বলক্রিয়া। শক্তির এই বলক্রিয়ার উপর জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, পরিণতি ও লয় নির্ভর করে। ব্রহ্ম জ্ঞানক্রিয়া দ্বারা সেই বলক্রিয়াকে নিয়মিত করেন। এইরূপে সগুণভাবে ব্রহ্মের এই জ্ঞান দ্বারা ক্রিয়া-শক্তি-পরিচালনাতেই তাঁহার কর্ত্তৃত্ব। এইজন্য তিনি অকর্ত্তা হইয়াও জগৎকর্ত্তা। ব্রহ্মের এই সগুণভাব মায়াজন্য হইলেও তাহা মিথ্যা বা কল্পিত নহে, এবং এ কর্ত্তৃত্বও কল্পিত নহে।

আর এক দিক্ হইতে আমরা এ কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব। এ জগতে জ্ঞান, সত্তা ও সুখাদি অনুভূতির বিকাশ হইতে সেই জগৎকারণ ব্রহ্মকে অনন্ত সচ্চিদানন্দরূপে ধারণা করা হয়। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দঘন। তিনি সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী শক্তিবিশিষ্ট। এই জগদতীতরূপে ব্রহ্মের এ জ্ঞান, সত্তা বা শক্তি ও আনন্দ নির্ব্বিশেষ। জগতের কারণ রূপে জগতের সহিত সম্বন্ধ জন্য সেই জ্ঞান ক্রিয়াশক্তি ও আনন্দ বিকাশোন্মুখ হয়। বিকাশোন্মুখ অবস্থায় তাহারা পরস্পর বিপরীতভাবযুক্ত হয়। বিপরীত ভাবযুক্ত না হইলে বিকাশের সম্ভাবনা থাকে না, ইহ জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ সত্য। ইহাকে পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায় Principl of Contradiction বলে। আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এই নিমিত্ত, সৃষ্টির উন্মুখ অবস্থা যদি কল্পনা করা যায়, তবে তখন ব্রহ্ম জ্ঞান জ্ঞান-অজ্ঞান রূপ হয়, ব্রহ্মানন্দ আনন্দ-নিরানন্দরূপ হয়; ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে এতদনুসারে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার সৎস্বরূপও জগৎকারণরূপে সদসৎরূপ হয়, তাঁহার

পরাশক্তির বলক্রিয়া হেতু যে কর্তৃত্ব, তাহা কর্তৃত্ব-অকর্তৃত্বরূপ হয়। এইজন্য সগুণব্রহ্ম কর্তা হইয়াও অকর্তা অথবা অকর্তা হইয়াও কর্তা। পরমেশ্বররূপেও তিনি অকর্তা হইয়াও কর্তা। আর পুরুষরূপেও তিনি অকর্তা হইয়াও কর্তা। জীবাত্মা যদি ব্রহ্ম বা ব্রহ্মের স্বরূপ হয়, তবে অবশ্য বলিতে হইবে যে, জীবাত্মা স্বরূপতঃ অকর্তা হইয়াও স্বশক্তি হেতু কর্তা। তবে জীবের জ্ঞান যেমন পরিচ্ছিন্ন, অসারযুক্ত, সেইরূপ জীবের কর্তৃত্বও পরিচ্ছিন্ন। তাহা ভগবানের নিয়মিত প্রকৃতির কর্তৃত্ব দ্বারা আবরিত। এই আবরণ দূর হইলে তাঁহার স্বকর্তৃত্ব প্রকাশিত হয়। প্রকৃতিজ বুদ্ধিতে যে পুরুষ-সান্নিধ্যবশতঃ জ্ঞানের বিকাশ হয়, তাহার দ্বারা পুরুষের স্বীয় জ্ঞস্বরূপ যেমন আবরিত থাকে, সেইরূপ প্রকৃতির কর্তৃত্বে প্রকৃতি-বশীভূত জীবের স্বীয় স্বরূপ—তাহার কর্তৃস্বরূপও আবরিত থাকে। যে পুরুষ প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে পারে, তাহারই এই কর্তৃত্ব-অকর্তৃত্ব-স্বরূপ লাভ হয়। সে প্রকৃতিকে কেবল নিয়মিত করে বলিয়া কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম করে না। এই অর্থেই প্রধানতঃ গীতায় উক্ত হইয়াছে—

> "কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
> স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ" ॥ (৪।১৮)।

বুদ্ধি বা চিত্ত যখন নির্ম্মল হয়, তখন তাহাতে জ্ঞান প্রকাশিত হয়, তখন সেই নির্ম্মল চিত্তে আত্মস্বরূপ প্রতিবিম্বিত হয়, এবং সেই জন্য আত্মদর্শন হয়। আত্মার স্বরূপ—এই সচ্চিদানন্দ-ঘনরূপ এই স্বরূপে আত্মার 'জ্ঞ'-স্বভাব ও আনন্দ-ভোগ-স্বভাব—যেমন প্রকাশিত হয়, সেইরূপ স্বশক্তিও প্রকাশিত হয়। সেই শক্তি দ্বারাই জীবাত্মা স্বপ্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব নিয়ন্তৃত্ব করিতে পারে। ভগবান্ গীতাতে ইহাই উপদেশ দিয়াছেন। নির্ম্মলাত্মা ব্যক্তিকে তিনি অসঙ্গ নির্লিপ্ত ভাবে, অকর্তা-স্বরূপে অবস্থান করিয়াও জগৎ-চক্র-প্রবর্তন জন্য ঈশ্বরার্থে কর্ম্ম করিবার

উপদেশ দিয়াছেন। বলিয়াছি ত, সগুণ নির্গুণ উভয়রূপ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিই মুক্তির পরাকাষ্ঠা; কেবল নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপলাভ যে মুক্তি, তাহাই এক-মাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে। তাহাতে পূর্ণপরব্রহ্ম-স্বরূপত্ব লাভ হয় না। এ তত্ত্ব পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। নিগুণ ব্রহ্মরূপই অকর্ত্তা; সগুণরূপে ব্রহ্ম অকর্ত্তা হইয়াও কর্ত্তা। ব্রহ্মের পূর্ণস্বরূপ লাভ করিতে হইলে, পুরুষকে অকর্ত্তা হইয়াও এই ভাবে কর্ত্তা হইতে হইবে।

অতএব ভগবান্ অর্জ্জুনকে যেমন উপদেশ দিতেছেন পুরুষ অকর্ত্তা, তেমনই অন্যদিকে তাঁহাকে অনাসক্তভাবে, নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ দিতেছেন। ইহাতে কোন অসঙ্গতি নাই। প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজ গুণে আসক্তিই সমুদায় অনর্থের মূল। কর্ত্তা হইয়াও কর্ত্তৃত্বে আসক্তি হেতু আপনাকে কর্ত্তা বোধ করাতেই কর্ম্ম-বন্ধন হয়। এজন্য অর্জ্জুনকে এই কর্ত্তৃত্বভাব ও আসক্তি দূর করার জন্য ভগবান্ এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন। এই আসক্তিযুক্ত কর্ত্তৃত্বভাবরূপ অহঙ্কারের যে অভিব্যক্তিতে পুরুষ বদ্ধ হয়, তাহা ক্রমশঃ দূর করিবার জন্য শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্রে বিহিত কর্ম্মের উপদেশ আছে। তাহা নিরর্থক নহে।

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥ ২২

উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা ভর্ত্তা ভোক্তা আর
মহেশ্বর—তাঁহাকেই পরমাত্মা কয়,
এই দেহে হন তিনি পুরুষ পরম॥ ২২

২২। এই শ্লোকে সেই পুরুষের পুনর্ব্বার সাক্ষাৎভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। (শঙ্কর)। প্রকৃত মোক্ষ হেতু যে জ্ঞান, তাহাই এই শ্লোকে

সাক্ষাৎ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে (গিরি)। এই দেহাবস্থিত পুরুষের স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে (রামানুজ)। প্রকৃতি-বিবেক না হওয়া পর্য্যন্ত যে প্রকারে পুরুষের সংসারিত্ব সিদ্ধ হয়, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তাহা পুরুষের স্বরূপ নহে। পুরুষের যাহা স্বরূপ, তাহা এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে (স্বামী)। পূর্ব্বে সংসারী পুরুষের কথা উক্ত হইয়াছে। সেই সংসারিত্ব দূর করিবার জন্য পুরুষের যাহা প্রকৃত স্বরূপ, সেই তত্ত্ব সাক্ষাৎভাবে এস্থলে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (মধু)। পূর্ব্ব শ্লোকে দেহবদ্ধ ভোক্তা জীবের কথা উক্ত হইয়াছে। এই শ্লোকে তাহার নিয়ন্তা সেই দেহস্থ ঈশ্বরের তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে। এই দেহে জীব ব্যতীত অন্য যে পুরুষ আছেন, তিনি মহেশ্বর পরমাত্মা। তাঁহার তত্ত্ব এস্থলে উক্ত হইয়াছে (বলদেব)। এইরূপ প্রকৃতিস্থ হইয়া গুণসঙ্গ হেতু প্রকৃতির সংসার-দশা হয়, তাহা পূর্ব্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ; কিন্তু ইহা পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ নহে। পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা এই শ্লোকে বিবেচিত হইয়াছে (কেশব)।

উপদ্রষ্টা—যিনি সমীপস্থ হইয়া দ্রষ্টা হন, অথচ স্বয়ং অব্যাপৃত থাকেন, তিনি উপদ্রষ্টা। ইহার দৃষ্টান্ত—যেমন যজমান ও ঋত্বিক্ প্রভৃতি যে সময় যজ্ঞকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে, সে সময় অন্য যজ্ঞ-বিদ্যাকুশল (ব্রহ্মা) ব্যক্তি যেমন, তাহার পরিদর্শন করে, অথচ নিজে কোন কাজে লিপ্ত বা ব্যাপৃত হয় না, কেবল ঋত্বিক্ ও যজমানাদির কার্য্যে দোষ-গুণ পরিদর্শন করে মাত্র, সেইরূপ দেহ ও ইন্দ্রিয়ের যে সকল ব্যাপার হইতেছে, তাহার নিকটে থাকিয়া পুরুষ বা আত্মা তাহার দ্রষ্টা হয় মাত্র, কোন কার্য্যে স্বয়ং লিপ্ত হয় না। এই কারণে পুরুষ উপদ্রষ্টা। অথবা দেহ, চক্ষু প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ও আত্মা—সকলেই দ্রষ্টা ; ইহাদের মধ্যে দেহ বাহ্যদ্রষ্টা (by sensation of touch) তাহা অপেক্ষা চক্ষু অন্তর্দ্রষ্টা (by perception), মন বুদ্ধি তাহা অপেক্ষা অন্তর্দ্রষ্টা এ

সকল দ্রষ্টা হইতে আত্মাই প্রকৃত পক্ষে অন্তর্দ্রষ্টা ; কারণ, আত্মা (পুরুষ) সকলেরই প্রত্যক্ অর্থাৎ আত্মভাবে সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাতা হইয়া সমুদায় দর্শন করেন। এইজন্ম আত্মা উপদ্রষ্টা। অথবা যাহা অপেক্ষা অধিক ভাবে কেহই দেখিতে পায় না, সেই সর্ব্বাতিশয়ী আন্তর-দ্রষ্টাই উপদ্রষ্টা। অথবা যজ্ঞকর্ম্মের দর্শকের ন্যায় সকল বিষয়েই আত্মা দ্রষ্টা ; এজন্য আত্মা উপদ্রষ্টা (শঙ্কর)।

এস্থলে 'উপ' এই উপসর্গের অর্থ সামীপ্য। যিনি সমীপস্থ হইয়া দ্রষ্টা হন, তিনি উপদ্রষ্টা। সমীপে থাকিয়া নানাভাবে দ্রষ্টা হওয়া যায়। সন্নিধিমাত্রে স্বব্যাপার বিনা উপদ্রষ্টা হওয়া যায়। পুরুষ প্রত্যগাত্মা বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সন্নিহিত, অন্তরস্থ প্রত্যগাত্মরূপে তিনি সর্ব্বসাক্ষী। চিন্মাত্র-স্বভাব আত্মা সমুদায় গোচর করেন, এজন্য তিনি উপদ্রষ্টা (গিরি)।

এই দেহে অবস্থিত পুরুষ দেহ-প্রবৃত্তির অনুগুণ সংকল্পাদিরূপে দেহের উপদ্রষ্টা হয় (রামানুজ)। এই প্রকৃতিকার্য্য দেহে বর্ত্তমান থাকিয়াও পুরুষ প্রকৃতিজ দেহ হইতে ভিন্ন, প্রকৃতিজ দেহ গুণযুক্ত নহে ; তাহার কারণ এই যে, পুরুষ উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা ইত্যাদি। উপদ্রষ্টা—অর্থাৎ দেহ হইতে পৃথগ্‌ভূত হইয়াও দেহের সমীপে স্থিত হইয়া দ্রষ্টা বা সাক্ষী হয় (স্বামী)।

এই প্রকৃতি-পরিণামদেহে জীবরূপে বর্ত্তমান থাকিয়াও পুরুষ প্রকৃতির অতীত ; প্রকৃতিজগতের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট পরমার্থতঃ অসংসারী। তিনি স্বীয় রূপেই উপদ্রষ্টা। যেমন যজ্ঞ-বিদ্যাকুশল ব্রহ্মা যজ্ঞকর্ম্ম ব্যাপারে সমীপস্থ থাকিয়াও—স্বয়ং অব্যাপৃত হইয়া তাহাতে ব্যাপৃত ঋত্বিক্ যজমানাদির ব্যাপার পরিদর্শন ও দোষগুণ পর্য্যালোচনা করে, সেইরূপ কার্য্য-কারণ-ব্যাপারে বিচক্ষণ পুরুষ স্বয়ং সমীপস্থ হইয়াও অব্যাপৃত থাকিয়া তাহা দর্শন করেন। তিনি দ্রষ্টা হন মাত্র, কর্ত্তা হন না। এজন্য তিনি উপদ্রষ্টা। অথবা দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ইহাদের দ্রষ্টৃত্ব বাহ্য। তাহাদের

অপেক্ষা আত্মা প্রত্যগাত্মরূপে অব্যবহিত, অতি সমীপস্থ দ্রষ্টা। সন্নিহিত অথচ পৃথগ্‌ভাবে থাকিয়া যিনি দ্রষ্টা, তিনিই উপদ্রষ্টা (বলদেব)। শরীরেন্দ্রিয় ব্যাপারে সমীপস্থ থাকিয়া দ্রষ্টা (হনু)। সাক্ষী, যে দেহাদি সমুদায় ভগবানে নিবেদন করিয়া দিয়া, তদ্দত্ত প্রসাদরূপে সেবার্থ উপ-যোগী ভোগকর্ত্তা তাহার সাক্ষী অর্থাৎ তাহাকে মুখ্য সেবার উপযোগী করান। (বল্লভ)।

উপ=সমীপে, দেহের অবস্থার পরিণামাদিতে সাক্ষীর ন্যায় অবস্থিত (কেশব)।

অনুমন্তা—অনুমননকারী। অনুমনন অর্থে অনুমোদন অর্থাৎ লোকে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাদের সেই কার্য্যের উপর যে পরিতোষ, তাহাই অনুমনন। আত্মা এই প্রকার অনুমন্তা। অথবা দেহ ও ইন্দ্রিয় সমূহের ব্যাপার সম্বন্ধে স্বয়ং কোন প্রকারে ব্যাপৃত না থাকিলেও আত্মা নিজে যেন অনুকূল ভাবে ব্যাপৃত রহিয়াছে বলিয়া আপাততঃ প্রতীতি হয়, এজন্য আত্মাকে অনুমন্তা বলা যায়। অথবা নিজ নিজ ব্যাপারে প্রবৃত্ত দেহ ইন্দ্রিয় সকলকে কোন সময়ে নিবারণ করে না বলিয়া আত্মাকে অনুমন্তা বলা যায় (শঙ্কর)।

যাহারা স্বয়ং কর্ম্ম করিয়া ব্যাপারবান্ হয়, সেই দেহেন্দ্রিয়াদির ক্রিয়ার পার্শ্বস্থ হইয়া সর্ব্বরূপে অনুমোদন ও অনুমননকারী আত্মা এই সন্নিধি-মাত্রেই কর্ত্তা হয় বলিয়া অনুমন্তা (গিরি)।

দেহের অনুমন্তা (রামানুজ)। অনুমোদিতা। অর্থাৎ সন্নিধিমাত্রেই অনুগ্রাহক (স্বামী)। কার্য্যকারণ বৃত্তিতে স্বয়ং অপ্রবৃত্ত হইয়াও সন্নিধিহেতু তাহার অনুকূল বলিয়া প্রবৃত্তের ন্যায় বোধ হয়। এজন্য আত্মা অনুমন্তা। অথবা স্বব্যাপারে প্রবৃত্ত দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিকে যিনি তেমন নিবারণ করেন না, কেবল সাক্ষিরূপে থাকেন, সেই অন্য পুরুষ অনুমন্তা (মধু)। অনুমতিদাতা; ঈশ্বরের অনুমতি বিনা জীব কোন কার্য্য

করিতেই সমর্থ হয় না (বলদেব)। কার্য্য-করণ প্রবৃত্তিতে স্বয়ং অপ্রবৃত্ত থাকিয়াও প্রবৃত্তের ন্যায় তাহা অনুকূলরূপে প্রতীয়মান হয় বলিয়া আত্মা অনুমন্তা (হনু)। অনুমোদনকর্ত্তা, অর্থাৎ যে তাঁহাতে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ করে বা তাঁহার জন্য কর্ম্ম করে, তাহার অনু বা পশ্চাৎ মোদিত হন (বল্লভ)। দেহের ভাব প্রবৃত্তি প্রভৃতির অনুমোদক (কেশব)।

ভর্ত্তা—ভরণকর্ত্তা। যদিচ দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন ইহারা পরস্পর সংহত হইয়াও জড়, তাহা হইলেও ইহারা চৈতন্যময় আত্মার ব্যবহারিক ভোগ সিদ্ধ করিবার জন্য সেই চৈতন্যময় আত্মার চৈতন্যাভাসে উদ্ভাসিত হয়। সেই চৈতন্যাভাস দ্বারা প্রকাশ করিয়া আত্মা যে ইহাদের স্বরূপ অবধারণ করিয়া থাকে, সেই স্বরূপাবধারণই এখানে 'ভরণ' বলিয়া বুঝিতে হইবে। আত্মা এইরূপ ভরণকর্ত্তা বলিয়া ভর্ত্তা (শঙ্কর)।

পুরুষ দেহের ভর্ত্তা (রামানুজ)। ঈশ্বররূপে ভর্ত্তা, বিধায়ক (স্বামী)। সংহত দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি যাহা চৈতন্যের আভাসযুক্ত হয়, তাহাদের নিজ সত্তাস্ফুরণ দ্বারা ধারণকারী, ও পোষণকারী (মধু)। ধারক (বলদেব)। সংহত দেহ ইন্দ্রিয় মনোবুদ্ধিগণের যে আত্মচৈতন্যের আভাস হয়, সেই আভাসের কারণরূপে আত্মা ভর্ত্তা (হনু)। ধারক, পতিরূপে ধারক, পোষক (বল্লভ)। ধারক (কেশব)।

ভোক্তা—অগ্নির উষ্ণ স্বভাব যেমন সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে, সেই প্রকার চৈতন্যই আত্মার নিত্য স্বভাব। এই নিত্য চৈতন্যময়, স্বভাব বশতঃ আত্মার বুদ্ধির সুখ-দুঃখ-মোহ-স্বরূপ সর্ব্ববিষয়িণী বৃত্তিকে যেন নিজ চৈতন্যগ্রস্ত করাইয়া পৃথগ্‌ভাবে বিভক্তাকারে প্রকাশ করে। এই জন্য আত্মা ভোক্তা (শঙ্কর)। চিদবসান ভোগ, সেই ভোগ ক্রিয়া চিত্তে উপস্থিত হইলে, আত্মা তাহা গ্রহণ করিয়া ভোক্তা হয় (গিরি)।

দেহপ্রবৃত্তিজনিত সুখদুঃখের ভোক্তা এই পুরুষ (রামানুজ)। ভোক্তা অর্থাৎ পালক (স্বামী, বলদেব)। বুদ্ধির যে সুখ-দুঃখ-মোহা-

ত্মক প্রত্যয়, তাহার স্বরূপ চৈতন্য দ্বারাই প্রকাশিত হয়। আত্মা নির্ব্বিকার হইয়াও তাহা উপলব্ধি করে, এজন্য আত্মা ভোক্তা (বলদেব)। বুদ্ধির সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক প্রত্যয় সকল চৈতন্যস্বরূপ দ্বারা চৈতন্য-প্রত্যয়ের ন্যায় হয়। আত্মা এইরূপে বিভক্তবৎ প্রতীয়মান হইয়া ভোক্তা হয় (হনু)। রক্ষক, স্বীয়তত্ত্বজ্ঞানে যে রক্ষাকারী (বল্লভ)।

এই সম্বন্ধে পূর্ব্বে ১৪শ শ্লোকে 'গুণ-ভোক্তার' অর্থ দ্রষ্টব্য। জীবাত্মা যেমন বদ্ধভাবে ভোক্তা, সেইরূপ মুক্ত ব্রহ্মভাবে বা নির্গুণ ভাবেও ভোক্তা হইতে পারেন।

মহেশ্বর—আত্মাই মহেশ্বর। আত্মা সকলেরই আত্মা; এজন্য ইহা মহান্ এবং আত্মা স্বতন্ত্র, এজন্য আত্মা ঈশ্বর। আত্মা মহান্ এবং ঈশ্বর, এজন্য মহেশ্বর (শঙ্কর)। 'দেহের নিয়মন-ব্যাপারে দেহের ভরণ-কার্য্যে, দেহকে পোষণ-কার্য্যের দ্বারা দেহ ইন্দ্রিয় মনের পুরুষ সম্বন্ধে মহেশ্বর হন। পরে গীতায় পুরুষকে "উৎক্রামতি ঈশ্বরঃ" (১৫।৮) বলা হইয়াছে (রামানুজ)। মহান্ ও ঈশ্বর;—অর্থাৎ ব্রহ্মাদিরও পতি (স্বামী)। সর্ব্বাত্মা হেতু ও স্বতন্ত্র হেতু মহেশ্বর (মধু)। ব্রহ্মাদি সমুদায় কর্ত্তাগণের প্রভু ভগবান্দ্বারাই তাহাদের কর্ত্তৃত্ব (বল্লভ)। দেহযাত্রা-নির্ব্বাহক আর ইন্দ্রিয়গণের ঈশ্বর, দেহের ধারক ও পালক (কেশব)।

পরমাত্মা—আত্মার অবিদ্যা দ্বারা পরিকল্পিত দেহ হইতে বুদ্ধি পর্য্যন্ত সংঘাত অচেতন ও অনাত্ম হইলেও আত্মার চৈতন্য-শক্তি-প্রভাবে চৈতন্যযুক্ত হয় বলিয়া, তাহারা 'আত্মা' এই ভাবে ব্যবহার-গোচর হয়; সেই সকল বিশেষণ-বিশিষ্ট আত্মা এই দেহের মধ্যে দেহের সহিত বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার-গোচর হইলেও বাস্তবিক এই আত্মাই পরমাত্মা বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। এই দেহেই আত্মা পরমাত্মা (শঙ্কর)। এই দেহ ইন্দ্রিয় ও মন সম্বন্ধেই পুরুষকে পরমাত্মা বলা হইয়াছে। দেহ ও মনের প্রতি আত্মা শব্দ প্রযোজ্য হয়। আত্মা শব্দের এই অর্থ

গীতার "ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা" (গী। ১৩।২৪) শ্লোক হইতে পাওয়া যায়। মূলে 'ইতি চ' এই শব্দ দ্বারা পরমাত্মা ও মহেশ্বর উভয়ই পুরুষ সম্বন্ধে উক্ত হইয়া থাকে, ইহাই বুঝায় (রামানুজ)। পরমাত্মা, অর্থাৎ অন্তর্যামী (স্বামী)। অবিদ্যাহেতু দেহাদি বুদ্ধি পর্য্যন্ত কল্পিত। তাহা হইতে পরম বা উৎকৃষ্ট। পূর্ব্বোক্ত উপদ্রষ্টাদি বিশেষণ-বিশিষ্ট আত্মাই পরমাত্মা। পুরুষ পরমাত্মা বলিয়া কথিত (মধু)।

আত্মা = দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন, ইহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; অন্তরাত্মা জ্ঞানময় [illegible], এজন্য পরমাত্মা (কেশব)।

এই দেহে হন তিনি পুরুষ পরম—(দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ) এই দেহেই উক্ত বিশেষণ-বিশিষ্ট আত্মাই পরমাত্মা,এবং সেই আত্মা 'পর', অর্থাৎ [illegible] হইতে 'পর' বা বিলক্ষণ। পরে গী[illegible] উক্ত হইয়াছে, "উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।" (১৫।১৭)। এবং পূর্ব্বে ভগবান্ বলিয়াছেন,—'ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত'(১৩।২)। অতএব এই পুরুষই উত্তম পুরুষ। পূর্ব্বে উপক্রমে যাহা উক্ত হইয়াছে, পরে তাহাই এ স্থলে উপসংহাররূপে উক্ত হইয়াছে। (শঙ্কর)।

পূর্ব্বে 'অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম' ইত্যাদি দ্বারা যাহা উক্ত হইয়াছে, সেই পুরুষ পর। এই পুরুষ পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানশক্তি হইয়া প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছেন এবং গুণসঙ্গ হেতু সেই দেহমাত্রেই মহেশ্বর ও পরমাত্মা হইয়াছেন (রামানুজ)। এই দেহস্থ সেই পুরুষই উত্তম পুরুষ (মধু)। পূর্ব্বে সর্ব্বতঃ পাণিপাদ ইত্যাদি দ্বারা ঈশ্বর যে জীবের সহিত অবস্থিতি করেন, ইহা উক্ত হইয়াছে। এ স্থলে ইহাই পুনরুক্ত হইয়াছে (বলদেব)। পর অর্থাৎ অব্যক্ত হইতে পর (হনু)। এই প্রকৃতির কার্য্যে ভূতদেহে বর্ত্তমান থাকিয়াও পুরুষ দেহ হইতে ভিন্ন (কেশব)।

এই শ্লোকে পুরুষের অর্থ।—পূর্ব্বে তিন শ্লোকে যে পুরুষের

কথা উক্ত হইয়াছে, এই শ্লোকেও সেই পুরুষের কথা উক্ত হইল। পূর্ব্বের উক্ত কয় শ্লোকে যে প্রকৃতিবদ্ধ পুরুষের কথা উক্ত হইয়াছে, এ শ্লোকে সেই পুরুষের স্বরূপ উক্ত হইয়াছে, এই মাত্র বিশেষ। শঙ্কর ও তদনুবর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণ ইহা দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য সংস্থাপন করিয়াছেন। জীব ব্রহ্ম হইলেও প্রকৃতি বা অবিদ্যার সহিত তাদাত্ম্য অর্থাৎ তদ্ভাবাপন্ন হওয়ায় তাহার সেই সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীরের সহিত বিভিন্ন যোনিতে জন্ম ও সংসারভোগ হয়। এ শ্লোকে তাহার প্রকৃত ব্রহ্ম-স্বরূপ যাহা দেখান হইয়াছে, তাহা জানিলে তাহার মুক্তি হয়। রামানুজ জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিলেও প[illegible] [illegible] পরম পুরুষ হইতে তাহা[illegible] [illegible]ভেদ অঙ্গীকার করিয়াছেন। [illegible] [illegible]দেব স্বামী ও বল্লভের মতানুবর্ত্তী ব্যাখ্যাকার প্রভৃতি এই শ্লোকোক্ত পুরুষ যে পরম পুরুষ, এবং তাহা পূর্ব্বকয় শ্লোকোক্ত পুরুষ হইতে [illegible] [illegible] বুঝাইয়াছেন।

জীবব্রহ্মে ভেদ ও অভেদবাদ।—ভগবান্ এই অধ্যায়ের প্রথমেই বলিয়াছেন যে, এই অধ্যায়ে যে তত্ত্ব সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে, তাহা ঋষিগণ দ্বারা ছন্দে ও ব্রহ্ম সূত্র পদে বিস্তারিত ভাবে বিবৃত আছে। অতএব এই পুরুষতত্ত্ব আমরা উপনিষদ্ হইতে বুঝিতে চেষ্টা করিব। উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাই উপদিষ্ট হইয়াছে। উপনিষদ অনুসারে আত্মাই ব্রহ্ম। এজন্য উপনিষদে জীবতত্ত্ব স্বতন্ত্র উপদিষ্ট হয় নাই। প্রামাণ্য উপনিষদ্ হইতে শঙ্করাচার্য্য দেখাইয়াছেন যে, এই ব্রহ্ম দুই ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছেন—এক সগুণ ভাবে আর এক নির্গুণ ভাবে। শঙ্কর অবশ্য সগুণ ভাবকে মায়াময় বলিয়াছেন, এবং তাহা যে পারমার্থিক সত্য, তাহা স্বীকার করেন নাই। ঈশ্বর, জীব ও জগৎ—এই ব্রহ্মের সগুণ ভাব। এজন্য শঙ্কর মতে ব্রহ্মের জীব ভাব পারমার্থিক সত্য নহে। এইরূপে তিনি পারমার্থিক অর্থে জীবব্রহ্মের ঐক্য স্থাপন করিয়াছেন।

রামানুজ উপনিষদুপদিষ্ট ব্রহ্মকে সগুণভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন,

সেই ভাবকে পারমার্থিক সত্য বলিয়াছেন। তিনি নির্গুণ ভাব স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে ব্রহ্মের ঈশ্বর-জীব ও জগদ্ভাব নিত্য সত্য, —পারমার্থিক সত্য। ঈশ্বর চিৎ, জড় অচিৎ আর জীব চিদচিৎ অথবা জড়দেহ যুক্ত চিৎ। ঈশ্বর এক, কিন্তু এই চিদচিৎ জীব বহু। এজন্য রামানুজ জীবকে ব্রহ্ম বলেন, অথচ জীব ঈশ্বর হইতে নিত্য ভিন্ন, তাহাও প্রতিপন্ন করেন। রামানুজের মতই দ্বৈতবাদের মূল। যদি ঈশ্বর, জীব ও জড় জগৎ এই তিন তত্ত্ব নিত্য ও পারমার্থিক সত্য হয়, তবে আর এরূপ ব্রহ্ম স্বীকারের প্রয়োজন কি? ঈশ্বরই একমতে পরব্রহ্ম পরমপুরুষ। জীবগণ তাঁহার অংশ হইতে পারে, তাঁহার স্বরূপও কোন অংশে হইতে পারে, কিন্তু জীব ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ প্রভেদ অনাদি।

উপনিষদে জীবই ব্রহ্ম।—যাহা হউক, এই দ্বৈতমত উপনিষদের প্রতিপাদিত ব্রহ্মবাদের বিরোধী। উপনিষদ্ অনুসারে ব্রহ্ম একই। তিনিই আত্মা,—তিনিই পরমাত্মা,—তিনিই জীবাত্মা। তিনি সর্ব্বতঃ পাণিপাদ, তিনি সর্ব্ব-অন্তরে স্থিত। গীতায়ও এই মত প্রতিষ্ঠিত। নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম পরব্রহ্মের এ উভয় ভাবই গীতায় পারমার্থিক সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শঙ্করের অদ্বৈতবাদে অর্থাৎ ব্রহ্মের কেবল নির্গুণ স্বরূপবাদের যে দোষ, এবং রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে অর্থাৎ কেবল সগুণ ব্রহ্ম বা নিত্য ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এই তিন ভাবে স্থিত ব্রহ্মবাদের যে দোষ, গীতায় তাহা নাই। গীতা অনুসারে নির্গুণ ব্রহ্ম, পরমেশ্বর ও জীব স্বরূপতঃ এক হইয়াও ভিন্ন। ব্রহ্মের এ তিন ভাব অনাদি; কেন না, এ সংসারই অনাদি। ব্রহ্মের এ তিন ভাব পারমার্থিক সত্য; অথচ এ তিন ভাব এক,—অবিচ্ছিন্ন। সংসার-দশায় এ তিন ভাব এক হইয়াও ভিন্নের ন্যায় প্রতিভাত হয়। ব্রহ্ম বা পরমাত্মা এই তিন ভাবেই সর্ব্বগত—সর্ব্বব্যাপী।

প্রতিদেহস্থ পুরুষের তিন রূপ।—উক্ত কারণে প্রতিদেহে, জীবাত্মা, পরমেশ্বর ও অক্ষর নির্গুণ ব্রহ্ম নিত্য বর্ত্তমান। দেহরূপ পুরে অধিষ্ঠান হেতু ব্রহ্মই পুরুষ (বৃহদারণ্যক, ২।৫।১৮)। সেই পুরুষই সমুদায় (শ্বেতাশ্বতর, ৩।১৫) আর সেই পুরুষের দ্বারাই এই সমুদায় পূর্ণ, (শ্বেতাশ্বতর, ৩।৯)। জীবভাব গ্রহণ করিয়া, তিনি ক্ষর পুরুষ, অপরিচ্ছিন্ন অক্ষর নির্গুণ ব্রহ্মভাবে প্রতিদেহে কূটস্থরূপে তিনি অক্ষর পুরুষ, আর প্রতিদেহে অন্তর্যামী নিয়ন্তা পরমেশ্বর-ভাবে তিনি উত্তম পুরুষ। ক্ষর পুরুষ বা জীব-ভাব স্থায়ী নহে ; সে ভাব হইতে তাহার মুক্তি আছে, সে ভাবে ক্রম-পরিণতি আছে। এ জন্য তাহা ক্ষর। এই পুরুষের ক্ষর-ভাব দূর হইলে, তাহার অক্ষর পুরুষ-ভাব, অথবা ঈশ্বরভাব বা পরম পুরুষ-ভাব হইতে পারে। গীতায় পরে পুরুষের এই তিন ভাবের উপদেশ আছে (১৫।১৬,১৭)। পুরুষের যত দিন প্রকৃতি-বদ্ধভাব বা ভূতভাব থাকে, পুরুষকে ততদিন ক্ষর পুরুষ বলা যায়, ততদিন সে তাহার অন্তরস্থ অক্ষর পুরুষ বা পরম পুরুষ হইতে ভিন্ন। সেই ক্ষরভাব দূর হইলে, সেই অক্ষর বা পরম পুরুষ হইতে অভিন্ন হয়। এই শ্লোকে প্রকৃতিবদ্ধ ক্ষর পুরুষের এই পরম পুরুষরূপ উপদেশ দ্বারা, সর্ব্ব পুরুষের একত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে। সর্ব্বদেহে একই অক্ষর পুরুষ ও পরম পুরুষ অধিষ্ঠিত কোন দেহের সহিতই সে পুরুষ লিপ্ত নহে। এক আকাশ (অথবা Ether) যেমন প্রতিদেহে নির্লিপ্তভাবে থাকে এবং তদধিষ্ঠানে দেহ-কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, নির্গুণ অক্ষর ব্রহ্ম এবং পরমেশ্বর সেইরূপ নির্লিপ্তভাবে প্রতিদেহে অবস্থান করেন। অক্ষর ব্রহ্ম সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ; কিন্তু পরমেশ্বর নিয়ন্তা অন্তর্যামী হইয়াও নির্লিপ্ত। এই অধ্যায়-শেষে ২৭,২৮ ও ৩১শ শ্লোকে তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে। এই অক্ষর ও পরম পুরুষের সর্ব্বদেহমধ্যে যে নির্লিপ্তভাবে স্থিতি, তাহাই বিভক্তের ন্যায় হইয়া আংশিকরূপে যে লিপ্তভাবে প্রত্যেক দেহে জীব বা ক্ষর পুরুষ-ভাবে স্থিতি, ইহাই বুঝিতে হইবে।

বিম্ববাদ ও প্রতিবিম্ববাদ।—ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? উপনিষদে ইহার দুইরূপ উত্তর আছে। এক বিম্ববাদ আর এক প্রতিবিম্ববাদ। বৃহৎ ব্যাপক অগ্নির সন্নিহিত বস্তুতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়িয়া যেমন তাহাকে অগ্নিময় করে, সেইরূপ পরমপুরুষের অংশই প্রতিদেহে বদ্ধ হইয়া জীব হয়। ইহা বিম্ববাদ। অথবা কোন বিশেষ দেহ (লিঙ্গদেহ)-রূপ উপাধি সন্নিহিত ব্রহ্ম বা পরম পুরুষের প্রতিবিম্ব সেই দেহ গ্রহণ করিয়া সেই দেহই জীবরূপ পরা প্রকৃতি হয়, এবং তৎসন্নিহিত পরম পুরুষ সেই প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া ক্ষর পুরুষ বা সেই দেহবদ্ধ পুরুষ হন। ইহা প্রতিবিম্ববাদ। বিম্ববাদ সম্বন্ধে শ্রুতি এই—

"যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাৎ।
তথা ক্ষরাদ্বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি॥" (মুণ্ডক ২।১।১)।

আরও আছে—

"যথোর্ণনাভিঃ সৃজ্যতে গৃহ্যতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥" (মুণ্ডক ১।১।৭)

উপনিষদে প্রতিবিম্ববাদের স্পষ্ট উল্লেখ নাই। কিন্তু শঙ্কর এই প্রতিবিম্ববাদই গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রতিবিম্ববাদ প্রধানতঃ সাংখ্য-দর্শনের। প্রকৃতিবদ্ধ পুরুষে তৎসন্নিহিত প্রকৃতির যেরূপ ছায়া পড়ে, পুরুষ সেইরূপে রঞ্জিত হয় এবং এইরূপে স্বপ্রকৃতির সহিত তাহার তাদাত্ম্য হয়। শঙ্করাচার্য্য ও সাংখ্যপণ্ডিতগণ এই প্রতিবিম্ববাদ ভিন্নরূপে বুঝাইয়াছেন। শঙ্করের মতে, যেমন বিভিন্ন প্রকার মলিনতাযুক্ত বিভিন্ন দর্পণে বা মলিন ও আবিল জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব ম্লান দেখি, অথবা যদি

আমরা তাহাতে নিজের মুখ দেখিতে যাই, তবে তাহা যেমন মলিন ও বিকৃত দেখায়, মুখের স্বরূপ কি, তাহা দেখিতে পাই না—সেইরূপ বিভিন্নরূপ মলিনতাযুক্ত চিত্তরূপ উপাধিতে আত্মা আপনার স্বরূপ দেখিতে পায় না—আপনাকে মলিন বোধ করে। সাংখ্যমতে সে প্রতিবিম্ব চুম্বকের (মণির) সান্নিধ্যে লৌহের চুম্বকশক্তির প্রতিবিম্ব (বা Induction) যেরূপ, সেইরূপ। অথবা আধুনিক বিজ্ঞানমতে চুম্বক তাড়িত-শক্তির প্রতিবিম্বের (induction এর) মত। পুরুষ-সান্নিধ্যে জড় অন্তঃকরণে পুরুষের চৈতন্যাদি প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া, চিত্ত বা অন্তঃকরণ চৈতন্যযুক্ত হয়। পুরুষ সেই প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া, তাহাই তাহার স্বরূপ মনে করে। ইহাই পুরুষের প্রকৃতিবদ্ধ অবস্থা। যাহা হউক, আলোক-প্রতিবিম্ব বা চুম্বকাদির প্রতিবিম্ব অলীক নহে; আলোক-চিত্রে ও লৌহের চুম্বকক্রিয়ায় তাহা বুঝা যায়। এ প্রতিবিম্বে বিম্ব থাকে। চিত্ত এইরূপে পুরুষের প্রতিবিম্বে চৈতন্যাদি-যুক্ত হইয়া জীব (পরা প্রকৃতি) হয়। পুরুষ সেই প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া, আপনাকে জীব বোধ করে। চিত্তের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব জ্ঞাতৃত্বই আপনার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব জ্ঞাতৃত্ব মনে করে, এবং এইরূপে পরিচ্ছিন্ন হয়। প্রকৃতি-সংযোগ দূর হইলে, পুরুষে আর সে প্রতিবিম্ব পড়ে না। তখন পুরুষ স্বরূপে অবস্থান করে—মুক্ত হয়। অতএব সাংখ্যমতে ও শঙ্কর-ব্যাখ্যাত বেদান্তমতে এইরূপ প্রতিবিম্ববাদই সঙ্গত; কেবল বিম্ববাদের স্থান নাই। বেদান্তের ব্রহ্মবাদে বিম্ববাদ ও প্রতিবিম্ববাদ উভয়কে সামঞ্জস্য করিয়া গ্রহণ করাই সঙ্গত। গীতায় এ উভয়বাদের সামঞ্জস্য আছে। গীতায়—

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" (১৫।৭)

এই শ্লোকে যেমন বিম্ববাদ গৃহীত হইয়াছে বলিয়া আপাততঃ বোধ হয়, সেইরূপ—

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।" (১০।২০)

এই শ্লোকে এবং প্রতিজীবে স্ব-ভাব বা 'আমি' ভাব (self consciousness) ব্রহ্মেরই অধ্যাত্মভাব (৮।৩) উপদিষ্ট হওয়ায় প্রতিবিম্ব-বাদই গৃহীত হইয়াছে বলা যায়। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর পূর্ণ। তাঁহার অংশ পারমার্থিক সত্য নহে। তাঁহার কলা নাই—তিনি নিষ্কল। "ব্রহ্ম নিষ্কলং" (শ্বেতাশ্বতর, ৬।১৯, মুণ্ডক, ২।২।৯)। অতএব তাঁহার অংশ-কল্পনা কেবল উপদেশ জন্য ও বোধসৌকর্য্য জন্য।

ব্রহ্ম কিরূপে জীব হন—উপনিষদ্ অনুসারে সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্ম বহু হইব, কল্পনা বা ঈক্ষণ করিয়া বহুর সৃষ্টি করিয়া বা নামরূপে ব্যাকৃত করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সে অনুপ্রবেশ দ্বারা তাঁহার অংশ বিভক্ত হয় না, তিনি পূর্ণরূপেই সর্ব্বক্ষেত্রে অনুপ্রবিষ্ট হন। এজন্য প্রতি দেহে যে ব্রহ্ম পুরুষরূপে অধিষ্ঠিত হন, সে তাঁহার পূর্ণ অবিভক্তরূপ। তথাপি তাঁহাকে অপূর্ণ বিভক্তরূপে প্রতীয়মান হয়। পূর্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপে সৎ-অসৎ চিৎ-অচিৎ ও আনন্দ-নিরানন্দ-রূপ অনন্ত ভাবের বিকাশে বহুধা বিভক্তের ন্যায় হন। দেহস্থ হইয়া অন্তঃকরণে প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়াই তিনি জীবরূপ হন। এই প্রতিবিম্বেই তাঁহাকে বিভক্তের ন্যায় দেখায়—তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন বোধ হয়। প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়াই পুরুষরূপে ব্রহ্ম প্রকৃতিবদ্ধ হন। কিন্তু এই প্রতিবিম্বের অন্তরালে তিনি স্বরূপেই অবস্থান করেন। সাগরবক্ষে ভাসমান ফেন, তরঙ্গ, হিমগিরির ন্যায় অক্ষয় বা পরম পুরুষের মধ্যে জীব ভাসমান থাকে, ইহা উপমাচ্ছলে উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মই অনন্ত জীবরূপ হন। তিনিই অনন্তরূপ দেহ স্থাপনা করিয়া ও স্বীয় মায়াশক্তিদ্বারা সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, নিজ প্রতিবিম্ব প্রতি অন্তঃকরণকে দিয়া তাহাকে চৈতন্যযুক্ত ও জ্ঞাতা ভোক্তা কর্ত্তা ভাবযুক্ত করিয়া, অর্থাৎ তাহার জীবভাব বিকাশ করিয়া দিয়া এবং সেই ভাবের প্রতিবিম্ব পুনঃ গ্রহণ করিয়া, অনন্ত

প্রকারে জ্ঞান অজ্ঞান আনন্দ নিরানন্দ ও সদসৎ ভাবে সেই অনন্ত সত্তা জ্ঞান আনন্দঘনসাগরে প্রকাশিত হন। এক এক দেহে অর্থাৎ চিত্তে ইহার কোন একরূপ ভাবের বিকাশ হয়। সে প্রতিবিম্ব ক্ষয়, সে পরিচ্ছিন্ন ভাব ক্ষয় ও বিনাশ-শীল। এজন্য সেই ভাবে ব্রহ্মই ক্ষর পুরুষ। তিনিই জীব।

এইরূপে এ স্থলে গীতায় প্রকৃতিস্থ হইয়া চিত্তের প্রতিবিম্ব গ্রহীতা ভোক্তা ভাবে স্থিত পুরুষের যে স্বরূপ পরমাত্মা পরমপুরুষ, তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, শ্রুতি অনুসারে প্রতিদেহে সেই এক পুরুষই ভোক্তা জীবাত্মা-রূপে ও কেবল দ্রষ্টা পরমাত্মরূপে এবং তাহার অন্তর্যামী নিয়ন্তা পরমেশ্বররূপে অবস্থান করেন। এই বিভিন্ন ভাব হেতু সেই একই পুরুষকে তিনভাবে গ্রহণ করা যায়। আত্মা-স্বরূপে তিনি দুই ভাবে প্রতীয়মান হন। এক জীবাত্মা ভাবে, আর এক পরমাত্মা ভাবে। শ্রুতিতে আছে—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥"

(ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।২১ ; মুণ্ডক উপঃ ৩।১।১)

এই ঋক্ মন্ত্রে এই অর্থে একই দেহে ভোক্তা জীবাত্মা ও দ্রষ্টা পরমাত্মার কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

সাংখ্যের বহু পুরুষবাদ অগ্রাহ্য।—অতএব যদি কেবল এই অংশবাদ বা বিম্ববাদ পারমার্থিকভাবে গ্রাহ্য না হয়, যদি এই অংশ-ভাব কেবল এক অবিভক্তের বিভক্তের ন্যায় আপাত-প্রতীয়মান ভাব মাত্র হয়, তবে সাংখ্যের বহু পুরুষবাদ স্থান পায় না। এই শ্লোক হইতে বুঝা যায়, যে গীতায় সাংখ্যের 'পুরুষবাদ' গৃহীত হইলেও, বহু পুরুষবাদ গৃহীত হয় নাই। সাংখ্যের বহু পুরুষবাদ যে গীতায় গৃহীত হয় নাই, তাহা পূর্ব্বে ১৯শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। এ স্থলে এই বহু পুরুষবাদ কেন গ্রাহ্য নহে, তাহা আরও বিশদ করিয়া বুঝিতে হইবে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সাংখ্যদর্শন দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকজ্ঞান মাত্র উপদেশ দিয়াছে। পুরুষ হইতে যে প্রকৃতি ভিন্ন, তাহা প্রতিপন্ন করিয়াই সাংখ্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। তাহাতে বহু পুরুষবাদ নিরর্থক। সম্ভবতঃ ইহা যে ঋষি কপিলের পরে কোন সাংখ্যপণ্ডিতের দ্বারা প্রবর্ত্তিত, এ কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই বহু পুরুষবাদ যে পারমার্থিক সত্য নহে, তাহা গীতায় দেখান হইয়াছে। পুরুষ যে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, তাহাই সাংখ্যদর্শনের সার উপদেশ। তাহাই সাংখ্যদর্শন হইতে জানিতে হইবে। পুরুষ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রকৃতির ধর্ম্ম পুরুষে নাই, এই "নেতি নেতি" বা নিষেধ মুখে কেবল পুরুষের স্বরূপ সাংখ্যদর্শনে ইঙ্গিত করা আছে। পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়। তাহা উপনিষদে উপদিষ্ট হইয়াছে। তাহা সাংখ্যদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় নহে। তাহা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োজনও সাংখ্য-দর্শনের নাই এবং তাহা সিদ্ধান্ত করিবার চেষ্টাও সাংখ্যদর্শনে করা হয় নাই। তাহা হইতেই পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ জানিতে হইবে।

যুক্তি অনুসারে যে সাংখ্যের পুরুষবাদ গ্রাহ্য নহে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কারিকায় আছে,—জন্ম মরণ করণ সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ নিয়ম হেতু, অযুগপৎ প্রবৃত্তি হেতু এবং ত্রিগুণের বিপর্য্যয় হেতু পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হয় (কারিকা)। কিন্তু ইহাই পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ করিবার যথেষ্ট কারণ নহে। এক পুরুষবাদেও ইহার ব্যাখ্যা হয়। বেদান্তে ও শাঙ্কর ভাষ্যে তাহা বুঝান আছে। সাংখ্যকারিকায় উক্ত হইয়াছে, কার্য্যকারণের বিভাগ ও বিশ্বরূপের অবিভাগ হইতে এক প্রকৃতির অনুমান করিতে হয়। এ জগৎ অনন্ত বৈচিত্র্যময় অথচ ইহা শৃঙ্খলাবদ্ধ এক অবিভক্ত (Organised whole)। এই বিভাগ অবিভাগ, এই একত্ব বহুত্ব বুঝিবার জন্য মূলে দুই তত্ত্ব সাংখ্যশাস্ত্রে কল্পিত। এই দুই তত্ত্ব পুরুষ ও

প্রকৃতি। এই বিভাগ ও অবিভাগের কারণ বুঝিবার জন্য সাংখ্যশাস্ত্র প্রকৃতিকে এক এবং পুরুষকে 'বহু' কল্পনা করিয়াছেন। আর এই এক প্রকৃতিও যে ত্রিগুণাত্মিকা অথবা বহু সত্ব, বহু রজঃ ও বহু তমোগুণের মিলিত সাম্যাবস্থা, তাহাও কল্পনা করিয়াছেন। ইহাতে কল্পনা-বাহুল্য হইয়াছে। কল্পনালাঘব দ্বারা যদি ইহা বুঝিতে পারা যায়, যদি ইহা নির্ণীত (explained) হয়, তবে সেই কল্পনা (theory)ই গ্রাহ্য। ইহা জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ ধারণা। এক ব্রহ্ম অর্থাৎ অনন্ত পরাশক্তিময় বা অনন্ত জ্ঞান ও ক্রিয়া-শক্তিময় ব্রহ্ম কল্পনা করিলেই এ জগতের একত্ব ও অনন্ত বৈচিত্র্য বুঝিতে পারা যায়। এজন্য ইহার নিমিত্ত কোনরূপ কল্পনা-বাহুল্যের পরিবর্ত্তে এই বেদান্তসম্মত কল্পনাই (theory) যুক্তিতে গ্রাহ্য। যাহা হউক, এ স্থলে এ সকল কঠিন দুর্ব্বোধ্য দার্শনিকতত্ত্বের আলোচনার প্রয়োজন নাই।

পুরুষের বদ্ধাবস্থা।—অতএব যে পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিকে অর্থাৎ অষ্টধা ভিন্ন অপরা প্রকৃতিকে বা লিঙ্গ-শরীরকে আত্মস্বরূপকে গ্রহণ করিয়া প্রকৃতিবদ্ধ হইয়া প্রকৃতিজ গুণ ভোগ করে এবং গুণসঙ্গহেতু বিবিধ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া সংসার ভোগ করে, সে পুরুষ এক, সে পুরুষ স্বরূপতঃ পরমাত্মা মহেশ্বর পরম পুরুষ। বদ্ধ অবস্থায় পুরুষ, আপনার এই স্বরূপ জানিতে পারে না। ইহাই অজ্ঞান। এই অজ্ঞান-বদ্ধ অবস্থায়, এই পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিভাবাপন্ন অবস্থায় পুরুষ পরমাত্মা মহেশ্বর বা পরম পুরুষ বা অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম নহে। জ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে, সর্ব্বরূপ পরিচ্ছিন্নতা দূর করিতে না পারিলে, সে তাহার স্বরূপ অবস্থা জানিতে পারে না—সে অবস্থা লাভ করিতে পারে না। দেহস্থ ও দেহবদ্ধ পুরুষের সে তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় পরবর্ত্তী শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। বদ্ধ পুরুষ দেহে তাদাত্ম্যহেতু সে যে দেহের অতীত আত্মা, তাহা বুঝিতে পারে না।

পুরুষ দেহে 'পর'—পুরুষ যে প্রকৃতির অতীত এবং প্রকৃতিজ ইন্দ্রিয়, মন অহঙ্কার, বুদ্ধি. জীবভাব সকলেরই অতীত, তাহা শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতিতে আছে—

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসশ্চ পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥
মহতঃ পরমব্যক্তম্ অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥

(কঠ-উপঃ ৩।১১।১১)

অন্যত্র আছে—

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্ ॥
অব্যক্তাৎ তু পরঃ পুরুষঃ ব্যাপকোঽলিঙ্গ এবচ ॥

(কঠ-উপঃ ৬।৭-৮)।

কঠোপনিষদের এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, সত্ত্ব বা বুদ্ধির অতীত মহানাত্মা, মূলপ্রকৃতি বা অব্যক্ত তাহার অতীত, আর পুরুষ সে অব্যক্তের অতীত—তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ। এই মহানাত্মাই জীব—তাহাই 'পরা' প্রকৃতি (গীতা, ৭।৪)। তাহা বুদ্ধিতত্ত্বে প্রতিবিম্বিত আত্মা বা চৈতন্য। তাহা অপরা-প্রকৃতি-সংসৃষ্ট। তাহাকে ক্ষর পুরুষ বলা যায় না। ক্ষর পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যে প্রভেদ তাহা পরে, ১৫।১৬ শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইবে।

পুরুষ সর্ব্বভূতে পরমাত্মা স্বরূপ।—এই যে পুরুষ, ইনি আত্মা। তিনি এক সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে স্থিত পরমাত্মা।—শ্রুতিতে আছে—

"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ় আত্মা প্রকাশতে।"

(কঠ, ৩।১২)।

তাঁহাকে জানিলে আর শোক মোহ থাকে না, ইহা শ্রুতি বলিয়াছেন, যথা,—"অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষবস্থিতম্।

মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥"

(কঠ, ২।২২)।

এই আত্মাই সমুদায়।

"ইমানি ভূতানি ইদং সর্ব্বং যৎ অয়ম্ আত্মা।"

(বৃহদারণ্যক ২।৪।৬)।

"অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ ইতি অনুশাসনম্।"

(বৃহদারণ্যক, ২।৫।১৯)।

এই শ্রুতি অনুসারে এই সর্ব্বানুভবকরী আত্মাই ব্রহ্ম। তিনিই পুরুষ।

মূল উপনিষদে পরমাত্মা স্বতন্ত্র ভাবে উক্ত হন নাই। সর্ব্বত্র আত্মারই উল্লেখ আছে। কেবল বৃহদারণ্যকে এক স্থানে আছে "নমঃ পরমাত্মনে" (৩।১।১)।

পরমাত্মা-রূপে পুরুষ মহেশ্বর।—এই পরমাত্মাই সকলের শাস্তা, সকলের নিয়ন্তা। শ্রুতিতে আছে—

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ।

ভয়াৎ ইন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥"

পরমাত্মা-রূপে পুরুষই মহেশ্বর। ক্ষর পুরুষভাবে তিনি মহেশ্বর নহেন। দেহস্থ দেহবদ্ধ 'পরাপ্রকৃতি' জীবভাবে তিনি মহেশ্বর নহেন। নিজ শরীরে বদ্ধ পুরুষরূপেও তিনি মহেশ্বর নহেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। পরমাত্মা পরমেশ্বরকেই শ্রুতিতে মহেশ্বর বলা হইয়াছে। সগুণ ব্রহ্মই মহেশ্বর। জীবাত্মাকে কোথাও মহেশ্বর বলা হয় নাই। এই ব্রহ্মই 'ঈশ, ঈশান ঈশ্বর, মহেশ্বর'। শ্রুতিতে আছে—

"এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষ সর্ব্বান্তর্যামী।" (মাণ্ডূক্য, ৬)।

সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্য ঈশানঃ সর্ব্বস্য অধিপতিঃ।...

'এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতপাল এষ ভূতপতিঃ এষ সেতুর্বিধারণে।'

সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং মহৎ॥' (শ্বেতাশ্বতর, ৩।১৭)।

'তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্।' (শ্বেতাশ্বতর, ৬।৭)।

'স এষ সর্ব্বস্য ঈশানঃ সর্ব্বস্য অধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ।' (বৃহদারণ্যক, ৫।৬।১)।

অতএব মহেশ্বর এই সগুণ ব্রহ্ম—এই পরমেশ্বর। গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে (১৩।২৭; ১৮।৬১) যে, এই ঈশ্বর বা পরমেশ্বরই সর্ব্বভূত-হৃদয়ে বাস করেন।

হৃদয়স্থিত পরমেশ্বররূপেই তিনি সকলকে নিয়মিত করেন, তিনি সকলের মহেশ্বর হন। শ্রুতিতে আছে—

'এষ হ্যেবৈনং সাধু কর্ম্ম কারয়তি, তং যম্ এভ্যো লোকেভ্য উন্নীয়তে।' (কৌষিতকী উপঃ ৩।৮)। অথচ তাঁহার নিয়ন্তৃত্বে জীবের যে কর্ম্ম হয়, তাহাতে তিনি অসংস্পৃষ্ট থাকেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ নো এব অসাধুনা কনীয়ান্।"

(বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২২; কৌষিতকী ৩।৮)।

এই ব্রহ্মই যে জীবজগৎরূপে বিবর্ত্তিত, ব্রহ্মই যে জীবাত্মা বা পুরুষ, তাহা শ্রুতিতে বারবার উক্ত হইয়াছে। শ্রুতিতে আছে—

"স বা অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ চক্ষুর্ময়ঃ শ্রোত্রময়ঃ পৃথিবীময়ঃ আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়স্তেজোময়ো-ঽতেজোময়ঃ কামময়োঽকামময়ঃ ক্রোধময়োঽক্রোধময়ঃ ধর্ম্মময়োঽধর্ম্মময়ঃ সর্ব্বময়স্তদ্ যদেতদিদম্ময়োঽদোময় ইতি, যথাকর্ম্মা যথাচারী তথা ভবতি, সাধুকারী সাধুর্ভবতি, পাপকারী পাপো ভবতি, পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন। অথ খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি। স

যথাকামো ভবতি তৎ ক্রতুর্ভবতি যৎ ক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে, যৎ কর্ম্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে।”

(বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৪।৪ ৫)।

গীতার এই শ্লোকের অর্থ। অতএব সেই এক ব্রহ্মই বদ্ধপুরুষ হয়েন, তিনি অক্ষর পুরুষ এবং তিনি পরমপুরুষরূপে প্রতিদেহে অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনিই বুদ্ধি ও অহঙ্কারাদিযুক্ত অন্তঃকরণ, তিনি চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়রূপে সর্ব্বতঃ পাণিপাদ হইয়া বিবর্ত্তিত; তিনিই আকাশাদি স্থূলভূত,—তিনিই সমুদায়। এ সমুদয়ই ব্রহ্ম। তিনি প্রতি দেহ সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, বদ্ধের ন্যায় হন, তিনিই অকাম হইয়াও কামযুক্ত হন, অকর্ত্তা হইয়াও কর্ত্তা হন, পাপ বা পুণ্য-কর্ম্ম আচরণ করিয়া অসাধু বা সাধু হন। তিনিই জীবরূপে বদ্ধ হন। তিনিই আপনাকে সে বদ্ধ-ভাব হইতে মুক্ত করেন। তিনিই এ সমুদায়।

অতএব এ স্থলে এই গীতোক্ত পুরুষের স্বরূপ কি, এবং সাংখ্যোক্ত পুরুষ হইতে তাঁহার প্রভেদ কি, তাহা ব্রহ্মসূত্রপদে বা বর্ত্তমান প্রচলিত উপনিষদ হইতে বুঝিতে পারা যায়। এতদনুসারে এই শ্লোকের সঙ্কলিত অর্থ এইরূপ :—

যিনি উপদ্রষ্টা অর্থাৎ জীবের অন্তরতম প্রদেশে দ্রষ্টৃ-স্বরূপে—আত্ম-স্বরূপে অবস্থান করেন, চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিলে যে দ্রষ্টা-স্বরূপে অবস্থান করা যায় (পাতঞ্জল যোগসূত্র, ১।৩) সেই দ্রষ্টৃ-স্বরূপ যিনি,—যিনি অনুমন্তা অর্থাৎ জীব-হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া তাহার কামকর্ম্ম নিয়মিত ও অনুমোদন করেন এবং যিনি জীবভাবের ভর্ত্তা বা ভরণকর্ত্তা ও অন্তর্যামিরূপে মায়াদ্বারা সর্ব্বভূতকে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় চালন করেন,—যিনি ভোক্তা অর্থাৎ জীব-হৃদয়ে নিয়ন্তৃরূপে অবস্থান করিয়া, তাহাকে কর্ম্মে প্রণোদিত করিয়া নির্লিপ্তভাবে সুখ দুঃখ দ্বন্দ্বাতীত আনন্দস্বরূপ

হইতে অপ্রচ্যুত ভাবে সেই কর্ম্মের ভোক্তা হন,—যিনি মহেশ্বর অর্থাৎ সর্ব্বজীবে ও সর্ব্বজগতে সর্ব্বত্র অধিষ্ঠিত থাকিয়া সকলের নিয়ন্তা ও শাস্তা হন, যিনি পরমাত্মা, অর্থাৎ সর্ব্বভূতে অন্তর্য্যামী আত্মারূপে থাকিয়া তাহাদের আত্মভাবের (self এর) বিকাশ করেন,—যিনি প্রতিদেহে বিভক্তের ন্যায় অবস্থিত হইয়াও দেহ হইতে ভিন্ন 'পর' রূপে বা পরম-পুরুষ-ভাবে অবস্থান করেন,—তিনিই পুরুষ। ইহাই পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ। সমগ্র গীতা-শাস্ত্র ও তাহার সমন্বয় হইতে এই অর্থই নিষ্কাশিত হয়।

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥২৩

যে জানে পুরুষে আর সর্ব্বগুণ সহ
প্রকৃতিকে এইরূপে, থাকি বর্ত্তমান
সর্ব্বরূপে, পুনঃ আর না লভে জনম ॥২৩

২৩। যে জানে পুরুষে…প্রকৃতিকে এইরূপে—এইরূপে এ স্থলে আমার স্বরূপ যে প্রকার উক্ত হইয়াছে, সেই লক্ষণযুক্ত আত্মাকে যিনি উক্ত প্রকারে জানিয়াছেন, অর্থাৎ সাক্ষাৎ আমিই সেই পুরুষ, এইরূপ জানিয়াছেন এবং উক্ত লক্ষণ প্রকৃতি বা অবিদ্যাকে যিনি উক্তরূপে গুণ বা স্ববিকার সহ জানিয়াছেন, অর্থাৎ এই প্রকৃতির বাস্তবিক কোন সত্তা নাই, বিদ্যাই ইহার বিনাশ করিয়া থাকে, যিনি এইরূপ জানিয়াছেন। (শঙ্কর)।

উক্ত-স্বভাব পুরুষকে এবং উক্ত-স্বভাব প্রকৃতিকে আর পরে (১৪শ অধ্যায় হইতে) বক্ষ্যমাণ স্বভাবযুক্ত ও সত্ত্বাদি গুণ সহ এই প্রকৃতিকে যিনি যথাবৎ বিবেকদ্বারা জানিয়াছেন। (রামানুজ)। এস্থলে

প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞানীর স্তুতি করা হইয়াছে। এই উপদ্রষ্টাদিরূপে পুরুষকে যিনি জানেন, এবং সুখ-দুঃখাদি পরিণাম সহিত প্রকৃতিকে জানেন (স্বামী)। এইরূপে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যিনি গুণের সহিত প্রকৃতিকে ও পুরুষকে ভগবানের রূপ বলিয়া জানেন (বল্লভ)।

ক্ষেত্রজ্ঞ যৎস্বভাব ও যৎপ্রভাব, তাহা (পুরুষ স্বরূপ উপকরণ) উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে ১২শ শ্লোকে 'যাহা জানিয়া অমরত্ব লাভ করিবে' বলা হইয়াছে, তাহারই উপসংহার করা হইতেছে। উক্ত প্রকারে সেই পুরুষকে জানিয়া, অর্থাৎ এই পুরুষ যে আমি, ইহা সাক্ষাৎকার করিয়া এবং অবিদ্যারূপ প্রকৃতিকে স্ববিকার সহ জানিয়া অর্থাৎ তাহা যে মিথ্যা, আত্মবিদ্যা দ্বারা বাধিত হয়, ইহা জানিয়া এবং এইরূপে যাঁহার অজ্ঞান ও তৎকার্য্য নিবৃত্ত হইয়াছে। (মধু)।

এ স্থলে জ্ঞানফল উক্ত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ভগবান্ বুঝাইয়াছেন যে, পুরুষ মহেশ্বর এবং প্রকৃতিই জীব, তাহা যিনি জানিয়াছেন, (বলদেব)। এস্থলে পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক-জ্ঞানীর স্তুতি করা হইতেছে। উপদ্রষ্টাদি স্বভাব পুরুষকে এবং গুণসহ অর্থাৎ সুখদুঃখাদি পরিণামস্বভাব প্রকৃতিকে যিনি জানেন (কেশব)।

এ স্থলে ব্যাখ্যাকারগণ পুরুষ ও গুণসহ প্রকৃতিকে যেরূপে বুঝাইয়াছেন, তাহা যে গীতোক্ত পুরুষ প্রকৃতিতত্ত্বের সহিত ঠিক সঙ্গত হয় নাই, তাহা পূর্ব্ব কয় শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতে বুঝা যাইবে। পুরুষের স্বরূপ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর বটেন, পুরুষ জীব নহেন, পুরুষ বহু নহেন—এক, এ কথা সঙ্গত। কিন্তু প্রকৃতি অবিদ্যা নহে, প্রকৃতি জীবও নহে। পরা প্রকৃতি জীব হইলেও এ স্থলে যে প্রকৃতিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা জীব নহে। তাহা অপরা প্রকৃতি। পুরুষ-প্রকৃতি-জ্ঞান অর্থে পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক-জ্ঞান। তাহা অবশ্য অপরোক্ষ জ্ঞান। কেবল শ্রবণ মাত্রেই তাহা লাভ করা যায় না। মনন দ্বারাও লাভ করা যায় না। নিদিধ্যাসন

দ্বারা তাহা লাভ করা যায়। কিরূপে তাহা লাভ করা যাইতে পারে, তাহা এই অধ্যায়েই পরে বিবৃত হইয়াছে। ক্ষেত্রজ্ঞ-ক্ষেত্র-জ্ঞান, এই পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক-জ্ঞানের অন্তর্গত।

থাকি বর্ত্তমান সর্ব্বরূপে—(সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি)—সর্ব্বপ্রকারে বর্ত্তমান থাকিলেও (শঙ্কর)। বিহিত নিষিদ্ধ যে কোন ভাবে (গিরি)। দেব-মনুষ্যাদি-দেহে অতিমাত্র ক্লিষ্টভাবে বর্ত্তমান থাকিয়াও (রামানুজ)। বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া বর্ত্তমান থাকিলেও (স্বামী)। প্রারব্ধ কর্ম্মবশে ইন্দ্রের ন্যায় বিধি অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান থাকিলেও (মধু)। সর্ব্বথা অর্থাৎ ব্যবহার সম্পর্কে বর্ত্তমান থাকিলেও (বলদেব)। সেইরূপ আচরণকারী যিনি হন (বল্লভ)। তিনি দেব-মনুষ্যাদি যে কোন দেহে এবং সুখী বা দুঃখী যে কোন অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিয়াও (কেশব)।

'সর্ব্বথা' শব্দের অর্থ সর্ব্বপ্রকারে অথবা যে কোন প্রকারে বা যে কোন ভাবে। বর্ত্তমান শব্দ 'বৃৎ' ধাতুজ। 'বৃৎ' ধাতুর অর্থ 'প্রবৃত্ত' হওয়া, এজন্য বর্ত্তমান শব্দে 'কর্ম্মে প্রবৃত্তি' বুঝায়। যে গুণ ও ক্রিয়া দ্বারা কোন দ্রব্যের উপস্থিত অস্তিত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, সেই কর্ম্ম ও গুণ দ্বারা সে দ্রব্যকে 'বর্ত্তমান' বলা যায়; অতএব এ স্থলে বর্ত্তমান অর্থে কর্ম্মে প্রবৃত্ত অবস্থাই বুঝায়। ব্যাখ্যাকারগণ তাহাই বুঝিয়াছেন। যাহা হউক, বর্ত্তমান অর্থে যে কোন অবস্থায় অবস্থানও বুঝাইতে পারে। তদনুসারে অর্থ এই যে—যিনি এই তত্ত্বজ্ঞানী, তিনি কর্ম্মযোগে, কর্ম্মসন্ন্যাসযোগে, জ্ঞানযোগে, ধ্যানযোগে বা ভক্তিযোগে, যে কোনরূপ যোগে ব্যাপৃত থাকেন। যাহা হউক, এ স্থলে যে কোনরূপ কর্ম্মে ব্যাপৃত অর্থ অধিক সঙ্গত। কেন না, যিনি জ্ঞানী, তাঁহার জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ, কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ বা ভক্তিযোগ সাধনের প্রয়োজন থাকে না। তাঁহারা এইরূপ কোন এক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তবে জ্ঞানী হইয়াছেন। জ্ঞানী হইলেও কর্ম্মানু-

ষ্ঠান হইতে পারে। অতএব এই শেষ অর্থই সঙ্গত। সর্ব্বথা অর্থে হিত-অহিত, বিহিত-অবিহিত, লোকের মঙ্গলকর-অমঙ্গলকর সুকৃত-দুষ্কৃত কর্ম্ম সমুদায়ই বুঝায় না। ভগবান্ কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান জন্য যে সকল বিভিন্নরূপ কর্ম্মের কথা বলিয়াছেন, কেবল তাহাই বুঝায়। কেবল সেই কর্ম্মই কাম-সংকল্প-বিহীন, রাগ-দ্বেষ-মলাহীন হইতে পারে এবং কেবল তাহাই আর পুনর্জন্মের কারণ হয় না। একথা পরে উল্লিখিত হইবে।

আর না লভে জনম (ন স ভূয়োঽভিজায়তে)—তিনি এই স্থূলশরীর বিনাশের পর অন্য দেহ গ্রহণ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন না। তাঁহার আর স্থূলদেহ[illegible] হয় না, দেহান্তর-গ্রহণও হয় না। সর্ব্বপ্রকারে বর্ত্তমান থাকিলেও যখন তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না, তখন 'স্ববৃত্তস্থ' বা স্বধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত থাকিলে যে আর জন্ম হইবে না, সে সম্বন্ধে কথাই নাই। ইহাই এই শ্লোক 'অপি' শব্দের তাৎপর্য্য (শঙ্কর)। তাঁহার পুনর্ব্বার আর প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ হয় না, তিনি আর প্রকৃতি-সংবদ্ধ হন না। সেই দেহাবসানে তিনি 'অপহতপাপ্মা' ও অপরিচ্ছিন্ন লক্ষণ আত্মাকে প্রাপ্ত হন (রামানুজ)। সে মুক্ত হয় (স্বামী বলদেব)। বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যানাশ হেতু, আর সেই অবস্থা কার্য্যের (দেহ গ্রহণের) সম্ভাবনা না থাকায় এই বিদ্বৎ শরীর ধ্বংসের পর আর দেহ-গ্রহণ হয় না। তিনি বিহিত অবিহিত কোনরূপ কর্ম্ম করিলেও আর যখন তাঁহার পুনর্জ্জন্ম লাভ হয় না, তখন বিধি অতিক্রম না করিয়া স্ববৃত্তস্থ থাকিলে যে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিবেন না, তাহা নিশ্চয়। 'অপি' শব্দের ইহাই অর্থ (মধু)। আর প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ হয় না (কেশব)।

কর্ম্ম ও কর্ম্মবীজ নাশ।—এ স্থলে যে উক্ত হইয়াছে, আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না, তাহার অর্থ বুঝিতে হইবে। পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক-জ্ঞান হইলে, সেই জ্ঞান দ্বারা সমুদায় কর্ম্মবীজ বিধ্বস্ত হইয়া যায়। কর্ম্মই জন্মের কারণ। সেই কর্ম্মবীজ নষ্ট হইলে আর কর্ম্মজন্য জন্মগ্রহণ

হইতে পারে না। বীজ নষ্ট হইলে আর অঙ্কুর হয় না। শঙ্করাচার্য্য বলেন যে, এ স্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, যদি এই জ্ঞানলাভ করিলেই মুক্তি হয়, আর জন্মগ্রহণ করিতে না হয়, তাহা হইলে কর্ম্মফল-ভোগের যে নিয়ম অপরিহার্য্য, তাহার ব্যাঘাত হয়। যদি এই জন্মে এই জ্ঞান-লাভ হেতু আর জন্ম না হয়, তাহা হইলে, জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে এই জন্মে কৃত কর্ম্ম, জ্ঞানোৎপত্তির পরে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইবে, এবং অসংখ্য পূর্ব্ব জন্মের অনুষ্ঠিত যে সকল কর্ম্মসংস্কার সঞ্চিত আছে, তাহারা নিজ নিজ ফলভোগ না করিয়াই একেবারে বিধ্বস্ত হইবে। ইহা যুক্তি-যুক্ত নহে। বিশেষতঃ তাহাতে ফলের জন্য কর্ম্ম করিবার যে উপদেশ আছে, তাহা নিরর্থক হয়। অতএব জ্ঞানোৎপত্তির পর সেই তিনরূপ কর্ম্মফলক্ষয়ের জন্য তিনটি, অন্ততঃ একটি জন্মেরও প্রয়োজন স্বীকার করিতে হয়। শঙ্করাচার্য্য এই আপত্তির আশঙ্কা করিয়া ইহার উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলেন, জ্ঞানোৎপত্তি হইলেই যে সমুদায় কর্ম্মক্ষয় হইয়া যায়, তাহা শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্রেই উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা—

"ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।"

"ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।"

"তস্য তাবদেব চিরমিষীকাতুলবৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি প্রদূয়ন্তে।"

এরূপ বহু শ্রুতি আছে। অতএব শাস্ত্র অনুসারে জ্ঞানীর সর্ব্বকর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায়। গীতাতেও উক্ত হইয়াছে—

"যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥" (৪।৩৭)

যুক্তিতেও ইহাই সিদ্ধ হয়। অবিদ্যা কাম ক্লেশ বীজ নিমিত্তই কর্ম্ম-ফলারম্ভক হয়। ইহার অন্য আরম্ভক নাই। শাস্ত্রে আছে—

"বীজান্যগ্ন্যুপদগ্ধানি ন রোহন্তি যথা পুনঃ।
জ্ঞানদগ্ধৈ তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সম্পদ্যতে তথা॥"

ইহাতেও এক আপত্তি হইতে পারে যে, জ্ঞানোৎপত্তির পরে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সমুদায় দগ্ধ হয়, বটে, কিন্তু জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে কৃত কর্ম্মবীজ কিরূপে জ্ঞান দ্বারা দগ্ধ হইবে? কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম দগ্ধ হয়, ইহাই উপদেশ দিয়াছেন। সর্ব্ব শব্দের অর্থ-সংকোচ করা যুক্তিযুক্ত নহে। প্রারব্ধ কর্ম্ম, ফল প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া, তাহা নষ্ট না হইতে পারে, কিন্তু যে সব সঞ্চিত কর্ম্ম ফলোন্মুখ হয় নাই, যা ফল দিতে আরম্ভ করে নাই, তাহারা অবশ্যই জ্ঞান দ্বারা নষ্ট হয় আর ফলোন্মুখ হইতে পারে না। ধনুক হইতে যে বাণ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহাকে সংবরণ করা যায় না বটে, কিন্তু যে বাণ প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, তাহা সংবরণ করা যাইতে পারে। সেইরূপ প্রারব্ধ কর্ম্ম অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত কর্ম্মমধ্যে যেগুলির বীজ কার্য্যোন্মুখ হইয়া এই জন্মের কারণ হইয়াছে—এই জাতি, আয়ু ও ভোগের কারণ হইয়াছে, সে কর্ম্ম সেই লব্ধ বেগ হেতু যাবজ্জীবন ফল দান করিবে বটে, কিন্তু যে সঞ্চিত কর্ম্ম ফল দিতে আরম্ভ করে নাই, তাহাদের বীজই জ্ঞানের দ্বারা দগ্ধ হইয়া নিষ্ফল হয়।

যদি জ্ঞানোৎপত্তি মাত্র প্রারব্ধ কর্ম্মও বিধ্বস্ত হইত, তবে তৎক্ষণাৎ এ শরীরও বিধ্বস্ত হইত; কিন্তু তাহা হয় না। পূর্ব্বসঞ্চিত সংস্কার-বেগ দ্বারা (চক্রবৎ) শরীর ধৃত হয়। এ জন্য প্রারব্ধ কর্ম্ম জ্ঞানদ্বারা নষ্ট হয় না, ইহা স্বীকার করিতে হয়। অতএব এই জ্ঞান-স্থিতি হইলে পূর্ব্বসঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম্ম দগ্ধ হইয়া যায় বলিয়া আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। জ্ঞান অগ্নিস্বরূপ; তাহা সমুদায় কর্ম্মবীজকে দগ্ধ করে বলিয়া তাহার অঙ্কুরোৎপাদনশক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়।

এই জ্ঞান দ্বারা কিরূপে কর্ম্মবীজ বিধ্বস্ত হয়? যাহা হউক, যিনি পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক-জ্ঞানী, তিনি কর্ম্মাচরণ করিয়াও কিরূপে আর জন্ম ও সংসারের অধীন হন না, তাহা এ স্থলে বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত।

জ্ঞান কি, তাহা পূর্ব্বে (এই অধ্যায়ের ৮-১০ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে। তত্ত্ব-জ্ঞানার্থ-দর্শন সেই জ্ঞানের এক রূপ। বলিয়াছি ত, এই তত্ত্ব-জ্ঞান প্রকৃতি-পুরুষ-জ্ঞান। এই জ্ঞান হইতেই গীতা অনুসারে সমগ্র ব্রহ্মতত্ত্ব, অর্থাৎ ঈশ্বরতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, জগত্তত্ত্ব, ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ-তত্ত্ব, এবং এই জগদতীত নিগুর্ণ ব্রহ্মতত্ত্ব,—সমুদায়ই জানিতে পারা যায়।

বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে রজস্তমোমলাহীন শুদ্ধ সাত্ত্বিক ও সম্পূর্ণ নির্ম্মল না হইলে, এই জ্ঞান তাহাতে প্রতিভাত হয় না, এবং বুদ্ধি এই জ্ঞানের স্বরূপ হইতে পারে না। এই জ্ঞানস্বরূপ নির্ম্মল বুদ্ধি-দর্পণেই দেহস্থ পুরুষ আপনার স্বরূপ দর্শন করিতে পারেন। ইহাই গীতার উপদেশ। চিত্তে কোনরূপ মলিনতা থাকিলে, চিত্তদর্পণ সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও নির্ম্মল না হইলে, পুরুষ তাহাতে আপনার স্বরূপ স্পষ্ট দেখিতে পায় না।

কামই কর্ম্মবীজ।—চিত্তের সকল মলিনতার মূল কাম বা কামনা। 'কাম' এই সংসারের মূল— এ জগতের মূল। বলিয়াছি, ব্রহ্ম বহু হইবার কামনা করিয়াই সৃষ্টি করেন। এই জন্য শ্রুতিতে আছে—"কামময় এবায়ং সর্ব্বম্" ... কামের ইংরাজী প্রতিশব্দ 'Will', জর্ম্মান পণ্ডিত সপেনহর তাহাকেই জগৎ-কারণ এবং জগৎ এই কামেরই অভিব্যক্তি, তাহা বুঝাইয়াছেন। তিনি যে উপনিষদ হইতেই এ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এই কাম যেমন জগতের মূল, তেমনি ইহাই এক অর্থে পুরুষ-প্রকৃতি-সংযোগের মূল। এই সংযোগের মূল কারণ যে অজ্ঞান, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। সেই অজ্ঞানের মূল এই 'কাম' বা কামনা। ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত; পূর্ব্বে ২০শ ও ২১শ শ্লোকে পুরুষের ভোক্তৃত্ব ও অকর্তৃত্বের ব্যাখ্যাস্থলে এই কামতত্ত্ব বিশেষরূপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

অতএব বলা যায় যে,—(সপেনহর-কৃত "World as Will and

Id... ... ... হেতু পুরুষের প্রকৃতি-সংযোগ হয় এবং পুরুষকে প্রকৃতিবদ্ধ হইতে হয়। প্রকৃতি এই কামকে কেন্দ্র (nucleus) করিয়া পুরুষের ক্ষেত্র গঠন করে। তাহার লিঙ্গ-শরীর বা সমুদায় করণ উৎপাদন করে। এই 'কাম'কে কেন্দ্র করিয়াই যত কর্ম্ম সম্পাদিত হয়, তাহার সংস্কার-জালের সৃষ্টি হয়। এই সংস্কার অনুসারে সূক্ষ্ম শরীর বার বার স্থূল শরীর গ্রহণ করে, এই সংস্কার অনুসারে সেই স্থূল শরীর দ্বারা কর্ম্ম করিয়া সেই সংস্কারকে ক্রম-আপূরিত করিতে থাকে। এইরূপে 'বহু' জন্ম ধরিয়া এই 'কাম'কে কেন্দ্র করিয়া সংস্কাররাশি সঞ্চিত ও ক্রম- ... ... থাকে। এইরূপে ... জন্মে ... অন্য সকলের সংস্কার অনুসারে কর্ম্ম আচরিত হয় এবং সেই সকল কর্ম্মজ সংস্কার সেই লিঙ্গশরীরে 'কাম' কেন্দ্রের চারি দিকে সংযুক্ত হইতে থাকে। তাহা দ্বারা ... ... কোষের মধ্যে ... কোষের ... বিজ্ঞানময় কোষের ক্রমবিকাশ হইতে থাকে, এবং তদনুসারে জীবের জাত্যন্তর-পরিণাম হইতে থাকে; এক অর্থে আমাদের চিত্তই এই সংস্কারের সমষ্টি। তাহা যে এই সংস্কারের আধার, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। সেই সংস্কারই ক্রম-আপূরিত হইয়া চিত্তকেও ক্রমে পরিণত করে, উন্নত করে, শেষে জ্ঞানলাভের উপযুক্ত করে। *

---

* আধুনিক পণ্ডিতগণ এই সংস্কাররাশিকে বংশানুক্রমে (by the law of heredity) সঞ্চিত বলেন। ক্ষুদ্র জীবাণু (amiba protosoa) হইতে আরম্ভ করিয়া ... ... আসিতে এই সংস্কাররাশি ক্রমসঞ্চিত হয়। ইহাই এখনকার সিদ্ধান্ত। ... পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রসিদ্ধ ডারউইনকে অনুসরণ করিয়া, ইহা জীব জাতির নিয়ম, এইমাত্র স্বীকার করেন। ইহা যে প্রতি ব্যক্তি সম্বন্ধে নিয়ম, তাহা স্বীকার করেন না। আমাদের শাস্ত্র মতে জীব তৃণ হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত পরিণাম লাভ করিতে পারে। এই পরিণতি জন্য কত লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে হয়। বৃক্ষযোনি হইতে বিহঙ্গরূপ পক্ষি-যোনি, বিভিন্ন পশুযোনি ভ্রমণ করিয়া তবে মানব জন্ম লাভ হয়। মানুষজন্ম লাভের পূর্ব্বে কত লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে হয়, আবার কত লক্ষ মানব-যোনিতে ভ্রমণ করিলে তবে মানুষ মুক্তির উপযোগী হয় — জ্ঞান লাভ করে।

বলিয়াছি ত, 'কাম' এই সংস্কারের আধার বা কেন্দ্র। সংস্কাররাশি যতই সঞ্চিত হয়, কাম বা বাসনাও তদনুসারে স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। কাম, কর্ম্ম ও কর্ম্মজ সংস্কারের কারণ। আর কর্ম্ম ও কর্ম্মজ সংস্কার সে 'কাম' বা বাসনার স্ফূর্ত্তি ও পরিণতির প্রতি কারণ। এইরূপে কাম (Will) দ্বারা সংস্কাররাশি সঞ্চিত হইয়া, সেই সংস্কারজাল দ্বারাই পুরুষকে স্বক্ষেত্রে বদ্ধ করিয়া রাখে।

জ্ঞান দ্বারা কাম-নাশ।—যখন চিত্ত নির্ম্মল হয়, তাহার বিজ্ঞানময় কোষের পূর্ণ পরিণতি হয়, তখন তাহাতে জ্ঞানের প্রকাশ হয়। সেই জ্ঞানের সাহায্যে চিত্তের যাহা কিছু মলিনতা অবশিষ্ট থাকে, তাহা দূর হয়। তখন এ মূল 'কাম' বা বাসনাবীজও বিধ্বস্ত হইয়া, তাহার সহিত সমুদয় সংস্কাররাশি নষ্ট হইয়া যায়। সমুদায় কামনাজ কর্ম্মবীজ বিধ্বস্ত হয়। এই জন্য গীতায় উক্ত হইয়াছে—

"যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্প-বর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥" ৪।১৯

এই কাম বা বাসনাই পুরুষের ব্যক্তিত্বের মূল (Principium Individuationis)। ইহাই অবিদ্যা-বীজ। ইহাকেই অনেকে মায়া-বীজ বলেন। ইহাই ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে, ব্যক্তিত্ব রক্ষা করে। *

কাম-নাশে ব্যক্তিত্বের লোপ ও মুক্তি—চিত্ত সম্পূর্ণ নির্ম্মল হইলে, যখন তাহাতে এই জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ হয়, যখন তাহার পুরুষের স্বরূপ দর্শন হয় বা তাহাতে পুরুষের স্বরূপ পূর্ণ প্রতিভাত হয়, তখন এই কামবীজ দগ্ধ হইয়া যায়। কামবীজ বিধ্বস্ত হইয়া গেলে, আমাদের ব্যক্তিত্ব—'আমি'ত্বের গণ্ডী দূর হইয়া যায় এবং কামকে আশ্রয়

---

* অতএব এই সংস্কার প্রতি জীবের নিজস্ব। মাতাপিতৃজ শরীর সেই সংস্কার-বিকাশের ক্ষেত্রমাত্র। সে সংস্কার-বিকাশের সহায় মাত্র। পুত্র মাতাপিতৃ-সংস্কার পায় না। মাতাপিতৃজ সংস্কার তাহার সংস্কার-বিকাশের সহকারী কারণ মাত্র।

বা কেন্দ্র করিয়া যে সংস্কারজাল গঠিত করিয়া চিত্তকে মলিন করিয়াছিল, সে সমুদায় সংস্কারজাল বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কাজেই তাহার সহিত সমুদায় কর্ম্মবীজ অর্থাৎ যে সব কর্ম্ম বন্ধন-কারণ, তাহার মূল সমুদায়ও দগ্ধ হইয়া যায়। তখন আর চিত্তে কোনরূপ মলিনতা থাকে না। চিত্তের কোনরূপ মলিনতা দ্বারা তাহাতে পুরুষের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহা মলিন হয় না। পুরুষ তখন সেই নির্ম্মল চিত্ত-দর্পণে আপনার স্বরূপ স্পষ্ট দেখিতে পায়। পুরুষের তখন প্রকৃতিবন্ধন, ব্যক্তিত্ব-ভাব (Individuality) ঘুচিয়া যায়। তখন তাহার সর্ব্বত্ব, (universality)·ব্রহ্মত্ব, তাহার পরমাত্মা মহেশ্বর পরম স্বরূপ প্রকাশিত হয়। যাহার অহঙ্কার, দর্প, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি সকলই দূর হইয়াছে, যাহার 'আমিত্ব' 'মমত্ব' ঘুচিয়া গিয়াছে, তিনি যে ব্রহ্মভূত হন, তাহা গীতায় উক্ত হইয়াছে (৬।২৭ ; ১৮।৫৪)। যাঁহার কামনাদি দূর হইয়াছে, যিনি আপনাকে 'অকর্ত্তা' রূপ জানিয়াছেন, যিনি সর্ব্বভূতে পৃথক্ ভাবমধ্যে আপনার একত্ব দেখিতে পাইয়াছেন এবং সেই একত্ব হইতে এই বহুত্বের বিস্তার হইয়াছে জানিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মভাবাপন্ন বা ব্রহ্মসম্পদ্‌যুক্ত হন, আপনাকেও বিস্তার করিয়া দেন (গীতা ১৩।৩০)। তিনি আপনাকে এই সর্ব্বগত সর্ব্বত্রব্যাপ্ত ব্রহ্মরূপে জানিয়াছেন, তাঁহার আর ব্যক্তিত্ব বন্ধন থাকে না—ব্যক্তির সম্বন্ধীয় কোন 'কাম' বা বাসনা থাকে না, তিনি আর ব্যক্তিত্বমধ্যে আবৃত থাকেন না। তখন ব্যক্তিগত কাম ও কামজ কর্ম্ম-সংস্কার সমুদায় বিধ্বস্ত হওয়ায়, তাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না।

কাম নষ্ট হইলে যে ব্যক্তিত্ব ঘুচিয়া যায়, ব্রহ্মত্ব-লাভ হয়, তাহা উপনিষদেও উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা—

"তদেব সক্তঃ সহ কর্ম্মণৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষক্তমস্য।
প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎকিঞ্চেহ করোত্যয়ম্‌।
তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণ ইতি নু কাময়মানোঽ-

থাকাময়মানো যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামঃ ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি॥"

(বৃহদারণ্যক, ৪।৪।৬)।

ইহার তাৎপর্য এই যে,—যে ব্যক্তি কর্ম্মফলে আসক্ত হইয়া কর্ম্ম করে, সে সেই কর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া সেই ফলই প্রাপ্ত হয়। তাহার লিঙ্গশরীরান্তর্গত মন যাহাতে সর্ব্বতোভাবে আসক্ত হয়, সে কর্ম্ম দ্বারা সেই ফলই লাভ করে। জীব ইহলোকে যে কিছু কর্ম্ম করে, সে কর্ম্মফল পরলোকে ভোগ করে। ভোগ দ্বারা তাহা নিঃশেষ হইলে, পুনর্ব্বার এই জীবলোকে কর্ম্ম করিবার জন্য সমাগত হয়।

এই প্রকারে কাময়মান পুরুষ সংসারে অনুবর্ত্তন করে। কামনা-বিহীন পুরুষ তাহা করে না। যিনি অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম বা আত্ম-কাম, তাঁহার প্রাণ আর উৎক্রমণ করে না। তিনি ব্রহ্মভাব লাভের পর ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন।

প্রকৃত জ্ঞানীর পক্ষে কেবল নিষ্কাম কর্ম্মই সম্ভব—এই তত্ত্ব-জ্ঞান প্রকৃতপ্রকারে লব্ধ হইলে, জ্ঞানী অতঃপর যদি কোন কর্ম্ম করেন, তাহা অকাম ও আপ্তকাম হইয়া নিষ্কাম ভাবেই আচরণ করেন। তাঁহার কাম বা বাসনাবীজ নষ্ট হইয়া গেলেও (অর্থাৎ জর্ম্মাণ পণ্ডিত সপেনহরের কথায়,—তাঁহার absolute denial of the will সিদ্ধ হইলেও) তিনি সেই নিষ্কামভাবে অকর্তৃস্বরূপে অবস্থান করিয়াও আপনাকে সেই আত্মস্বরূপে যুক্ত রাখিতে পারেন, তাঁহার সে স্বরূপের প্রচ্যুতি হয় না। যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন (৪।১৮) করেন, যিনি ভগবান্‌কে স্বরূপতঃ আশ্রয় করিয়া সর্ব্বকর্ম্ম আচরণ করেন (১৮।৫৬), যিনি স্বধর্ম্মাচরণ করিয়াও সর্ব্বকর্ম্মফল-সন্ন্যাস দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি লাভ করেন (১৮।৪৯), যিনি নিষ্কাম ভাবে কার্য্য কর্ম্ম আরম্ভ করেন (৩।১৯), যে বিদ্বান্ লোকহিতার্থ কর্ম্ম করেন

(৩।২৫), যিনি মুক্ত, সঙ্গহীন ও জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া যজ্ঞার্থ কর্ম্মাচরণ করেন (৪।২৩), যিনি ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করেন, (১২।১০) তিনি কর্ম্মে অভিপ্রবৃত্ত হইয়াও কিছুই করেন না (৪।২০), তিনি যোগে কর্ম্মসন্ন্যাস পূর্ব্বক আত্মবান্ ও জ্ঞানদ্বারা সংশয়শূন্য হইয়া কর্ম্ম করিলেও বদ্ধ হন না (৪।১১), তিনি সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা হইয়া, কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মে লিপ্ত হন না (৫।৭), তিনি ব্রহ্মে সর্ব্বকর্ম্মার্পণ করেন বলিয়া লিপ্ত হন না (৫।১০)। যাঁহার তত্ত্বজ্ঞানলাভে 'কাম' বিধ্বস্ত হইয়াছে, যাঁহার ব্যক্তিত্ববোধ ঘুচিয়া গিয়াছে, যাঁহার ব্রহ্মের ন্যায় 'বিস্তার' বা আত্মসম্প্রসারণ হইয়াছে, তিনি কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া উক্ত প্রকারে যে কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করুন, তাহাতে আর পুনর্জন্ম ভোগ করিতে হয় না। জ্ঞান হইলে, 'কাম'-বীজ বিধ্বস্ত হইয়া যেমন তাহার সহিত পূর্ব্ব-সংস্কার সমুদায় দগ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ জ্ঞানে স্থিত হইয়া কর্ম্মযোগ করিলেও তাহাতে কাম না থাকায় জন্মাদি ফলপ্রদ সংস্কার আর উৎপন্ন হয় না।

প্রকৃত জ্ঞানী অন্যায় কর্ম্ম করিতে পারেন না।—অনেক ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন যে,—'সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি' অর্থে তিনি বিহিত অবিহিত যে কোনরূপ কর্ম্ম আচরণ করুন, ইহা সঙ্গত হইতে পারে না। কেন না, যাঁহার জ্ঞানে স্থিতি হেতু 'কাম' দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, যিনি নিষ্কাম, আপ্তকাম, আত্মকাম হইয়াছেন, তিনি সাধারণ বিধি-নিষেধের অতীত হইলেও তিনি আর অকর্ত্তব্য অন্যায় পাপ, লোকের বা সমাজের অহিতকর, লোকের উদ্বেগকর কোন কর্ম্মই করিতে পারেন না। কেন না, এ সকল কর্ম্মের মূল 'স্বার্থ, 'কাম'। অনেক অজ্ঞানী মনে করেন যে, 'অহং ব্রহ্ম' এই মহাবাক্য শ্রবণে যখন আমার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে, তখন যদি আমি চুরি করি বা পরদারগমনাদি যে কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়া সমাজদ্রোহী হই, তাহাতে আমার মুক্তস্বরূপের হানি হয় না। তাহা প্রারব্ধবশে প্রকৃতি বা অজ্ঞান দ্বারা কৃত কর্ম্ম মাত্র। তাহাতে আমার আত্মার সম্বন্ধ

নাই। আমি ত্রিগুণাতীত, অজ্ঞানাতীত,—ত্রিগুণহেতু দেহ দ্বারা যে কোন কর্ম্ম হয়, তাহাতে আমি নির্লিপ্ত। এই ধারণা যে ভুল এবং নানা অনর্থের মূল, তাহা আর বলিতে হইবে না। জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানবীজ নষ্ট হইলে আর অজ্ঞানজ কর্ম্ম হইতে পারে না। প্রকৃতি ও পুরুষ প্রয়োজন-সাধন জন্য কর্ম্ম করে মাত্র, ইহাই সাংখ্যদর্শনের উপদেশ। যখন পুরুষের প্রয়োজন শেষ হয়, যখন তাহার প্রকৃতিপুরুষবিবেক-জ্ঞান হয়, প্রকৃতি তাহা দ্বারা দৃষ্ট হয়. তখন প্রকৃতি আর তাহার জন্য কর্ম্ম করে না। সুতরাং তখন প্রকৃতি বা অজ্ঞানের উপর এই সকল কুকর্ম্মের দোষ আরোপ করা নিতান্ত ভ্রান্তি মাত্র। পুরুষ যখন আপনার স্বরূপ জানিতে পারে, তখন সে আর প্রকৃতিবদ্ধ থাকে না; তখন সে প্রকৃতির বশীভূত থাকে না। তখন প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে তাহার অধীন—তাহার বশীভূত। এই জন্য সেই জ্ঞানী পুরুষ আপনাকে নিষ্কাম ও অকর্ত্তা জানিয়াও স্ব-প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ নিয়মিত করিয়া তাহা দ্বারা কর্ম্ম করাইতে পারেন। যে কার্য্য দ্বারা অন্তরাত্মার পরিতোষ হয় (মনু, ৪।১৬১), যে কার্য্য দ্বারা 'I ought' এই কর্ত্তব্যবোধের (categorical imparative) সার্থকতা হয়, যে কার্য্য দ্বারা ব্রহ্ম কল্পনার (Divine Idea-Fichte—) সদ্ভাবে পরিণতির সাহায্য হয়, সেই ঐশ্বরীয় কার্য্য মাত্রই তখন তিনি আপন বশীভূত ও সুসংস্কৃত প্রকৃতির দ্বারা করাইয়া থাকেন। সুতরাং জ্ঞানীর নিকট প্রকৃতি বা বুদ্ধি অহঙ্কার মন ইন্দ্রিয় সমুদায় বশীভূত। তাহারা এইরূপ কার্য্যের যন্ত্রমাত্র। যাঁহারা বলেন, জ্ঞানী প্রারব্ধবশে কর্ম্ম করিতে পারেন, তাঁহাদের ইহা ভ্রম। প্রারব্ধ জাতি, আয়ু ও ভোগের কারণ মাত্র। প্রারব্ধ দ্বারা ভোগ হয়, কোন কর্ম্ম হয় না। কাম-বীজ দগ্ধ না হইলেই 'প্রারব্ধ' ক্রিয়মাণ কর্ম্মের কারণ হয়, নতুবা হয় না। অতএব সর্ব্বথা বর্ত্তমান অর্থে এ স্থলে কর্ম্মযোগে উক্ত প্রকার কর্ম্মমধ্যে যে কোনরূপ কর্ম্মে ব্রতী, এই মাত্র বুঝায়। অথবা কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ,

ভক্তিযোগ, ধ্যানযোগ প্রভৃতি যে কোন প্রকারে আত্মাতে বা পরমেশ্বরে যুক্ত হইয়া অবস্থান, এইমাত্র বুঝায়।

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ॥ ২৪

কেহ ধ্যানে আত্মবলে আত্মাতে আপন
করে আত্মা দরশন ; কেহ সাংখ্যযোগে,
অপর কেহ বা করে কর্ম্ম-যোগ দ্বারা ॥২৪

২৪। কেহ ধ্যানে…করে দরশন—এই শ্লোকে আত্মদর্শনের উপায়-বিকল্প উক্ত হইয়াছে। ধ্যানে অর্থাৎ ধ্যান দ্বারা শব্দাদি বিষয় সকল হইতে শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় সকল মনেতে এবং মনকে আত্মাতে উপসংহৃত করিয়া একাগ্রভাবে যে চিন্তা, তাহাকে ধ্যান বলে। তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন মনোবৃত্তিই ধ্যান। আত্মাতে—অর্থাৎ বুদ্ধিতে। আত্মবলে বা আত্মদ্বারা—অর্থাৎ ধ্যান দ্বারা সংস্কৃত অন্তঃকরণের সাহায্যে। আত্মাকে দর্শন করে—অর্থাৎ প্রত্যক্ চৈতন্যকে দর্শন করে (শঙ্কর)।

যোগ-নিষ্পন্ন কেহ আত্মাতে বা শরীরে অবস্থিত আত্মাকে মনের দ্বারা বা ধ্যানের দ্বারা ভক্তিযোগে দর্শন করেন (রামানুজ)। আত্মাকার প্রত্যয় আবৃত্তি দ্বারা আত্মাতে বা দেহে আত্মাদ্বারা বা মনের দ্বারা কেহ দর্শন করে (স্বামী)। কেবল জ্ঞান-সাধনাই মুক্তির কারণ নহে; এজন্ত এস্থলে অন্য সাধনের স্বরূপও উক্ত হইয়াছে। কোন জ্ঞানী ধ্যান দ্বারা অর্থাৎ পরিকল্পনা দ্বারা আত্মহৃদয়ে মনের দ্বারা আত্মরূপ ভগবান্‌কে দর্শন করেন (বল্লভ)।

এ স্থলে এই দুই শ্লোকে চতুর্ব্বিধ লোকের আত্মদর্শন-সাধন-বিকল্প উক্ত হইয়াছে। কেহ উত্তম সাধক, কেহ মধ্যম সাধক, কেহ মন্দ সাধক, কেহ মন্দতর সাধক। ইহাদের মধ্যে উত্তম সাধকের পক্ষে আত্মজ্ঞান-সাধন-প্রণালী এ স্থলে উক্ত হইয়াছে। ধ্যানের দ্বারা অর্থাৎ বিজাতীয় প্রত্যয় অন্তরিত করিয়া সজাতীয় প্রত্যয়-প্রবাহ দ্বারা শ্রবণ মনন ফলভূত আত্মচিন্তন বা নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মাতে অর্থাৎ বুদ্ধিতে আত্মাকে অর্থাৎ প্রত্যক্ চৈতন্যকেই আত্মবলে অর্থাৎ ধ্যানসংস্কৃত অন্তঃকরণে উক্ত উত্তম যোগিগণ দর্শন বা সাক্ষাৎ করেন (মধু)।

মহেশ্বরের প্রাপ্তিতে যে সাধন-বিকল্প, তাহাই এই শ্লোকে ও পরের শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। যাঁহারা বিশুদ্ধচিত্ত, তাঁহারা আত্মাতে বা মনে স্থিত আত্মাকে বা মহেশ্বর আমাকে ধ্যান দ্বারা বা উপসর্জ্জনীভূত জ্ঞান দ্বারা আত্মবলে অর্থাৎ স্বয়ং বা অন্যের সাহায্য বিনা সাক্ষাৎ করেন (বলদেব)।

এইরূপ প্রকৃতি-বিযুক্ত আত্ম-দর্শনের সাধনভেদ-প্রযুক্ত অধিকারিভেদ এই শ্লোকে ও পরবর্ত্তী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। কেহ সদাচার্য্য বাক্য আত্মতত্ত্ব নিশ্চিত অবধারণ করিয়া যোগযুক্ত হন অর্থাৎ শ্রবণ মননের আত্মভূত নিদিধ্যাসন বা ধ্যান দ্বারা আত্মাতে অর্থাৎ দেহেতে আত্মার দ্বারা অর্থাৎ মনের দ্বারা দেহে অবস্থিত পরমাত্মাকে দর্শন করেন (কেশব)।

আত্মা এই স্থলে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। দেহাদিতে আত্মাধ্যাসই ইহার কারণ। দেহাত্মবাদীর মতানুসারে দেহকে অর্থাৎ স্থূল দেহকে আত্মা বলা হয়। মনাত্মবাদীর মতানুসারে মনকে আত্মা বলা হয়। আর বুদ্ধি-আত্মবাদ-মতে বুদ্ধিকে আত্মা বলা হয়। অধ্যাস হেতু ব্যবহারিক অর্থে আত্মা এইরূপ ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়। গীতায় পূর্ব্বে ৬।৫-৭ম শ্লোকে আত্মা এইরূপ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

কেহ সাংখ্যযোগে—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় আমার দৃশ্য—আমি এই গুণত্রয় হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ এবং এই গুণত্রয়ের যাহা কিছু

ব্যাপার, আমি তাহারই দ্রষ্টা ; আমি অবিনাশী অপরিণামী আত্মা—এই প্রকার চিন্তাই সাংখ্যযোগ। সেই সাংখ্যযোগ-বলে সংস্কৃত আত্মা অর্থাৎ অন্তঃকরণ দ্বারা কেহ কেহ আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন, ইহা পূর্ব্ব হইতেই অনুবৃত্ত হইতেছে (শঙ্কর)। অপরে অর্থাৎ যাঁহারা যোগাদি দ্বারা আত্মাবলোকন করিতে অধিকারী এবং জ্ঞানযোগেই অধিকারী, তাঁহারা সাংখ্যযোগ দ্বারা আত্মদর্শন করেন (রামানুজ)। সাংখ্য অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের বৈলক্ষণ্য আলোচনা দ্বারা যে অষ্টাঙ্গ যোগ, তাহা দ্বারা আত্মদর্শন করেন (স্বামী)। সাংখ্য অর্থাৎ নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক-যুক্ত যোগের দ্বারা অপরে আত্মদর্শন করেন (বল্লভ)। যাঁহারা মধ্যম অধিকারী, তাঁহাদের আত্মজ্ঞান-সাধন এ স্থলে উক্ত হইয়াছে। তাঁহারা সাংখ্যযোগ দ্বারা অর্থাৎ নিদিধ্যাসনের পূর্ব্বভাবী শ্রবণ-মননরূপ অর্থাৎ নিত্যানিত্য বস্তু-বিবেকাদি পূর্ব্বক—এই গুণত্রয়-পরিণামী—ইহারা সমুদায় মিথ্যা, ইহারা আত্মা নহে, আত্মা তাহাদের সাক্ষী, নিত্য, বিভু, নির্ব্বিকার, সত্য, সমস্ত জড়বর্গ সম্বন্ধশূন্য এবং সেই আমিই আত্মা ; এই প্রকার বেদান্ত-বাক্য-শ্রবণরূপ এবং তাহার চিন্তন বা মননরূপ যে সাংখ্যযোগ, তাহা দ্বারা আত্মাকে আত্মাতে ধ্যানোৎপত্তি দ্বারা দর্শন করেন (মধু)। সাংখ্য ও যোগ পৃথক্। সাংখ্য অর্থাৎ উপসর্জ্জনীভূত ধ্যান ও জ্ঞান দ্বারা কেহ, আত্মদর্শন করেন এবং যোগ দ্বারা অর্থাৎ উপসর্জ্জনীভূত জ্ঞান বা অষ্টাঙ্গ-যোগের দ্বারা আত্মদর্শন করেন। (বলদেব)। অন্য কোন সিদ্ধ যোগী শ্রবণ-মনন-পর্য্যায়ে সাংখ্যযোগ দ্বারা অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকাত্মক যোগের দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন (কেশব)।

কর্ম্মযোগ দ্বারা—কর্ম্মই যোগ, তাহা দ্বারা। ঈশ্বরে ফলার্পণ বুদ্ধিতে যে কর্ম্মানুষ্ঠান করা যায়, সেই কর্ম্মই যোগ। যোগ শব্দের সাধারণ অর্থ ঘটনা। এই প্রকার কর্ম্মও মোক্ষঘটনার কারণ। সুতরাং ইহাই যোগ। সত্ত্বশুদ্ধি ও জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা এই প্রকার কর্ম্ম-পরম্পরা

মোক্ষের কারণ। এজন্য ইহাকে যোগ বলা যায়। এই কর্ম্মযোগ দ্বারা আবার যোগিগণ এই প্রকারে আত্মাকে দর্শন করেন (শঙ্কর)। এ স্থলে আত্মদর্শনের সুকর উপায় উক্ত হইতেছে। কর্ম্মযোগ দ্বারা ও তদন্তর্গত জ্ঞানের দ্বারা মনের যে যোগ বা যোগ্যতা উৎপন্ন হয়, তাহা দ্বারাই কেবল যোগী আত্মদর্শন করেন (রামানুজ)। যাহারা মন্দ অধিকারী, তাহাদের যে জ্ঞানসাধন, তাহা এক্ষণে উক্ত হইতেছে। ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে ফলাভিসন্ধিহীন হইয়া স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত বেদবিহিত কর্ম্মকলাপের আচরণ দ্বারা ইঁহারা আত্মাতে আত্মবলে আত্মাকে দর্শন করেন অর্থাৎ সত্ত্বশুদ্ধি দ্বারা শ্রবণ মনন ধ্যান উৎপত্তি দ্বারা দর্শন করেন।

এই ধ্যান-যোগ, সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগ ইহাদের মধ্যে ক্রম-সমুচ্চয় থাকিলেও সেই সেই নিষ্ঠা যে অভেদ, ইহাই অভিপ্রায় বলিয়া বিকল্পে এইরূপ উক্ত হইয়াছে (স্বামী)।

কর্ম্মযোগ অর্থাৎ অন্তর্গত ধ্যান, জ্ঞান ও নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা (বলদেব)। কর্ম্মযোগ অর্থাৎ কর্ম্মেতে তদাত্মক প্রাকট্যরূপ যোগ (বল্লভ)।

ইহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট অধিকারী, অর্থাৎ যাহারা জ্ঞানযোগের অনধিকারী—তাহারা কর্ম্মযোগ দ্বারা অর্থাৎ ঈশ্বরে অর্পণ বুদ্ধিতে ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক বর্ণ ও আশ্রমবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা অন্তঃকরণ-শুদ্ধিপূর্ব্বক ধ্যানযোগ-উৎপন্নহেতু আত্মদর্শন করে (কেশব)।

এই শ্লোকে আত্মদর্শনের উপায় সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। এই উপায় তিনটি ;—ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগ। ধ্যানযোগ পূর্ব্বে ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে ; সাংখ্যযোগ দ্বিতীয় ও পঞ্চম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে এবং কর্ম্মযোগ দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এই বিভিন্ন যোগগুলির সকলেই যে আত্মদর্শনের উপায়, তাহা এস্থলে কথিত হইয়াছে। মূল শ্লোকে 'সাংখ্যেন যোগেন' উক্ত হইয়াছে। এ জন্য বলদেব বলেন, ইহার অর্থ সাংখ্যজ্ঞান ও যোগই বা সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত

যোগ অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ যোগ। পাতঞ্জল-দর্শন সাংখ্যশাস্ত্রেরই অন্তর্গত। এজন্য পাতঞ্জল যোগ-সূত্রকে সাংখ্যপ্রবচন-সূত্রও বলা যায়। এই অনুসারে বলদেব এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু অন্য ব্যাখ্যাকারগণ 'সাংখ্যেন যোগেন' অর্থে এক সাংখ্যযোগ দ্বারা ইহাই বুঝিয়াছেন। গীতায় পূর্ব্বে দ্বিবিধ নিষ্ঠার কথা আছে,—সাংখ্যদের জ্ঞানযোগ-নিষ্ঠা এবং যোগীদের কর্ম্মযোগ-নিষ্ঠা (৩।৪)। অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যে, ইহার মধ্যে যে কোন নিষ্ঠাতেই উভয়ের ফললাভ হয়; এজন্য এ উভয়ই এক অর্থাৎ সাংখ্যজ্ঞান দ্বারা যে স্থান-প্রাপ্তি হয়, যোগ দ্বারাও তাহাই অধিগম্য হয়; এজন্য উভয় নিষ্ঠাই এক বা একফল-প্রদ। ফল সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে ইতরবিশেষ নাই '(৫।৪,৫)। অতএব পূর্ব্বে 'যোগ' অর্থে কর্ম্ম-যোগ উক্ত হইয়াছে। এই শ্লোকে কর্ম্ম-যোগের কথা পৃথক্ আছে, এজন্য 'সাংখ্যেন যোগেন' অর্থে সাংখ্যযোগ বা জ্ঞানযোগ-নিষ্ঠা। অতএব শঙ্করাদি ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যাই সঙ্গত। অর্থাৎ আত্মদর্শনের উপায় তিন প্রকার;—ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ বা জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মযোগ।

এ স্থলে মধুসূদন প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ যে বলিয়াছেন, এই বিভিন্ন উপায়, বিভিন্ন অধিকারীর জন্য, তাহা সঙ্গত নহে। গীতায় এরূপ অধিকারিভেদ করা নাই। কর্ম্মযোগ এবং সাংখ্যযোগ বা জ্ঞানযোগ যে একই, উভয়ের দ্বারাই যে এক ফল লাভ হয়, বালকেরাই যে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখে, তাহা উক্ত হইয়াছে, দেখাইয়াছি। ধ্যানযোগও সেইরূপ, আত্ম-দর্শনের অন্যতম উপায়। তাহা উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট নহে। শঙ্করাচার্য্য এরূপ প্রভেদ করেন নাই। ধ্যানযোগ শ্রেষ্ঠ অধিকারীর জন্য, সাংখ্যযোগ মধ্যম অধিকারীর জন্য এবং কর্ম্মযোগ নিম্নাধিকারীর জন্য— এরূপ বিবেচনা সঙ্গত নহে। ভগবান্ অর্জ্জুনের এই ভ্রম দূর করিবার জন্য নানারূপে উপদেশ দিয়াছেন।

ধ্যানযোগ।—ধ্যানের দ্বারা আত্মদর্শন করিবার উপায় ষষ্ঠ অধ্যায়ে

বিবৃত করিয়াছি, বলিয়াছি। ধ্যানযোগের ফলে যোগী ... হইয়া দ্রষ্টৃস্বরূপে অবস্থান হয়। সংকল্প-প্রভব কামকে অশেষে ত্যাগ করিয়া, মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সর্ব্বদিক্ হইতে প্রত্যাহার করিয়া, ধৃতি-গৃহীত বা ধারণাযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা উপরত হইয়া মনকে আত্মাতে সংস্থিত করিতে পারিলে, এবং কোনরূপ চিন্তা না করিলে এই ধ্যানযোগ-সিদ্ধি হয় (৬।২৪,২৫)। তাহাতে মন প্রসন্ন হয়, ব্রহ্ম-সংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখ-লাভ হয় এবং যোগযুক্তাত্মা ও সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া আত্মাকে সর্ব্ব-ভূতস্থ ও আত্মাতেই সর্ব্বভূত দর্শন করা যায় (৬।২৯)। ইহাই ধ্যানযোগ ... । এই আত্মদর্শন-ফলে ধ্যানযোগী ... এবং সমুদায় ঈশ্বরে দর্শন করেন। (৬।৩০)।

সাংখ্যযোগ বা জ্ঞানযোগ— জ্ঞান-নিষ্ঠ ... অজ্ঞান নাশ হয়। ... সূর্য্যবৎ জ্ঞান প্রকাশিত হয় (...) ... সর্ব্বত্র 'সম' বা ব্রহ্ম দর্শন হয়। জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ স্থিরবুদ্ধি হইয়া সমত্বে বা ব্রহ্মে স্থিত হন (৫।১৯।২০)। জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি বাহ্য স্পর্শে অসক্তচিত্ত হইয়া ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা হন (৫।২১)। তিনি ... সুখ, ... আরাম অন্তর্জ্যোতি হইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন (৫।২৪ ...) ... সর্ব্বলোক-মহেশ্বরকে জানিতে পারেন এবং সতত মুক্ত থাকেন (৫।২৮।২৯)। এই জ্ঞানযোগীই সাংখ্যযোগী। সাংখ্যযোগী দেহ ... জানিয়া দেহ হইতে পৃথক্ জ্ঞানে আপনাকে দর্শন করেন। তিনি সমাধি দ্বারা বুদ্ধি স্থির করিয়া যোগযুক্ত হয়েন (২।৫৩) এবং আত্মাতে আত্মাতেই তুষ্ট থাকেন (২।৫৫), চিত্তকে আত্মবলে ধরিয়া ... ও নিস্পৃহ হইয়া স্থিতপ্রজ্ঞ হয়েন। বুদ্ধি এইরূপ স্থির ও ... হইলে তবে তাহাতে আত্মদর্শন বা ব্রহ্মদর্শন হয়।

কর্ম্মযোগ—কর্ম্মযোগ দ্বারা কাম বা কর্ম্মবীজ ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যায়, তাহার ফলে বুদ্ধি নিম্মল হয়, এবং সেই শুদ্ধ নিষ্কাম ... হইতে

অবস্থান হেতু, তাহাতেও [illegible] পূর্ব্বে [illegible] নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলা হইয়াছে (২।৩৯)। অর্থাৎ এই বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে জ্ঞান বা কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা ও কর্ম্মে আসক্তি থাকে না, জন্ম-বন্ধ হইতে মুক্ত হওয়া যায় (২।৫১)। বুদ্ধি যখন "মোহ" হইতে মুক্ত হয়, এক-অধ্যবসায়াত্মক হয়, তখন সেই বুদ্ধি-যুক্ত হইয়া কর্ম্মসাধনই কর্ম্ম-যোগ। বুদ্ধি নির্ম্মল, কামক্রোধাদি-মলবিহীন হইলে তবে সেই বুদ্ধি-যোগে নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিবার সাধনায় সিদ্ধি হয়। এই 'যোগ' বা কর্ম্মযোগসিদ্ধিতে বুদ্ধি সমাধিতে অচলভাবে স্থির হয় (২।৫৩), অর্থাৎ তাহাতে আত্ম-স্বরূপ [illegible] লব্ধ তাহাতে সমাহিত থাকে। যে বুদ্ধিযোগ দ্বারা কর্ম্মযোগ সিদ্ধ হয়, সেই বুদ্ধিকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, তাহাকে রাগদ্বেষ-বিমুক্ত করিতে হয়, আত্মবশীভূত করিতে হয়, আত্মাতে যুক্ত করিতে হয় (২।৬০,৬১) সর্ব্ব 'কাম' ত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ, নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার হইতে হয় (২।৭১)। যাঁহার বুদ্ধি স্থির 'যুক্ত,' তিনি নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিয়াও স্থিতপ্রজ্ঞ হন, তাঁহার ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হয় (২।৭২)।

সাংখ্যের যে জ্ঞানযোগ, তাহা দ্বারা আত্মাকে প্রকৃতি ও প্রকৃতিজ বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে পৃথক্ জানিয়া আত্মাকে বা পুরুষকে বুদ্ধি হইতে পৃথগ্‌ভাবে অবস্থান করাইতে হয়। আর যোগীর যে কর্ম্ম, যোগ তাহাতে বুদ্ধিকে এইরূপে শুদ্ধ সম্পূর্ণ নির্ম্মল করিয়া আত্মাকে তাহাতে অবস্থান করাইতে হয়। এই নির্ম্মল বুদ্ধিতেই আত্মদর্শন হয়। এই নির্ম্মল বুদ্ধির স্বরূপ—জ্ঞান, ধর্ম্ম ইত্যাদি। এই বুদ্ধিতে যজ্ঞাদি আচরিত হইলে, সেই যজ্ঞে সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন হয় (৪।২৩), স্বধর্ম্ম স্বকর্ম্ম আচরণে তাহাদ্বারা ভগবান্‌কে অর্চ্চনা করা হইতেছে—এই জ্ঞান হয় (১৮।৪৬)। পূর্ব্বে কর্ম্মযোগ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এ স্থলে সে সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। নিষ্কাম ভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্মের আচরণ অভ্যাস করিতে করিতে পরিণামে 'কাম-সঙ্কল্প' আসক্তি প্রভৃতি

সমুদায় নষ্ট হইয়া যায়, চিত্ত সম্পূর্ণ নির্ম্মল হয় এবং সেই নির্ম্মলচিত্তেই আত্মদর্শন হয়। এই জন্য এ স্থলে উক্ত হইয়াছে যে, কর্ম্মযোগই আত্ম-দর্শনের উপায়। অন্য কোনরূপ যোগ অবলম্বন না করিয়াও কেবল এই কর্ম্মযোগসাধন করিলেই ইহার ফলে পরিণামে আত্মদর্শন হয়।

এ স্থলে বল্লভ-সম্প্রদায়ের অনুযায়ী ব্যাখ্যা বুঝিতে হইবে। গীতার সপ্তম অধ্যায়ের শেষে ও অষ্টম অধ্যায়ের প্রথমে পরমেশ্বরের সমগ্র ভাব— নির্গুণ ব্রহ্মভাব, অধ্যাত্মভাব, অধিকর্ম্মভাব, অধিদৈব ভাব, অধিভূতভাব ও অধিযজ্ঞ ভাব উক্ত হইয়াছে। এই ভগবানের কর্ম্মভাব বুঝাইতে কর্ম্মকে ভূতভাবের উদ্ভবকর বিসর্গ বলা হইয়াছে (৮।৩)। ভগবানের যে বিসর্গ বা বিসৃষ্টি দ্বারা ভূতভাবের উদ্ভব অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি ও পরিণতি হয়, তাহাই কর্ম্ম। অতএব এ স্থলে কর্ম্মযোগের অর্থ ভগবানের এই অধিকর্ম্মভাব তদনুযায়ী কর্ম্ম দ্বারা আপনাতে অনুভব করা। কিন্তু এই কর্ম্মযোগ দ্বারা অধিকর্ম্মভাবে ভগবান্‌কে অনুভব করিলে, ক্রমে তাঁহার সমগ্র ভাব অনুভব করা হয়।

আত্মদর্শন—অর্থাৎ পূর্ব্বে ২২শ শ্লোকে যে পুরুষ এই দেহে থাকিয়াও দেহ হইতে পর বা পৃথক্ এবং শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তিনিই পরমাত্মা মহেশ্বর। এ স্থলে সেই পুরুষকেই আত্মা বলা হইয়াছে। প্রকৃতি হইতে এই পুরুষকে পৃথক্ জানিয়া পুরুষের যে স্বরূপ-দর্শন, তাহাই আত্মদর্শন। পূর্ব্বে যে তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনের কথা উক্ত হইয়াছে এবং যাহা জ্ঞানের স্বরূপ, তাহাই এই আত্মদর্শন। প্রকৃতি-পুরুষ এই দুই তত্ত্ব। আত্মস্বরূপ পুরুষকে দর্শন করিতে হইলে তৎপূর্ব্বে প্রকৃতির স্বরূপ জ্ঞান ও প্রকৃতিকে দর্শন করা প্রয়োজন। আত্মদর্শন হইলেই তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন সিদ্ধ হয়।

———

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৫

অন্যে নাহি জানি ইহা করে উপাসনা
শুনি অপরের কাছে, শ্রুতি-পরায়ণ
তাহারা ত মৃত্যুকেই করে অতিক্রম ॥ ২৫

২৫। অন্যে নাহি জানি ইহা—অন্য ব্যক্তিগণ এই পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে কোন একটি দ্বারা যথোক্ত আত্মস্বরূপ জানিতে সমর্থ না হইয়া (শঙ্কর)। উক্ত কর্ম্মযোগাদিতে আত্মাবলোকন সাধনে অনধিকারী (রামানুজ)। অতি মন্দাধিকারীর নিস্তার উপায় এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। যাহারা সাংখ্যযোগাদিমার্গে উক্ত উপদ্রষ্টা অনু-মন্তাদি লক্ষণ আত্মাকে সাক্ষাৎ করিতে জানে না (স্বামী)। এ স্থলে মন্দতর অধিকারীর সাধন উক্ত হইয়াছে। ইহারা যে পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত ত্রিবিধ অধিকারী হইতে বিলক্ষণ, তাহা এই শ্লোকে 'তু' শব্দ দ্বারা দ্যোতিত হইয়াছে। ইহারা উক্ত ত্রিবিধ উপায় মধ্যে কোন উপায় দ্বারা আত্মদর্শন করিতে জানে না (মধু, কেশব)। যাহারা উক্তরূপ কোন সাধনোপায় জানে না (বলদেব)। মূর্খলোকে ইহা না জানিয়া (বল্লভ)।

করে উপাসনা শুনি অপরের কাছে—আচার্য্যগণের নিকট শ্রবণ করিয়া অর্থাৎ 'এই প্রকার চিন্তা কর' এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া উপাসনা করেন, অর্থাৎ শ্রদ্ধাপর হইয়া সেই উপদেশ অনুসারে চিন্তা করিতে থাকেন (শঙ্কর, মধু)। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীর নিকট শ্রবণ করিয়া কর্ম্মযোগাদি দ্বারা আত্মাকে উপাসনা করেন (রামানুজ)। আচার্য্যের উপদেশ শ্রবণ করিয়া উপাসনা বা ধ্যান করে (স্বামী)। যাঁহারা এ উপায় জানে না, তাঁহারা

অন্যের মুখে সেই সকল উপায় শ্রবণ করিয়া সেই মহেশ্বরকে উপাসনা করেন (বলদেব)। অন্যের কাছে অর্থাৎ গুরুর মুখে শুনিয়া, অনুভব বিনা 'এবম্‌' এইরূপে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উপাসনা করেন (বল্লভ)। যাঁহারা তত্ত্বদর্শী গুরুর নিকট এই তত্ত্ব জানিয়া শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসপূর্ব্বক উপাসনা করেন (কেশব)।

শ্রুতিপরায়ণ তাহারা।—শ্রুতি অর্থাৎ শ্রবণ। আচার্য্যের উপদেশ-বাক্যই যাহার 'পর' বা প্রধান 'অয়ন' বা গমন, অর্থাৎ মোক্ষ-মার্গ প্রবৃত্তিতে প্রকৃষ্ট সাধন, যাহাদের কোন প্রকার আত্মপ্রমাণের উপর নির্ভর নাই, আচার্য্যের উপদেশই সার বলিয়া গ্রহণ করে, নিজ বিবেকের উপর যাহাদের বিশ্বাস বা নির্ভর নাই—তাহারাই শ্রুতি-পরায়ণ (শঙ্কর)। শ্রবণ-নিষ্ঠ (রামানুজ)। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক উপদেশ-শ্রবণ-পরায়ণ (স্বামী)। স্বয়ং বিচারে অসমর্থ এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গুরুর উপদেশ শ্রবণ-মাত্র-পরায়ণ (মধু)। তত্তৎ কথা শ্রবণাদি-নিষ্ঠ (বলদেব)। শ্রুত্যুক্ত প্রকারে শ্রদ্ধা সহ আচরণকারী (বল্লভ)। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণপরায়ণ হইয়াও ক্রমে সংসার হইতে উত্তীর্ণ হয়, অর্থাৎ তাহারা মনন বা বিচার-সমর্থ হইয়া ক্রমে মুক্ত হয় (কেশব)।

মৃত্যুকেও করে অতিক্রম।—ইহারাও যখন মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে, তখন যাহারা বিবেক-বলে, প্রমাণ বিষয়ে যাহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, তাহারা ত মৃত্যুকে অতিক্রম করিবেই। (শঙ্কর)। তাহারা পূতপাপ হইয়া কর্ম্মযোগাদি আরম্ভ করিয়া ক্রমে মৃত্যুকে অতিক্রম করে (রামানুজ)। মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ"।—তাহারা ক্রমে সংসারের পারগামী হয় (স্বামী)। তাহারা সেই 'শ্রুত' উপায় ক্রমে অধ্যয়ন করিয়া তাহা সাধন করে এবং পরিণামে মৃত্যুকে অতিক্রম করে। এই স্থলে 'শ্রবণ-মহিমা' দর্শিত হইয়াছে (বলদেব)। তাহারাও মুক্ত

হয়। ভগবান্ স্ববাক্যের যাথার্থ রক্ষার জন্য তাহাদিগকেও মুক্ত করিবেন,—স্নেহবশে নহে (বল্লভ)।

এই উপাসনা কাহার।—পূর্ব্ব-শ্লোকে যে ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা উপাসনা নহে; উপাসনা স্বতন্ত্র। পূর্ব্বে জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা ভগবানের যজনা ও উপাসনার কথা উক্ত হইয়াছে (৯।১৫; ৯।২২)। অন্য দেবতার যজনা ও উপাসনার কথাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে (৭।২১; ৯।২৩)। দেবগণ, ভূতগণ ও পিতৃগণের উপাসনা বা ব্রতের কথাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে (৯।২৫)। ইহাদের মধ্যে ভগবানের উপাসনাই যে শ্রেষ্ঠ, তাহা দ্বাদশাধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে (১২।২, ৬ ও পরবর্ত্তী শ্লোকে দ্রষ্টব্য)। ইহা ব্যতীত দ্বাদশ অধ্যায়ে অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা উক্ত হইয়াছে। সে উপাসনা যে অধিকতর ক্লেশকর, তাহাও উক্ত হইয়াছে (১২।৩-৫)। এই অব্যক্ত অক্ষর উপাসনা উপনিষদুক্ত ব্রহ্মোপাসনা—ইহা ব্রহ্মের প্রতীক উপাসনা, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। 'ওঙ্কার' সূর্য্যাদিতে অধিষ্ঠিত পুরুষ, 'প্রাণ' প্রভৃতিতে ব্রহ্ম ভাবনা দ্বারা যে উপাসনা, তাহা প্রতীক উপাসনা। শ্রুতির উপদেশ শ্রবণ করিয়া উপাসক সেই উপাসনায় রত হইতেন। এই প্রতীক উপাসনা যে ব্রহ্মোপাসনা—তাহা বেদান্তদর্শনে বিবৃত হইয়াছে। অতএব যাহারা শ্রুতিপরায়ণ, অন্যের নিকট 'শ্রবণ' করিয়া উপাসনা করে, তাহারা প্রধানতঃ ব্রহ্মের প্রতীকোপাসক।*

---

* বেদ সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ শ্রুতি। ইহা পূর্ব্বে গ্রন্থাকারে লিখিয়া রাখিবার বিধান ছিল না। গুরু বা আচার্য্যের নিকট তাহা 'শ্রবণ' করিয়া লাভ করিবার ব্যবস্থা ছিল। তাহা এইরূপে গুরুপরম্পরাক্রমে রক্ষিত হইত। শিষ্য আচার্য্যের নিকট শ্রবণ করিয়া তাহা স্মরণ রাখিতেন। পরে তিনি আচার্য্য হইয়া অন্য শিষ্যকে তাহা শ্রবণ করাইতেন। অতএব এই শ্রবণ দ্বারাই শ্রুত্যুক্ত উপাসনা-তত্ত্ব তখন জানিতে হইত। এই শ্রুতির কথা পূর্ব্বে ২।৫২,৫৩ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

এই প্রতীকোপাসনার ফলেও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে; প্রতীকো-পাসকগণ ব্রহ্মবিৎ হইয়া, মৃত্যুর পর দেবযানে গতি লাভ করেন আর পুনরাবর্ত্তন করেন না (৮।২৪)। এই শ্লোকে ইঁহাদের কথাই উক্ত হইয়াছে বোধ হয়। ঈশ্বরোপাসনা বা অন্য দেবতাদির উপাসনার কথা এ স্থলে উক্ত হয় নাই। শ্রুতি অর্থে উপনিষদান্ত বেদকেই বুঝায়। আর কোন শাস্ত্র শ্রুতি নহে, আর কোন শাস্ত্রের 'শ্রবণ' বিহিত নাই। গীতার সাংখ্যযোগ, ধ্যানযোগ ও কর্ম্মযোগ যে ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে, শ্রুতিতে সে ভাবে স্পষ্টরূপে তাহার উপদেশ নাই। শ্রুতি শ্রবণ দ্বারা এই সকল যোগ-মার্গ জানা যায় না। শ্রুতিতে কেবল ব্রহ্মোপাসনাই নানাভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে।

তন্মধ্যে শ্রুতির উপদিষ্ট প্রতীক, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার উপায় হইলেও প্রতীকোপাসনা যে প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা নহে—তাহা শ্রুতিতেই উক্ত হইয়াছে। কেন না, ব্রহ্ম হইতে বাক্, মননক্রিয়া, দর্শন-শ্রবণাদি ক্রিয়া অভ্যুদিত হয়; সুতরাং ব্রহ্ম বাচ্য, মন্তব্য, দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য হয় না। যাঁহার উপাসনা করিতে হইবে, তিনি অবশ্য বাচ্য, মন্তব্য, চিন্তিতব্য, দ্রষ্টব্য অথবা শ্রোতব্য হইবেন। যে প্রতীক দ্বারা যে ব্রহ্মের উপাসনা করা যায়, তাহা অবশ্য বাচ্য, দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য বা মন্তব্য হইবেনই। অতএব 'প্রতীক' ব্রহ্ম নহে এবং প্রতীকোপাসনায় ঠিক ব্রহ্মোপাসনা হয় না। শ্রুতিতে ইহাই উক্ত হইয়াছে। যথা—

"যদ্‌বাচা নাভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে

* * * *

যৎ মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।

* * * *

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যন্তি

* * * *

যৎ শ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্
—তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদম্ উপাসতে।"

(কেন উপঃ, ১।৪—৭)।

এতদনুসারে যাহা "ইদং", তাহা ব্রহ্ম-'প্রতীক' হইলেও ব্রহ্ম নহে। তাহা হয় চক্ষুগ্রাহ্য (রূপবিশিষ্ট) বা কর্ণগ্রাহ্য (নাসাবিশিষ্ট) বা মনোগ্রাহ্য (কল্পনা-সৃষ্ট) না হয় বাক্য-গ্রাহ্য (কোন দ্রব্যগুণ কর্ম্ম বা সম্বন্ধের বাচক শব্দ বাচ্য)। এই শ্রুতি অনুসারে তাহা ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে পারে না।০ উপনিষদে যে 'অহং' যে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ভাবে ব্রহ্মোপাসনা বিহিত আছে, তাহাকে "অহংগ্রহোপাসনা" বলে। এই 'অহং' আত্মা নহে, ইহা প্রকৃতিজাত অহঙ্কার মাত্র; তাহা ব্রহ্ম নহেন। সুতরাং এই "অহংগ্রহোপাসনা" ও প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা নহে। ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কারের অতীত ও তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে বুদ্ধিতত্ত্ব (কঠ, ৯।১০), তাহা যখন সম্পূর্ণ সাত্ত্বিক ও নির্ম্মল হইয়া এই অধ্যায়োক্ত জ্ঞানস্বরূপ হয়, তখনই কেবল আত্মা তাহাতে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় আত্মদর্শন সিদ্ধ হইতে পারে। সেই ব্রহ্ম বা আত্মাই উপাস্য। বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ নির্ম্মল করিয়া তাহাকে জ্ঞানস্বরূপে অবস্থান করাইয়া এই আত্মদর্শন করিবার উপায় উক্ত ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগ। ইহার আর উপায়ান্তর নাই।

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্‌বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৬

স্থাবর কিংবা জঙ্গম সত্ত্ব যাহা কিছু
হয় সমুদ্ভূত, তাহা জেনো' হে ভারত!
হয় ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে ॥ ২৬

২৬। স্থাবর কিংবা জঙ্গম সত্ত্ব যাহা কিছু হয় সমুদ্ভূত—যাহা কিছু (যাবৎ কিঞ্চিৎ) বস্তু (সত্ত্ব) সঞ্জাত হয়, অর্থাৎ উৎপন্ন হয়, সে বস্তু কি, তাহা অবিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে যে, তাহা 'স্থাবর' এবং 'জঙ্গম' (শঙ্কর)। স্থাবর ও জঙ্গম এবং সত্ত্ব—অর্থাৎ চিদচিৎ-সংসর্গজনিত সত্ত্ব। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যাহা কিছু সত্ত্ব সঞ্জাত হয় (রামানুজ)। যাবৎ অর্থাৎ অধ্যাস-সমাপ্তি পর্য্যন্ত যাহা কিছু স্থাবর বা জঙ্গমাত্মক বস্তুমাত্র সমুৎপন্ন হয় (স্বামী)। অধ্যাস-সমাপ্তি পর্য্যন্ত—সেই অধ্যাস হেতু যে গুণসঙ্গ হয়, এবং গুণসঙ্গ হইতে যে সদসদ্‌যোনিতে "জন্মগ্রহণের কথা উক্ত হইয়াছে—সেই অধ্যাস-সমাপ্তি পর্য্যন্ত এইরূপে যাহা কিছু স্থাবর বা জঙ্গম বস্তু সঞ্জাত হয় (মধু)। স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু সত্ত্ব বা প্রাণিজাত—যে উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট বিভিন্নরূপে সঞ্জাত হয় (বলদেব)। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যাবৎ বস্তুমাত্র, তাহা পূর্ব্বোক্তরূপে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ—এই উভয়ের সংযোগ হেতু অর্থাৎ ক্রীড়ার্থ আত্মার সংযোগ হেতু—ক্ষেত্রের সহিত সংযোগ হেতু—সেই সত্ত্বাত্মক সমুদায় সমুদ্ভূত হয় (বল্লভ)। এই শ্লোক হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই অধ্যায়ে প্রকৃতি-পুরুষ বিচার করা হইয়াছে। প্রকৃতি-পুরুষ-সংসর্গ হইতে যে সর্ব্ব প্রাণীর উৎপত্তি, তাহাই এ স্থলে উক্ত হইয়াছে (কেশব)।

তাহা হয় ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে—সে সমুদায়ই অসৎ ক্ষেত্র 'সৎ' ক্ষেত্রজ্ঞের পরস্পর অধ্যাসরূপ সংযোগ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে (শঙ্কর)। তাহা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের ইতরেতর-সংযোগ হইতেই উৎপন্ন হয় (রামানুজ)। অবিবেককৃত আত্মাধ্যাস হেতু ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের যে সংযোগ হয়—তাহা হইতে সঞ্জাত হয় (স্বামী)। অবিদ্যা ও তাহার কার্য্যাত্মক জড় বা এই অনির্ব্বচনীয় সদসৎ-রূপ দৃশ্যজাত ক্ষেত্র, এবং তাহা হইতে বিলক্ষণ ও তাহার উদ্ভাসক স্বপ্রকাশ পরমার্থ সৎ চৈতন্য অসঙ্গ উদাসীন নির্ধর্ম্মক অদ্বিতীয় ক্ষেত্রজ্ঞ—এই দুইয়ের মায়াবশে অবিবে

নিমিত্ত মিথ্যা-তাদাত্ম্য-অধ্যাসহেতু সত্য মিথ্যা মিথুনীকরণাত্মক ইতরেতর সম্বন্ধরূপ যে সংযোগ, তাহা হইতেই উৎপন্ন হয় (মধু)। তাহা ক্ষেত্র বা প্রকৃতির সহিত ক্ষেত্রজ্ঞের (জীবের) সংযোগ হইতে হয়। ঈশ্বর প্রকৃতিকে এবং জীবকে নিয়মিত করিয়া প্রবর্ত্তিত করেন, উভয়কে সম্বদ্ধ করেন। তাহা হইতে দেহোৎপত্তির দ্বারা প্রাণী সৃষ্ট হয়—ইহাই অর্থ (বলদেব)। এই সমুদায় ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়, কেবল পুরুষ বা কেবল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয় না (কেশব)।

স্থাবর জঙ্গম—যাহাদের স্বতঃপ্রবর্ত্তিত গতি নাই, যাহারা অচল, সেই জড়বর্গই স্থাবর। আর যাহারা স্বতঃপ্রবর্ত্তিত হইয়া গমন করে, সেই সকল প্রাণিবর্গই জঙ্গম। কেবল উদ্ভিদ্‌কেই যে স্থাবর বলে, তাহা নহে। গীতায় উক্ত হইয়াছে—"স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ" (১০।২৫)। অতএব স্থাবর-সমুদায় স্থিতিশীল জড়বর্গ। এ জগতে যাহা কিছু সত্ত্ব বা সত্তা-যুক্ত বস্তু আছে—তাহাকে দুই ভাগে বিভাগ করা যায়—স্থাবর ও জঙ্গম। ন্যায়দর্শন অনুসারে সত্তাই পরা জাতি। তাহার দুই অপর জাতি—এই স্থাবর ও জঙ্গম। স্থাবর ও জঙ্গমকে সাধারণতঃ জড় ও জীব বা প্রাণী, অচেতন ও চেতন বলা হয়। স্থাবর ও জড় যে জড় পরমাণুবিশেষের সমবায়-সংযোগে জাত এবং তাহা জীব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, ইহাই আমাদের ধারণা। কিন্তু এ স্থলে এ জড়কেই এই ('রাগবিরাগয়োর্যোগঃসৃষ্টিঃ'—ইতি সাংখ্যসূত্র) এই সামান্য (genus) সত্তার অন্তর্গত করা হইয়াছে—উভয়ের কারণ যে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বা প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ, ইহাও উক্ত হইয়াছে। অতএব জীবের ন্যায় জড়ও প্রকৃতি-পুরুষের বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে উৎপন্ন সত্তা। সামান্য বালুকণা, এমন কি, সামান্য অণু পর্য্যন্ত যাহা কিছু জড় দেখি, সমুদায়ের মূল যে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ, প্রত্যেকের মধ্যে যে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ আছেন, এবং তাঁহার সহিত সংযুক্ত ক্ষেত্র

আছে, তাহা এই শ্লোক হইতে বুঝিতে হইবে। প্রতি অণু পরমাণুতে এই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ স্বরূপতঃ অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের ন্যায় থাকেন। প্রত্যেকের মধ্যেই মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা, স্থূলভূতাদি যাহা কিছু ক্ষেত্রের উপকরণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—সকলই থাকে। কোনটিই এই পঞ্চভূতের মধ্যে কোন এক ভূতের অতি সূক্ষ্ম অবিভক্ত অংশমাত্র নহে। প্রতি পরমাণুটিই বা জড়ের অতি সূক্ষ্ম বিভাগযোগ্য অংশই এক একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি (monad) হইয়াও পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। * অনেক অণু পরমাণুতে এবং তাহার সংযোগে গঠিত যে কোন জড়ে ক্ষেত্রের এই সূক্ষ্ম অংশ—অন্তঃকরণ প্রভৃতি বীজভাবে অপ্রকাশিতভাবে থাকে। তাহার বাহ্য ক্রিয়া নাই বা সে ক্রিয়া আমরা বুঝিতে পারি না, এজন্য আমরা তাহাদের কেবল স্থূলভূতেরই রূপমাত্র মনে করি। জড়ে যে চৈতন্য নিহিত আছে, এক আত্মাই সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট, তাহার কোন লক্ষণ আমরা দেখিতে পাই না বলিয়া তাহাকে চৈতন্যহীন মনে করি। সেইরূপ আমরা জড় স্থাবরকে প্রাণহীন মনে করি। কিন্তু কোন সত্তাই প্রাণহীন নহে। সাংখ্যদর্শন অনুসারে প্রাণ অন্তঃকরণের সামান্য বৃত্তিমাত্র (সাংখ্যকারিকা, ২৯)। জড় অণু যখন ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ হইতে উৎপন্ন, যখন তাহাতে ক্ষেত্রের অন্তঃকরণ বীজভাবে নিহিত আছে, তখন অবশ্য সেই অন্তঃকরণবৃত্তি প্রাণেও নিহিত। সকল সত্তাই প্রাণী। শ্রুতিতে আছে, প্রাণ ব্রহ্ম, প্রাণই এ সমুদায়, প্রাণ শক্তি দ্বারা সমুদায় বিধৃত। এই প্রাণই যে পরাপ্রকৃতি, তাহা পূর্ব্বে ৭।৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে।

---

* যাঁহারা এই তত্ত্ব বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করেন, এবং গীতার এই শ্লোকের অর্থ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে চাহেন, তাঁহারা ইংরাজীভাষায় প্রকাশিত জর্ম্মাণ দার্শনিক লাইব নিট্‌স্ (Leibnity) প্রতিপাদিত Monadalogy পাঠ করিবেন। তাহাতে সাংখ্যদর্শনের উপদিষ্ট প্রকৃতিপুরুষবাদ কতকটা বুঝিবারও সুবিধা হইবে।

অতএব এই শ্লোক হইতে বুঝিতে হইবে যে, অণু পরমাণু হইতে হিমালয় প্রভৃতি স্থাবরাত্মক এবং সামান্য কীটাণু হইতে মনুষ্য পর্যন্ত জঙ্গমাত্মক যাহা কিছু সত্ত্ব বিদ্যমান আছে—তাহাতে অন্তঃকরণ ও বহিঃকরণরূপ সূক্ষ্মশরীর অপ্রকাশিতভাবে অপ্রকট চৈতন্যের সহিত ও প্রাণের সহিত অবস্থিত আছে। তাই এই জড় অণু বা কীটাণু ক্রম-বিকাশিত হইতে পারে, এবং তাহার ক্রম-আপূরণ ও জাত্যন্তর পরিণাম হইয়া থাকে। আজি যাহা জড়ের সূক্ষ্ম বিভক্ত অণুমাত্র সত্তা—তাহা হয়ত অনন্ত কালের ক্রম-বিকাশ বা জীবের নিয়ম অনুসারে ক্ষেত্র-ধর্ম্ম-রাগ-বিরাগবশেই চালিত হইয়া রাগ বা আকর্ষণ দ্বারা অন্য অণুর সহিত মিলিত হইয়া নিম্নতম বা ক্ষুদ্রতম জীবাণু হইতে ক্রমোন্নতির নিয়মে বৃক্ষাদি যোনিতে ভ্রমণ করিয়া পরে পশুযোনি ও ক্রমে অন্তঃকরণের ও ইন্দ্রিয়ের বিকাশ ও পরিণতি হেতু মানবযোনিও লাভ করিতে পারে, এবং পরিণামে মুক্তও হইতে পারে। অতএব জগতে অণুটি পর্যন্ত হেয় নহে। প্রত্যেক সত্তার অন্তরে পরমাত্মা পরমেশ্বর নিয়ন্তৃরূপে অবস্থিত আছেন ও পুরুষরূপে অধিষ্ঠিত আছেন, তাহা পরশ্লোকে উক্ত হইয়াছে। (কোন প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ পণ্ডিত বলিয়াছেন—"The consciousness sleeps in stone dreams in animals and awakes in man" * অর্থাৎ চৈতন্য উপলখণ্ডে নিদ্রিত অবস্থায় থাকে, পশুতে তাহা স্বপ্নাবস্থায় থাকে, মানুষে তাহা জাগরিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন যে, অতিক্ষুদ্র—তৃণাদপি অতিক্ষুদ্র উদ্ভিজ্জও "অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখ-দুঃখসমন্বিতাঃ" (মনুসংহিতা, ১।৪৯)।

সত্তা সমুদ্ভূত হয়—অর্থাৎ যে কোন সত্তা স্থূল বাহ্য পাঞ্চভৌতিক

* জর্ম্মাণ পণ্ডিত সপেনহর কৃত "World as Will and Idea" নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

শরীর গ্রহণ পূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করে। সত্তা কাহাকে বলে? সতের ভাবই সত্তা, যাহা সৎ, তাহা ভাবযুক্ত না হইলে প্রকট হয় না। সত্তা (অর্থাৎ Being) ভাবযুক্ত হইয়া ব্যক্ত হয়, (Becoming) ব্যক্ত না হইলে, তাহাকে অসৎ (Nought) ও বলা যায়। এই ভাব দুইরূপ;— নির্ব্বিকার ও বিকারযুক্ত। যাহা সতের নির্ব্বিকার ভাব—তাহা নিত্য। আর যাহা বিকারী—তাহা ষড়্ভাব বিকারযুক্ত জন্মস্থিতি নাশ প্রভৃতির অধীন পরিণামী, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। অতএব প্রত্যেক বিকারী সত্তার ভাববিকার আছে। তাহার জন্ম, বৃদ্ধি, স্থিতি, ক্ষয়, মৃত্যু প্রভৃতি আছে। যে সকল স্থাবর বহুপরমাণুর সংঘাতে উৎপন্ন হয়, তাহার এই জন্মাদি আমাদের প্রত্যক্ষ হয়। পঞ্চস্থূলভূতযুক্ত হইয়া স্থূল শরীর গ্রহণ করিলে বা স্থূলভূত ভাবযুক্ত হইলে, তবে তাহা আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হইতে পারে। সূক্ষ্মাবস্থায় প্রত্যক্ষগোচর হয় না। ক্ষুদ্র অণু প্রভৃতির বা পরমাণুর জন্মাদি আমরা বুঝিতে পারি না, তাহাদের নিত্য জ্ঞান হয়। কিন্তু তাহারা নিত্য নহে। প্রলয়ান্তে সৃষ্টিকালে তাহাদের অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে বা অষ্টধা অপরা প্রকৃতি হইতে, প্রকৃতির পরিণাম হেতু উৎপত্তি এবং প্রলয়ে তাহাদের ধ্বংস হয়। প্রকৃতি একই নিয়মে সর্ব্বত্র পরিণত হয়। প্রকৃতি হইতে একইরূপ বিকার যে ষোড়শতত্ত্ব, তাহা ক্রমে উৎপন্ন হইয়া সম্পূর্ণ ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। কোন স্থূলভূত বা সূক্ষ্মভূত স্বতন্ত্র থাকে না। তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে পঞ্চভূতই থাকে; এবং তাহার অন্তরালে পঞ্চতন্মাত্র, তাহার অন্তরালে কারণরূপে সূক্ষ্ম শরীর এবং তাহার অন্তরালে মূল প্রকৃতি থাকে। সৎকার্য্যবাদ অনুসারে কার্য্য কারণের অন্তর্ভূত; কারণ হইতেই কার্য্যের বিকাশ এবং কার্য্য ধ্বংসে কারণেই লয় হয়। সাংখ্যদর্শনের ইহাই সিদ্ধান্ত। এজন্য পঞ্চস্থূল-ভূতের অন্তরালে তাহার কারণ সূক্ষ্মভূত বা তন্মাত্র থাকে; তন্মাত্রের অন্তরালে তাহার কারণ অহঙ্কার থাকে ইত্যাদি। অতএব প্রত্যেক

সত্তার মূল প্রকৃতি ও তাহার পরিণাম ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব মিলিত হইয়া সর্ব্বত্র সর্ব্বসত্তায় অবস্থান করে। পুরুষসংযোগ ব্যতীত প্রকৃতির এই পরিণতি হয় না বলিয়া পুরুষও তাহার অন্তরালে প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়া অবস্থান করে। গীতার ইহাই সিদ্ধান্ত। এই ভাবে সাংখ্যদর্শনের তত্ত্ব সম্বন্ধে যে আপত্তি, তাহা অনেকটা মীমাংসিত হয়। পরমাণু পর্য্যন্ত প্রতি ব্যক্তিভাবে প্রকাশিত সত্তার মধ্যে এইরূপে সংযুক্ত পুরুষ-প্রকৃতি এবং সেই সংযোগ হেতু প্রকৃতির সমুদায় পরিণাম অবস্থিত। তাহারা সূক্ষ্মভাবে থাকিতে পারে, স্থূল হইয়াও সমুদ্ভূত হইতে পারে। পুরুষ ও অষ্টধা অপরা প্রকৃতিজ লিঙ্গদেহযুক্ত সকলই সৃষ্টি হইতে প্রলয় পর্য্যন্ত অথবা মোক্ষ পর্য্যন্ত স্থায়ী। যাহা প্রকৃতি বিকৃতি ষোড়শবিধ—তাহারই সংযোগ-বিয়োগ হয়। সংযোগ হেতু জন্ম বা উদ্ভব এবং বিয়োগ হেতু মৃত্যু। ইহাই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল সংসার বা জগৎ। এইরূপে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ-সমুদ্ভূত সমুদায় স্থাবরজঙ্গমাত্মক সত্ত্বের তত্ত্ব বুঝিতে হইবে। * শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৩।১২ মন্ত্রে) আছে—"মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈব প্রবর্ত্তকঃ।" এই সত্ত্ব অন্তঃকরণ নহে। ইহাই সর্ব্ব-স্থাবরজঙ্গমাত্মক সত্ত্ব। এক পুরুষই এ সকলের প্রবর্ত্তক। তিনি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞরূপে উভয়কে সংযুক্ত করিয়া সকল সত্ত্বের উৎপাদন করেন।"

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ—পূর্ব্বে (১৩।২) শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে—

"ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম।"

---

* সমুদায় সত্তা বা সমুদায় ভূত যে এক অর্থে জীব, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তবে যাহাদের এই প্রাণশক্তি বা জীবনীশক্তি অভিব্যক্ত, তাহাকেই সাধারণতঃ প্রাণী বলে। আর যাহাতে প্রাণশক্তি অনভিব্যক্ত, তাহাকে জড় বলে। যাহাকে আমরা জড় বলি, তাহা যে প্রাণযুক্ত এ তত্ত্ব সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু প্রতিপন্ন করিয়াছেন; তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। জড়বাদী হার্বার্ট স্পেন্সরও বলিয়াছেন, "The conception to which physicist tends is muchless that of universe of everywhere alive; dead-matter than that of a universe if not in the stictest sense still in a general sense.

এই তত্ত্ব ভগবান্ অর্জ্জুনকে এই অধ্যায়ের প্রথমেই উপদেশ দিয়াছেন। ইহা ভগবানের পূর্ব্বে কেহ উপদেশ দেন নাই—এজন্য ইহা 'আমার মত' ভগবান্ এই কথা বলিয়াছেন। যে স্থলে প্রাচীন ঋষিদের মত উক্ত হইয়াছে, সে স্থলে 'উচ্যতে' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ আছে।

যাহা হউক, পূর্ব্বে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই জ্ঞান, ইহা উক্ত হইয়াছে। এ স্থলে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগে সমুদায় স্থাবরজঙ্গমাত্মক সত্ত্বের উদ্ভব, ইহা উক্ত হইল। অতএব ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ ও তাহাদের সংযোগ বুঝিতে পারিলেই এই জগৎতত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে।

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগই পুরুষ-প্রকৃতি-সংযোগ—পুরুষ-প্রকৃতি সংযোগ ও ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ এক অর্থে একই। সমষ্টিভাবে এই জড় জীবময় বা স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় জগতের মূল কারণ—এই প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ। আর ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক সত্ত্বার উৎপত্তিকারণ—এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ। ব্যষ্টির জ্ঞান হইলে তাহা হইতে সমষ্টির জ্ঞান হয়। পুরুষই এক অবিভক্ত হইয়া প্রতি শরীরে বিভক্তের ন্যায় হয়েন, এবং সেই শরীরের ক্ষেত্রজ্ঞ হন। আর প্রকৃতি এক হইয়াও তাহার গুণ ও বিকার হেতু তাহা হইতে বহু শরীরের উৎপত্তি হয়,—সামান্য অণু হইতে পর্ব্বত এবং সামান্য কীটাণু হইতে মনুষ্যদেহ পর্য্যন্ত সমুদায় শরীর উৎপন্ন হয়। প্রকৃতি হইতে জাত প্রতি শরীরে বা প্রতিক্ষেত্রে পুরুষ সংযুক্ত থাকিয়া সেই ক্ষেত্রজ্ঞ হয়েন, আর সমষ্টিভাবে সর্ব্বশরীরে পুরুষ পরমেশ্বর-রূপে এক ক্ষেত্রজ্ঞ হন। শুধু ক্ষেত্রজ্ঞ নহেন—তিনি প্রতিক্ষেত্রে সমষ্টি-ভাবে অন্তর্যামী ও নিয়ন্তা হন। এ তত্ত্ব আমরা পূর্ব্বে নানারূপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

এই পুরুষ-প্রকৃতি-সংযোগ হইতে যে সংসার, তাহা সাংখ্য-দর্শনের অভিমত। তবে সাংখ্য-দর্শন অনুসারে পুরুষ বহু। বহু বদ্ধ পুরুষের সহিত প্রকৃতি সংযুক্ত হইলে প্রত্যেক পুরুষের বন্ধন উপযোগী নানারূপ

শরীর বা ক্ষেত্র সৃষ্ট হয়, এবং সেই শরীরে বদ্ধ থাকিয়া সেই দেহস্থ পুরুষ সেই দেহেরই ক্ষেত্রজ্ঞ হয়। গীতায় এই অর্থে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ উক্ত হয় নাই, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ সব তত্ত্ব আর এ স্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই।

শঙ্করাচার্য্যের মতে ক্ষেত্র অসৎ ও সংযোগ অধ্যাস মাত্র— শঙ্করাচার্য্য বলেন যে, যে জীব ও পরমেশ্বরের অভেদজ্ঞানই মোক্ষের সাধন, ইহা 'যৎ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ' ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাই যে সিদ্ধান্ত, ইহার হেতু দেখাইবার জন্য এই শ্লোকের আরম্ভ করা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ অবলম্বন করিয়া, এই ক্ষেত্র মায়া-নির্ম্মিত হস্তী বা স্বপ্ন-দৃষ্ট গন্ধর্ব্বনগরাদির ন্যায় অসৎ হইলেও সত্যের ন্যায় বিজ্ঞাত হইয়া থাকে।

শঙ্করাচার্য্য আরও বলিয়াছেন যে, এজন্য ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ অধ্যাস-মূলক। এই সংযোগ অবয়বের সহিত অবয়বীর সংযোগ হইতে পারে না; কারণ, আকাশের ন্যায় ক্ষেত্রজ্ঞের কোন প্রকার অবয়ব নাই। এই সংযোগ সমবায়-সম্বন্ধ-জনিতও নহে। তন্তু এবং পটের মধ্যে যে সমবায় সংযোগ-সম্বন্ধ আছে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে সে প্রকার সংযোগও হইতে পারে না। এই সংযোগ কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ-জনিত। তন্তু বস্ত্রের কারণ, বস্ত্র তাহার কার্য্য। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-মধ্যে এরূপ কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ নাই। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ পরস্পর বিলক্ষণ-স্বভাব। ক্ষেত্র জ্ঞানের বিষয়, আর ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানস্বরূপ। ইহাদের মধ্যে বাস্তব কোন সংযোগ থাকিতে পারে না। অতএব সংযোগের কারণ—অধ্যাস। পরস্পরমধ্যে অধ্যাসরূপ যে সম্বন্ধ আছে, তাহাই এই স্থলে এই সংযোগ শব্দের অর্থ। ক্ষেত্রজ্ঞের ধর্ম্ম ক্ষেত্রে আরোপিত হয়, এবং ক্ষেত্রের ধর্ম্ম ও তাদাত্ম্য ক্ষেত্রজ্ঞে আরোপিত হয়, এবং ক্ষেত্রের তাদাত্ম্য ক্ষেত্রজ্ঞে আরোপিত হয়। এই প্রকার পরস্পরের স্বরূপ ও

ধর্ম্মের পরস্পরে যে আরোপ, তাহাই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপগত বিবেকের অভাবই এই সংযোগের কারণ। এই অধ্যাসরূপ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ মিথ্যাজ্ঞান।

শঙ্করাচার্য্য আরও বলেন যে, শাস্ত্রে যেরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে, তদনুসারে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ অগ্রে জানিয়া মুঞ্জতৃণমধ্য হইতে যে তাহার ইষীকা বা বীজ পৃথক্ করা যায়, সেইরূপে ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রজ্ঞকে পৃথক্ করিয়া, তাহা 'সৎ বা অসৎ বস্তু নহে' এই সকল শাস্ত্রের সহায়ে ক্ষেত্রজ্ঞকে সর্ব্বোপাধিমুক্তস্বভাব পরব্রহ্মরূপে যে দর্শন করিতে পারে, এবং ক্ষেত্রকে মায়াময় মিথ্যা অসৎরূপে যে দেখিতে পারে, তাহার মিথ্যাজ্ঞান অপগত হওয়ায় তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। তখন আর তাহার পুনর্জন্মের কারণ থাকে না,—মোক্ষলাভ তাহার পক্ষে সুলভ হয়।

অতএব শঙ্করাচার্য্য এবং তাঁহার অনুবর্ত্তী গিরির মতে এই ক্ষেত্র অজ্ঞানকল্পিত এবং এই সংযোগ অধ্যাস মাত্র—প্রকৃত নহে। এই সংযোগ সম্বন্ধে রামানুজ ও মধুসূদন বলেন,—এ সম্বন্ধ ইতরেতর সম্বন্ধ। স্বামী বলেন, অবিবেককৃত আত্মাধ্যাস হেতু এই সংযোগ হয়। বলদেব বলেন, ঈশ্বরই তাঁহার পরাপ্রকৃতি জীবের অর্জ্জিত, তাঁহার অপরা প্রকৃতি অষ্টধা প্রকৃতির সংযোগ বা সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দেন।

সংযোগ অধ্যাস নহে—এ স্থলে শঙ্করাচার্য্যের অর্থ গ্রাহ্য হইতে পারে না। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগের কারণ যে অধ্যাস, ইহাই তিনি সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু অধ্যাস সংযোগের পূর্ব্বে থাকিতে পারে না। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ না হইলে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞের অধ্যাস এবং ক্ষেত্রজ্ঞে ক্ষেত্রের অধ্যাস হইতে পারে না। সুতরাং এই সংযোগ অধ্যাসের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী। এজন্য এই সংযোগই অধ্যাসের কারণ, অধ্যাস সংযোগের কারণ হইতে পারে না। আর সংযোগের ন্যায় অধ্যাসও একটি 'সৎ' এবং আর একটি অসৎ বা মিথ্যা-জনিত বস্তুর মধ্যে হইতে পারে না। ক্ষেত্র

থাকিলেও অধ্যাস হইতে পারে না। অধ্যাসকে সাধারণতঃ ভ্রম বলা যায়। ইহাকে যোগসূত্রে 'বিকল্প' ও বিপর্য্যয়রূপ চিত্তবৃত্তি বলে। ইংরাজীতে ইহাকে Illusion delusion hallucination বলে। ইহার সকলকেই অধ্যাস বলা যায় না। রজ্জু সম্মুখে দেখিয়া যদি তাহাতে সর্প-ভ্রম হয়, তাহাকেই অধ্যাস বলে। রজ্জু না থাকিলেও যদি সর্প-ভ্রম উপস্থিত হয়, তাহা অধ্যাস নহে। এজন্য কোন ভাব-পদার্থ অবলম্বন ব্যতীত অধ্যাস হয় না।. অসতের ভাব হয় না। যাহা অসৎ, তাহা অবলম্বন করিয়া অধ্যাস হয় না। রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস স্থলে রজ্জু অসৎ নহে। শঙ্করাচার্য্য যে ক্ষেত্রকে অসৎ মিথ্যা, স্বপ্নদৃষ্টরূপ গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় অলীক বলেন, তাহাই তত্ত্ব হইলে, তাহাতে আত্মার অধ্যাস ও আত্মাতে এই কল্পিত পদার্থের ধর্ম্মাধ্যাসরূপ যে সংযোগ, তাহা সম্ভব হইত না।

এ সম্বন্ধে আরও এক কথা বুঝিতে হইবে। এই অধ্যাসের স্থান বা অধিকরণ কোথায়? চিত্তে বা চিত্তরূপ উপাধিতেই এই অধ্যাস হয়। পাতঞ্জল দর্শন অনুসারে ইহা চিত্তবৃত্তিবিশেষ। চিত্তবৃত্তি-নিরোধ হইলে এ অধ্যাস থাকে না। সুতরাং চিত্তের সহিত আত্মার বা পুরুষের সংযোগ না হইলে, পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ না হইলে এ অধ্যাস হয় না। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ বিনা কোনরূপ অধ্যাসই সম্ভব নহে। সুতরাং অধ্যাস এই সংযোগের কারণ নহে।

অধ্যাসই যদি এই সংযোগের কারণ হইত, তবে স্থাবর সত্তায় বা জড়ে এই পুরুষ-প্রকৃতি-সংযোগ কোনরূপে বুঝা যাইত না। জড় সত্তার অধ্যাস সেই জড়ে নাই। তাহার চৈতন্য বা চিত্ত সমুদায়ই অপ্রকাশিত— বীজভাবে স্থিত। আমার জ্ঞানে সে সত্তা জড়রূপে প্রতিভাত মাত্র। অতএব তাহার সত্তাভাব অসৎ, আমার জ্ঞানের অধ্যাস মাত্র, ইহাই বলিতে হয়। তাহা হইলে সেই সত্তাই পুরুষ-প্রকৃতি-সংযোগ বা অধ্যাস তাহার উদ্ভবের কারণ, ইহা বলা যায় না।

যাহা হউক, শঙ্করাচার্য্যের মত সত্য হইলে গীতার সমুদায় উপদেশ মিথ্যা ও ব্যর্থ হয়। গীতা অনুসারে পুরুষ প্রকৃতি দুই অনাদিতত্ত্ব। প্রকৃতির গুণ ও বিকার হইতে শরীর বা ক্ষেত্র হয়। পুরুষ সেই প্রকৃতিজ শরীরে স্থিত হইয়া ভোক্তা হয়, এবং প্রকৃতিজ গুণসঙ্গ হেতু তাহার সদসদ্‌যোনিভ্রমণ হয়। অজ্ঞান হেতুই অবশ্য পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজ গুণে আসক্ত হয়। এক অর্থে অজ্ঞানই যে এই সংযোগের কারণ, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু পুরুষ বা ক্ষেত্রজ্ঞ এই অজ্ঞান হেতু প্রকৃতিতে বা ক্ষেত্রে সংযুক্ত হইয়া তাহাতে বদ্ধ হইলেও ক্ষেত্র সেই অজ্ঞানমূলক মিথ্যা কল্পিত বস্তু নহে। অন্ততঃ গীতার সে উপদেশ নহে।

ক্ষেত্র মিথ্যা নহে।—আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, শঙ্করাচার্য্য মায়াকে পরমেশ্বরের পরা গতি বলিয়াছেন। শ্রুতি (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্) অনুসারে সেই পরা গতি দ্বিবিধ—তাহা জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়ারূপা। এই শক্তির কারণাবস্থা মায়া, আর ইহার কার্য্যাবস্থায় বা জ্ঞান ও বলরূপে ক্রিয়া অবস্থায় ইহাই প্রকৃতি। শ্রুতিতে আরও আছে যে, এই মায়াই প্রকৃতি। আর যিনি মায়ী, এই মায়াযুক্ত বা এ মায়ার আধার, তিনি পরমেশ্বর। শ্রুতিতে আরও আছে যে, শক্তি ও শক্তিমানে কোন প্রভেদ নাই। এ সকল কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। অতএব প্রকৃতি যদি ভগবৎশক্তি বা ব্রহ্মশক্তি বলিয়া শঙ্কর স্বীকার করেন, তবে কিরূপে সেই প্রকৃতিজ ক্ষেত্রকে তিনি মিথ্যা বলেন, বলিতে পারি না। শক্তি নিত্য, তাহার নাশ নাই। কারণাবস্থায় তাহা বীজরূপে থাকে মাত্র। শঙ্কর নিজেই বলিয়াছেন যে, কারণের অন্তর্ভূত শক্তি, এবং শক্তির অন্তর্ভূত কার্য্য। এই ক্ষেত্র—কার্য্য, ইহার অন্তর্ভূত—শক্তিরূপা মায়া বা প্রকৃতি। তাহা সৎ। সৎ না হইলে, বলিয়াছি ত তাহা হইতে কার্য্য বা ভাববিকার হয় না।

গীতায় ভগবান্ প্রকৃতিকে ও মায়াকে 'তাঁহারই' বলিয়াছেন। মায়া মিথ্যা, তাহাতে যদি ভগবানের এইরূপ 'আমার' বলিয়া অধ্যাস হইয়াছে বলা যায়, তবে অবশ্য এই মিথ্যা অধ্যাস হেতু তাঁহার 'জ্ঞান'—অজ্ঞান হয়। তিনি উপদেষ্টা হইতে পারেন না। অতএব গীতা অনুসারে প্রকৃতি ও প্রকৃতির পরিণাম ক্ষেত্র—সত্যতত্ত্ব, তাহা অনাদি। ভগবান্ সেই ক্ষেত্রজ্ঞানের উপদেশ দিতেছেন। সেই জ্ঞানই জ্ঞান, তাহা বলিতেছেন। সেই জ্ঞানই যে মিথ্যা জ্ঞান অথবা তাহা মিথ্যা অসৎ এই জ্ঞান, তাহা বলেন নাই। তিনি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়ই,—তত্ত্বজ্ঞানই জ্ঞান,—ইহাই বলিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে একটি সৎ ও আর একটি অসৎ, এই জ্ঞানই উপদেশ দেওয়া যদি ভগবানের অভিপ্রেত হইত, তবে অবশ্য তিনি তাহার স্পষ্ট উপদেশ দিতেন। উপদেষ্টার উপদেশ যদি অস্পষ্ট বা বিকল্পাত্মক হয়, তবে তাহা বৃথা। আরও বুঝিতে হইবে যে, যদি ক্ষেত্রজ্ঞ 'সৎ' এবং ক্ষেত্র 'অসৎ' এতদুভয়ের বিবেকজ্ঞানোপদেশই অভিপ্রেত হইত, তবে পূর্ব্বোক্ত এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে 'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং' না বলিয়া ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিবেকজ্ঞান অবশ্য বলা হইত। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ এ স্থলে দ্বন্দ্বসমাস হেতু সমানাধিকরণতাযুক্ত। এ উভয়ের জ্ঞান তুল্যরূপে এ স্থলে উক্ত হইয়াছে। অতএব ইহার মধ্যে একটি সত্যতত্ত্ব আর একটি মিথ্যাতত্ত্ব, ইহা গীতার উপদেশ বলিয়া কখনই গ্রহণ করা যায় না।

সংযোগের অর্থ—এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ যদি উভয়ই সত্যতত্ত্ব হয়, তবে তাহাদের সংযোগ বুঝা কঠিন হইবে না। রামানুজ ও মধু বলিয়াছেন —ইহা ইতরেতর-সংযোগ। ক্ষেত্র জড় ও ক্ষেত্রজ্ঞ চৈতন্য ; জড় ও চৈতন্য এতদুভয়ের পরস্পর সংযোগ কিরূপে সম্ভব ? এই প্রশ্ন হইতে পারে। কেন না, যাহারা পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মী, তাহাদের মধ্যে সংযোগ ধারণা করা যায় না। বলদেব এই সংযোগের কারণ যে ঈশ্বর বা স্বয়ং পরমপুরুষ, তাহাই অঙ্গীকার করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত মেনত্রাঁদে

প্রভৃতি occasionalism মত দ্বারা এবং লাইবনিট্‌স্ প্রভৃতি Pre-established harmony দ্বারা এই সংযোগ কতকটা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এ স্থলে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই। বলদেবের ব্যাখ্যা ইঁহাদের ব্যাখ্যার কতকটা অনুরূপ হইলেও ভিন্ন। যাহা হউক, এই সংযোগতত্ত্ব বলদেব যেরূপ বুঝাইয়াছেন, তাহাই অধিক সঙ্গত বোধ হয়। আমরাও পূর্ব্বে এইরূপে ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মই বহু বিশেষ সত্ত্ব।' নামরূপের দ্বারা কল্পনা করিয়া তাহা সৃষ্টি পূর্ব্বক তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হন। এই অনুপ্রবেশ হেতু ব্রহ্ম, স্বকল্পিত ও স্বীয়পরাশক্তি-রূপা উপাদান হইতে সৃষ্ট বস্তুতে বা সত্তাতে সংযুক্ত হইয়া অবস্থিত হন। এই সংযোগ ও অবস্থান হেতুই তিনি পুরুষ হন। প্রতিক্ষেত্রে তিনি ক্ষেত্রজ্ঞরূপে অবস্থিত থাকেন। প্রতিক্ষেত্রে তাঁহারই পরাশক্তি বা মায়াখ্য প্রকৃতি দুইরূপ—এক অপরা জড়রূপ ও পরা জীবরূপ। জীবরূপ পরা প্রকৃতি সেই ক্ষেত্রেরই অন্তর্ভূত। সেই জীবভাবযুক্ত প্রকৃতি-অধিষ্ঠিত পুরুষ পরিচ্ছিন্নের ন্যায় হইয়া, অজ্ঞানাবৃতের ন্যায় হইয়া ক্ষরপুরুষভাবে প্রতি ক্ষেত্রে স্বতন্ত্ররূপে বিভক্তের ন্যায় হইয়া ক্ষেত্রজ্ঞ হন। এ কথা আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি, এবং পরবর্ত্তী শ্লোকে তাহা আরও বিশদ-ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব। অতএব ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ ব্যাপারে ভগবানের যে মত, আমরা যে ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহাই উপনিষদে উপদিষ্ট এবং তাহাই গ্রাহ্য। এই মতানুসারেও সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দর্শনের বাধা হয় না ; কেবল সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব মায়াময়,পরমার্থভাবে অসত্য, ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয় না। অথবা নির্গুণ ব্রহ্ম পারমার্থিক তত্ত্ব নহে, ইহাও স্থাপনার চেষ্টা করিতে হয় না। এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগে ভূতগণের উৎপত্তি-তত্ত্ব পরে (১৪।৩,৪ শ্লোকে) বিবৃত হইয়াছে। সেই শ্লোকের ব্যাখ্যা এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য।

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭

—o✦o—

পরমেশ সর্ব্বভূতে সমভাবে স্থিত
বিনাশী সবার মাঝে তিনি অবিনাশী
এরূপে যে হেরে সেই করে দরশন ॥ ২৭

২৭। পরমেশ সর্ব্বভূতে সমভাবে স্থিত—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের
য অজ্ঞান হেতু সংযোগ হইতে সংসারে বার বার জন্মভোগ করিতে
য়, সেই পুনরাবর্ত্তনরূপ সংসারবীজের নিবৃত্তি বা বিনাশের কারণ যে
মাত্মতত্ত্বজ্ঞান, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইলেও পুনর্ব্বার অন্য প্রকারে এ স্থলে
উপদিষ্ট হইয়াছে (শঙ্কর)।

'সম' অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ভাবে ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সর্ব্বভূত বা
প্রাণীর মধ্যে পরমেশ্বর অবস্থিত। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অব্যক্ত ও
আত্মা' হইতে পরম সেই পরমপুরুষ পরমেশ্বর (শঙ্কর)। পূর্ব্ব-
শ্লোকোক্ত ইতরেতর সম্বন্ধ দ্বারা যুক্ত ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞরূপ যে সর্ব্বভূত দেবাদি
নানা প্রকার আকারে অভিব্যক্ত, তাহা হইতে বিযুক্তভাবে, অথচ সেই
সর্ব্বভূতের দেহ মন প্রভৃতির পরম ঈশ্বররূপে অবস্থিত এই আত্মা।
তিনি জ্ঞাতৃস্বরূপে বা জ্ঞাতৃভাবে সমান আকারে সর্ব্বভূতে অবস্থিত
রামানুজ)। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্ব্বভূতে নির্ব্বিশেষ সংরূপে বা সত্তাভাবে
পরমাত্মা অবস্থিত (স্বামী)। প্রপঞ্চান্তঃপাতী স্থাবর-জঙ্গমাত্মক
সর্ব্বভূতে লীলার্থ অনেকবিধ রসভোগার্থ অবস্থিত, এবং রসানুভবার্থ
নীচোচ্চাদি ধর্ম্মরহিত, এজন্য সমভাবে স্থিত (বল্লভ)। সর্ব্বভূত
অর্থাৎ ভবন (উৎপত্তি)-ধর্ম্মক স্থাবরাস্থাবরাত্মক প্রাণিবর্গ। তাহাতে

সর্ব্বত্র একরূপে সর্ব্বজড়বর্গের সত্তা স্ফূর্ত্তি প্রদান দ্বারা পরমেশ্বর অবস্থিত (মধু)। পরাপ্রকৃতি ও অপরাপ্রকৃতি-সংযুক্ত স্থাবরজঙ্গমাত্মক দেহবান্ সর্ব্বজীবে একরসরূপে পরমেশ্বর অবস্থান করেন (বলদেব)। সম—অর্থাৎ নানা স্থাবরজঙ্গমরূপ সবিশেষ ভূতভাবমধ্যে তাহা হইতে বিলক্ষণ নির্ব্বিশেষ ভাবে উৎকর্ষাপকর্ষরহিত ভাবে। পরমেশ্বর,—অর্থাৎ পরম এবং ঈশ্বর। পরম অর্থাৎ দেহ, মন, বুদ্ধি, জীবাত্মা হইতে পরম এবং তাহাদের নিয়ন্তা ঈশ্বর (গিরি)।

পূর্ব্বে প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ হইতে সংসারের উদ্ভব-তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে। সেই সংসার হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রকৃতি-বিযুক্ত আত্ম-দর্শনের উপায় এ স্থলে উক্ত হইতেছে। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গমাদি সমুদায় ভূতে সমভাবে অর্থাৎ দেবমনুষ্যাদি বিভিন্ন আকার-বিযুক্ত হইয়া কেবল জ্ঞান-স্বরূপে অবস্থিত (কেশব)।

বিনাশী সবার মাঝে তিনি অবিনাশী,—এই ভূত সকল বিনাশশীল হইলেও সর্ব্বভূতাত্মা পরমেশ্বর অবিনশ্বর। পরমেশ্বর ও ভূতগণের মধ্যে যে আত্যন্তিক বৈলক্ষণ্য আছে, তাহাই ইহা দ্বারা দেখান হইয়াছে। সকল প্রকার বিকারের মধ্যে জন্ম বা উৎপত্তিরূপ বিকারই সকল বিকারের আদি। অপচয় উপচয় হইতে বিনাশ পর্য্যন্ত অন্য যে বিকার ভাবপদার্থের হইয়া থাকে, সে সকলই জন্মের পরবর্ত্তী। বিনাশের পর আর কোন বিকারের সম্ভাবনা নাই। বিনাশের পর আর সে ভাবপদার্থই থাকে না; এজন্য তাহার আর কোন বিকারই থাকে না। ধর্ম্মীতেই ধর্ম্ম অবস্থিতি করে। পরমেশ্বরে সকল প্রকার ভাববিকারের যে শেষ, তাহার প্রতিষেধ দ্বারা বিনাশের পূর্ব্বভাবী সর্ব্ববিকারও সেই আত্মাতে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং কোন প্রকার বিকারের কার্য্য আত্মাতে সম্ভবপর নহে। সর্ব্বভূত এই ষড়্ভাববিকারের অধীন। এই হেতু বিকারী সর্ব্বভূত হইতে সর্ব্ববিকাররহিত

পরমেশ্বরের বৈলক্ষণ্য ও নির্ব্বিশেষত্ব সিদ্ধ হইতেছে (শঙ্কর)। সেই সর্ব্ববিনাশশীল দেহাদিতে বিনাশের অযোগ্যস্বভাবহেতু অবিনশ্বরভাবে পরমেশ্বর অবস্থিত (রামানুজ)। বিনাশী সর্ব্বভূতে অবিনাশিভাবে পরমেশ্বর অবস্থিত (স্বামী)। দেহনাশ হেতু বিনাশশীল সর্ব্বভূতে, তাহা হইতে বিলক্ষণ অবিনাশী পরমেশ্বর। দ্বিবিধ প্রকৃতিসংযোগ হইতে উৎপন্ন; সুতরাং বিবিধ বিনাশধর্ম্মী জীব হইতে একরস অবিনাশী পরমেশ্বরের বৈলক্ষণ্য এইরূপে দেখান হইয়াছে (বলদেব)।

অনেকবিধ জন্মাদিরূপ পরিণামশীল, আর গুণপ্রধান ভাবাপত্তিদ্বারা বিষয়ের আকর্ষণ হেতু চাঞ্চল্যযুক্ত—অতএব প্রতিক্ষণ পরিণামশীল এবং এজন্য পরস্পরে বাধ্যবাধকভাবাপন্ন হইয়া পরিণামশীল ও বিনাশ বা মায়াসন্দর্শনগবাদির ন্যায় দৃষ্ট-নষ্টভাবযুক্ত এই সর্ব্বভূত। আর প্রতিদেহে এক, জন্মাদি পরিণামশূন্য, বাধ্যবাধকভাবশূন্য, সর্ব্বদোষবিরহিত দৃষ্ট-নষ্ট-প্রায় সর্ব্বদ্বৈতবাধা দ্বারা অবাধিত এবং সর্ব্বপ্রকারে জড়প্রপঞ্চ হইতে বিলক্ষণ এই পরমেশ্বর (মধু)। সেই বিনাশশীল সর্ব্বভূতে অর্থাৎ তাদৃশ লীলাববোধরাহিত্য হেতু বিনাশপ্রাপ্ত সর্ব্বভূতে, অন্যথাভাবে ক্রোধাদিরহিত হইয়া সেই সেই লীলানুভবকারী অবিনাশী পরমেশ্বরকে যে দেখিতে পারে, সেই পরমেশ্বরকে দর্শন করে। যে এরূপ দর্শন করিতে অসমর্থ, সে অপরাধী হয় (বল্লভ)।

বিষমাকার দেহ বিনাশী হইলেও তাহাতে অবিনাশী অর্থাৎ বিনাশের অযোগ্য ও নিত্য স্বরূপে অবস্থিত (কেশব)।

পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২০শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই ষড়্‌ভাব-বিকারের কথা উক্ত হইয়াছে। এই শ্লোকের অর্থগ্রহণ জন্য তাহা দেখিতে হইবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৬শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, অসতের ভাব হয় না। যাহা 'সৎ', তাহারই ভাব হয়। সেই ভাব দুইরূপ,—এক বিকার-হীন ভাব, আর এক জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, নাশ প্রভৃতি ছয় প্রকার

বিকারযুক্ত ভাব। যাহা সৎ বিকারহীন, তাহাই আত্মা, পরম পুরুষ বা পরমেশ্বর। এই নিত্য বিকারহীন ভাবের তত্ত্ব পূর্ব্বে অষ্টম অধ্যায়ে ২০শ হইতে ২২শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। আর যাহা ষড়্‌বিকারযুক্ত বা জন্মস্থিতিনাশাদি ভাববিকারের অধীন, তাহা সাংখ্যদর্শন অনুসারে পরিণামী 'সৎ', তাহাই প্রকৃতি। বলদেব বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি গীতা অনুসারে দুইরূপ;—পরাজীবরূপা প্রকৃতি, আর অপরা অষ্টধা জড়প্রকৃতি। এই অপরা ও পরাপ্রকৃতির অর্থাৎ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ হইতে সমুদায় স্থাবরজঙ্গমাত্মক সর্ব্বভূত সত্তা বা জীব। এ কথা কতদূর সঙ্গত, তাহা পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব। যাহা হউক, একই 'সৎ' দুইরূপভাবযুক্ত, এবং প্রত্যেক সত্তায় এই দুই ভাব অনুস্যূত। তাহার একটি নির্ব্বিকার ভাব, আর একটি উক্ত সবিকার ভাব। এই দুই ভাব (যাহাদের আমরা পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায় Noumenon ও Phenomenon বলিতে পারি, তাহারা) পরস্পর পৃথক্‌ভাবে থাকিতে পারে না। এজন্য প্রত্যেক বিকারী ভাবের (Phenomenon) মধ্যে, সতের এই নির্ব্বিকার (Noumenon) ভাবও অনুস্যূত। নির্ব্বিকার 'সৎ' প্রত্যেক বিকারী ভাবের আধার, অথবা মধুসূদনের কথায় তাহার সত্তা স্ফূর্ত্তির কারণরূপে অধিষ্ঠিত। এই নির্ব্বিকার 'সৎ' নির্গুণ ব্রহ্ম। তিনি নির্ব্বিশেষ 'সৎ'রূপে প্রত্যেক বিকারী ভূতের অন্তরে অধিষ্ঠিত। তিনিই সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বররূপে সেই বিকারী ভূতের অন্তর্যামী নিয়ন্তা পরমপুরুষরূপে অধিষ্ঠিত। পটে যেমন চিত্র অবস্থিত, সেইরূপ ব্রহ্মে —এই সর্ব্বভূতময় জগৎ অবস্থিত। অথবা নির্ম্মল শুভ্রপটে যেমন আলোকসাহায্যে ছায়াচিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়া নিয়ত পরিবর্ত্তিত হয়, ব্রহ্ম আধারে, ব্রহ্মমায়াশক্তিদ্বারা সেইরূপ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল সর্ব্বভূতময় জগৎ প্রকাশিত হয়। এই ভাবে সর্ব্ববিনাশশীল ভূতগণের 'সৎ' আধার-রূপে এবং তাহাদের হইতে বিলক্ষণ অথচ তাহাদের অন্তঃস্বরূপে

অবিনাশী অর্থাৎ অপরিণামী নির্ব্বিকার সৎস্বরূপ পরমেশ্বর অবস্থিত আছেন, এই তত্ত্ব বুঝিতে হইবে।

কেবল সর্ব্বভূতের 'সৎ' আধারস্বরূপে যে ব্রহ্ম সর্ব্বভূতে অবস্থিত, তাহা নহে। আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে,ব্রহ্মকে 'সচ্চিদানন্দ'-স্বরূপে ধারণা করা হয়। তিনি কেবল সৎ নহেন, তিনি 'চিৎ' ও আনন্দস্বরূপও বটেন অর্থাৎ ব্রহ্ম যেমন সন্ধিনী-শক্তিযুক্ত, সেইরূপ সংবিৎ ও হ্লাদিনী-শক্তিযুক্ত। সেই অনন্ত সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম অবিভক্ত হইয়াও সৃষ্টিতে বহু পরিচ্ছিন্ন 'সৎ, চিৎ' আনন্দস্বরূপে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া বিভক্তের ন্যায় বোধ হয় এবং অনন্ত সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ পরিচ্ছিন্ন সান্ত হইয়া সদসৎ, চিদচিৎ, আনন্দ-নিরানন্দ এই দ্বৈতভাবযুক্ত বা পরস্পর বিরোধী দ্বন্দ্বভাবযুক্তের ন্যায় (contradictory) প্রতীয়মান হয়। এইরূপ বিভক্তের ন্যায় পরিচ্ছিন্নের প্রতিভাত ব্রহ্ম বা আত্মাই—জীবাত্মা বা ক্ষর পুরুষ। তাহা ভূত বা জীব নহে, ইহা পরে ব্যাখ্যাত হইবে। এই জীবাত্মা বা ক্ষরপুরুষই ব্রহ্ম। প্রতিক্ষেত্রের আধাররূপে ব্রহ্ম স্থিত হইয়া এই ক্ষরপুরুষভাবে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু সর্ব্বক্ষেত্রে নির্ব্বিশেষভাবে কেবল 'সৎ' আধাররূপে তিনি অক্ষর পুরুষ আর সর্ব্বক্ষেত্রে জ্ঞাতা দ্রষ্টা, অন্তর্যামী, নিয়ন্তৃভাবে তিনি পরমেশ্বর পরম পুরুষ। তিনি সর্ব্বভূতে, সমভাবে অপরিচ্ছিন্নরূপে পূর্ণ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে অবস্থিত। তিনি সর্ব্বভূতে সমভাবে, অপরিচ্ছিন্নরূপে, পূর্ণ সর্ব্বদানন্দস্বরূপে অবস্থিত। তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে যেমন 'সৎ'স্বরূপ, সেইরূপ চিৎস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। সর্ব্বভূতে যে জ্ঞান, যে কর্ম্মবৃত্তি ও যে আনন্দভোগজন্য 'কাম' বা বাসনার বিকাশ হয়, তাহারও আধার সেই সর্ব্বভূত-অন্তরে অবস্থিত সচ্চিদানন্দঘন পরমেশ্বর। পরমেশ্বর সর্ব্বভূতের অন্তরে অন্তর্যামিরূপে নিয়ন্তৃরূপে অবস্থান করেন, তাহাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। পরমেশ্বর যে সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত, তাহা পূর্ব্বে গীতায় অনেক স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে।

গীতায় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে—

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ (৫।১৮)

সর্ব্বভূতে কেন সমদর্শন করিতে হইবে, তাহার কারণ উক্ত শ্লোকে বলা হয় নাই। তাহার কারণ এই শ্লোকেই উক্ত হইয়াছে। সর্ব্বভূতে সমভাবে পরমেশ্বর অবস্থান করেন, এই জন্য সর্ব্বভূতে এই সমদর্শন বিহিত। গীতায় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—

'সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ'॥ (৬।২৯)

পরমেশ্বর সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা-রূপে সর্ব্বভূতে অবস্থিত। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—'অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ' (১০।২০)। যাহা আমার আত্মা, তাহাই সর্ব্বভূতের আত্মা; সে আত্মা এক, অতএব আমার আত্মাতেই সর্ব্বভূত অবস্থিত। আত্মা সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত। এই সর্ব্বভূতে যিনি সমভাবে আত্মার অবস্থিতি দর্শন করেন, তিনিই সমদর্শী। তিনি পরমেশ্বকে সর্ব্বত্র দর্শন করেন,এবং সর্ব্বভূতকে এই পরমেশ্বরে দর্শন করেন (৬।৩০) এবং যিনি এই পরমেশ্বরকে এইরূপে সর্ব্বভূতে সমভাবে স্থিত দেখিতে পান, তিনি এই 'একত্ব' আশ্রয় করিয়া অনন্যভক্তিতে ভগবান্‌কেই ভজনা করেন (৬।৩১)। তিনি আত্ম-উপমাদ্বারা সর্ব্বত্র অর্থাৎ সর্ব্বভূতে সমদর্শন করেন, সর্ব্বভূতকে আপনার তুলনায় আপনারই মত দেখেন, কাহাকেও পর বা আপনা হইতে ভিন্ন মনে করেন না (৬।৩২)। গীতায় ভগবান্ আরও বলিয়াছেন,—

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥" (৯।৪-৬)

অতএব পরমেশ্বর সর্ব্বভূতের অন্তরে সমভাবে অবস্থিত (Immanent) থাকিয়াও সর্ব্বভূতভাবের অতীত হইয়া (transcendant ভাবে) অবস্থান করেন। পূর্ব্বে এই অধ্যায়ের ১৭শ শ্লোকে "হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্" ব্রহ্মতত্ত্বব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ সকল কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

পরমেশ্বর যে কেবল সর্ব্বভূতের অন্তরে সমভাবে অবস্থিত থাকেন, তাহা নহে,—তিনি সর্ব্বভূতের নিয়ন্তৃরূপে সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাহাও গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে, যথা—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥"
(গীতা ১৮।৬১)।

এইরূপে আমরা, বিনাশশীল সর্ব্বভূতমধ্যে সমভাবে অবিনাশী পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান বুঝিতে পারি, এবং এই জ্ঞানসাধনা দ্বারা সর্ব্বভূতে ঈশ্বরকে দর্শন করিতে শিক্ষা করিতে পারি।

এরূপে যে হেরে সেই করে দরশন—(যঃ পশ্যতি স পশ্যতি)—যে ব্যক্তি এইরূপে পরমেশ্বরকে দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃত দর্শন করেন; যাহার চক্ষু আছে, সে দেখে বটে, কিন্তু প্রায়ই তাহারা বিপরীত দর্শন করিয়া থাকে। পরন্তু আত্মদর্শীই যথার্থদর্শী। তিমিররোগগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন অনেক চন্দ্র দেখে, কিন্তু যাহার এই রোগ নাই, সে এক চন্দ্রই দর্শন করে বলিয়া সে যথার্থদর্শী, সেইরূপ যে ব্যক্তি এক অবিভক্ত যথোক্ত আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি বিভক্ত ও অনেকাত্মদর্শনকারী অপেক্ষা যথার্থ-দর্শী। অবিদ্যা হেতু যাহার আত্মজ্ঞান ভ্রমাত্মক, সে বিপরীত দর্শনকারী। তাহাদের তুলনায় যাঁহারা সর্ব্বভূতে সমভাবে স্থিত আত্মাকে দর্শন করেন, অবিদ্যাদোষহীন তাঁহারাই যথার্থদর্শী বা সম্যগ্দর্শী।

(শঙ্কর)। অর্থ এই যে, তাঁহারা যথাবস্থিত আত্মাকে দর্শন করেন। আর যাহারা বিষমাকারে দেহাদিতে বিষমাকাররূপে স্থিত জন্মবিনাশযুক্তভাবে আত্মাকে দর্শন করে, তাহারা সংসারী হয় ; অর্থাৎ সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে, ইহাই অভিপ্রায় (রামানুজ)। অর্থাৎ তিনিই প্রকৃত দ্রষ্টা, অন্যে নহে (স্বামী)। তাঁহারাই যথার্থদর্শী, অন্যে নহে (বলদেব)। জড় প্রপঞ্চ হইতে বিলক্ষণ আত্মাকে যিনি বিবেক দ্বারা দর্শন করেন, অর্থাৎ শাস্ত্রচক্ষু দ্বারা দর্শন করেন; তিনিই দর্শন করেন। তিনি জাগ্রদবস্থাকে স্বপ্নের ন্যায় ভ্রম বলিয়া বুঝিতে পারেন। যে অজ্ঞ, সে এই স্বপ্নময় জগৎকে সত্য মনে করে। রজ্জুতে সে সর্প দর্শন করে। শুদ্ধ আত্মদর্শন দ্বারা সেই অবিদ্যা বা ভ্রমের নিবৃত্তি হয়, এবং তাহাতে অবিদ্যাকার্য্যও নিবৃত্তি হয়। এই অবিদ্যা দূর হইলে 'বিশেষ্য' পদ যে আত্মা, তাহাই লাভ হয়। পরমেশ্বর তাহারই বিশেষণ, মর্য্যাদাপূর্ব্বক সেই বিশেষ্য আত্মার পরিবর্ত্তে এ স্থলে বিশেষণ 'পরমেশ্বর'ই ব্যবহৃত হইয়াছে। অথবা এই বিশেষ্য পদ (আত্মা),—বিষম—চঞ্চল—বাধ্যবাধকলক্ষণ—জড়বর্গ হইতে বৈধর্ম্ম্যযুক্ত সমত্বভাবে স্থিত পরমেশ্বররূপ বিশেষণ হইতেই প্রাপ্ত, ইহা বলা যায় (মধু)। ভূতগণ হইতে পরমেশ্বরের বৈলক্ষণ্য প্রথমে উক্ত হইয়া তাহারই উপসংহার করা হইতেছে যে, নির্ব্বিশেষ সর্ব্বভাববিকাররহিত, কূটস্থ এক অদ্বিতীয় ইত্যাদি বিশেষণযুক্ত ঈশ্বরকে যিনি দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃত দ্রষ্টা। যে ঈশ্বরপরাঙ্মুখ অনাত্মদর্শী, সে দর্শন করিলেও বিপরীতদর্শী। যে ঈশ্বরপ্রবণ, সেই সম্যগ্‌দর্শী, ইহাই অর্থ। (গিরি)। তিনিই প্রকৃত আত্মদর্শন করেন (কেশব)।

এ স্থলে মধুসূদন যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। শঙ্কর এ স্থলে পরমেশ্বরের উল্লেখ করেন নাই, আত্মারই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট করিয়া এইরূপে ঈশ্বরতত্ত্বদর্শীকে যথার্থদর্শী বলেন নাই, আত্মদর্শীকেই যথার্থদর্শী বলিয়াছেন। মধুসূদন তাহাই বিস্তারিত করিয়া

উক্তরূপ অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আত্মা বিশেষ্য, আর পরমেশ্বর বিশেষণ। গীতায় ইহার বিপরীত মতই প্রতিষ্ঠিত। পরমেশ্বরের যে এই আত্মরূপে অবস্থান বা অধ্যাত্মভাব, তাহা তাঁহার স্ব-ভাব (গীতা, ৮।৩)। ইহা তাঁহার বিবিধ নিত্য ভাবের মধ্যে এক ভাব মাত্র। সর্ব্বভূতকে অধিকরণ করিয়া, তাঁহার এই আত্মভাব, অতএব আত্মভাব যে বিশেষ্য, ইহা বলা যায় না। সর্ব্বনিয়স্তৃত্বভাব হইতে 'পরমেশ্বর'ভাব যেমন ব্রহ্মের বা সগুণ ব্রহ্মের বিশেষণ, আত্মা বা পরমাত্মা-ভাবও সেইরূপে সর্ব্বভূতান্তর্ভূত ভাবে তাঁহারই বিশেষণ। সুতরাং আত্মাকে বিশেষ্য ও পরমেশ্বরকে বিশেষণ বলা যায় না, উভয় শব্দই ব্রহ্মনির্দ্দেশক বিশেষণ।

সর্ববভূত—এ স্থলে সর্ব্বভূতকে বিনাশশীল অর্থাৎ ষড়্ভাববিকার-যুক্ত, জন্মস্থিতিলয় প্রভৃতি ভাববিকারের অধীন বলা হইয়াছে। এই ভূতগণের কথা গীতায় নানা স্থলে উক্ত হইয়াছে। এই ভূতগণের স্বরূপ কি, তাহা এ স্থলে আমাদের বুঝিতে হইবে। এই শ্লোকে দুই তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে—ঈশ্বরতত্ত্ব ও ভূততত্ত্ব, এবং ঈশ্বরও ভূতের সহিত সম্বন্ধতত্ত্ব। এই শ্লোক হইতে এইমাত্র জানা যায় যে, ভূতগণ বিনাশশীল ও ঈশ্বর অবিনাশী ও সমভাবে সর্ব্বভূতে অবস্থিত। এ স্থলে ইহা ব্যতীত সর্ব্বভূতের সহিত ঈশ্বরের অন্য সম্বন্ধ উক্ত হয় নাই। গীতায় অন্যত্র তাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া বুঝিতে হইবে। গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, পরমেশ্বর "সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা" (৫।৭)। তিনি সর্ব্বভূতস্থ আত্মা (৬।২৯), তিনিই আত্মরূপে সর্ব্বভূতাশয়ে স্থিত (১০।২০)। পরব্রহ্মস্বরূপ তিনি সর্ব্ব-ভূতের অন্তরে স্থিত (১৩।১৬)। তিনি সর্ব্বভূতে সম বা 'এক' ভাবে স্থিত (১৮।২০)। ভগবান্ সর্ব্বভূতের বীজ (৭।১০; ১০।৩৯)। তিনি তাঁহার যোনি মহদ্ব্রহ্মে বীজপ্রদান করেন, তাঁহা হইতেই সর্ব্বভূত উৎপন্ন হয়—এজন্য তিনি সর্ব্বভূতের বীজপ্রদ পিতা (১৪।৩)। ভগবান্ সর্ব্বভূতের সুহৃদ্ (৫।২৯), জীবন (৭।৯); তাঁহারই অংশ জীবলোকে

জীবভূত হইয়াছে (১৫।৭), তাঁহারই পরা প্রকৃতি জীবভূত হইয়া জগৎ ধারণ করে (৭।৫)। তিনি সর্ব্বভূতের নিয়ন্তা (১৮।৬১)। সর্ব্বভূত তাঁহাতে স্থিত (৯।৪)। আর তিনি সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত (৯।২৯)। পরব্রহ্ম পরমেশ্বরভাবে ভূতভর্ত্তা (১৩।১৬), ভূতভৃৎ (৯।৫); ভগবান্‌ই ভূতভাবন (৯।৫), ভূতমহেশ্বর (৯।১১)। তিনিই ভূতাদি (৯।১৩)।

উপনিষদ্ হইতেও আমরা এ তত্ত্ব জানিতে পারি। পরমাত্মা পরমেশ্বর যে "সর্ব্বভূতে গূঢ়" তাহা উপনিষদে উক্ত হইয়াছে (শ্বেতাশ্বতর, ৩।৭; ৪।১৫; ৪।১৬; ৬।১১)। তিনিই ভূতাত্মা (মৈত্রায়ণী, ৩-২-৩)। সেই ভূতাত্মা এক—তিনিই ব্রহ্ম (ব্রহ্মবিন্দু উপ, ১২)। ব্রহ্মই বা পরমেশ্বরই ভূতাধিপতি (বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২২)। নির্গুণ ব্রহ্মই 'ভূতযোনি' (মুণ্ডক, ১।১।৬)।

এই সকল শাস্ত্র হইতে ভূতগণের সহিত ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের যে সম্বন্ধ, তাহা জানিতে পারা যায়। এই জ্ঞান শাস্ত্রজনিত, শাস্ত্রদৃষ্টির ফল। এক্ষণে এই ভূতগণের স্বরূপ সম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ কি, তাহা জানিতে হইবে। ভগবান্ আপনাকে সর্ব্বভূতের জীবন বলিয়াছেন (৭।৯)। তিনি একাংশে জীবভূত হইয়া পরা প্রকৃতিরূপে জগৎ ধারণ করেন বলিয়াছেন (১৫।৭)। অতএব ভূতগণ জীবনযুক্ত, তাহাদিগকে জীব বলিতে হয়। শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ভূতগণ প্রাণযুক্ত—

"প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈ র্বিভাতি।" (মুণ্ডক, ৩।১।৪)।

অতএব এই ভূতগণ প্রাণী। ভূতগণকে জীব বলা যায়, প্রাণীও বলা যায়। প্রাণই জীবন। ভূতগণ প্রাণী বা প্রাণযুক্ত বলিয়াই জীব জীবনযুক্ত। সর্ব্বভূত বা সর্ব্বপ্রাণী কাহারা, তাহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, যথা—

"ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব বীজানীতরাণি চেতরাণি চাণ্ডজানি চ জরুজানি চ স্বেদ-

ঞানি চৌদ্ভিজ্জানি চাশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনো যৎ কিংচেদং প্রাণি জঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরং সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতম্।”
(ঐতরেয় উপঃ, ৫।৩)।

অতএব শ্রুতি অনুসারে অতি ক্ষুদ্র অণু-পরিমাণ জড়জীব মিশ্রভাবযুক্ত যাহা কিছু, বীজ যাহা কিছু (protoplasm), অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, জরায়ুজ যাহা কিছু, অশ্ব, গো, হস্তী, মানুষ যাহা কিছু—এক কথায় যাহা কিছু স্থাবরজঙ্গম সমুদায় প্রাণী। পূর্ব্বে ২৬শ শ্লোকে যে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সত্ত্বের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে জঙ্গম সত্তাকে আমরা প্রাণী বা জীব বলিয়া জানি ; তাহারা এই সর্ব্ব-ভূতের অন্তর্গত। কিন্তু যাহা স্থাবর সত্তা, তাহাদের জীব বা প্রাণী বলিয়া আমাদের ধারণা নাই, তাহারা জীবনহীন প্রাণহীন জড় বলিয়াই আমাদের ধারণা। যাহা হউক, এই স্থাবর সত্তার মধ্যে উদ্ভিদ যে প্রাণী, তাহা বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন। অধুনা বিজ্ঞান-বিশারদ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু জড়েও এই জীবন, এই প্রাণ ও প্রাণ-ক্রিয়া আবিষ্কার করিয়া, “প্রাণপ্রবেশং সর্ব্বতঃ” এই শ্রুত্যুক্ত তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অতএব যে সকল স্থাবর সত্তাকে আমরা জড় মনে করি, তাহারাও যে প্রাণী বা জীব, তাহা অবশ্য বলিতে হইবে। সামান্ত জড় পরমাণুটিও ক্ষুদ্রতম জীবাণুর ন্যায় প্রাণী বা জীব, তাহাও এই ভূতগণের অন্তর্গত। তবে তাহাদের মধ্যে প্রাণ বা জীবনক্রিয়ার অভিব্যক্তি নাই, তাহা বীজভাবে নিহিত এইমাত্র অর্থাৎ যে সকল সত্তামধ্যে প্রাণ বা জীবন অর্থাৎ প্রাণের বা জীবনের ক্রিয়া অভিব্যক্ত, সাধারণভাবে আমরা তাহাদিগকে জীব বলি, আর যে সকল সত্তার এই প্রাণ বা জীবন অথবা তাহার ক্রিয়া অনভিব্যক্ত, তাহাদিগকে আমরা জড় বলি ; এবং এইরূপে জীব ও জড়ে প্রভেদ করি। এ কথা আমরা পূর্ব্বে ২৬শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ স্থলে আর তাহার

পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। পরে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ৩য়, ৪র্থ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ইহা বিবৃত হইবে।

এই ভূতগণের ইংরাজী প্রতিশব্দ being ; যাহারা 'ভবন্' ধর্ম্মযুক্ত ভবন্ বা হওন—হওয়া। যাহারা উৎপত্তি প্রভৃতি ভাবযুক্ত, তাহারাই ভূত। ভূ ধাতু হইতে ভূত। এ জন্ত যড়্ভাববিকারযুক্ত যাহা কিছু সত্তা (entity), তাহা ভূত। গীতায় সর্ব্বত্র যে 'ভূত' শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় সত্তা অর্থেই বুঝিতে হইবে। তাহারা সকলেই জীব, সকলেই প্রাণী। অতিক্ষুদ্র অণুটি পর্য্যন্ত এই 'ভূত' বা প্রাণী। গীতায় কোথাও ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু ও আকাশকে ভূত বলা হয় নাই। তাহাদিগকে অপরা প্রকৃতিমাত্র বলা হইয়াছে, এবং তাহাদিগকে মহাভূতও বলা হইয়াছে (১৩।৫)।* তাহারা গীতা অনুসারে 'ভূত' নহে। স্থাবর জঙ্গম সত্তা অর্থাৎ অচর বা চর যাহা কিছু শরীর (১৩।১৫), কেবল তাহারই ভূত।

এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি সামান্য অণুটি পর্য্যন্ত ভূত, জীব বা প্রাণী হয়, তবে আমার এই যে শরীর, ইহার উপাদান কি ? আমি যদি একটি জঙ্গম বা 'চর'ভূত হই, তবে আমিই এই শরীরী ভূত, আমার মধ্যে বা আমার শরীরে আর দ্বিতীয় কোন ভূত থাকিতে পারে না। তাহাই

---

* আকাশাদি মহাভূত—ইহা বলিবার কারণ এই বোধ হয় যে, ইহারা এক অর্থে প্রাচীন বৈদিক দেবতা। আকাশ—দ্যুঃ (বা দ্যুঃ পিতা যাহা হইতে Jupiter এবং পৃথিবী, ইঁহারা সর্ব্বভূতের পিতামাতা—দ্যাবা-পৃথিবী। বায়ু (বা ইন্দ্র ও মরুদ্গণ) ও অগ্নি—ইঁহারা বেদের প্রধান দেবতা। বেদে অপ্ বা জলাধিপ বরুণও প্রধান দেবতা। গীতায় একাদশ অধ্যায়ে ইঁহাদের উল্লেখ আছে। এই মহাভূতগণে অধিষ্ঠিত আত্মাই যে এই সকল দেবতা, তাহা যাস্ক বুঝাইয়াছেন। বেদান্ত অনুসারে আত্মা হইতেই এই আকাশাদির উৎপত্তি। (তৈত্তিরীয় ২।১।১) অতএব তাহারা গীতোক্ত এই ভূতের অন্তর্গত নহে। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের পাঁচ বা চারি ভূতবাদ এবং পরমাণুবাদ গীতায় গৃহীত হয় নাই। বেদান্তে যাহাদিগকে মহাভূত বলা হইয়াছে (ঐতরেয়, ৩।৩), তাহারাই গীতোক্ত মহাভূত।

যদি হয়, তবে আমার এই পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীরকে জড় বলিতে হয়, আর আত্মার সংযোগে তাহা জীব বা প্রাণী হইয়াছে বলিতে হয়। সুতরাং গীতা অনুসারে পূর্ব্বে 'ভূত' সম্বন্ধে যে অর্থ বুঝা গিয়াছে, আমাদের সম্বন্ধে এরূপ ধারণা তাহার বাধক।

যাহা হউক, আমরা গীতাতেই এ কথার উত্তর পাই। গীতায় আছে, যাহারা অসুরী-প্রকৃতিযুক্ত তপস্বী, তাহারা—

"কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।" (গীতা ১৭।৬)।

অতএব এতদনুসারে আমাদের প্রত্যেকের শরীরে ভূতগ্রাম অর্থাৎ বহুভূত বা বহুসত্তা মিলিত হইয়া বাস করে। * বহুভূত মিলিত হইয়া আমাদের শরীর হয়,—ইহার অর্থ এই যে, অতি ক্ষুদ্র ভূতসত্তা মিলিত হইয়া অপেক্ষাকৃত উন্নত-জাতীয় জীব-শরীর সংগঠিত করে। এইরূপে ক্রমে উচ্চশ্রেণীর জীবের শরীর অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবাণু-সমষ্টি দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক জাতীয় জীব-শরীর বিশেষ-জাতীয় ভূতগণ দ্বারা সংগঠিত। এজন্য প্রত্যেক জাতীয় শরীরী জীবকে 'ভূত-বিশেষসঙ্ঘ' (১১।১৫) বলা যায় এবং এইরূপে সজাতীয় বা সেই জীবশরীর-বিশেষের অনুকূল বহুভূতবিশেষ মিলিত হইয়া শরীর বা ক্ষেত্র গঠিত হয় বলিয়া এই শরীরকে সঙ্ঘাত (১৩।৬) বলা হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই সকল ভূতগণ ও এই সকল সত্তা এক অর্থে জীব; কেন না, প্রাণরূপ পরাপ্রকৃতি সকলের মধ্যেই অনুস্যূত। শ্রুতি অনুসারে প্রাণই এ সমুদায়। কিন্তু বিশেষভাবে ব্যবহারিক অর্থে জীবে ও ভূতে পার্থক্য আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে (৬।৩।১) যে, ভূত সকলের বীজ তিন প্রকার;—অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ। জীবজ অর্থে জরায়ুজ।

* এই ভূতগ্রাম অর্থে স্থূল পঞ্চ মহাভূত নহে। তাহাদের কর্ষণ, কোন জীবকর্তৃ দ্বারা সম্ভব নহে। আরও গীতায় অন্যস্থানে (৮।১৯; ১৮ শ্লোকে) এই ভূতগ্রামের কথা উক্ত হইয়াছে। সেখানে ভূতগ্রাম অর্থে এই সত্তা সমূহ।

অতএব যে সকল ভূত জরায়ুজ, তাহাদিগকেই প্রধানতঃ জীব বলে। এই জরায়ুজ জীব-শরীর, অন্য সত্তার শরীরের ন্যায়, এই ক্ষুদ্রভূত অর্থাৎ অণ্ডজ ও স্বেদজ ভূতসঙ্ঘ দ্বারা গঠিত।

এই তত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত। আধুনিক বিজ্ঞানমতে প্রত্যেক উদ্ভিদ্ ও জঙ্গম জীব-শরীর (organised body) বহু ক্ষুদ্র জীবাণু (amoeba, protozoa প্রভৃতি নিম্নতম জীবাণু) দ্বারা সংগঠিত। প্রত্যেক শরীরটি যেন এক ক্ষুদ্র জগৎ। তাহাতে কত প্রকারের কত কোটী এইরূপ জীবাণু বাস করে, তাহা কে বলিতে পারে? এই জীবাণু ব্যতীত কোন জড়-অণু যদি এই শরীরের উপাদানরূপে থাকে, তবে তাহাও এক একটি-স্বতন্ত্র সত্তা, বা এক একটি ক্ষুদ্রতম জীবাণু মাত্র, ইহাও আমরা এই গীতা হইতে জানিতে পারি। কেন না, জড়ও প্রাণ বা জীবনবিশিষ্ট, তবে তাহাদের সে প্রাণের বা জীবনের ক্রিয়া অপ্রকটিত। যাহা হউক, এই শরীরের উপাদান যে জীবাণু বা জড়াণু, তাহাদেরও শরীর একটি ক্ষুদ্র জগৎ বলিতে হইবে। কিন্তু সে ক্ষুদ্রত্বের সীমা আমরা জ্ঞানে ধারণা করিতে পারি না। যিনি অণু হইতেও অণু, শ্রুতিতে তাঁহাকে ব্রহ্ম—মহৎ হইতেও মহৎ-ব্রহ্ম বলিয়াছেন।

প্রত্যেক জীবশরীরে যে ক্ষুদ্র অণুগুলি উপাদান, তাহাদের প্রাণ বা জীবনীশক্তির সমষ্টি হইতে সেই শরীরী জীবের প্রাণ বা জীবন, ইহাও বলা যায়। * শরীরের প্রতি কেন্দ্রে (nerve centres. এ) এই জীবন-ক্রিয়ার বিকাশ আমরা দেখিতে পাই। কোন প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ পণ্ডিত

---

* কিন্তু তাহাকে অর্থাৎ শরীরস্থ জীবাণুর প্রাণশক্তি-সমষ্টি সে শরীরী জীবের প্রাণ নহে। তাহার প্রাণশক্তি স্বতন্ত্র। তাহা এই সকল জীবাণুর প্রাণশক্তিকে নিয়মিত করিয়া আপনার বশীভূত করিয়া রাখে। যখন তাহা না পারে, তখন জীবাণুগণ পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়, শরীর ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখন সেই জীবের প্রাণ সে শরীর হইতে উৎক্রমণ করে, এবং সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ-শরীর সেই প্রাণের সঙ্গে গমন করে।

(Hartmann) বলিয়াছেন যে, সেই সকল কেন্দ্রে (nerve এবং ganglion centre এ) বুদ্ধি ও জ্ঞান অপ্রকট (unconscious) ভাবে অবস্থিত। কোন উচ্চতর অপ্রকটিত এক অজ্ঞ জ্ঞান ও শক্তির প্রভাবে তাহারা মিলিত হইয়া এই শরীরে কার্য্য করে। মধুমক্ষিকা যেমন পরস্পর পরামর্শ না করিয়াও, কোন অজ্ঞাত নিয়ন্তার প্রেরণায় মিলিত হইয়া আশ্চর্য্য কৌশলযুক্ত মধুচক্র নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ আমাদের শরীরস্থ ভূতগ্রাম বা জীবাণু সকল সম্মিলিত হইয়া কোন ভূমা সর্ব্বদর্শী সর্ব্বকারণ সর্ব্বেশ্বরের নিয়ন্তৃত্বে আমাদের প্রাণশক্তির বশীভূত হইয়া, আমাদের শরীরের গঠন, ধারণ ও রক্ষণ ব্যাপার সম্পাদন করে। এইরূপে ভূত-বিশেষসঙ্ঘ দ্বারা আমাদের যে শরীর গঠিত হয়—যে সংঘাত হয়, তাহা আমাদের ক্ষেত্রের উপাদান। তাহাতে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ অধিষ্ঠিত থাকেন বলিয়া, সেই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগে আমাদের বিশেষ সত্ত্ব—মানুষরূপে উদ্ভব হয়, এবং ক্ষেত্রজ্ঞ আমার ক্ষেত্রে যে বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, ইন্দ্রিয়, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতির বিকাশ করে, তদনুসারে আমাদের শরীরস্থ ভূতগ্রাম নিয়মিত হয়। আমাদের সহিত সংযুক্ত প্রকৃতিজ বুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা তাহারা এইরূপে নিয়মিত হয়। আমরা হস্ত দ্বারা কোন বস্তু গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে, আমাদের মস্তিষ্ক হইতে প্রবাহিত জ্ঞান-নাড়ীর (sensory nerves) দ্বারা সেই ইচ্ছা হস্তে সংক্রমিত বা পরিচালিত হয় এবং কর্ম্মশক্তিবাহিনী নাড়ী (motor nerves) দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া হস্তের পেশী, শিরা প্রভৃতি সঙ্কোচ দ্বারা সেই গ্রহণ-কার্য্য সম্পন্ন করে। সেই সব জ্ঞানশক্তি ও কর্ম্মশক্তি প্রবাহক নাড়ী, শিরা, পেশী প্রভৃতি সকলই এই সমুদায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু দ্বারা গঠিত। শরীররাজ্যে মস্তিষ্ক-গঠনকারী জীবাণুগণই রাজমন্ত্রীর ন্যায় রাজার আজ্ঞা প্রচার করে, অন্য জীবাণুগুলি সেই সকল নাড়ী, শিরা, পেশী প্রভৃতিতে অবস্থিত থাকিয়া সেই আজ্ঞা বহন ও পালন করে।

কিন্তু এই সকল জীবাণুগুলি অজ্ঞাতসারে ভৃত্যের ন্যায় এইরূপে আজ্ঞাবহ হয়। তাহারা শরীরের মধ্যে বিশেষ স্থানে থাকিয়া নিজের বংশবৃদ্ধি করিতেছে, মরিয়া যাইতেছে, আবার তাহাদের উত্তরাধিকারিগণ তাহাদের স্থান অধিকার করিতেছে। সকলে নিজ নিজ কার্য্য করে, অথচ অলক্ষ্যে—অজ্ঞাতসারে এই সমষ্টি-শরীরের যিনি শরীরী তাঁহার কার্য্য সম্পাদন করে। অথচ তাহারা যে এই সমষ্টি-শরীরের কার্য্য করিতেছে, তাহা জানিতেও পারে না। আমাদের মানব-সমাজের যে নিয়ম, প্রত্যেক শরীর-রাজ্যেরও তদনুরূপ নিয়ম। মানব-সমাজ যেমন ভগবানের বিরাট্ শরীরের অন্তর্গত, ও তাহার মধ্যে আমরা অবস্থিত থাকিয়া ও নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করিয়া, অলক্ষ্যে সেই বিরাট্ সমাজ-দেহের কার্য্য সম্পাদন করি, আমাদের শরীরমধ্যেও সেইরূপ এই জীবাণুগণ অবস্থিত থাকিয়া, সমষ্টিভাবে অজ্ঞাতে সম্মিলিত হইয়া সেই শরীরের কার্য্য সম্পাদন করে।* যখন তাহারা এই শরীরের কার্য্য আর সম্পাদন না করে বা করিতে পারে না, অথবা যখন তাহারা বিজাতীয় অণুগণের শরীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন শরীর রুগ্ন হয়, এবং পরিণামে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। আধুনিক বিজ্ঞান অনুসারে শরীরতত্ত্ব এইরূপে বুঝিতে হয়। এইরূপে আমরা গীতোক্ত শরীরস্থ ভূতগ্রামের কথা বুঝিতে পারি, এবং গীতোক্ত এই সর্ব্বভূততত্ত্ব ও স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় সত্ত্বার তত্ত্ব বুঝিতে পারি. প্রত্যেক স্থাবর বা জঙ্গম সত্তা যে এইরূপ ভূতগ্রাম, বা ভূতসঙ্ঘ দ্বারা সংঘাত বা শরীরযুক্ত, তাহাও ধারণা করিতে পারি, এই ভূতগণের সমষ্টিভাবে সংঘাত যে শরীর, সেই শরীরী জীবকেও ভূত বলিতে পারি এবং এইরূপ ভূতগণের সহিত সত্ত্বার যে পার্থক্য, তাহা বুঝিতে পারি আর সে

* এই সমাজ-শরীরের তত্ত্ব, আমরা 'সমাজ ও তাহার আদর্শ' নামক পুস্তকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

সর্ব্বভূতবিশেষসত্ত্ব বা সত্তা সকল কিরূপে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ হইতে উদ্ভূত, তাহাও ধারণা করিতে পারি।* পূর্ব্বে ২৬শ শ্লোকের ব্যাখ্যায়ও ইহা বিবৃত হইয়াছে।

ভূতগণের উৎপত্তি বিনাশ।—গীতায় এ স্থলে ভূতগণকে বিনাশশীল বলা হইয়াছে; সুতরাং এই ভূতগণের উৎপত্তি-বিনাশতত্ত্ব আমাদের বুঝিতে হইবে। গীতা হইতেই আমরা তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। এই ভূতগণের যোনি বা উৎপত্তিস্থান গীতায় পূর্ব্বে (৭।৪-৫ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে। ভূমি, অপ্, অনল, বায়ু, আকাশ (এই পাঁচ মহাভূত) এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার (এই অন্তঃকরণ) এই আটটি অপরা প্রকৃতি। প্রকৃতি এই আটভাগে বিভক্ত। ইহাই লিঙ্গশরীর। আর এই অপরা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন যে পরা প্রকৃতি, যাহা জীবভাব অর্থাৎ 'প্রাণ' বা 'জীবন,'—এই দুই প্রকৃতিই সমুদায় ভূতগণের যোনি বা উপাদান-কারণ। আর ভগবান্ তাহার নিমিত্ত-কারণ (গীতা, ৭।৬)। এই জন্য ভগবান্ ভূতভাবন (৯।৫), ভূতমহেশ্বর (৯।১১), এবং ভূতগণের যোনি। যোনির অর্থ নিয়ন্তা (১৮।৬১)। যাহা হউক, উক্ত দুইরূপ প্রকৃতি এই সমভূতগণের যেরূপ উৎপত্তিকারণ, সেইরূপ যোনির অন্য অর্থ দেহ (body, form) (গীতা ১৩।২১)

গীতায় আরও উক্ত হইয়াছে যে, ভগবানের যোনি—মহদ্‌ব্রহ্ম, তাহাতেই তিনি বীজ প্রদান পূর্ব্বক গর্ভ উৎপাদন করেন, তাহাতেই

---

† এ সম্বন্ধে প্রধান দার্শনিক হেগেলের মত, শ্রীযুক্ত হীরালাল হালদার মহাশয় তাঁহার 'Hegelianism and Personality' প্রবন্ধে যেরূপ বুঝাইয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল।

"The body of man is an organic unity. Ideally therefore it must be a system of cells, a self-differentiation of the Absolute, which is itself a system of differentiations······This theory does not by any means destroy the unity of the human personality." (p, 27)

সর্ব্বভূতের সম্ভব বা উৎপত্তি হয় (১৪,৬)। অতএব যাহা এই পরা ও অপরা প্রকৃতি, তাহাই মহদ্‌ব্রহ্ম। মুণ্ডক উপনিষদে নির্গুণ ব্রহ্মকেই সর্ব্বভূতযোনি বলা হইয়াছে (১।১।৬)। অতএব প্রাণযুক্ত লিঙ্গই ভূতগণের উৎপত্তি-কারণ, বা মূল-শরীর (neucleus)। কিন্তু ভগবান্‌ ইহাতে বীজ প্রদান না করিলে, এই প্রাণবিশিষ্ট লিঙ্গ হইতে ভূতের উৎপত্তি হয় না। এ বীজ কি, তাহা আমরা উক্ত ১৪।৩ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বুঝিতে চেষ্টা করিব। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, তাহাই ভগবানের ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষরূপ প্রাণযুক্ত লিঙ্গ ক্ষেত্রের উপাদান মাত্র, তাহার সহিত এই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের সংযোগ হইলে, তবে তাহা ভূত (বা being) রূপে উদ্ভূত হয়। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্ম নানা যোনি কল্পনা করিয়া, নামরূপ দ্বারা তাহা ব্যাকৃত করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন। এই অনুপ্রবেশই ভগবানের এই বীজনিষেক। তিনি জ্ঞানরূপে এই নানা যোনিতে অবস্থান করেন বলিয়া, তদনুসারে জীবের বিকাশ হয়, এবং জীব ভগবানের সেই জীবন-কল্পনার আদর্শ অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। সর্ব্বত্র ব্রহ্মের পরাশক্তি বলক্রিয়া তাহার জ্ঞানক্রিয়া দ্বারা নিয়মিত হয়। শুধু ভগবানের জ্ঞানরূপ বীজদ্বারাই ভূতগণের উদ্ভব হয় না। এই যে বীজ, ইহা মায়াশক্তি হেতু ভগবানের পরিচ্ছিন্ন— সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। প্রতি ক্ষেত্রে যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ, তিনি সেই সর্ব্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ পরম পুরুষেরই স্বরূপ। তবে তাহা মায়া-পরিচ্ছিন্ন, এই মাত্র প্রভেদ। বীজের যেমন বিকাশ হইয়া বৃক্ষত্বে পরিণতি হয়, সেইরূপ এই প্রতিদেহস্থ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষও মায়ামুক্ত হইলে সেই সচ্চিদানন্দ-ঘন পরমেশ্বর বা ব্রহ্মের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

যাহা হউক, এইরূপে এই ভূতগণের উৎপত্তি কখন হয়, তাহাও গীতায় উক্ত হইয়াছে। প্রতি সৃষ্টির প্রারম্ভে ভূতগণের উৎপত্তি হয়, এবং প্রতি প্রলয়ে তাহারা বীজভাবে সূক্ষ্মকারণরূপে অব্যক্ত

প্রকৃতিতে লীন থাকে। আবার যখন সৃষ্টি হয়, তখন তাহারা অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হয়।'

"অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥"

(গীতা, ৮।১৮।১৯)

অন্যত্র আছে—

"সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥"

(গীতা, ৯।৭।৮)।

আমাদের শাস্ত্র অনুসারে সৃষ্টি (creation) নাই। সৃষ্টি ও বিসর্জ্জন (emanation) একই অর্থ। এই জগতে যত কিছু ভূতসত্তা, তাহা প্রকৃতিতে পরমেশ্বর হইতে বিসৃষ্ট (Immanant) হয়। আর প্রলয়ে তাহা ভগবানের প্রকৃতি-শক্তিতেই লীন (absorption) হয়। এইরূপে পরা ও অপরা প্রকৃতিতে বা মহদ্‌ব্রহ্মে পরমেশ্বর বীজ প্রদান করায় বা পুরুষ-প্রকৃতি-সংযোগে—ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগে যে সমুদয় ভূত-সত্তার উৎপত্তি হয়, তাহা সৃষ্টিতে অনাদি অথবা সৃষ্টিতে উৎপন্ন হইয়া প্রলয় পর্য্যন্ত সেই ভূতভাবের স্থিতি হয়। এই সৃষ্টির স্থিতি অবস্থায় জীবগণের বার বার জন্ম হয় এবং বার বার নাশ হয়, ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। জীবভাব গ্রহণ করিয়া পুরুষের নানাযোনি-ভ্রমণ হয়। জীবভাব গ্রহণ করাতেই পুরুষের সংঘাতরূপ স্থূলশরীর-গ্রহণ হয়' এবং সে স্থূলশরীর ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু তাহাতে যে ভূতগ্রামের সংঘাত হইতে সেই স্থূল-

শরীর হয়, তাহার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। পুরুষের প্রাণশক্তির দ্বারা ভূতগ্রাম সংহত হইয়া শরীরের উপাদান হয়, সেই শক্তি উৎক্রমণ করিলে সে সংঘাত নষ্ট হওয়ায় ভূতগ্রাম ভিন্ন ও বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়।

এই শ্লোকে এই ভূতভাব যে বিনাশশীল বলা হইয়াছে, তাহা এইরূপে বুঝিতে হইবে। ভূতগ্রামের সংশ্লেষ দ্বারা যে 'সংঘাত' উৎপন্ন হয়, তাহার বিশ্লেষ হেতু ধ্বংস হয় বটে, কিন্তু তাহাতে ভূতগণের বিনাশ হয় না, প্রলয়েই তাহাদের বিনাশ হয়; তাহারা কারণে লীন হয়, আবার সৃষ্টিতে তাহাদের উদ্ভব হয়। কেবল যাহা ভূতসংঘাত, তাহাই সৃষ্টি অবস্থায় উৎপত্তি ও বিনাশশীল।

ভূতসর্গ।—গীতা অনুসারে এই লোকে অর্থাৎ মনুষ্যলোকে ভূতসর্গ দ্বিবিধ;—এক দৈব ও আর এক আসুর। সমষ্টিভাবে ভূতসর্গকে এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং সেই ভূতসর্গমধ্যে মানবজাতির দৈবী ও আসুরী প্রকৃতির কথা উক্ত হইয়াছে। (গীতা ১৬।৬-৭ দ্রষ্টব্য)। পুরাণে এই ভূতসর্গকে ব্রহ্মার সৃষ্ট দেবাসুর প্রভৃতি ভাবে গৃহীত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনে এই ভূতসর্গকে চতুর্দ্দশবিধ বলা হইয়াছে, যথা—

"অষ্টবিকল্পো দৈবস্তৈর্য্যগ্‌যোনয়শ্চ পঞ্চধা ভবতি।
মানবশ্চৈকবিধঃ সমাসতো ভৌতিকঃ সর্গঃ॥" (কারিকা ৫৩)

অর্থাৎ অষ্টবিধ দেবযোনি, পঞ্চবিধ তির্য্যগ্‌যোনি ও একবিধ মনুষ্য-যোনি—সংক্ষেপে ইহাই ভূতসর্গ। এই স্থলে ভূত অর্থে জীবযোনি। ব্রহ্মা সৃষ্টির আরম্ভে যে বিভিন্ন-জাতীয় জীবযোনি কল্পনা করিয়া সৃষ্টি করেন, তাহারই কথা উক্ত হইয়াছে। গীতায় যে সর্ব্বভূতের কথা উক্ত হইয়াছে,—এই ভূতসর্গ তাহা হইতে কতকটা ভিন্ন। এই ভূতসর্গ বিভিন্ন ভূতযোনি মাত্র। অর্থাৎ ভূতগণের সংহত হইয়া উদ্ভবের বা নানা শরীর-সৃষ্টির কারণ। অতএব ব্রহ্ম এইরূপ বিভিন্ন-জাতীয় জীবকে নাম-রূপ (form) দ্বারা কল্পনা (idea) করিলে, প্রকৃতি হইতে তাহাদের বিগ্র-

দেহ উৎপন্ন হয় এবং এই লিঙ্গশরীরকে কেন্দ্র করিয়া, ভূতগণ সংহত হইয়া এই সকল বিভিন্নশ্রেণীর জীবদেহকে সেই (form) রূপ অনুসারে সৃষ্টি করে। এইরূপে ভূতগণের সংঘাতে যে যে ভিন্ন প্রকার যোনির (দেহের) সৃষ্টি হয়, তাহাই এই ভূতসর্গ; ইহারা এক ভূতযোনি। এই ব্যাপারের সহিত সাংখ্যদর্শনে ও গীতায় যে ভূতসর্গ উক্ত হইয়াছে, তাহার বিরোধ নাই।

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৮

সর্ব্বত্র- সমান আর সমভাবে স্থিত
ঈশ্বরে যে হেরে, আত্মা দ্বারা আত্মাকে সে
হিংসা নাহি করে,—তাহে পায় পরা গতি ॥ ২৮

২৮। সর্ব্বত্র...ঈশ্বরে যে হেরে—পূর্ব্বশ্লোকে যেরূপে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তদনুসারে সেই পরমেশ্বরকে সর্ব্বভূতে একভাবে অবস্থিত, সুতরাং সর্ব্বত্র একই বলিয়া যে দর্শন করে (শঙ্কর)। সর্ব্বত্র অর্থাৎ দেবাদি শরীরে, তাহার আধার ও নিয়ন্তৃরূপে অবস্থিত ঈশ্বরকে অর্থাৎ আত্মাকে দেবাদি বিষম আকার হইতে বিযুক্ত ও জ্ঞান দ্বারা একাকার-ভাবে 'সম' যে দর্শন করে (রামানুজ)। সর্ব্বত্র অর্থাৎ ভূতমাত্রে সমান অপ্রচ্যুতস্বরূপে অবস্থিত অক্ষর পরমাত্মাকে যে দর্শন করে (স্বামী)। জন্মাদি বিনা অন্য ভাববিকার যে নাশ, সেই ভাববিকারশূন্য হইয়া সম্যক্-রূপে অবস্থিত অবিনাশী আত্মাকে দর্শন করিয়া, অবশ্য আমিই সেই, ইহা শাস্ত্রদৃষ্টি দ্বারা যে সাক্ষাৎ করে (মধু)। সর্ব্বত্র ভূতমধ্যে 'সম' অর্থাৎ সম্যক্ অপ্রচ্যুতস্বরূপ গুণ দ্বারা অবস্থিত ঈশ্বরকে যে দর্শন করে

(বলদেব)। সর্ব্বত্র অর্থাৎ এই প্রপঞ্চের পদার্থমাত্রে সম্যক্ প্রকারে স্থিত, অর্থাৎ তথাভূত লীনার্থ অবস্থিত সর্ব্বসামর্থ্যযুক্ত ঈশ্বরকে সমভাবে যে দর্শন করে, (বল্লভ)।

উক্তরূপ সমদর্শনের ফল এ স্থলে উক্ত হইয়াছে। সর্ব্বত্র দেবাদি-দেহে সমভাবে অবস্থিত, দেবাদি বিভিন্ন আকার বিযুক্ত সমভাবে স্থিত দেহ ইন্দ্রিয়াদির স্বামী ঈশ্বরকে যে দর্শন করে (কেশব)।

[এই শ্লোকে সম্যক্দর্শনের ফলকীর্ত্তন দ্বারা স্তুতি করা হইয়াছে। (শঙ্কর, মধু)। উক্তরূপে ভূতগণ হইতে পৃথগ্‌ভাবে ঈশ্বরদর্শনের মহিমা এ স্থলে বর্ণিত হইয়াছে (বলদেব)।]

আত্মদ্বারা আত্মাকে সে হিংসা নাহি করে,—সে আপনাকে আপনি হিংসা করে না, এবং আত্মহিংসা করে নাই বলিয়া সে পরমগতি অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিয়া থাকে (শঙ্কর)। সে আত্মাদ্বারা অর্থাৎ মনের দ্বারা স্বীয় আত্মাকে হিংসা করে না অর্থাৎ রক্ষা করে এবং সংসার হইতে মোচন করে। তাহা হইতে সে জ্ঞাতৃস্বরূপে সর্ব্বত্র সমানাকারে আত্মদর্শনফলে পরা গতি লাভ করে,—যাহা পরম গন্তব্য, সেই যথাবস্থিত আত্মাকে প্রাপ্ত হয়। আর যে দেবাদি আকারযুক্ত বিষমভাবে স্থিতরূপে আত্মাকে দর্শন করে, সে আত্মাকে হিংসা করে, অর্থাৎ ভবজলধিমধ্যে প্রক্ষেপ করে (রামানুজ)। সে স্বীয় আত্মাদ্বারা আত্মাকে হিংসা করে না, অবিদ্যা দ্বারা সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাকে তিরস্কার পূর্ব্বক বিনাশ করে না। তাহাতে সে পরা গতি বা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। আর যে এইরূপ দর্শন করিতে না পারে, সে দেহাত্মদর্শী, দেহের সহিত আত্মাকে হিংসা বা অধঃপাতিত করে (স্বামী)। সে স্বলীলাত্মরূপে আত্মস্বরূপ অবিকৃত আত্মাকে নিশ্চয় পূর্ব্বক হিংসা করে না অর্থাৎ অন্যথা প্রাপ্ত হয় না, যথার্থরূপে জানিয়া প্রপন্ন হয়। তাহা হইতে উৎকৃষ্ট বৈকুণ্ঠাখ্যাতি প্রাপ্ত হয়। শাস্ত্রে আছে,—

'যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে।
কিং তেন ন কৃতং পাপং চৌরেণাত্মাপহারিণা॥" (বল্লভ)।

সেই আত্মদর্শী, আত্মাদ্বারা আত্মাকে হিংসা করে না। যাহারা অজ্ঞ, তাহারা অবিদ্যা দ্বারা যে পরমার্থ বস্তু এক অকর্ত্তা অভোক্তা পরমানন্দরূপ আত্মা 'সর্ব্ববস্তুতে অস্তি ভাতি' হইলেও তাহাকে নাস্তি 'ন ভাতি' এই প্রতীতি হেতু আত্মাকে স্বয়ং তিরস্কার পূর্ব্বক 'নাই' এইরূপ যে জ্ঞান করে, তাহারই আত্মার হিংসা বা হনন করে। আর অজ্ঞ ব্যক্তিরা সেই প্রকারে বিদ্যা (বৈদিককর্ম্মকাণ্ড বিদ্যা) দ্বারা ও আত্মরূপে পরিগৃহীত দেহেন্দ্রিয়সংঘাতকে, কর্ম্মবশে আত্মরূপে গ্রহণ করে। এইরূপে অবিদ্যা ও বিদ্যা উভয় দ্বারাই আত্মহনন হয়। অনাত্মাতে আত্মাভিমানই আত্মহনন। যে আত্মজ্ঞ, যে অনাত্মবস্তুতে আত্মাভিমানশূন্য, যে শুদ্ধ আত্মস্বরূপ দর্শন করে—সে আত্মস্বরূপ লাভ করে, তাহা হইতে অর্থাৎ আত্মহননাভাবে অবিদ্যা ও তৎকার্য্যনিবৃত্তি হেতু পরাগতি বা মুক্তি লাভ করে। সে প্রকৃতি বিকার অবিবেক হেতু বিষয়রস-গ্রহণে আসক্ত হইয়া নিজের আত্মাকে হিংসা করে না অর্থাৎ অধঃপাতন করায় না। সে বিষয়বিরাগী প্রকৃতির বিকার হইতে ভিন্ন আত্মার বিবেক খ্যাতি হইতে উৎকৃষ্ট গতিলাভ করে (বলদেব)।

এই সম্বন্ধে স্বামী ও মধু যে শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা এই :—

"অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতা।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥"
(ঈশ উপঃ ৩)।

এই শ্লোকের শাঙ্কর ভাষ্য অনুসারে যাহারা অবিদ্যা বশতঃ আত্মাকে অস্বীকার করে, তাহারা আত্মঘাতী। আত্মা স্বপ্রকাশরূপে বিদ্যমান থাকিলেও যাহারা অবিদ্যাবশতঃ আত্মার অজর অমর প্রভৃতি ভাব অনুভব করিতে পারে না,.. তাহাদের নিকট সর্ব্বদা আত্মা তিরোহিত বা

অবিজ্ঞাত থাকে, অর্থাৎ নিহতের মত অপ্রকাশিত থাকে। এ জন্য আত্মজ্ঞানহীন লোককে আত্মঘাতী বলা যায়। তাহারা পুনঃ পুনঃ সংসারে আগমন করে। গীতায় পূর্ব্বে (৬।৩০ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে যে,—

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥"

অর্থাৎ যে সর্ব্বত্র সমবস্থিত ঈশ্বরকে দর্শন করে, সে আত্মাকে বা ঈশ্বরকে হিংসা করে না—নষ্ট করে না। এই হিংসা বা নাশ অর্থে সাধারণতঃ আমরা যাহা বুঝি, তাহা নহে। সে অর্থে আত্মা হত্যা করেন না, হত হন না (২।১৯)। এ স্থলে এই হিংসা বা নাশ অর্থে 'আত্মা বা ঈশ্বরকে না দেখিয়া, বা জানিয়া আত্মদ্রোহী হওয়া; এই শ্লোকের ব্যাখ্যায়ও শঙ্করাচার্য্য এইরূপে আত্মাকে হিংসা বা হনন করার অর্থ বুঝাইয়াছেন। তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত হইল। "এক্ষণে এরূপ শঙ্কা হইতে পারে যে, কোন প্রাণীই ত আপনার আত্মাকে নিজে হিংসা করিতে পারে না। তবে কেন এ স্থলে অপ্রাপ্তপ্রাপ্তির প্রতিষেধ করা হইয়াছে? কেহ যখন কোনরূপে আত্মার হিংসা করিতে পারে না, (গীতা ২।১৯ প্রভৃতি শ্লোক দ্রষ্টব্য), তখন আত্মহিংসা সর্ব্বরূপে অপ্রাপ্ত; তবে তাহার প্রতিষেধ কিরূপে সম্ভব? কিন্তু এরূপ শঙ্কা নিরর্থক। যাহারা অজ্ঞ, তাহাদের নিকট আত্মার স্বরূপ সর্ব্বদা আবৃত। তাহারা দেহ প্রভৃতি অনাত্মবস্তুকে আত্মা বলিয়া অঙ্গীকার করে এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম সঞ্চয় পূর্ব্বক আত্মভাবে কল্পিত দেহাদিকে একবার স্বীকার করে, আবার ত্যাগ করে, আবার গ্রহণ করে, ত্যাগ করে। এই ভাবে আত্মাকে বার বার হনন করে। এইরূপে যাহারা অজ্ঞানী, তাহারা আত্মহা—আত্মঘাতী। যাহা বাস্তবিক পরমার্থতঃ আত্মা, তাহা অজ্ঞানের আবরণে যেন হত বলিয়া প্রতীত হয়। আত্মা বিদ্যমান থাকিলেও অজ্ঞানহেতু তাহার বিদ্যমানতার কার্য্য-বিষয় সম্বেদনাদি মধ্যে মধ্যে বিলুপ্ত হয়; এজন্য লোকে অবিনাশী আত্মাকে

হত বলিয়া বোধ করে। অতএব সকল অজ্ঞব্যক্তিরা আত্মঘাতী। কিন্তু যিনি আত্মতত্ত্বজ্ঞ, তিনি উক্ত কোনরূপেই আত্মাকে হনন করেন না। সুতরাং আত্মদর্শনের ফল যে পরম গতি, তিনি তাহা লাভ করেন।”

শঙ্কর প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ এইরূপে আত্মাদ্বারা আত্মহিংসা কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইয়াছেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও সুসঙ্গত অর্থ হইতে পারে। ভগবান্ সর্ব্বভূতের আত্মা। তিনি বলিয়াছেন, “অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ” (১০।২০); অতএব যিনি জ্ঞানী আত্মদর্শী সর্ব্বভূতমধ্যে সর্ব্বত্র এই আত্মাকে দর্শন করেন, যে জ্ঞানীব্যক্তি সর্ব্বভূতে বা সর্ব্বজীবে সমভাবে অখণ্ড এক অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের ন্যায় স্থিত আত্মাকে দর্শন করেন, যিনি আত্মাতে সমুদায় দর্শন করেন, তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে সর্ব্বজীবে সর্ব্বাত্মভূতাত্মা সর্ব্বান্তর্যামী ঈশ্বরকে দর্শন করেন, তিনি কোন ভূতকে বা জীবকে হিংসা করিয়া তদ্দ্বারা সেই সর্ব্বভূতে স্থিত এক অবিভক্ত আত্মাকে হিংসা করিতে পারেন না। অহিংসাই তাঁহার পরম ধর্ম্ম হয়, তাঁহার সার্ব্বভৌম মহাব্রত হয়, তিনি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটটির মধ্যেও সমভাবে ভগবান্‌কে অবস্থিত দেখেন, তাঁহার নিজেরই স্বরূপ যে আত্মা, তাহাই তাঁহাতে অবস্থিত দেখেন। যাঁহার এইরূপ দর্শন-সিদ্ধি হয়, তিনি সামান্য কীটটি পর্য্যন্ত কোন জীবকেই হিংসা করিতে পারেন না। তিনি স্বয়ং আত্মস্বরূপ হইয়া নিজ আত্মা দ্বারা সর্ব্বভূতস্থ আত্মাকে হিংসা করিতে পারেন না। তিনি সকলকেই এই এক আত্মস্বরূপ জানিয়া কাহারও প্রতি ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা কিছুই করিতে পারেন না। তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী হইলে আত্ম দ্বারা কোন প্রকারে আপনাতে ও অন্যভূতে স্থিত আত্মাকে আর হিংসা করিতে পারেন না। ইহাই পরমতত্ত্ব।*

---

* জার্ম্মান দার্শনিক পণ্ডিত পাল ডুসেন (Paul Deussen) তাঁহার “Philosophy of the Vedanta” প্রবন্ধে বলিয়াছেন,—“The Gospels fix quite correctly as the highest law of morality “love your neighbour as

গীতায় এই অধ্যায়ের এই ২৭,২৮ দুই শ্লোক, দর্শন-শাস্ত্রের সার। "যঃ পশ্যতি স পশ্যতি" এই বাক্য দ্বারা তাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইহাই সার তত্ত্ব। এই দর্শনসিদ্ধি হইলেই তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনসিদ্ধি হয়। এই দুই শ্লোকে যে তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা যেমন দর্শনশাস্ত্রের সার, তাহার মূলসূত্র সেইরূপ ; তাহা সমগ্র নীতিশাস্ত্রের বা ধর্ম্মশাস্ত্রের মূলসূত্র। এই মূলসূত্র জানিলে সর্ব্বজীবের সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ, তাহা জানা যায়, এবং সর্ব্বজীবের সহিত যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, তাহা সহজে স্থির করা যায়। ইহা দ্বারা আমার নিজের সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য এবং আমার সহিত সংসৃষ্ট অপর যে কোন ব্যক্তির বা জীবের সহিত আমার যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, সে সমুদায় সহজে স্থির করা যায়। তাহার জন্য আর বিশেষভাবে কোন উপদেশের আবশ্যক হয় না।

---

yourself." But why should I do so ?......The answer is not in the Bible, but it is in the Veda, is in the great formula "*tat twam asi*" which gives in three words metaphysics and morals together. You shall love your neighbour, as yourselves,—because you are your neighbour, and mere illusion makes you believe that your neighbour is something different from yourselves, or in the words of the Bhagbad Gita he who knows himself in everything and everything in himself, will not injure himself by himself—*na-hinasti atmana atmanam.* This is the due and tenor of all morality and this is the stand point of a man knowing himself as Brahman. He feels himself as every thing—so he will not desire every thing, for he has whatever can be had ;—he feels himself as every thing,—so he will not injure anything for no body injures himself. He lives in the world surrounded by illusion, but not deceived by them....The *jivan mukta* sees the manifold world, and can not get rid of seeing it, but he knows that there is only one being Brahman the atman, his own Self, and he verifies it by his deeds of pure disinterested morality."

গীতায় এজন্য নীতিবিজ্ঞানের (moral philosophy) কোন উপদেশ বিশেষভাবে প্রদত্ত হয় নাই।*

---

* এই দুই শ্লোক সম্বন্ধে জর্ম্মান দার্শনিক পণ্ডিত [illegible] ডয়সেন যাহা বলিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা উচিত। তিনি তাঁহার "Element of Metaphysics" গ্রন্থে (pp 133-34) বলিয়াছেন—

"We know that these forces (appearing in the manifestation of nature) from the lowest to the highest are only the original forms in which the will to live variously appears. This truth came to light . in the conception that there is but one being, the (impersonal) Brahman, and that all Gods, men, animals, plants and inanimate beings are the diverse manifestations of it. The relation between the phenomena and the thing-in-itself is conceived figuratively as an emanation of the world from Brahman, compared to the coming forth of the web from the spider, the plants from the earth, the hair from the body. But at the same time the eternity of the souls for ever circulating in the *sansar* (i. e. the phenomenal world) is maintained: from which follows clearly that their relation to Brahman is to be conceived not as temporal relation of the effect to its cause, but as the relation of the time-conditioned to the timeless, that is of phenomena to the thing-in-itself with this metaphysical antithesis between the undivided Brahman, and the manifold world as which it appears, is immediately connected the ethical between denial and affirmation in the sense of the celebrated 'তত্ত্বমসি' a sentence which expresses in three words at once the deepest mystery of metaphysics and the highest aim of morality. *As an interpretation of this great truth; we may consider as in a wider sense our whole work so already the motto prefixed to it which we here translate.*

The Lord of all things dwells in every living being. Not dying when it dies.—He who sees him is seeing. Such will not, when in all this highest Lord he knows wrong through himself himself, and to perfection goes

Sri Bhagabad Gita Ch. xiii. 27. 28.

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ২৯

সর্ব্বরূপে সর্ব্বকর্ম্ম প্রকৃতির দ্বারা
কৃত হয়, আত্মা কিন্তু নহে কর্ত্তা কভু,
এরূপে যে হেরে, সেই করে দরশন ॥২৯

২৯। সর্ব্বরূপে সর্ব্বকর্ম্ম প্রকৃতির দ্বারা কৃত—পূর্ব্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, সর্ব্বভূতে স্থিত পরমেশ্বরকে যিনি সর্ব্বত্র সমভাবে দর্শন করেন, তিনি আত্মাকে আত্মা দ্বারা হিংসা করিতে পারেন না। ইহাতে শঙ্কা হইতে পারে যে, এই কথা বিরুদ্ধ। জীবের গুণ ও কর্ম্মের বৈলক্ষণ্য দেখিয়া ইহাই প্রমাণিত হয় যে, দেহভেদে আত্মাও ভিন্ন, সকলভূতে এক আত্মা সমভাবে থাকিতে পারেন না; সমভাবে থাকিলে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ জ্ঞানী, কেহ বা অজ্ঞানী হইত না। এই শঙ্কার (ও এই সাংখ্যদর্শনোক্ত বহুপুরুষবাদের) নিরাকরণ জন্য এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে। (শঙ্কর)। পূর্ব্বে "কার্য্যকারণ-কর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে" (১৩।২০) ইহা উক্ত হইয়াছে। তদনুসারে এই শ্লোক উক্ত হইল (রামানুজ)। শুভাশুভ কর্ম্ম কর্তৃত্ব দ্বারা আত্মার বৈষম্য দৃশ্যমান। সে আত্মার সমত্ব কিরূপে সম্ভব, এই আশঙ্কা-নিবারণার্থ এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে (স্বামী, মধু)। প্রকৃতি হইতে আত্মার বিবেক বা পার্থক্য কিরূপে জানা যাইবে, তাহারই প্রকার এই দুই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে (বলদেব)।

প্রকৃতি শব্দের অর্থ ভগবানের মায়া, তাহা ত্রিগুণাত্মিকা।
"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" (শ্বেতাশ্বতর উপ, ৪।১০)
এই শ্রুতিমন্ত্র দ্বারা ইহা জানা যায়। সেই প্রকৃতিই মহত্তত্ত্বাদি

কার্য্য ও কারণরূপে কর্ম্ম করিয়া থাকে, প্রকৃতি ব্যতীত অন্য কেহ কর্ত্তা নাই। এই সকল কর্ম্ম তিন প্রকার;—কায়িক, বাচিক ও মানসিক (গীতা ৫।১১ দ্রষ্টব্য)। সর্ব্বপ্রকারে প্রকৃতিই সকল কার্য্য করিয়া থাকে (শঙ্কর)। দেহেন্দ্রিয়-আকারে পরিণত প্রকৃতি দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে কর্ম্ম সকল ক্রিয়মাণ হয় (স্বামী)। দেহেন্দ্রিয়সংঘাতাকারের কারণভূত ভগবানের ত্রিগুণাত্মিকা মায়া কর্ত্তৃকই কায়মনোবাক্যের দ্বারা আরব্ধ কর্ম্ম সর্ব্বপ্রকারে ক্রিয়মাণ হয় (মধু)। প্রকৃতি সর্ব্বকর্ম্ম আমার অধিষ্ঠাতৃত্বে ও ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্বে বা প্রেরণায় সম্পাদন করে (বলদেব)। যদি পরমাত্মা ভগবান্ই সর্ব্বরূপে সর্ব্বত্র আছেন, তবে সকলে তাঁহাকে এরূপে দেখিতে পারে না কেন? ইহার উত্তরে এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে। প্রকৃতি ভগবানের লীলা-উপযোগী সমুদয় কর্ম্মই সম্পাদন করে, ইহা যে দর্শন করে (বল্লভ)।

আত্মা কিন্তু নহে কর্ত্তা কভু—আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ কর্ত্তা নহে; কারণ, আত্মা সর্ব্বপ্রকার উপাধি-বর্জ্জিত (শঙ্কর)। আত্মা অকর্ত্তা জ্ঞানাকার, প্রকৃতি-সংযোগ হেতু প্রকৃতিতে আত্মার অধিষ্ঠান হয়, তজ্জন্য সুখ-দুঃখ অনুভব ও কর্ত্তৃভাবে অজ্ঞানকৃত (রামানুজ)। দেহাভিমান হেতুই আত্মার কর্ত্তৃত্ব, নতুবা আত্মা স্বতঃ কর্ত্তা নহে (স্বামী)। পুরুষ সর্ব্ব-বিকারশূন্য, ক্ষেত্রে যে কর্ম্ম কৃত হয়, সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিত অসঙ্গ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা তাহার কর্ত্তা নহে, আত্মা সর্ব্বত্র সমান (মধু)। সকল কর্ম্ম সম্বন্ধে আত্মা অকর্ত্তা (বলদেব)।

এরূপে যে হেরে, সেই করে দরশন—এই প্রকারে প্রকৃতি ও আত্মার স্বরূপ যিনি দেখিয়া থাকেন, তিনিই পরমার্থদর্শী; যাহা নির্গুণ, সুতরাং অকর্ত্তা, তাহা আকাশের ন্যায় নির্ব্বিশেষ ও নিরুপাধিক। আত্মা প্রতিদেহে ভিন্ন, সে বিষয়ে কোন প্রকার প্রমাণ নাই (শঙ্কর)। তিনি আত্মাকে যথাবৎ অবস্থিত দেখেন (রামানুজ)। তিনিই সম্যগ্দর্শী,

অন্যে নহে (স্বামী)। তিনিই যথার্থদর্শী। সবিকার ক্ষেত্রের প্রতি দেহভেদে বৈষম্য হেতু সেই সেই দেহে বিচিত্রকর্ম্মকর্ত্তা, নির্বিকার, আকাশকল্প আত্মার এরূপ ভেদের কোন প্রমাণ নাই। ইহাই এস্থলে প্রতিপাদিত হইয়াছে (মধু)। এই শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, বিজ্ঞানানন্দস্বভাব আমি (অহং) যজ্ঞযুদ্ধাদি দুঃখময় কর্ম্ম করি না; কিন্তু অনাদি ভোগবাসনারূপ অবিবেক হেতু, আমারই সে ভোগসিদ্ধি জন্য আমা দ্বারা অধিষ্ঠিত সুখদুঃখ-মোহাত্মিকা প্রকৃতি মম বাসনা-সঙ্গত বা বাসনা অনুসারে পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, আমার দেহাদিদ্বারা কর্ম্ম করে; সেই হেতু সেই প্রকৃতিই কর্ম্মকর্ত্রী। সেই কর্ম্মকারিণী প্রকৃতি হইতে সেই কর্ম্ম সম্বন্ধে অকর্ত্তা শুদ্ধ জীব ভিন্ন। অবিবেক হেতু সেই শুদ্ধ জীবের কর্ত্তৃত্ব লোকে দেখিয়া থাকে (বলদেব)।

আমরা পূর্ব্বে ২০শ ও ২১শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব এবং পুরুষের অকর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এইমাত্র এস্থলে বলা উচিত যে, বলদেব আত্মাকে জীব বলিলেও তিনি পরমেশ্বরের নিয়ন্তৃত্বে ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের বাসনা অনুসারে তাহার স্বক্ষেত্র প্রকৃতি যে কর্ম্ম করে, এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, ইহাই সঙ্গত। ইহা আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
ততএব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥৩০

সর্ব্বভূতদের এই যে পৃথক্ ভাব
যবে একে স্থিত হেরে, তা হতে বিস্তার
হেরে আর, তখন সে লভে ব্রহ্মভাব ॥ ৩০

৩০। সর্ব্বভূতদের এই যে পৃথগ্‌ভাব যবে একে স্থিত হেরে—পুনর্ব্বার এই সম্যগ্‌দর্শন অন্য শব্দের দ্বারা এ স্থলে প্রপঞ্চিত করা হইতেছে। যে সময় ভূতপৃথগ্‌ভাব অর্থাৎ ভূতগণের পৃথক্‌ত্বকে "একস্থ" অর্থাৎ এক আত্মাতে (ব্রহ্মে) অবস্থিত দেখিতে পায় (অনুপশ্যতি), অর্থাৎ শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ অনুসারে মনন করিয়া আত্মপ্রত্যক্ষের বিষয় করিয়া থাকে অর্থাৎ আত্মাই এই বিশ্ব, এই ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, (শঙ্কর)। একস্থ অর্থাৎ এক আত্মাতে স্থিত (হনু)।

প্রকৃতি পুরুষ-তত্ত্বাত্মক দেবাদি সর্ব্বভূতে তাহাদের মধ্যে দেবত্ব, মনুষ্যত্ব, হ্রস্বত্ব-দীর্ঘত্বাদি যে পৃথগ্‌ভাব, তাহাকে একস্থ অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ, তাহা আত্মস্থ নহে—এইরূপ যখন দর্শন হয় (রামানুজ)। এই পৃথগ্‌ভাব-যুক্ত ভূতগণ প্রলয়ে এক প্রকৃতিস্থ, ইহা যখন দর্শন হয়, (বলদেব)। স্থাবর জঙ্গম ভূতগণের যে পৃথগ্‌ভাব বা ভেদ, তাহা ঈশ্বরশক্তিরূপ এক প্রকৃতিতে প্রলয়ে স্থিত, ইহা অনুদর্শন বা আলোচনা করেন। ভূতগণ প্রকৃতি-তাবন্মাত্র-স্বরূপে অর্থাৎ প্রকৃতিই তাহাদের স্বরূপ বলিয়া অভেদ, আত্মাই ভূতভেদকারী, অথচ আত্মার ভেদ নাই, যিনি ইহা দর্শন করেন, তিনি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন, ইহাই এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে (স্বামী)।

পূর্ব্বে ক্ষেত্রের যে আপাতভেদ দর্শন হয়, সেই ভেদ অঙ্গীকারপূর্ব্বক কেবল ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদদর্শন নিরাকৃত হইয়াছে। ইদানীং ক্ষেত্রভেদ দর্শনও মায়িক বলিয়া তাহা নিরাস করা হইতেছে। এ স্থলে অর্থ এই,—যে কালে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সর্ব্বভূতগণের বা জড়বর্গের পৃথগ্‌ভাব বা পরস্পর ভিন্নভাব একই সৎ-রূপ আত্মাতে স্থিত বা কল্পিত দর্শন করেন। যাহা কল্পিত, তাহা তাহার অধিষ্ঠান হইতে অনতিরেক বা পৃথক্ নহে। সুতরাং আত্মাতে কল্পিত এই পৃথগ্‌ভাবযুক্ত ভূতগণও সে সৎস্বরূপ আত্মা হইতে ভিন্ন নহে। এই তত্ত্ব যিনি শাস্ত্রাচার্য্যের উপদেশ শ্রবণ করিয়া মনন বা আলোচনা করেন। (মধু)।

ভূতগণের পৃথগ্‌ভাব ব্রহ্মেরই ভেদ,—এই বিচিত্র অনেকরূপাত্মক ভাবকে একস্থ—অর্থাৎ প্রলয়ে সংহারেচ্ছাত্মক রমণাত্মক ব্রহ্মস্বরূপস্থ এইরূপ অনুদর্শন করেন (বল্লভ)। এক অর্থাৎ বিষ্ণু, সর্ব্বভূতভাব সেই এক বিষ্ণুতেই অবস্থিত, ক্রমেই এক বিষ্ণু হইতেই বিস্তার হয় (শ্রীমন্মাধ্ব)।

প্রকৃতির বিকার সমুদায়, পুরুষ হইতে ভিন্ন, সাংখ্যদের এই যে অভিমত, ইহা নিরাকৃত হইয়াছে। যিনি ভূতগণের অর্থাৎ বিকার-সমূহের নানাত্ব প্রকৃতির সহিত আত্মাতেই প্রলীন দেখেন, অর্থাৎ পরিপূর্ণ আত্মা হইতেই প্রকৃতি আদি বিশেষ পর্য্যন্ত বিবর্ত্তিত, এজন্য তাঁহার আত্মারই স্বরূপ, সেই আত্মামাত্রেই এইরূপ যিনি দর্শন করেন (গিরি)।

পূর্ব্বে এইরূপে আত্মার সর্ব্বত্র সমত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক আত্মার ক্রিয়ার দ্বারা প্রাপ্ত প্রকৃতি নিমিত্ত বিভিন্ন শরীররূপ বৈষম্য পরিহার করা হইয়াছে। এক্ষণে দেহভেদ ও তাহার কারণের একত্ব দেখাইয়া, নিরাকরণ পূর্ব্বক দ্রষ্টার ব্রহ্ম-সাদৃশ্যরূপ আত্মপ্রাপ্তির কথা উক্ত হইয়াছে। (কেশব)।

তা হ'তে বিস্তার হেরে আর—আত্মা হইতেই এ জগতের বিস্তার অর্থাৎ উৎপত্তি বা বিকাশ দেখিয়া থাকে। আত্মতঃ প্রাণঃ, আত্মতঃ আশা, আত্মতঃ স্মরঃ, আত্মত আকাশঃ, আত্মতঃ তেজঃ, আত্মত আপঃ, আত্মত আবির্ভাবতিরোভাবৌ, আত্মত অন্নম্ ইত্যাদ প্রকারে আত্মা হইতে এ সকলের বিস্তার যখন দেখিতে পান (শঙ্কর)। সেই প্রকৃতি হইতে উত্তরোত্তর পুত্রপৌত্রাদিভেদ-বিস্তার তিনি দেখেন (রামানুজ)। সৃষ্টি-সময়ে সেই প্রকৃতি হইতেই ভূতগণের বিস্তার, এইরূপ দর্শন করেন (স্বামী)। সৃষ্টিকালে প্রকৃতি হইতেই দেবাদি ভূতগণের পৃথগ্‌ভাবে বিস্তার হইয়াছে, সেই পৃথগ্‌ভাব আত্মস্থ নহে, এবং আত্মা হইতেও তাহার বিস্তার হয় নাই, ইহা যিনি দর্শন করেন (বলদেব)। মায়াবশে এক আত্মা হইতেই

স্বপ্ন-মায়াবৎ-ভূতগণের পৃথগ্‌ভাবে বিস্তার যিনি অনুদর্শন করেন (মধু)। প্রপঞ্চরমণেচ্ছুক ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টিসময়ে সর্ব্বস্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতের বিকাশ হয়, ইহা যিনি অনুদর্শন করেন (বল্লভ)। বিস্তার—বিকাশ (হনু)।

সে লভে ব্রহ্মভাব—(ব্রহ্ম সম্পদ্যতে) তিনি ব্রহ্মই (ব্রহ্ম এব) হন (শঙ্কর)। তিনি ব্রহ্ম-সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। অপূর্ণত্ব হেতু অর্থাৎ অপূর্ণ বলিয়া এ সকলকে সেই পূর্ণস্বরূপ আত্মাতে দর্শন বা আত্মসাৎ করাই ব্রহ্মসম্পত্তি। ব্রহ্মত্বলাভ অর্থে এই জ্ঞান সমান (বা সমস্ত জ্ঞান), কালে মুক্তিই এ স্থলে সূচিত হইয়াছে (গিরি)। তিনি অনবচ্ছিন্নজ্ঞানে একাকার আত্মাকেই প্রাপ্ত হন (রামানুজ)। তিনি পরিপূর্ণ ব্রহ্ম-সম্পদ লাভ করিয়া ব্রহ্মই হন (স্বামী)। তখন স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদদর্শনের অভাবে ব্রহ্মই হন—সর্ব্বানর্থ-শূন্য হন। শ্রুতিতে আছে—

"যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥" (ঈশ-উপঃ ৭)

পূর্ব্বে প্রকৃতিভেদ দ্বারা আত্মভেদ নিরাকৃত হইয়াছে, এ স্থলে অনাত্মভেদ অব্যক্ত অপৃথগ্‌ভাব উপদিষ্ট হইয়াছে (মধু)। তিনি ব্রহ্মভূত হন, অর্থাৎ আপনাকে স্বকৃতি হইতে পৃথগ্‌ভাবে অনভিব্যক্ত, সর্ব্বপাপ-বিরহিত, বৃহৎ ইত্যাদি অষ্টগুণযুক্তরূপে অনুভব করেন (বলদেব)। ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন (বল্লভ)।

যখন ভূত পৃথগ্‌ভাব অর্থাৎ দেব-তির্য্যগ্‌-মনুষ্যাদি ভেদে ভিন্ন দেহরূপ ভাব বা কার্য্য, একস্থ, অর্থাৎ স্থিতিকালে একই ঈশ্বর-শক্তিরূপ প্রকৃতিতে স্থিত সর্ব্বদা দর্শন হয় এবং তাহা হইতে অর্থাৎ সেই প্রকৃতি-সকাশ হইতে সৃষ্টি-সময়ে ভূতগণের বিস্তার বা অভিব্যক্তি দর্শন হয়, তখন ভূতগণের কারণ বস্তুর একত্ব দর্শনহেতু ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ ব্রহ্মবৎ অবিচ্ছিন্ন জ্ঞান সমান আত্মাকে প্রাপ্ত হয় (কেশব)।

ভূতপৃথগভাব—একস্থ—এই তত্ত্ব বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্ন-

রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি। শঙ্কর-প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়াছেন যে, এই 'এক' অর্থে আত্মা বা ব্রহ্ম, এবং এই যে ভূতপৃথগ্‌ভাব বা এই পরিদৃশ্যমান 'বহুত্ব' এই ভূতময় জগতের 'নানাত্ব' ইহা সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মে বা আত্মাতে অবস্থিত। রামানুজ প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়াছেন যে, এই 'এক' প্রকৃতি—সর্ব্বভূতপৃথগ্‌ভাব প্রলয় অবস্থায় এই এক প্রকৃতিতেই অবস্থিত থাকে। এই বিভিন্ন-রূপ ব্যাখ্যার মধ্যে কোন্ ব্যাখ্যা সঙ্গত ও গ্রাহ্য, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা আবশ্যক।

গীতা হইতেই প্রথমে এ তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। গীতার পূর্ব্বাপর সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যে অর্থ সঙ্গত হয়, তাহাই গ্রাহ্য। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, তিনিই সর্ব্বভূতাশয়স্থিত আত্মা (১০।২০), সর্ব্বভূতস্থ আত্মা (৬।২৯), তিনি সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা (৫।৭)। তিনি সর্ব্বভূতের বীজ (৭।১০), সর্ব্বভূতের জীবন (৭।৯), সর্ব্বভূতের হৃদয়ে নিয়ন্তা অন্তর্য্যামিরূপে স্থিত (১৮।৬১)। সর্ব্বভূত তাঁহাতে স্থিত (৯।৪), সর্ব্বভূতে সমভাবে স্থিত (৯।২৯; ১৩।২৭), পরব্রহ্মরূপে তিনিই সর্ব্বভূতের বহিঃ ও অন্তরে স্থিত (১৩।১৬)। পূর্ব্বে ২৮শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় জীবের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ বুঝিবার জন্য এ তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। অতএব গীতায় বার বার নানাভাবে এই দুর্ব্বোধ্য তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। যে সর্ব্বভূতপৃথগ্‌ভাব, সর্ব্বভূতবিশেষসঙ্ঘ (১১।১৫) সেই এক ব্রহ্মে বা পরমাত্মা পরমেশ্বরে স্থিত। এ তত্ত্ব স্পষ্ট করিয়া গীতায় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।

*　　*　　*

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।" (৬।৩০, ৩১)।

অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—

'অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্। (১৩.১৬)।"

অতএব গীতা হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, এই ভূতপৃথগ্‌ভাব ব্রহ্মেরই, সে পৃথগ্‌ভাব, সে বিভক্তভাব পারমার্থিক সত্য নহে, তাহার মধ্যে অবিভক্ত এক ব্রহ্মভাবই পারমার্থিক সত্য, সর্ব্বভূতমধ্যে সেই একত্বদর্শনই প্রকৃত দর্শন। শ্রুতিতেও আছে,—"তস্য সর্ব্বস্য ব্রহ্ম ইতি একতা।" (ছান্দোগ্য-উপঃ ১।২।২৭)। অতএব গীতা ও শ্রুতি অনুসারে এই 'এক' যাহাতে ভূতপৃথগ্‌ভাব 'একস্থ', তাহা ব্রহ্ম, পরমেশ্বর বা পরমাত্মা। ব্রহ্মই এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব। পরব্রহ্ম নির্গুণভাবে জগদতীত হইলেও সগুণভাবে পরমেশ্বর পরমাত্মা। ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য তত্ত্ব পৃথক্ নাই, ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য সত্তা নাই, অন্য ভাব নাই। তাঁহার সত্তায় বা সংস্বরূপে সমুদায়ই সত্তাযুক্ত, তাঁহার জ্ঞানে সমুদায়ই অবস্থিত। এ তত্ত্ব পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে।

এই স্পষ্টার্থ সত্ত্বেও রামানুজ, স্বামী প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ কেন এই 'এক'কে প্রকৃতি বলিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না। তাঁহারা কেহই শুদ্ধাদ্বৈতবাদী নহেন। ঈশ্বর, জীব ও জড়জগৎ এ তিন নিত্য পৃথক্‌তত্ত্ব ইঁহারা স্বীকার করেন, কিন্তু এই তিন যে ব্রহ্মে অবস্থিত, এ তিন যে ব্রহ্মেরই বিস্তার, তাহা স্বীকার করেন না। এজন্য তাঁহারা সর্ব্বভূত যে ব্রহ্মে বা ঈশ্বরে 'এক' হইয়া অবস্থিত, তাহা স্বীকার করেন না। যে সাত্ত্বিক জ্ঞানের কথা ভগবান্ উল্লেখ করিয়াছেন ;—

'সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥"
(গীতা ১৮.২০)

জ্ঞানের এই সাত্ত্বিকভাবও বোধ হয় ইঁহারা স্বীকার করেন না। যাহা হউক, ইঁহারা এই 'এক'কে প্রকৃতি বলিলেন কেন? গীতা হইতেই তাঁহারা ইহার উত্তর দিতে পারিতেন। গীতায় আছে—

"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥" (গীতা ২।২৮)।

কিন্তু এই শ্লোক হইতে ব্যক্তাবস্থায় ভূতপৃথগ্‌ভাবে যে সেই অব্যক্তে একস্থ, এ কথা বলা সঙ্গত হয় না। এ স্থলে অব্যক্ত অর্থে মূল প্রকৃতি বা ভগবানের অব্যক্ত মূর্ত্তি—যাহা দ্বারা সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত (৯।৪), তাহা নহে। এ স্থলে অব্যক্ত বিশেষ্য নহে,—বিশেষণ। অব্যক্তসংজ্ঞক বলায় তাহা বিশেষ্য হইলেও, সে অব্যক্ত 'প্রকৃতি' নহে; তাহা এই গীতা অনুসারে এই ভগবানেরই মূর্ত্তি; সেই অব্যক্ত মূর্ত্তি, ভগবান্‌ হইতেই সমুদায় ব্যক্ত হইয়াছে (৭।২৪)। সে অব্যক্ত ও অক্ষর ব্রহ্ম (৮।২১; ১২।১—৬)। গীতায় ১৩।১৫ শ্লোকে যে অব্যক্ত ক্ষেত্রের উপাদানরূপে উক্ত হইয়াছে, সে অব্যক্ত নহে।

গীতায় এ সম্বন্ধে আরও একটি শ্লোক আছে—

"অব্যক্তাদ্‌ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥"

(গীতা ৮।১৮)

এ স্থলেও অব্যক্ত অর্থে গীতোক্ত প্রকৃতি নহে। সে প্রকৃতি দুই রূপ;—পরা ও অপরা (৭।৪-৫)। ইহা ব্যতীত অন্য প্রকৃতি গীতায় উপদিষ্ট হয় নাই। ইহা ব্যতীত যে অব্যক্তের কথা গীতায় উক্ত হইয়াছে, তাহা সাংখ্যের মূল প্রকৃতি বা অব্যক্ত নহে। কেন না, সাংখ্যের অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতি স্বতন্ত্র—মূল্যতত্ত্ব। গীতা অনুসারে সে অব্যক্ত ঈশ্বরের অব্যক্ত মূর্ত্তি, ব্রহ্মের অক্ষর স্বরূপ,—মহদ্‌ব্রহ্ম (১৪।৩)। তাহা স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে। তাহা হইতে পরা ও অপরা প্রকৃতির উদ্ভব হইলেও, তাহা হইতে উদ্ভূত বলিয়া শ্রুতিতে সর্ব্বত্র উক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ উক্ত শ্লোক অনুসারে ভূতগণ ব্রহ্মার রাত্রিশেষে বা প্রলয়-শেষে কল্পারম্ভসময়ে অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হয়, এবং সৃষ্টিতে এই ব্যক্তাবস্থায় থাকিয়া আবার ব্রহ্মার

দিনশেষে বা কল্পক্ষয়ে অর্থাৎ প্রলয়ারম্ভে সেই অব্যক্তেই বিলীন হয় বা বীজরূপে অবস্থান করে (৮।১৯)। ইহা হইতে বলা যায় না যে, ভূতগণ সৃষ্টির স্থিতি-অবস্থায় যখন ব্যক্ত হইয়া পৃথগ্‌ভাবযুক্ত হয়, তখনও তাহারা সেই অব্যক্তে অবস্থান করে। রামানুজ ও স্বামী সে কথা স্বীকার করেন। তাঁহারাও বলিয়াছেন যে, 'এক' অর্থে প্রকৃতি, আর সর্ব্বভূতভাব প্রলয়েই সে 'এক' প্রকৃতি অবস্থান করে, এবং সৃষ্টির আরম্ভে তাহা হইতে বিস্তার হয়। মধ্য বা ব্যক্তাবস্থায় যে সর্ব্বভূত-ভাব এই প্রকৃতিতে একস্থ, তাহা তাঁহারা বলেন নাই। কিন্তু এ স্থলে এই ব্যক্তাবস্থার কথাই উক্ত হইয়াছে। অতএব ইঁহাদের অর্থ অনুসারেও বলিতে হয় যে, মধ্য বা ব্যক্ত অবস্থায় যে ভূতপৃথগ্‌ভাব, তাহা অব্যক্তে বা প্রকৃতিতে অবস্থান করে না, ব্রহ্মে বা পরমেশ্বরেই অবস্থান করে।*

সেই এক হইতে বিস্তার,—অতএব সেই 'এক' ব্রহ্ম, আত্মা বা পরমেশ্বর হইতেই এই সর্ব্বভূতময় জগতের বিস্তার হয়, প্রকৃতি বা অব্যক্ত হইতে হয় না, ইহাও সিদ্ধান্ত করিতে হয়। পূর্ব্বে যে অহরাগমে অব্যক্ত হইতে ভূতগণের প্রভব হয় বলা হইয়াছে, সে অহঃ-স্বরূপ ব্রহ্মার দিবা বা কাল্পিক সৃষ্টি আরম্ভ—তাহা মহাপ্রলয়ান্তে সৃষ্টি নহে। এ স্থলে যে বিস্তার বা সৃষ্টি মহাপ্রলয়ান্তে হইয়া থাকে, তাহারই উল্লেখ হইয়াছে। কাল্পিক বা খণ্ড প্রলয়ের কথা এস্থলে উক্ত হয় নাই।

---

* জর্ম্মাণ দার্শনিক হেগেল বলিয়াছেন, 'Man as spirit is a reflection of God" (*Philosophy of Religion Eng.* trans vol III, p *146*)। সর্ব্বভূত ঈশ্বরে স্থিত ও তাঁহা হইতে অভিব্যক্ত, এ কথাও হেগেল বুঝাইয়াছেন। যথা—"This act of differentiation is merely a movement, playing of Love with itself, in which it does not get to the otherness or other being in any serious sense, nor actually reach a condition of separation and division" (Philosophy of Religion. ditto. Vol III, p *35*) জর্ম্মাণ দার্শনিক ফিক্‌টেও এই কথা বুঝাইয়াছেন।

ব্রহ্ম হইতেই যে এই সৃষ্টি হয়, ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত। সাংখ্যদর্শনে পুরুষ-সান্নিধ্যে প্রকৃতি হইতেই এ জগতের পরিণতি হয়, এই সিদ্ধান্ত হইলেও বেদান্তশাস্ত্রের তাহা সিদ্ধান্ত নহে। গীতা বেদান্তের প্রস্থান-ভেদ মাত্র। শ্রুতিতে আছে :—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব,—তদ্ ব্রহ্ম ইতি" (ঐতরেয়, ৩।১।১)। এই শ্রুতি অনুসারে বেদান্ত-দর্শনে ব্রহ্মের লক্ষণা উক্ত হইয়াছে—"জন্মাদ্যস্য যতঃ" (ব্রহ্মসূত্র, ১।১।২)। নির্গুণ ব্রহ্ম মায়াখ্য পরাশক্তিযুক্ত—এজন্য সগুণ। এই কারণরূপা পরাশক্তি কার্য্যোন্মুখ হইলে ব্রহ্ম সগুণ হন; তিনি পরমেশ্বর, পরমপুরুষ, ও পরমাত্মা হন, আর এই পরা সগুণ মায়া প্রকৃতিরূপা হন। তখন এই মায়াকেই অব্যক্ত বলা যায়। অবশ্য মায়া মায়িক মহেশ্বর হইতে যখন স্বতন্ত্রা নহেন, ভিন্না নহেন, এই আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে এই মায়ারূপ উপাদান হইতে প্রথম কার্য্যরূপে আকাশাদি-ক্রমে পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি হয়; বুদ্ধি, মন অহঙ্কারের সৃষ্টি হয়। আত্মা বা পরম পুরুষ তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হন বলিয়া ইঁহারা সকলে দেবতা। আকাশাদি দেবতার কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তাঁহারা সকলে বৈদিক দেবতা। বুদ্ধিতত্ত্বে আত্মা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া হিরণ্যগর্ভ হন। প্রাণতত্ত্ব ইহারই অন্তর্ভূত। মনস্তত্ত্বে অনুপ্রবিষ্ট আত্মা বা অধিদেবতা বিষ্ণু, আর অহঙ্কারতত্ত্বে অনুপ্রবিষ্ট আত্মা বা অধিদেবতা রুদ্র। ইঁহারাও বৈদিক দেবতা। সমষ্টি আকাশাদি-অভিমানী আত্মাই দেবতা। ইহাই শ্রুতির অধিদৈবতরূপ। আর এই পরমাত্মা পরমপুরুষ আপনাকে এই পঞ্চ মহাভূত ও বুদ্ধি মন অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে বিযুক্তভাবে, ইহাদিগকে তাঁহার অপরা প্রকৃতি বলিতে পারেন। গীতায় এইরূপেই এই আটকে অপরা প্রকৃতি বলা হইয়াছে। আর যে মুখ্য প্রাণতত্ত্ব, যাহার অভিমানী দেবতাও হিরণ্যগর্ভ, তাহাকে ভগবান্ এইরূপে তাঁহার পরা-

প্রকৃতিও বলিয়াছেন। (গীতা ৭।৫৪ শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। এই পরা ও অপরা প্রকৃতি, এই মায়াখ্য পরাশক্তির প্রথম কার্য্যাবস্থাই সর্ব্বভূতযোনি (গীতা ৭।৫)। ইহাই মহদ্‌ব্রহ্ম, ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপস্বরূপ (গীতা ১৪।৩)। ইহাতে ভগবান্ অনুপ্রবিষ্ট হইলে বা আত্মস্বরূপ (পুরুষরূপ) বীজ-নিষেক করিলে তবে সর্ব্বভূত-পৃথগ্‌ভাবের উৎপত্তি হয়। এইরূপে সেই এক ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্টির আরম্ভে ভূতপৃথগ্‌ভাবের বিস্তার হয়। মহাপ্রলয়ের পর সৃষ্টির আরম্ভে এই নিয়ম। ব্রহ্মার রাত্রিশেষে যে কাল্পিক সৃষ্টির কথা ভগবান্ পূর্ব্বে অষ্টম অধ্যায়ে বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে ত্রিলোকীর ধ্বংস হয় মাত্র, ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংস হয় না; তাহাতে ভূতগণেরও ধ্বংস হয় না; ভূতগণ সেই প্রলয়ে অবশ হইলে সেই যে অব্যক্তাবস্থা হয়, তাহাতেই বীজভাবে লীন থাকে। এই কাল্পিক প্রলয়ের অন্তে যে ভূতগণের 'প্রভব', তাহা বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্‌গমনের ন্যায় উৎপত্তি মাত্র। অথবা প্রসুপ্ত অবস্থা হইতে জাগ্রদবস্থাপ্রাপ্তি মাত্র। তাহা আদিম ভূত-পৃথগ্‌ভাবের বিস্তার নহে। ইহাই গীতার সিদ্ধান্ত,—ইহাই শ্রুতির ও বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। এ স্থলে এ তত্ত্ব বিশেষভাবে বুঝিবার প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বে ইহা বিবৃত হইয়াছে।

লভ ব্রহ্মভাব।—মূলে আছে—"ব্রহ্ম সম্পদ্যতে।" ইহার অর্থ ব্রহ্মসম্পদ লাভ করা বা ব্রহ্মের সালোক্য লাভ করা। ইহা দিয়া ব্রহ্মপুরে আত্মার প্রতিষ্ঠা (মুণ্ডক, ২।২।৭)। ইহাই ব্রহ্মপ্রাপ্তি (কঠ, ৬।১৮)। ইহা ব্রহ্মভাবে পরমানন্দভোগ (নাদবিন্দু উপঃ ২০)। এই ব্রহ্মসম্পদ লাভ হেতু 'ব্রহ্মলোক'-প্রাপ্তি হয় (ছান্দোগ্য ৮।১২।১; বৃহদারণ্যক, ৬।২।১৫)। ইহাকে গীতায় ব্রাহ্মী স্থিতিও বলা হইয়াছে (২।৭২ ও তাহার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। এই ব্রাহ্মী স্থিতির ফল যে ব্রহ্মনির্ব্বাণ, তাহাও উক্ত হইয়াছে (২।৭২)। আত্মতত্ত্বজ্ঞানেই অর্থাৎ

সর্ব্বত্র আত্মদর্শন-ফলেই যে ব্রহ্মে নির্ব্বাণ হয়, তাহাও গীতায় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, (৫।২৪-২৬)। যিনি নিরঞ্জন ব্রহ্মভূত হন, তিনি সর্ব্বপাপশূন্য (৬।২৭), প্রসন্নাত্মা (১৮।৫৪), নিষ্কাম, নিস্পৃহ, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার হন (২।৭১), তিনিই শান্তি লাভ করেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই ব্রহ্মসম্পদ্ লাভ করিয়া অর্থাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে এক আত্মা বা ঈশ্বরকে 'সম' ভাবে দর্শনফলে যে ব্রহ্মসম্পদ্-লাভ হয়, তাহার ফলে উক্তরূপ যে অবস্থান হয়, তাহা এক অর্থে নির্গুণ ব্রহ্ম-স্বরূপে অবস্থান,— সগুণ ও নির্গুণভাবে জ্ঞেয় পরব্রহ্মে অবস্থান নহে। এই ব্রহ্মসম্পদ্‌লাভ বা ব্রাহ্মী স্থিতি যে পরম পুরুষার্থ নহে, প্রকৃতি হইতে পুরুষের বিবেকজ্ঞান লাভ করিয়া পুরুষের স্বরূপ অবস্থা যে সাংখ্যদর্শনে উক্ত হইয়াছে, তাহাও পরম পুরুষার্থ নহে। গীতা অনুসারে সগুণ-নির্গুণ-ভাবে জ্ঞেয় পরব্রহ্মের স্বরূপলাভই পরম পুরুষার্থ—ইহা পূর্ব্বে উক্ত ২।৭২ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ও পরে উক্ত হইয়াছে। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই।

রামানুজ প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ ব্রহ্ম অর্থে জীবাত্মা বা প্রত্যগাত্মা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এই প্রত্যগাত্মাই ব্রহ্ম। ঈশ্বর ও প্রকৃতি তাঁহা হইতে ভিন্ন। প্রকৃতি হইতে প্রত্যগাত্মার (পুরুষের) পার্থক্যজ্ঞান লাভ করিয়া সেই প্রত্যগাত্মার ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতিই ব্রহ্মসম্পদ্ লাভ। সুতরাং এই মতানুসারে তাঁহারা এই শ্লোকোক্ত 'এক' ও 'ব্রহ্ম-সম্পদ্‌লাভের' অর্থ বুঝাইয়াছেন। ইহা শ্রুতি ও গীতা-শাস্ত্র-সম্মত নহে। সর্ব্বত্র একত্ব-দর্শনে সর্ব্বভূতপৃথগ্‌ভাব সেই এক ব্রহ্মে স্থিত, এই তত্ত্ব দর্শনে ব্রহ্মসম্পদ্‌লাভরূপ পরাগতি-প্রাপ্তি হয়। যে নানাত্ব দর্শন করে, বহু পুরুষ হইতে পৃথক্ এক প্রকৃতি এবং এই পুরুষ (ভগবানের পরাপ্রকৃতি) এবং প্রকৃতি (অপরা) হইতে ভিন্ন ঈশ্বর, এইরূপ নানাত্ব দর্শন করে, তাহার কখন পরাশক্তি লাভ হয় না।

শ্রুতিতে আছে,—“নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।” (বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৯, কঠোপনিষদ্ ৪।১০।১১)।

এ স্থলে আরও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, পূর্ব্বে তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনকে জ্ঞানের স্বরূপ বলা হইয়াছে (১৩।১১ শ্লোক), সেই তত্ত্বজ্ঞানার্থই এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে এবং সেই তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শনই এই স্থলে ২৭শ শ্লোক হইতে এই শ্লোক পর্য্যন্ত সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ (১) বিনাশী সর্ব্বভূতে বিনাশ-রহিত পরমেশ্বরের সমভাবে অবস্থিতি দর্শন, (২) ভগবানেরই প্রকৃতি (ক্ষেত্ররূপে) সর্ব্বরূপে সর্ব্ব-কর্ম্ম করে, (ক্ষেত্রজ্ঞ) আত্মা বা পুরুষ অকর্ত্তা এই তত্ত্ব দর্শন, এবং (৩) সর্ব্বভূতপৃথগ্‌ভাব সেই ‘এক’ অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বা ব্রহ্মে অবস্থিত এবং সেই এক হইতে বিস্তারিত এই তত্ত্ব-দর্শন, এইরূপে তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শন সিদ্ধ হয়। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে সমভাবে স্থিত, ঈশ্বরের পরা ও অপরা প্রকৃতিই কর্ত্রী, পুরুষ অকর্ত্তা, এই সকল তত্ত্বজ্ঞানার্থ পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। এ স্থলে ভূতপৃথগ্‌ভাব যে ‘একে’ স্থিত অর্থাৎ “একমেবা-দ্বিতীয়ং” ব্রহ্মে স্থিত, এবং সেই এক হইতেই বিস্তারিত, ইহাই বিবৃত হইল এবং এই তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনফলে যে ব্রহ্মসম্পদ্ লাভ হয়, ব্রহ্মের ন্যায় আপন আত্মাকে সর্ব্বভূতে বিস্তার করিয়া, সর্ব্বাত্মভূত হইলে যে ব্রহ্ম-স্বরূপ লাভ হয়, তাহা আমরা এ স্থলে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই আত্ম-‘বিস্তার’ বা আত্ম-‘সম্প্রসারণ’ দ্বারাই ব্রহ্মসম্পদ্-লাভ হয়। এ তত্ত্ব আর বিস্তারিতভাবে বুঝিবার প্রয়োজন নাই।

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মাঽয়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥ ৩১

অনাদিত্ব নির্গুণত্ব হেতু, হে কৌন্তেয়!
সে অব্যয় পরমাত্মা দেহস্থ হয়েও
নাহি কিছু করে কিংবা নাহি লিপ্ত হয়।৩১

৩১। পূর্ব্বশ্লোকে—ভূতপৃথগ্‌ভাব এক পরমাত্মাতেই স্থিত ইহা উক্ত হইয়াছে। ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে যে, এক আত্মাই যদি সকল দেহের আত্মা হন, তবে সর্ব্বদেহকর্তৃ দেহের দোষের সহিত আত্মার সম্বন্ধ হইতে পারে। সেই আশঙ্কা দূর করিবার জন্ম এই শ্লোক (শঙ্কর)। দেহ হইতে ভিন্ন পরমাত্মা দেহস্থ হইয়াও দেহস্বভাবে লিপ্ত হন না, ইহাই এ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে (রামানুজ)। সংসার অবস্থায় দেহসম্বন্ধ নিমিত্ত কর্ম্ম ও তৎফল সুখ-দুঃখাদি দ্বারা পরমাত্মার বৈষম্য তুষ্পরিহর সমদর্শন সম্বন্ধ নহে, এই আপত্তির উত্তর এই শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে (স্বামী)। আত্মা স্বতঃ অকর্ত্তা হইলেও ঔপাধিক শরীর-সম্বন্ধ হেতু কর্ত্তৃত্ব-যুক্ত হইতে পারে, এই শঙ্কার নিবারণ জন্ম আত্মার অকর্ত্তৃত্ব পুনর্ব্বার এই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে (মধু)। দেহের সহিত জীবের উৎপত্তি-বিনাশ হয় না, ইহাই এ স্থলে উক্ত হইয়াছে (বলদেব)।

আত্মা প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং সেই জন্ম তাহার স্বতঃ কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, ইহা স্বীকার করিলেও শরীরে অবস্থান-দশায় ও শরীরের সহিত সম্বন্ধ নিমিত্ত কর্ম্ম দ্বারা ও তজ্জনিত সুখ-দুঃখাদির দ্বারা যদি আত্মা লিপ্ত হয়, তবে কিরূপে তাহার অকর্ত্তৃত্ব ও সমত্ব-দর্শন সম্ভব হয়, তাহার উত্তরে এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে (কেশব)।

অনাদিত্ব—অনাদির ভাব অনাদিত্ব। আদি শব্দের অর্থ কারণ। যাহার কারণ নাই, তাহা অনাদি। যে বস্তু আদিমৎ, তাহা নিজ স্বরূপে বিনাশশীল। আত্মা অনাদি বলিয়া ইহার বিনাশ নাই, ইহা অবিনাশী।

আত্মা নিরবয়ব ; এই কারণেও তাহার বিনাশ হইতে পারে না (শঙ্কর)। আদিমং বা উৎপত্তিবিনাশশীল শরীরস্থ হইয়াও আত্মা অনাদি অর্থাৎ উৎপত্তিরহিত (রামানুজ)। উৎপত্তি নাই বলিয়া অনাদি (স্বামী)। আদি অর্থাৎ অসৎ অবস্থা, সর্ব্বদা সৎ আত্মার কখন প্রাগসদবস্থা থাকিতে পারে না ; অতএব তাহার কারণাভাবে জন্মাভাব সূচিত হইয়াছে। যাহা অনাদি, তাহার জন্ম সম্ভব নহে। জন্ম না হইলে যাহা শেষে ভাববিকার বা বিনাশ, তাহারও সম্ভাবনা নাই। যাহা অনাদি, তাহা অজ ও অবিনাশী (মধু)।

নির্গুণত্ব।—যে বস্তু সগুণ, তাহার গুণের অপচয় হইলে বিনাশ হয়। আত্মা নির্গুণ ; সুতরাং তাহার বিনাশ হইতে পারে না (শঙ্কর)। সত্বাদি গুণরাহিত্য (রামানুজ)। নির্দ্ধর্ম্মকত্ব (মধু)। বিশুদ্ধ জ্ঞানানন্দত্ব (বলদেব)।

অব্যয় পরমাত্মা।—পরমাত্মা অনাদি এবং নির্গুণ, এই জন্য তাহা অব্যয় বা অবিনাশী (শঙ্কর)। ব্যয় দুই রূপ ;—কার্য্যত্বকৃত ব্যয় এবং গুণাপকর্ষ দ্বারা ব্যয়। পরমাত্মার এই দুই রূপ ব্যয়ের অভাব-হেতু অব্যয় (গিরি)। এই পরমাত্মা অনাদি বা উৎপত্তিধর্ম্মহীন বলিয়া এবং নির্গুণ বলিয়া অব্যয় বা অবিকারী (স্বামী)। এই অপরোক্ষ পরমাত্মা—পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন প্রত্যগাত্মা ব্যয়হীন বা সর্ব্ববিকারশূন্য। যাহা ধর্ম্মযুক্ত বা উৎপত্তিমৎ, অথবা যাহা উৎপত্তিমৎ না হইয়াও কেবল ধর্ম্মিস্বরূপ হয়, তাহা ব্যয়যুক্ত—তাহা অব্যয় নহে। পরমাত্মার উৎপত্তি নাই ; এই জন্মাভাব হেতু পরমাত্মা অব্যয়। পরমাত্মার কোন গুণ বা ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্মীতে ধর্ম্মের উপচয় বা অপচয় হয়। ধর্ম্মের সহিত ধর্ম্মীর তাদাত্ম্যহেতু ধর্ম্মীরও উপচয় বা অপচয় হয়। আত্মার কোন ধর্ম্ম নাই, এজন্য তাহার উপচয় বা অপচয় নাই। একারণও পরমাত্মা অব্যয় (মধু)। অব্যয়, অর্থাৎ পরম স্বরূপাদিনাশশূন্য (বল্লভ)।

এই আত্মা অর্থাৎ জীব—পরম এবং অব্যয়। ব্যয়ের প্রধান ধর্ম্ম বিনাশ। আত্মা শরীরস্থ হইলেও বিনাশরহিত (বলদেব)।

দেহস্থ হয়েও নাহি কিছু করে...নাহি লিপ্ত হয়।—আত্মার উক্তরূপ স্বরূপ বলিয়া, আত্মা শরীরস্থ হইয়াও কোন প্রকার কার্য্য করেন না, এবং কার্য্য করেন না বলিয়াই কোন প্রকার কর্ম্মফলের দ্বারাও লিপ্ত হন না। শরীরেই আত্মার উপলব্ধি হয়, এজন্য আত্মাকে শরীরস্থ বলা যায়। এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, তবে কর্ম্ম করে কে? পরমাত্মা হইতে অতিরিক্ত কোন দেহী যদি কর্ম্ম করে ও কর্ম্মে বা কর্ম্ম ফলে লিপ্ত হয়, তবে ভগবান্ 'আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও' (১৩।২), ইহা বলিয়া যে জীব ও ঈশ্বরে অভেদ—এই উপদেশ দিয়াছেন, ইহা উপপন্ন হয় না অর্থাৎ ঈশ্বর হইতে জীবের পার্থক্য অঙ্গীকারে, এই উপক্রমের বিরোধ নাই—এরূপ বলা যাইতে পারে (গিরি) অতএব যদি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন কোন দেহী না থাকে, তবে কে কর্ম্ম করে এবং কেই বা লিপ্ত হয়? যদি আর কেহ কর্ম্ম না করে ও না লিপ্ত হয়, তবে বলিতে হয় যে, ক্ষেত্রজ্ঞ ব্যতীত আর কেহ কর্ম্ম করে না ও ফলভোগ করে না। এইরূপ আপত্তি হইতে বুঝা যায় যে, ভগবান্ যে উপনিষৎপ্রতিপাদিত আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছেন, তাহা সর্ব্বপ্রকারে দুর্জ্ঞেয় ও দুর্ব্বাচ্য। এই কারণে বৈশেষিক, সাংখ্য, আর্হত ও বৌদ্ধ দার্শনিকগণ এই প্রকার মত পরিত্যাগ করিয়াছেন। যাহা হউক, এই আপত্তির যে উত্তর, তাহা ভগবান্ স্বয়ং দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে" (৫।১৪)। স্বভাব বা অবিদ্যাই কেবল কর্ম্ম করে ও কর্ম্মে লিপ্ত হয়—এই প্রকার ব্যবহারমাত্র হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মাতে কোন প্রকার কর্ম্ম বা কর্ম্মফলের সম্বন্ধ হইতেই পারে না। এ জন্য যাঁহারা জ্ঞাননিষ্ঠ, এই পরমার্থ সাংখ্য-দর্শনে স্থিত পরমহংস পরিব্রাজক, যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার অবিদ্যা-ব্যবহার

মিথ্যা বলিয়া জানিয়াছেন, তাঁহাদের কোন কর্ম্মে অধিকার নাই। ভগবান্ ইহাই এ স্থলে দেখাইয়াছেন (শঙ্কর)।

পরমাত্মা দেহ হইতে ভিন্নস্বভাব, ইহা নিরূপিত হইয়াছে। সেই পরমাত্মা শরীরস্থ হইয়াও অনাদি হেতু এবং নির্গুণ হেতু কোন কর্ম্ম করেন না, এবং দেহস্থ কোন ভাবে লিপ্ত হন না, (রামানুজ)। উক্ত হেতু এই পরমাত্মা দেহস্থিত হইয়াও কোন কর্ম্ম করেন না, কোন কর্ম্ম-ফলেও লিপ্ত হন না (স্বামী)।

অনাদি জন্মরহিত। নির্গুণ স্বরূপতঃ মায়া-গুণসম্বন্ধ-রহিত। অব্যয়=বিনাশ-বর্জ্জিত। যাহার উৎপত্তি আছে এবং যাহা প্রকৃতি গুণযুক্ত, তাহার 'ব্যয়' বা নাশ হয়। আত্মার এইরূপ 'ব্যয়' নাই, এই জন্য অব্যয়। পরমাত্মা—দেহ মন বুদ্ধিকে আত্মা বলে, ইহাদের অপেক্ষা যাহা পর বা শ্রেষ্ঠ, তাহাই পরমাত্মা। সুতরাং এই অব্যয় পরমাত্মা শরীরে থাকিয়াও কিছু করেন না বা কিছুতে লিপ্ত হন না অর্থাৎ দেহের ভাব যে পরিণাম আদি বা পুণ্যদোষ আদি, তাহাতে যুক্ত হন না (কেশব)।

এই আত্মা বা জীব পরম, অব্যয়, অবিনাশী ও নির্গুণ বলিয়া যুদ্ধ-যজ্ঞাদি কোন কর্ম্ম করেন না, এবং সেই হেতু উৎপত্তি-বিনাশ-লক্ষণ শরীর ইন্দ্রিয়স্বভাব দ্বারা লিপ্ত হয় না (বলদেব)। বলদেব আরও বলেন যে, পরমেশ্বর এবং আত্মা—ইঁহাদের মধ্যে প্রভেদ দর্শন করিলেই যে কৃতার্থ হওয়া যায়, এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে, এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। শ্রুতিতে আছে,—"এতেভ্য এব ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেব অনুবিনশ্যতি প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি" (বৃহদারণ্যক, ২।৪।১২)। অতএব শ্রুতি অনুসারে দেহ সহ আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ শ্রুতিতেই উক্ত হইয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তরে এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে। ইহাতে দেখান হইয়াছে যে, শ্রুতির এই অর্থ ঔপচারিক।

সর্ব্বগত ও সর্ব্বাত্ম হেতু দেহাদিতে স্থিত হইলেও স্বতঃ দেহাদি আত্ম রূপে কর্ম্ম করেন না কর্ম্মেও লিপ্ত হন না। কর্ত্তৃত্বের অভাবেও ভোক্তৃত্ব হইতে পারে, এই জন্য উক্ত হইয়াছে যে, তিনি লিপ্তও হন না।

'যেহেতু আত্মা—জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপচয় ও বিনা এই ষড়্‌ভাববিকারশূন্য (পূর্ব্বে ২।২০ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) এবং অধ্যাস সম্বন্ধে শরীরস্থ,—এজন্য শরীরে যে কার্য্য হয়, তাহা আত্ম করেন না, এবং কর্ম্ম না করায় কর্ম্মফলেও লিপ্ত হন না। যেমন জলস্থ (জলে প্রতিবিম্বিত) সবিতা জলের চলন হেতু চলিত হন না, সেইরূপ আত্মাও দেহের কর্ম্ম দ্বারা কর্ত্তা হন না। যে যেই কর্ম্ম করে, সে সেই কর্ম্মের ফলে লিপ্ত হয়। আত্মা অকর্ত্তা বলিয়া কোন কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি শরীরের বা ক্ষেত্রের ধর্ম্ম, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। প্রকৃতি বা মায়া দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম সর্ব্বরূপে কৃত হয়, ইহাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। অতএব যে পরমার্থদর্শী, তাহার সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তি হয়। আত্মার নির্দ্ধর্ম্মত্ব এ স্থলে উক্ত হওয়ায়, আত্মার স্বগতভেদও নিরস্ত হইয়াছে। অতএব আত্মা অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, ইহাই সিদ্ধ হইয়াছে' (মধু)। এই আত্মা শরীরস্থ অর্থাৎ শরীরে উপলভ্যমান (হনু)।

জীব ব্রহ্মের অংশ। অজ্ঞান হেতু দেহসম্বন্ধে জীবের কর্ম্মলেপ হয়, সেই অজ্ঞাননাশ হইলে সেই কর্ম্মলেপ হয় না; সুতরাং কিরূপে সমদর্শন সম্ভব? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, যাহারই অন্য সহ সম্বন্ধে উৎপত্তি হয়, তাহার নাশও হয়। অবিদ্যাবশতঃ জীবভাববং দেহ সম্বন্ধে আত্মার উৎপত্তি হইলেও সে সম্বন্ধের অভাবে আত্মা কেবল সাক্ষী। গুণের সহিত যাহার সম্বন্ধ হয়, গুণনাশে তাহার নাশ হয়; এই পরমাত্মা নির্গুণ, এজন্য অব্যয়, নাশশূন্য। এজন্য আত্মা শরীরস্থ হইয়াও কোন কর্ম্ম করেন না (বলদেব)।

পরমাত্মা।—এ স্থলে যে পরমাত্মা উক্ত হইলেন, তিনি জীব নহেন।

বলদেব, বল্লভ প্রভৃতি যে এই পরমাত্মাকে জীব বা জীবাত্মা বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। পূর্ব্বে ২২শ শ্লোকে শরীরস্থ পুরুষকে পরমাত্মা বলা হইয়াছে। তিনি উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর, পরমাত্মা ও এই দেহে দেহাতিরিক্ত 'পর' পুরুষ। তিনি যে ব্রহ্ম—সর্ব্বদেহে আত্মস্বরূপে অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের ন্যায় অবস্থিত, তাহা পূর্ব্বে উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই।

পরমাত্মা অনাদি দেহ অব্যয়।—পরমাত্মা যে অব্যয়, তাহার দুই কারণ,—তিনি অনাদি ও নির্গুণ। অনাদি হইলে অব্যয় হয় কেন? অনাদি অর্থাৎ যাহা কোন কারণ হইতে কার্য্যরূপে উৎপন্ন হয় না, এবং যাহার এই কারণরূপ হইতে কখনও কার্য্যরূপে প্রচ্যুতি হয় না। যিনি সর্ব্বকারণের কারণ, কার্য্যকারণাত্ম সম্বন্ধ বা নিমিত্তের যিনি অতীত, নিমিত্তের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, তিনি অব্যয়। যাঁহার ব্যয় নাই, তিনি অব্যয়। কারণ কার্য্যরূপে পরিণত হইলে, তাহার ব্যয় হয়। তবে যদি সেই কারণ অনন্ত হয়, আর কার্য্য সান্ত হয়, তবে সে কারণ হইতে কার্য্যোৎপত্তি হইলেও, সে কারণ অনন্ত পূর্ণই থাকে, অব্যয় থাকে। পরমাত্মা ব্রহ্ম কার্য্য-কারণসম্বন্ধের অতীত হইয়াও স্বমায়াশক্তি হেতু সর্ব্বকারণ। ব্রহ্ম কার্য্য-কারণের অতীত হইয়াও এই বিশ্বের আদি কারণ (first cause) বলিয়া তিনি অনাদি। আর কার্য্যকারণ সম্বন্ধের (causation) অতীত বলিয়াও তিনি অব্যয়।

পরমাত্মা নির্গুণ বলিয়া অব্যয়।—পরমাত্মা অনাদি বলিয়া অব্যয়, এবং নির্গুণ বলিয়াও অব্যয়। এই নির্গুণের অর্থ কি? নির্গুণ অর্থে সর্ব্বপ্রকার গুণ বা ধর্ম্মের অতীত। রামানুজ প্রভৃতির মতে সর্ব্ব হেয় গুণের সহিত সম্বন্ধশূন্য অথচ সর্ব্ব উপাদেয় গুণযুক্ত যিনি, তিনিই নির্গুণ। কিন্তু সে অর্থে ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা যায় না। ব্রহ্ম সগুণ ও

নির্গুণ উভয় ভাবযুক্ত। যেমন কোন পটের একদিকে চিত্র থাকে, ও অন্য দিক্ শুভ্র সর্ব্ববর্ণের দ্বারা অরঞ্জিত থাকে, সেইরূপ ব্রহ্ম একভাবে নির্গুণ, অন্যভাবে সগুণ। ব্রহ্মের নির্গুণ ভাব প্রপঞ্চাতীত ভাব (transcendent ভাব), তাহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। সম্বন্ধ ব্যতীত কোন গুণের অভিব্যক্তি হয় না। ব্রহ্ম পরমাত্মা-রূপে এই জগতের অতীত হইয়াই সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট। আকাশ যেমন নির্লিপ্ত হইয়াও সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট, সেইরূপ পরমাত্মাও সর্ব্বশরীরস্থ হইয়াও নির্লিপ্ত। এই পরমাত্মা নিশ্চল, স্থির, অক্ষর, অব্যয়, নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত ও প্রপঞ্চের সহিত সম্বন্ধহীন। এজন্য এই পরমাত্মা শরীরস্থ থাকিলেও নির্গুণ ব্রহ্মরূপ। শরীরস্থ পরমাত্মার প্রতিবিম্ব চিত্তে প্রতিফলিত হইলে যে জীবভাব হয়, সেই জীব কর্ত্তা ভোক্তা হইলেও, তাহার প্রতিবিম্ব আবার পরমাত্মাতে প্রতিবিম্বিত হইলেও, পরমাত্মা তাহা দ্বারা রঞ্জিত হয় না। তবে অধ্যাস হেতু অবিদ্যাবশে জীব তাহাকে সেই কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের দ্বারা রঞ্জিত বলিয়া মনে করে। অতএব শরীরস্থ হইলেও আকাশকল্প আত্মা নির্গুণই থাকে। যাহা নির্গুণ, তাহার কোনরূপ ব্যয় হয় না। গুণ হেতু যে সম্বন্ধ হয়, সেই সম্বন্ধ হেতু সেই গুণীর ব্যয় বা অপচয় উপচয় হইতে পারে। গুণসম্বন্ধ না থাকিলে কোন উপচয় বা অপচয় হয় না, অর্থাৎ কোন ব্যয় হয় না। যে দ্রব্য আমাদের প্রত্যক্ষ হয়, বা যাহার অনুমান হয়, তাহা জাতি গুণ, কর্ম্ম ও সম্বন্ধ দ্বারাই আমরা জানিতে পারি। পরমাত্মা সম্বন্ধে কোন গুণ (connotation) আমাদের প্রমা-জ্ঞানের বিষয় নহে। ব্রহ্ম বা পরমাত্মা যে অপ্রমেয়, এই নির্গুণত্বই তাহার কারণ। এ সম্বন্ধে শঙ্কর যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাই সঙ্গত। পূর্ব্বে ইহা বিবৃত হইয়াছে।

পরমাত্মা অকর্ত্তা ও অভোক্তা।—এই দেহে অধিষ্ঠিত যিনি পরমাত্মা, তিনি কোন কর্ম্ম করেন না, এবং কোন কর্ম্মে লিপ্ত হন না।

শ্রুতিতে যে শরীররূপ বৃক্ষে দুই পক্ষীর অধিষ্ঠানের কথা আছে, তাহার মধ্যে এক অর্থাৎ পরমাত্মা সর্ব্বভূতে সমভাবে স্থিত। তিনি দ্রষ্টা মাত্র, তিনি কোন কর্ম্ম করেন না ও কোন কর্ম্মফল ভোগ করেন না, কোন কর্ম্মেও লিপ্ত হন না। বদ্ধ জীবাত্মাভাবেই তিনি কর্ম্ম করেন ও কর্ম্মে লিপ্ত হন, ইহা প্রতীয়মান হয়। এই শ্রুতিমন্ত্র পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা এই—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি
অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥"
(ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।২১ ; মুণ্ডক উপঃ ৩।১।১)
'ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাম্প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে,
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি......॥" (কঠ উপঃ ৩।১)।
এই "প্রাণসংজ্ঞক জীব" (মৈত্রায়ণী, ৬।১৯)
মধ্যে আত্মা অনুপ্রবিষ্ট হন।

"অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপেণ ব্যাকরবাণীতি।' (ছান্দোগ্য, ৬।৩।২)। অতএব জীবদেহে আত্মা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপে ব্রহ্ম অবস্থিত, এ কথা বলা যাইতে পারে। এই পরমাত্মার অধিষ্ঠান থাকায় জীবাত্মা শরীরবদ্ধ ভাবে ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন থাকিয়াও এই ভূমা, পূর্ণ, অনন্ত, অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মার স্বরূপলাভে অধিকারী। শ্রুতিতে আছে—

"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥"

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্ যদ্ শরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে ॥"
(শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৫।৯,১০)।

এই জীব দেহে বদ্ধভাব হেতু জীবাত্মা ক্ষুদ্র, 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র' বালাগ্রভাগস্য শতধা' অনুমিত হইলেও, সে জীবাত্মার স্বরূপ যে পরমাত্মা, তাহা বার বার উক্ত হইয়াছে। জীবাত্মারূপে বদ্ধভাবে তিনি কর্ত্তা ও ভোক্তা বলিয়া বোধ হইলেও পরমাত্মারূপে তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতে সর্ব্বজীবে সমভাবে স্থিত, অনাদি, নিগুণ; এজন্য পরমাত্মস্বরূপে তিনি কর্ম্ম করেন না, কর্ম্মে লিপ্তও হন না।

জীবদেহে বা সর্ব্বভূতদেহে পরব্রহ্ম তিন ভাবে অধিষ্ঠিত, ইহা আমরা গীতা হইতে জানিতে পারি। এক জীবাত্মা বা ক্ষর পুরুষরূপে, এক পরমাত্মা বা অক্ষর পুরুষরূপে, আর এক পরমেশ্বর বা পরমপুরুষরূপে ব্রহ্ম জীবাত্মারূপে অবিভক্ত হইয়াও প্রতিদেহে বিভক্তের ন্যায় স্থিত; কিন্তু পরমাত্মা পরমেশ্বররূপে সর্ব্বদেহে সমভাবে স্থিত। পরমাত্মারূপে ব্রহ্মের নির্ম্মল স্বরূপ আমাদের অন্তরে নির্ম্মল বুদ্ধিতে অধ্যাত্মযোগাধিগম্য। আর পরমেশ্বর বা সগুণ ব্রহ্মরূপে তিনি আমাদের অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বত্র অন্তর্য্যামী নিয়ন্তৃরূপে একান্ত ভক্তি দ্বারা নির্ম্মলজ্ঞানে অধিগম্য। জীবাত্মারূপে জীবের অন্তরে বিভক্তের ন্যায় হইয়া অনুপ্রবিষ্ট আত্মারূপে— তাহাতে কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ভোগ অধ্যাস হইলেও পরমাত্মরূপে তিনি নিত্য নির্গুণ, পরমকারণরূপে অনাদি, অকর্ত্তা ও অভোক্তা।

যাহা হউক, জীবাত্মা বা পুরুষ স্বরূপতঃ অকর্ত্তা হইলেও এবং কর্ম্মে লিপ্ত না হইলেও কিরূপে আপনাকে ভোক্তা জ্ঞান করেন, তাহা পূর্ব্বে ২০শ ও ২১শ শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই দুই শ্লোক ব্যতীত এই তত্ত্ব ২৯শ শ্লোকেও পুনরুক্ত হইয়াছে। এ স্থলে ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

যাহা হউক, এই শ্লোকের শঙ্করাচার্য্য-প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যাই সঙ্গত ও গ্রাহ্য। বলদেব প্রভৃতি যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা গ্রাহ্য নহে। 'পরমাত্মা' বা জীবাত্মা এক হইলেও যে বিশেষ আছে, তাহা ব্যবহারক্ষেত্রে অগ্রাহ্য করা যায় না। পরমাত্মা অর্থে যে দেহ হইতে ভিন্ন ও 'পর' জীবাত্মা, ইহাও বলা যায় না; কেন না, একই পরমাত্মা সর্ব্বজীবে বা সর্ব্বভূতে সমভাবে স্থিত, ইহা গীতায় বারবার উপদিষ্ট হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য সেই বিশেষত্ব স্বীকার করেন নাই বলিয়া আত্ম-জ্ঞানীর পক্ষে নিষ্ক্রিয় সন্ন্যাস অবস্থাতেই অধিকার, এবং কর্ম্মে তাহার অধিকার নাই, এই মত জ্ঞাপন করিয়াছেন। বলদেব কেশব প্রভৃতি যে শ্রুতির উল্লেখ করিয়া শ্রুতি তদনুসারে জীবাত্মাকে বিনাশী বলিয়াছেন, এবং এই মত ঔপচারিক বলিয়া বুঝাইয়াছে, সে শ্রুতির এ অর্থ নহে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের (২।৪।১২) সেই মন্ত্র এই:—

"...ইদং মহদ্‌ভূতম্ অনন্তম্ অপারং বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেব অনুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি।" ইহার অর্থ, "এই বিজ্ঞানঘন আত্মা মহদ্‌ভূত, অনন্ত, অপার, এই ভূত সকল হইতে (মহাভূত হইতে) সমুত্থিত হইয়া তাহাতেই বিলীন হন, অর্থাৎ দেহাদি রূপে পরিণত এই সকল ভূত হইতে দেবমানবাদি ভাবে অভিব্যক্ত হইয়া মৃত্যুকে বা এই সকল ভূতের বা ভূতসংঘাত দেহের নাশে আপনার নাশ অনুভব করিয়া সেই পরমাত্মাতেই বিলীন হন। অর্থাৎ তাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না। যিনি জ্ঞান লাভ করিয়া অবিদ্যা হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার 'প্রাণ' আর উৎক্রমণ করে না, দেহনাশের সহিত যিনি ব্রহ্মে লীন হন, তাঁহার আর দেবযানে বা পিতৃযানে গতি হয় না, এই তত্ত্বই এ স্থলে শ্রুতিতে উক্তরূপে বুঝান হইয়াছে। অতএব ইহার দ্বারা জীবাত্মা বিনাশী ইহা প্রতিপন্ন হয় না। দেহবদ্ধ ভূতগণের মধ্যে যে আত্মা অবস্থিত, তাহা জীবাত্মাভাবে, দেহাত্মাধ্যাস হেতু দেহনাশে

আপনার যে বিনাশ অনুভব করে, তাহা অবিদ্যাকল্পিত মিথ্যা জ্ঞান। এই মিথ্যা জ্ঞান হেতুই জীবাত্মার ক্ষরভাব হয়, তাহাকে ক্ষর পুরুষ বলা যায়। মুক্তিতে জীবাত্মার সে বদ্ধ জীবাত্মভাব থাকে না, তাহার অবিনাশী নিগুর্ণ পরমাত্মস্বরূপ অনুভূত হয়। জীবাত্মা অকর্ত্তা বলিয়া যিনি যুদ্ধাদিকর্ম্ম করেন না, এই অর্থ হইলে ভগবান্ যে অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে বারবার উপদেশ দিয়াছেন, এবং যজ্ঞ, দান, তপঃ, কর্ম্ম, কার্য্য বলিয়া তাহা ত্যাজ্য নহে—এই উপদেশ দিয়াছেন, সমুদয় ব্যর্থ হয়। বলদেব জীব ও ঈশ্বরে যে ভেদ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও পরমার্থিক তত্ত্ব নহে। কেন না, ভগবান্ই সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা—তিনিই পরমাত্মা, ইহাই গীতার উপদেশ। নির্গুণ ব্রহ্ম পরমাত্মা, সগুণ ব্রহ্ম পরমেশ্বর। এ উভয় একই, ইহা আমরা বার বার বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। পরমেশ্বরের এক অংশই জীবভূত হইয়া জগৎ ধারণ করেন। সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর অনন্তপ্রকার ভূতদেহ কল্পনা করিয়া তাহা সৃষ্টিপূর্ব্বক তাহাতে অনুপ্রবেশ করিয়া এ জগৎ ধারণ করেন, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। জীবের এই পৃথগ্ভাব এই বিভক্তের ন্যায় অবস্থান, প্রতি ক্ষেত্রে প্রতীয়মান হয় বলিয়া, এই জীব ঈশ্বরের অংশ অংশিভাব উক্ত হইয়াছে। স্বরূপতঃ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর নিষ্কল। দেশকাল-নিমিত্ত দ্বারা পরিচ্ছেদ হইলে অংশভাব হয়। যাহা স্বরূপতঃ দেশকাল-নিমিত্তরূপ কোন উপাধি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, তাহার অংশ হইতে পারে না। সুতরাং জীব ও ঈশ্বরে অংশাংশিভাব ব্যবহারিক পারমার্থিক সত্য নহে। অতএব জীবাত্মায় ও পরমাত্মায় এবং জীবাত্মা ও ঈশ্বরে যে এই দেশকালনিমিত্ত পরিচ্ছেদ হেতু ব্যবহারিক মধ্যে এই ভেদভাব, তাহা পারমার্থিক সত্য নহে, ইহাই সিদ্ধান্ত; এ সম্বন্ধে শঙ্করের সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য। তিনি এই ব্যবহারিকভাবকে মিথ্যা বলিয়াছেন সগুণ ব্রহ্মকে মায়াযোগ হেতু পারমার্থিকভাবে অসত্য বলিয়াছেন

এই সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে। তিনি মায়াকে ব্রহ্মের পরাশক্তি স্বীকার করিয়াও কেন ব্রহ্মের সগুণভাবকে মায়িক বা মিথ্যা বলিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। শক্তি ও শক্তিমানে প্রভেদ নাই, ইহা শ্রুতির উপদেশ। শক্তি নিত্য; তাহা কখনও বীজভাবে কারণরূপে থাকে, কখনও বা কার্য্যরূপে প্রকট হয়। শক্তির কখনও ধ্বংস নাই। শক্তি না থাকিলে শক্তিমান্ থাকিতে পারে, এরূপ কল্পনাই করা যায় না। অতএব ব্রহ্ম স্বমায়াশক্তির দ্বারা যে জগতের কারণ হন, সে জগৎ মিথ্যা হইতে পারে না। তাহা সেই শক্তিরূপ কারণে প্রলয়ে লীন থাকিলেও তাহার একেবারে ধ্বংস বা অত্যন্তাভাব হয় না। এজন্য এই জগৎ অনাদি ও অনন্ত। অতএব সগুণ ব্রহ্মের এই ব্যবহারিক জীবভাবও পারমার্থিক তত্ত্ব। তবে জীবাত্মার পরমাত্মা-স্বরূপ যে আমরা জানিতে পারি না, সে ভ্রম অবশ্য অজ্ঞান বা অবিদ্যামূলক। এই অবিদ্যা দ্বারাই ভেদদর্শন হয়। সেই অবিদ্যা বা অজ্ঞান দূর করিবার জন্য এবং জীবাত্মার আপন পরমার্থস্বরূপ দর্শন করিবার জন্য গীতায় বার বার এইরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥ ৩২

—:*:—

সূক্ষ্ম হেতু সর্ব্বগত আকাশ যেমন
নাহি লিপ্ত হয়, আত্মা সর্ব্বত্র দেহেতে
অবস্থিত হয় তথা নাহি লিপ্ত হন॥ ৩২

সূক্ষ্ম হেতু সর্ব্বগত আকাশ যেমন নাহি লিপ্ত হয়।—যেমন আকাশ সর্ব্বগত বা ব্যাপক হইয়াও সূক্ষ্মতা হেতু কাহারও সহিত সম্বন্ধ

হয় না (শঙ্কর)। যেমন আকাশ সর্ব্ববস্তুতে সংযুক্ত হইয়াও সূক্ষ্মত্ব হেতু সর্ব্ববস্তুর স্বভাব দ্বারা লিপ্ত হয় না (রামানুজ)। যেমন আকাশ সর্ব্বগত পঙ্কাদিতেও স্থিত হইয়া সূক্ষ্মত্ব বা অসঙ্গত্ব হেতু পঙ্কাদিতে উপলিপ্ত হয় না (স্বামী, মধু, বলদেব)। সর্ব্বগত অর্থাৎ জড়জীবান্তর্গত। সূক্ষ্ম— অর্থাৎ স্বরূপাভাবযুক্ত, সঙ্গরহিত। (বল্লভ)।

আত্মা সর্ব্বত্র দেহেতে অবস্থিত হয় তথা নাহি লিপ্ত হয়— এইরূপ সকল দেহে অবস্থিত হইয়াও আত্মা কোন বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হয় না। কি কারণে আত্মা কর্ম্ম করে না ও লিপ্ত হয় না, তাহা এ স্থলে আকাশের দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান হইয়াছে (শঙ্কর)। আত্মা নির্গুণ হইলেও নিত্য সংযুক্ত দেহস্বভাবের সহিত কিরূপে সংযুক্ত হয় না, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত হইয়াছে। আত্মা সূক্ষ্ম হেতু সর্ব্বত্র দেব-মনুষ্যাদি দেহে অবস্থিত হইয়াও সেই সেই দেহ স্বভাবের দ্বারা লিপ্ত হয় না (রামানুজ)। সেইরূপ আত্মা উত্তম, মধ্যম বা অধম দেহে অবস্থিত হইয়াও দৈহিক দোষগুণে যুক্ত হয় না (স্বামী)। আত্মা অসঙ্গ হেতু শরীরস্থ হইয়াও শরীরের কর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত হয় না, ইহার দৃষ্টান্ত উক্ত হইয়াছে (মধু)। আত্মা অর্থাৎ জীব সর্ব্বত্র দেব-মনুষ্যাদি উচ্চোচ্চ দেহে স্থিত হইয়াও সেই দেহধর্ম্মদ্বারা লিপ্ত হয় না, ইহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত হইয়াছে (বলদেব, কেশব)। আত্মাও সূক্ষ্ম ভাব হেতু অপ্রতিহতস্বভাব—এজন্য সম্বন্ধ হয় না।

পূর্ব্বে (৯।৬) শ্লোকে এই আকাশের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। এই সমুদায় জগৎ ভগবানের দ্বারা ব্যাপ্ত, সর্ব্বভূত ভগবানেই স্থিত, অথচ ভগবান্ তাহাতে স্থিত নহেন, ভগবান্ আত্মস্বরূপে ভূতভৃৎ ভূতভাবন হইয়া এবং সর্ব্বভূতাশয়ে আত্মরূপে স্থিত হইয়াও (১০।২০) ভূতস্থ নহেন, এই ঐশ্বরীয় যোগ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার জন্য পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—

"যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥"

মহান্ সর্ব্বত্রব্যাপী বায়ু যেমন আকাশে স্থিত, সেইরূপ সর্ব্বভূত ভগবানেই স্থিত। বায়ু আকাশে স্থিত হইলেও আকাশ যেমন বায়ুতে স্থিত নহে, সেইরূপ সর্ব্বভূত ভগবানে স্থিত হইলেও, ভগবান্ সর্ব্বভূতে স্থিত নহেন। আধার-আধেয় ভাবে এই ভেদ। আকাশ, বায়ু প্রভৃতি ভূতগণের আধার, আকাশ বায়ু প্রভৃতির কারণ, এজন্য বায়ু প্রভৃতি ভূতগণ আকাশে স্থিত হইলেও সেই আধেয়ে আকাশরূপ আধারের স্থিতি নাই। সেইরূপ পরমেশ্বররূপ আধারে সর্ব্বভূতের স্থিতি হইলেও সর্ব্বভূতে পরমেশ্বর স্থিত নহেন। এ স্থলে ইহাই উক্ত হইয়াছে। পরমাত্মাতে সর্ব্বভূতের স্থিতি বটে, অথচ পরমাত্মা সর্ব্বত্র সর্ব্বরূপে প্রকটিত দেহে লিপ্ত হন না। তাহার দৃষ্টান্ত আকাশ। আকাশ সূক্ষ্ম হেতু তাহাতে অবস্থিত স্থূল কিছুতে লিপ্ত হয় না। আত্মাও সূক্ষ্ম হেতু স্থূল ভূতদেহে স্থিত হইয়াও লিপ্ত হয় না।

এই আকাশ দুই অর্থে ব্যবহৃত। এক অর্থ সর্ব্বব্যাপক স্থান (space) আর এক অর্থ সর্ব্বস্থানব্যাপক আকাশরূপ মহাভূত (ইহাকে ইংরাজীতে aether বলে)। এস্থলে এই দুই অর্থেই আকাশকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। সাংখ্যমতে আকাশ স্থূলভূত। তাহা হইতেই দিক্ (space) ও কাল (time)। এই মত বেদান্তসম্মত নহে। দিক্ উক্ত প্রথম অর্থে গৃহীত আকাশেরই রূপ। বৈশেষিক দর্শন অনুসারে এই অর্থে আকাশ ভূত নহে। দিক্ (space) যে সর্ব্বগত সকল বস্তুর আধার, সকলের স্থান বা অবকাশদানকারী সর্ব্বদ্রব্যে ওতপ্রোত হইয়া স্থিত, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। আধুনিক বিজ্ঞান অনুসারেও এই æther যে আমাদের সকলের শরীরে অনুপ্রবিষ্ট ও নির্লিপ্তভাবে অবস্থিত এবং এই শরীরস্থ আকাশের মধ্য দিয়াও আলোক, তড়িৎ প্রভৃতি শক্তিক্রিয়া পরিচালিত হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায়। অতএব এই সূক্ষ্ম আকাশ (æther) সর্ব্বভূতশরীরস্থ থাকিয়াও, স্থূলশরীরে যেমন লিপ্ত হয়

না, পরমাত্মাও সেইরূপ এই সর্ব্বভূতশরীরে আত্মা-রূপে থাকিয়াও নির্লিপ্ত ভাবে থাকেন, এই উপমা দ্বারা তাহা আমরা বুঝিতে পারি।

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩

সূর্য্য একা যেইরূপ করেন প্রকাশ
এই লোক সমুদায়, তথা হে ভারত!
ক্ষেত্রী একা সর্ব্ব ক্ষেত্র করেন প্রকাশ ॥ ৩৩

সূর্য্য……লোক সমুদায়।—আকাশের দৃষ্টান্তের দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার সমত্ব ও নির্লিপ্তত্ব বুঝান হইল বটে, তথাপি আত্মা যদি আকাশবৎ বিভু বা ব্যাপক হয়, তবে তাহার সর্ব্বত্র ব্যাপ্তি হেতু সর্ব্বান্তর্ব্বর্ত্তী সুখদুঃখাদির অনুভব সমান হইবে এবং আমি, তুমি, সে এইরূপ বিভাগের অভাব হইবে। আত্মা যদি মধ্য পরিণাম হয়, তবে তাহা দেহের ন্যায় নশ্বর হইবে। পিপীলিকা-দেহে সেই দেহ-পরিমাণ আত্মা কর্ম্মবশে পরে হস্তির-দেহ গ্রহণ করিতে হইলে তাহার সে দেহগ্রহণ অসম্ভব হইবে। এবং হস্তি-দেহস্থ আত্মারও কর্ম্মবশে পরজন্মে পিপীলিকা-দেহ গ্রহণ করিতে হইলে তাহাতে ব্যাপ্তি অসম্ভব হইবে। আর আত্মা যদি অণুপরিমাণ হয়, তবে প্রতিদেহে আত্মার অতি ক্ষুদ্র অংশে ব্যাপ্ত থাকায় দেহের সর্ব্বত্র সুখ দুঃখের অনুভূতি তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে। এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য এই শ্লোকে অন্য দৃষ্টান্ত দ্বারা আত্মার স্বরূপ বুঝান হইয়াছে (কেশব)। যেমন এক সবিতা বা আদিত্য এই সমুদায় লোকের অবভাসক (শঙ্কর)। যেমন সূর্য্য স্বপ্রভায় এই সমুদায় লোককে প্রকাশ করেন

(রামানুজ, বলদেব, স্বামী)। লোক অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয় সংঘাতরূপবৎ বস্তুমাত্র সূর্য্য এই লোক সকল প্রকাশ করিয়াও প্রকাশ্য বস্তুর ধর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত হয় না, এবং প্রকাশ্য বস্তুর ভেদ দ্বারা ভিন্ন হয় না (মধু)।

ক্ষেত্রী একা সর্ব্বক্ষেত্র করেন প্রকাশ।—মহাভূত হইতে ধৃতি পর্য্যন্ত (১৩।৫-৬) সমগ্র ক্ষেত্রকে অর্থাৎ দেহকে সেই ক্ষেত্রী পরমাত্মা সেই-রূপ প্রকাশ করেন। সূর্য্যের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে আত্মা সকল ক্ষেত্রে এক, অথচ স্বয়ং নির্লিপ্ত (শঙ্কর)। আমার এ ক্ষেত্র, ইহা ঈদৃশ, এইরূপে ক্ষেত্রের বাহ্য ও আন্তর, পাদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত স্বকীয় জ্ঞানে ক্ষেত্রী প্রকাশ করেন। প্রকাশ্য আলোক হইতে প্রকাশক সূর্য্য যেমন বিলক্ষণ, সেইরূপ এই যে বেগুভূত বা জ্ঞেয় ক্ষেত্র, তাহা হইতে উক্ত লক্ষণ যুক্ত ক্ষেত্রী অত্যন্ত বিলক্ষণ (রামানুজ)। অসঙ্গত্ব হেতু আত্মা লিপ্ত হন না—ইহা পূর্ব্ব শ্লোকে আকাশের দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান হইয়াছে। প্রকাশক হেতু আত্মা প্রকাশ্যের ধর্ম্মদ্বারা লিপ্ত হন না, তাহা সূর্য্যের দৃষ্টান্ত দ্বারা এ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে (স্বামী, মধু)। ক্ষেত্রী বা ক্ষেত্রজ্ঞ এক হইয়াও সমুদায় ক্ষেত্রকে প্রকাশ করেন, প্রকাশধর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত হন না, এবং প্রকাশ্যের ধর্ম্ম দ্বারাও লিপ্ত হয় না (মধু)। এক ক্ষেত্রী অর্থাৎ জীব সমুদায় ক্ষেত্র অর্থাৎ আপাদমস্তক দেহকে প্রকাশ করেন, চেতনযুক্ত করেন (বলদেব)। ক্ষেত্রী আমার অংশ হেতু প্রকাশ করেন, কৃৎস্ন—অর্থাৎ সম্পূর্ণ ক্ষেত্রকে প্রকাশ করেন (বল্লভ)। যেমন এক অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন সূর্য্য নিজের প্রভা দ্বারা সমুদায় লোককে প্রকাশ করেন, সেইরূপ ক্ষেত্রস্থ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা অণু পরিমাণ হইয়াও স্বধর্ম্মভূত জ্ঞানের দ্বারা আপাদমস্তক সমুদায় ক্ষেত্র বা দেহ প্রকাশ করেন। হে ভারত! ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা উক্ত দোষ হেতু বিভু পরিমাণও নহেন, মধ্যপরিমাণও নহেন। আত্মা যে অণু-পরিমাণ ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধ। (কেশব)।

এ স্থলে কঠ শ্রুতির পূর্ব্বোদ্ধৃত মন্ত্রের (৫।৯.১৩) পুনরুল্লেখ করা আবশ্যক। যথা—

'অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥
বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥
সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষু-
র্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ।
একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যোঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥
নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
"তমাত্মস্থং যোঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥"

এই কয় মন্ত্রের অর্থ দুর্ব্বোধ্য নহে। ইহা হইতে, বিশেষতঃ ইহার মধ্যে সূর্য্যের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, এক সর্ব্বগত সর্ব্বদেহস্থ সর্ব্বভূতান্তরস্থ পরমাত্মা সর্ব্বদেহকে প্রকাশ করিয়া ক্ষেত্রের নানারূপ বিধান

করিয়া, সর্ব্বক্ষেত্রকে প্রকাশ করিয়া একইরূপকে বহুধা ভিন্ন করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হন, এবং স্বয়ং অনিত্য চেতনাযুক্ত হইয়া অনিত্য, অচেতন দেহসকলকে চেতনবৎ করিয়া, প্রতিদেহস্থ জীবভাবের অনুরূপ কামনার বিধান করেন। অথচ কোনরূপে লিপ্ত হন না। পূর্ব্বে এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান্ আপনাকে সর্ব্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়াছেন, এ স্থলে তাহাই অন্যভাবে পুনরুক্ত হইয়াছে। এই উপনিষদুপদিষ্ট তত্ত্ব গীতায় অতি স্পষ্টভাবে পরিষ্কৃত ভাষায় উপদিষ্ট হইয়াছে। শঙ্কর-প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণ এইরূপেই এই কয়টি শ্লোক বুঝাইয়াছেন। কিন্তু বহুপুরুষবাদী রামানুজ,বলদেব প্রভৃতি কেবল জীবাত্মাকে প্রতিদেহস্থ প্রত্যগাত্মাকে, তাহার জ্ঞেয় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রী বলিয়াই বুঝিয়াছেন, এবং সমুদায় ক্ষেত্রের মর্ম্ম একই ক্ষেত্রেরই বিভিন্ন অংশ, এইরূপ বুঝিয়াছেন। এ অর্থ একান্ত অসঙ্গত সুতরাং গ্রহণীয় নহে। এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অর্থ প্রধানতঃ শঙ্করের ভাষ্য হইতেই বুঝিতে হইবে।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥ ৩৪

জ্ঞানচক্ষু দ্বারা যেই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের
এ প্রভেদ, আর ভূতপ্রকৃতি-মোক্ষের
তত্ত্ব জানে, সেই করে পরা গতি লাভ ॥ ৩৪

৩৪। জ্ঞানচক্ষু দ্বারা—শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিত আত্মপ্রত্যয়রূপ জ্ঞানচক্ষু দ্বারা (শঙ্কর, মধু)। বিবেক-বিষয়ক জ্ঞানাখ্য চক্ষু দ্বারা (রামানুজ, স্বামী)। বৈধর্ম্ম-বিষয়ক প্রজ্ঞা-চক্ষুদ্বারা (বলদেব)। আলোচনা দৃষ্টি দ্বারা (বল্লভ)।

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের এ প্রভেদ।—এই শ্লোকে সমুদায় অধ্যায়ের অর্থ উপসংহারে উক্ত হইয়াছে। যথাব্যাখ্যাত ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-মধ্যে যথাদর্শিত যে অন্তর অর্থাৎ ইতরেতর বৈলক্ষণ্যবিশেষ (শঙ্কর)। উক্ত প্রকারে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের এই অন্তর বা বিশেষ, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বিবেক (রামানুজ)। অন্তর=ভেদ (স্বামী)। লৌকিক সৃষ্টি হেতু ভেদ (বল্লভ)। উক্ত প্রকারে পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞমধ্যে পরস্পর বৈলক্ষণ্য—জড় চেতন, সবিকার, নির্ব্বিকার ইত্যাদিরূপ প্রভেদ (মধু)। ক্ষেত্রের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞ জীব ও ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বরের যে প্রভেদ পূর্ব্বে আমা কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে (বলদেব)। এই শ্লোকে এই অধ্যায়ের অর্থ ফলের সহিত উপসংহার করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে নিরূপিত ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ মধ্যে পরিণামী অপরিণামিরূপ বৈলক্ষণ্য জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা অর্থাৎ শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ জনিত ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপ যাথাত্ম্য জ্ঞান দ্বারা যাহারা জানিতে পারে। (কেশব)।

ভূতপ্রকৃতি-মোক্ষের তত্ত্ব।—ভূতগণের ও অবিদ্যালক্ষণ অব্যক্তাখ্য প্রকৃতি ইহাদের এবং মোক্ষণ বা অভাব গমন ইহার তত্ত্ব (শঙ্কর, মধু)। যাহা দ্বারা মুক্তি হয় অর্থাৎ অমানিত্বাদি প্রভৃতি উক্তলক্ষণ মোক্ষসাধন যে জ্ঞান, তাহাই মোক্ষ (রামানুজ)। ভূতগণের প্রকৃতি এবং তাহার সকাশ হইতে মোক্ষ অর্থাৎ মোক্ষের উপায় ধ্যানাদি (স্বামী)। মোক্ষ অর্থাৎ পরমার্থ তত্ত্ববিদ্যাদ্বারা অভাব গমন (মধু)। ভূতগণের প্রকৃতি সকল হইতে মোক্ষ, এবং সেই মোক্ষের সাধন অমানিত্বাদি (বলদেব)। ভূতগণের সম্বন্ধীয় যে সংসারোপযোগী প্রকৃতি, তাহা হইতে ধ্যানাদিরূপ মোক্ষসাধন (বল্লভ)। এই অধ্যায়োক্ত ভূতগণের প্রকৃতি হইতে মোক্ষের উপায়। (কেশব)।

পরাগতি লাভ।—পরমার্থতত্ত্ব ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়, আর দেহ গ্রহণ করে না (শঙ্কর)। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞমধ্যে বিবেকবিষয়ক উক্ত প্রকার

জ্ঞানের দ্বারা তাহাদের মধ্যে বিবেক বা পার্থক্য জানিয়া ভূত-প্রকৃতি মোক্ষোপায় অমানিত্বাদি-সাধন-নিষ্ঠ ও ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিবেক বিজ্ঞানবান্ সর্ব্ব অনর্থনিবৃত্তি দ্বারা পরমপুরুষার্থ লাভ করে (রামানুজ, মধু)। পরমপদ প্রাপ্ত হয় (স্বামী)। পরমার্থবস্তুস্বরূপ চৈতন্য (মধু)। প্রকৃতি হইতে 'পর' সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরমব্যোমাখ্য মৎপদ প্রাপ্ত হয় (বলদেব)। অমানিত্বাদি জ্ঞাননিষ্ঠা হেতু ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ যাথার্থ্য বিজ্ঞান দ্বারা সর্ব্বানর্থনিবৃত্তি পুর্ব্বক পরিপূর্ণ পরমানন্দাবির্ভাবলক্ষণ পুরুষার্থসিদ্ধি হয় (গিরি)। পর অর্থাৎ মোক্ষ (বল্লভ)। তাহারা অশেষ অবিদ্যা হইতে নিবৃত্তিলাভ করে ও প্রকৃতি-বিযুক্ত হইয়া শুদ্ধ আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। (কেশব)।

জ্ঞানচক্ষু।—যে তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন দ্বারা পরাগতি লাভ হয়, তাহাই সংক্ষেপে এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। সেই তত্ত্বজ্ঞানার্থ— প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞান ও ভূতপ্রকৃতি-মোক্ষ-জ্ঞান। জ্ঞানচক্ষু দ্বারা এই তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন করিলেই শ্রেষ্ঠ গতি লাভ হয়। জ্ঞানচক্ষু—অর্থাৎ শাস্ত্রদৃষ্টি। শাস্ত্র-জ্ঞান হইতে যে দর্শন বা অপরোক্ষানুভূতি সিদ্ধ হয়, তাহারই ফলে জ্ঞান-চক্ষুর উন্মেষ হয়। ইহা যোগজ দৃষ্টি বা দিব্য দৃষ্টি নহে (১১।৮ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। 'সোঽহং' এই শাস্ত্রহইতে ইন্দ্রিয় এবং ঋষি বামদেব, এবং ভক্তির চরম অবস্থায় উপাস্য উপাসকে অভেদভাবনা-ফলে প্রহ্লাদ—ইঁহারা 'আমি স্রষ্টা ঈশ্বর, আমি সূর্য্য, আমি চন্দ্র, আমি ইন্দ্র, আমি এ সমুদায়, আমাকে ব্রহ্ম বলিয়া জান' এইরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন। বেদান্তদর্শনে (১।১।৩০) সূত্রে আছে, "শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তু উপদেশঃ বামদেববৎ।" 'জীবও তদ্ধ্যায়ত্তবৃত্তি হইয়া আপনাকে ব্রহ্মরূপে দর্শন করিতে পারে। তবে এই দৃষ্টিশাস্ত্রজনিত। ইহা 'শাস্ত্রযোনি" (বেদান্তদর্শন, ১।১।৩)। এই দৃষ্টি প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, সুতরাং দিব্যদৃষ্টিরও বিষয় নহে। এ দৃষ্টি শাস্ত্রের উপদেশফলে

জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইলে, নির্ম্মল জ্ঞানে অপরোক্ষ অনুভূতিরূপে সিদ্ধ হয়।

মোক্ষ—প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক, বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ দ্বারা পুরুষের বা আত্মার স্বরূপ জানিয়া, যে প্রকৃতি হইতে বিবিক্ত, সর্ব্বগত, সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার এক ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকে নির্ম্মল জ্ঞানে দর্শন করা যায়। সেই প্রকৃতি-পুরুষের বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ আমরা পূর্ব্বে বিশেষরূপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। ভূত কাহাকে বলে, এবং ভূতপ্রকৃতি কাহাকে বলে, তাহাও বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। পরা ও অপরা প্রকৃতি সর্ব্বভূতযোনি। সেই ক্ষেত্রে পরমেশ্বরে আত্মারূপ বীজ নিষেক করিলে, তবে সকল প্রকার মূর্ত্তির বা সত্তার উদ্ভব হয়, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ তত্ত্ব পরে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। কিরূপে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগে সর্ব্বসত্তার উদ্ভব হয়, কিরূপে সত্ত্ব রজঃ ও তমো লক্ষণ ভূতপ্রকৃতি দ্বারা পুরুষ প্রতিক্ষেত্রে বদ্ধ হয়, এবং কিরূপে সেই ত্রিগুণরূপা প্রকৃতির বন্ধন হইতে মোক্ষ বা মুক্তি লাভ করে, তাহা পরের অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এ স্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে মোক্ষের কথা এ স্থলে সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে।

মোক্ষ কাহাকে বলে, তাহা পূর্ব্বে বিবৃত হয় নাই। গীতায় পূর্ব্বে 'জরামরণমোক্ষ' উক্ত হইয়াছে (৭।২৯)। সে স্থলে মোক্ষ অর্থে জরামরণ হইতে মুক্তি। গীতায় অন্যত্র আছে,—বন্ধং মোক্ষং বা বেত্তি। (১৮।৩০)। সেখানেও মোক্ষ অর্থে জন্মমৃত্যুরূপ সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি। গীতায় অন্যত্র আছে,—"মোক্ষ্যসে অশুভাৎ" (৪।১৬) ও 'মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।" (৯।২৮) শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে, সেই বিশ্বকর্ত্তাই সংসার-মোক্ষ-স্থিতিবন্ধ হেতু (৬।১৬)। এ স্থলেও মোক্ষ অর্থে সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি। অতএব এ স্থলে ভূতপ্রকৃতিমোক্ষ বলিয়া যে মোক্ষের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা এই মুক্তি,—এই ভূতপ্রকৃতিতে

আত্মা আপনার বদ্ধভাব অবিদ্যা হেতু বোধ করে, তাহা হইতে মুক্তি, অর্থাৎ আপনার পরমাত্মাস্বরূপ জানিলে মুক্তি। অতএব এ স্থলে শঙ্কর ও মধু কেন অর্থ করিলেন যে, মোক্ষ অর্থে মোক্ষণ বা অভাব গমন এবং রামানুজ, স্বামী ও বলদেব কেন অর্থ করিলেন যে, এই মোক্ষ অর্থে মোক্ষের সাধন অমানিত্বাদিলক্ষণ জ্ঞান, তাহা বুঝা যায় না। মোক্ষ অর্থে যদি অভাব গমন হয়, তবে বৌদ্ধের শূন্যবাদ আসিয়া পড়ে। সুতরাং এ স্থলে মোক্ষ অর্থে এই মোক্ষের তত্ত্ব।

অধ্যায়োপসংহার।—তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনরূপ জ্ঞানের বা জ্ঞানচক্ষুর বিকাশ করাইবার জন্য এবং তাহার ফলে সংসারনিবৃত্তি বা নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি করাইবার জন্য গীতার এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই তত্ত্বজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী কয় অধ্যায়ে ইহা বিবৃত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে এই তত্ত্বজ্ঞান, ইংরজীতে যাহাকে Philosophy বা Metaphysics বলে তাহারই সার। কোন পাশ্চাত্য দর্শনে এই তত্ত্বজ্ঞান এরূপ সংক্ষেপে অথচ সম্পূর্ণভাবে উপদিষ্ট হয় নাই। আমাদের দেশের কোন শাস্ত্রেও এরূপ ভাবে এই তত্ত্বজ্ঞান কোথাও সংগৃহীত হয় নাই। এই তত্ত্বজ্ঞানার্থ বুঝা অত্যন্ত কঠিন। এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অর্থ গ্রহণ করা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় প্রত্যেক শ্লোকেরই বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। যে সম্প্রদায়ের যেরূপ মত, সেই মতানুসারে সেই সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই জন্য মতবিশেষ অনিবার্য্য হইয়াছে। আমরা এই সমস্ত বিভিন্ন মত আলোচনা করিয়া যথাসাধ্য এই অধ্যায়ের অর্থ বিস্তারিতভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। মূলের ন্যায় এ ব্যাখ্যায়ও অনেক স্থলে পুনরুক্তি আছে। সে পুনরুক্তি অপরিহার্য্য ; বিশেষতঃ দুর্ব্বোধ্য দার্শনিক তত্ত্ব সকল বুঝিবার জন্য এবং পুনঃ পুনঃ অভ্যাসার্থ এই পুনরুক্তিরও প্রয়োজন। এইরূপ পুনরুক্তি ও বিস্তার সত্ত্বেও অনেক স্থলে অনেক তত্ত্ব

দুর্ব্বোধ্য রহিয়া গিয়াছে। অতি বিস্তার ভয়ে সে সকল স্থান আর সুবোধ্য করিতে পারা যায় নাই। সকল স্থলেও যে আমরা বুঝিয়াছি, ইহাও বলিতে পারি না। হয় ত এজন্য অনেক স্থলের অর্থ অপরিস্ফুট ও অসংলগ্ন হইয়াছে। তাহা অপরিহার্য্য।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই অধ্যায়ে প্রতিপাদিত বিষয়—ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব, জ্ঞানের স্বরূপ, জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব, প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকতত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব, আত্মদর্শনের উপায়, স্থাবরজঙ্গমাত্মক সর্ব্ব সত্তার উৎপত্তিতত্ত্ব, ভূততত্ত্ব, সর্ব্বভূতস্থ পরমেশ্বরতত্ত্ব, ভূত প্রকৃতিমোক্ষতত্ত্ব। এ অধ্যায়ে যে জ্ঞান হইতে মোক্ষ হয়, সেই জ্ঞান কি, তাহা বুঝাইয়া ভগবান সেই জ্ঞানের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান—তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন, সেই তত্ত্বজ্ঞান সংক্ষেপে উপদেশ দিয়াছেন। বলিয়াছি ত তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন করাইবার জন্য এই অধ্যায়ে এই সকল মূলতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। এই তত্ত্ব সকলের মধ্যে প্রধান ঈশ্বরতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব, জীব ও প্রকৃতির সম্বন্ধতত্ত্ব এবং জীব ও ঈশ্বরে সম্বন্ধতত্ত্ব। এ অধ্যায়ে যে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব বা পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব প্রধানতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে, এই সকল তত্ত্ব তাহারই অন্তর্গত। জ্ঞান যখন এই সকল তত্ত্বদর্শনরূপ হয় তখন ব্রহ্ম তাহার জ্ঞেয় হন। ব্রহ্মজ্ঞানসিদ্ধি হইলেই পরমমুক্তিলাভ হয়। এই জন্য এই অধ্যায়ে ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে যে সকল তত্ত্ব সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ বিচ্ছিন্নভাবে ব্রহ্মসূত্রপদের বর্ত্তমান গ্রন্থ মূল উপনিষদে পাওয়া যায়। গীতায় ইহা উক্ত হইয়াছে—

"ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥" (১৩৪)

অতএব যাঁহারা এই ব্রহ্মতত্ত্ব, পুরুষতত্ত্ব, প্রকৃতি বা ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রভৃতি বিশেষভাবে জানিতে চাহেন, তাঁহারা উক্ত ব্রহ্মসূত্রাদি প্রভৃতি হইতে অর্থাৎ উপনিষদ্ হইতে ইহা প্রধানতঃ জানিতে পারেন। আমরা এই

ব্যাখ্যায় প্রয়োজনমত উপনিষদের মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া এই সকল তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। যাঁহারা উপনিষদ্ আলোচনা করেন নাই, তাঁহারা আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে যদি অধিকারী হইয়া থাকেন, বিশেষতঃ যদি আধুনিক জর্ম্মান্ দার্শনিক ক্যাণ্ট, হেগেল, সেলিং ফিক্টে, সোপেনহর, লাইবনিজ প্রভৃতির ও স্পাইনোজার প্রতিপাদিত দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকেন এবং যদি হেগেলের জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব (The absolute reason) এবং তাহা হইতে এই জীব ও জড়জগতের বিকাশের তত্ত্ব বুঝিয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের পক্ষে এই অধ্যায়োক্ত তত্ত্ব সকল বুঝিতে কষ্ট হইবে না। ব্যাখ্যাবাহুল্য ভয়ে আমরা এই সকল দার্শনিক পণ্ডিতগণের মত উদ্ধৃত করিয়া এই অধ্যায়ের কোন শ্লোক বুঝিতে চেষ্টা করি নাই। বিশেষতঃ গীতায় এই অধ্যায়ে উপনিষদু-পদিষ্ট ব্রহ্মতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে। এজন্য উপনিষদ্ অবলম্বন করিয়াই এই ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। অন্য কোন মতের অবতারণা বা সমালোচনা করি নাই। তবে স্থানে স্থানে উক্ত দার্শনিক পণ্ডিতগণের মতের ইঙ্গিত করিয়াছি মাত্র। জিজ্ঞাসু পাঠক তাহা দেখিয়া লইবেন।

গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায় শেষ হইল। এই অধ্যায়ের নাম ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ যোগ। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্ জ্ঞানং মতং মম।" (১৩।২)

এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-জ্ঞানই প্রধানতঃ এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এই অধ্যায় গীতার তৃতীয় ষট্কের প্রথম অধ্যায়। গীতার প্রথম ষট্কে বা প্রথম ছয় অধ্যায়ে আত্মতত্ত্ব ও কর্ম্মযোগ প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে। এই প্রথম ষট্‌ককে সে জন্য গীতার Psychology ও Ethics বিভাগ বলা যায়। গীতার দ্বিতীয় ষট্কে ঈশ্বরতত্ত্ব ও ভক্তিযোগ বিবৃত হইয়াছে। ইহাকে গীতার Theology ও Religion অংশ বলা যায়। সেইরূপ এই তৃতীয় ষট্কে তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন বিবৃত হইয়াছে। ইহাই গীতার প্রকৃত দর্শন অংশ। ইহাকে Philosophy ও Metaphysics বিভাগ বলা যায়। এ অধ্যায়ের আরম্ভে এ কথা বিবৃত হইয়াছে।

তত্ত্বজ্ঞানের যাহা প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহাই তত্ত্বজ্ঞানার্থ। যাহা দ্বারা এই তত্ত্বজ্ঞানের অপরোক্ষ দর্শন সিদ্ধ হয়, তাহাই তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন। এই তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন সিদ্ধ হইলে যে ফল হয়—তাহাকেও তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন বলে। এই জন্য গীতায় এই তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনকে জ্ঞানের স্বরূপ বলা হইয়াছে। শুধু ইহা জ্ঞানের এই অধ্যায়োক্ত বিংশতিরূপ জ্ঞানের একটি রূপ মাত্র নহে। ইহাই ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞানার্থ বা তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্যে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-জ্ঞানই প্রধান। তাহা ভগবান্ উক্ত শ্লোকে বলিয়াছেন। পরে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে পুনর্ব্বার এই ক্ষেত্র-সম্বন্ধীয় ত্রিগুণ-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে এবং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞযোগে জীবের উৎপত্তি ও ক্ষেত্রের ত্রিগুণজ ভাবের দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের বন্ধন উক্ত হইয়াছে। সেই জ্ঞানকে ভগবান্ "জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্" (১৪।১) বলিয়াছেন। পঞ্চদশ অধ্যায়েও

এই তত্ত্বজ্ঞান জীবের সংসারবন্ধন, মুক্তি ও পুরুষোত্তমতত্ত্ব উপদেশ করিয়া ভগবান্ বলিয়াছেন,—ইহাই গুহ্যতম শাস্ত্র (১৫।২০)। এইরূপে ভগবান্ এই তত্ত্বজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব বার বার উপদেশ দিয়াছেন।

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব।—এই তৃতীয় ষট্‌কের প্রথম তিন অধ্যায়ে অর্থাৎ এই ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ অধ্যায়ে এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্বজ্ঞান প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে। পরের তিন অধ্যায়ে ইহার মধ্যে ক্ষেত্র-সম্বন্ধীয় ত্রিগুণতত্ত্বের বিস্তার করা হইয়াছে। এইরূপে এই তৃতীয় ষট্‌কে যে, তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন বিবৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রথম ও প্রধান—এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-জ্ঞান। এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-জ্ঞান ও সাংখ্য-দর্শনোক্ত প্রকৃতি-পুরুষজ্ঞান এক অর্থে একই। সাংখ্যদর্শন অনুসারে প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকজ্ঞান হইতেই পরমপুরুষার্থ সিদ্ধি হয়—সর্ব্বদুঃখের একান্ত নিবৃত্তি হয়—কৈবল্য-মুক্তি হয়। প্রকৃতি হইতে ক্ষেত্রের উৎপত্তি হয়—ক্ষেত্র প্রকৃতিরই পরিণাম। আর যিনি পুরুষ—তিনি এই ক্ষেত্রের জ্ঞাতা হইয়া ক্ষেত্রজ্ঞ হন। এই জন্য প্রকৃতিপুরুষজ্ঞানই—ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-জ্ঞান।

ভগবান্ অতি সংক্ষেপে প্রথমেই এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ কাহাকে বলে, তাহা বলিয়া দিয়াছেন। এই শরীরই ক্ষেত্র। আর ক্ষেত্রকে যে জানে, সেই ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্রজ্ঞ—জ্ঞাতা, আর ক্ষেত্র—জ্ঞেয়। ক্ষেত্রজ্ঞমধ্যেও বিশেষ আছে। যিনি বা যে পুরুষ ব্যষ্টি ক্ষেত্রের জ্ঞাতা, তিনি সেই বিশেষ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ, আর যিনি সর্ব্ব-ক্ষেত্রের জ্ঞাতা—নিয়ন্তা—তিনি পরমেশ্বর। পরে পঞ্চদশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, যিনি ব্যষ্টি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ—তিনি ক্ষর পুরুষ, আর যিনি সমষ্টিভাবে সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ, তিনি পুরুষোত্তম পরমেশ্বর। অতএব ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব জানিতে হইলে, ব্যষ্টি ক্ষেত্রবদ্ধ ক্ষরপুরুষতত্ত্ব, ব্যষ্টি-ক্ষেত্র-মুক্ত পুরুষতত্ত্ব, আর সর্ব্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ উত্তম-পুরুষতত্ত্ব বুঝিতে হয়। সেইরূপ

ক্ষেত্রতত্ত্ব বুঝিতে হইলে, সেই ক্ষেত্রের যাহা উপাদান ও যাহা কারণ, সেই প্রকৃতিতত্ত্বও বুঝিতে হয়। অর্থাৎ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব বুঝিতে হইলে, সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বরতত্ত্ব, ব্যষ্টিক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ জীবতত্ত্ব এবং সমষ্টি ক্ষেত্ররূপ জগৎ-তত্ত্ব ও ব্যষ্টিক্ষেত্ররূপ জীব-শরীরতত্ত্ব সমুদায় বুঝিতে হয়। ইহাই দর্শনশাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়—

"জীবতত্ত্বং জগত্তত্ত্বং ঈশতত্ত্বং তৃতীকম্।
স্থিতৈকাদশতন্ত্রেষু তত্তদ্যুক্ত্যা নিরূপিতম্॥"

অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি—উপসংহার।

ইহাই দর্শনশাস্ত্রের সাধারণ প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু ইহাই শেষ নহে। এই তিন তত্ত্বকে এক অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বমধ্যে দর্শনই জ্ঞানের শেষ—দর্শনের শেষ, ইহাই বেদান্ত। এজন্য উক্ত অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধিতে উক্ত হইয়াছে,—

"পশ্চাৎ বেদান্তসদ্যুক্ত্যা অদ্বৈতশ্রুতিমানতঃ।
অদ্বয়ং ব্রহ্ম সংসিদ্ধং দ্বৈতস্যাসহঃ কৃতঃ॥"

যাহা হউক, এই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-জ্ঞানই যে জ্ঞান,—ইহাই যে সর্ব্ব জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, তাহা আমরা ইহা হইতে বুঝিতে পারি।

আমরা বলিয়াছি যে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-জ্ঞানই সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতি পুরুষ-বিবেকজ্ঞান। কিন্তু ইহার মধ্যে বিশেষ আছে। সাংখ্যদর্শন অনুসারে পুরুষ বহু—তন্মধ্যে কতক বদ্ধ ও কতক মুক্ত। বদ্ধ পুরুষই প্রকৃতিবদ্ধ থাকে, পরে পুরুষ প্রকৃতি-বিবেকজ্ঞান লাভে প্রকৃতিবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হন নাই। পাতঞ্জলদর্শনে পুরুষবিশেষ ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন। পাতঞ্জল দর্শন অনুসারে এই পুরুষবিশেষ ঈশ্বর—বদ্ধ ও মুক্ত পুরুষ হইতে ভিন্ন। কিন্তু গীতায় উত্তম পুরুষ যে সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ পরমেশ্বর, তিনি স্বরূপতঃ বদ্ধ বা মুক্ত পুরুষ হইতে ভিন্ন নহেন, এ তত্ত্ব যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

এ ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে আর এক কথা বুঝিতে হইবে। অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারগণের মতে যিনি প্রতিক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ, তিনি অক্ষর পুরুষ হইলেও তিনি পরা প্রকৃতি। ভগবান্ পূর্ব্বে যে বলিয়াছেন, তাঁহার দুই প্রকৃতি ;—এক অষ্টধা অপরা প্রকৃতি আর এক পরা প্রকৃতি। সেই পরা প্রকৃতিই এই ক্ষেত্রজ্ঞ জীব। আর অপরা [illegible] ক্ষেত্র, পরা প্রকৃতিই জীবভূত হইয়া জগৎ ধারণ করে। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, এই অর্থ সঙ্গত নহে। পরা প্রকৃতি এই ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে পারে না। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ পরা প্রকৃতি হইলে, সাংখ্যোক্ত [illegible] পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেকজ্ঞান নিরর্থক হয়। আর গীতা অনুসারে পরা এবং অপরা প্রকৃতি উভয়েই ভূতযোনি মাত্র। [illegible]গণের বীজপ্রদ পিতা। সুতরাং এই প্রকৃতি জীবভূত [illegible] ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মা নহে। আর ব্যষ্টি ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ [illegible] প্রকৃতি বলিলে, তাহার সহিত সর্ব্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বরের [illegible] কি, সে ভেদের মীমাংসা হয় না। কোনরূপ অভেদ [illegible] থাকে না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, গীতোক্ত পরা প্রকৃতি বেদান্তোক্ত প্রাণ। ইহাই জীবভূত হয়। এই প্রাণই মুখ্য প্রাণ। [illegible] প্রাণেরই বৃত্তি প্রাণ, অপান, সমান প্রভৃতি পাঁচ প্রকার। [illegible] প্রাণতত্ত্ব স্বীকৃত হয় নাই। প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুকে [illegible] বলা হইয়াছে মাত্র। অতএব সাংখ্যদর্শন অনুসারে অর্থ [illegible], এই পরা প্রকৃতিকে প্রাণ না বলিয়া চেতনা (consciousness) বলিতে হয়। পুরুষ-সন্নিধানে লিঙ্গশরীরে চেতনার অভিব্যক্তি হয়। এই চেতনাই (consciousness) পরা প্রকৃতির স্বরূপ। চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে,—

"চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।"

এই চেতনার দ্বারাই জগৎ বিধৃত। তাই গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, পরা প্রকৃতি জীবভূত হইয়া জগৎ ধারণ করে (গীতা ৭।৫)। যাহা হউক,

বেদান্ত অনুসারে এ স্থলে পরা প্রকৃতিকে প্রাণ বলাই অধিক সঙ্গত। চেতনার ন্যায় প্রাণও ক্ষেত্রের উপাদান।

যাহা হউক, এইরূপে ভগবান্ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব সংক্ষেপে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে বুঝাইয়া, পরে সংক্ষেপে এই ক্ষেত্র কি, তাহা তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ শ্লোক পর্য্যন্ত বিবৃত করিয়াছেন। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, এই ক্ষেত্রই শরীর। ইহার প্রধান উপকরণ পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও অব্যক্ত। ইহাই গীতোক্ত অষ্টধা অপরা প্রকৃতি ও সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি-বিকৃতি। আর ইহার অপর উপকরণ মন দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ স্থূলভূত—ইহাই সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির বিকৃতি। উক্ত অষ্টধা প্রকৃতি-বিকৃতি ও মন, ইন্দ্রিয়গণ লিঙ্গশরীরের উপকরণ আর পঞ্চ স্থূলভূত স্থূল শরীরের উপকরণ। প্রকৃতি হইতে পরিণত প্রকৃতি-বিকৃতি যে বুদ্ধি, মন ও পঞ্চ মহাভূত (বা তন্মাত্রা) এবং এই প্রকৃতি-বিকৃতি হইতে পরিণত কেবল বিকৃতি যে-মন, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ স্থূলভূত—এই ষোড়শ বিকৃতি—সর্ব্বশুদ্ধ প্রকৃতির পরিণাম এই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব ও প্রকৃতি—ইহাই এই ক্ষেত্রের উপকরণ। এই পর্য্যন্ত সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্ত। গীতায় ইহা ব্যতীত ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা, ধৃতি,—ইহাদিগকে এই ক্ষেত্রের উপকরণ বলা হইয়াছে। সাংখ্যদর্শন অনুসারে চেতনা—সূক্ষ্মশরীরে পুরুষের চৈতন্যের প্রতিবিম্ব মাত্র। তাহা স্বতন্ত্র ভাবে গৃহীত হয় নাই। ধৃতি যে প্রাণশক্তি, তাহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সাংখ্যদর্শন অনুসারে তাহা করণের অর্থাৎ অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়গণের সামান্য বৃত্তি। সংঘাত—স্থূলশরীর-সমবায় শক্তি। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ ইহারা অন্তঃকরণের ত্রিগুণজ ভাব হইতে উৎপন্ন। ইহারাই ক্ষেত্রের বিকারের কারণ। ভগবান্ সবিকার ক্ষেত্রতত্ত্ব বিবৃত করিবার প্রসঙ্গে এই ইচ্ছা-দ্বেষাদির উল্লেখ করিয়াছেন—এবং ইহাদিগকে সবিকার ক্ষেত্রের উপকরণ বলিয়াছেন।

এই ক্ষেত্র ও তাহার বিকার বুঝিতে হইলে, এবং এই ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ কিরূপে বদ্ধ হন, তাহা বুঝিতে হইলে, সাংখ্যোক্ত ত্রিগুণ-তত্ত্ব বুঝিতে হয়। ভগবান্ তাহা চতুর্দশ অধ্যায় হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়ের কতক দূর পর্য্যন্ত বুঝাইয়াছেন, সে স্থলে এই ত্রিগুণের ভাব দ্বারা ক্ষেত্র কিরূপে রঞ্জিত হইয়া ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকেও রঞ্জিত করে, তাহা বিবৃত হইয়াছে। সবিকার ক্ষেত্র এ স্থলে 'সমাসে' বা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে মাত্র। পরে এই তত্ত্ব বিস্তারিত হইয়াছে। আমরা এই কয় শ্লোকে উক্ত ক্ষেত্রের উপকরণের অর্থ যথাস্থানে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ গীতার এক বিশেষত্ব; পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে দেহ-দেহী বা শরীর-শরীরীর বিভাগ উক্ত হইয়াছে, তাহাই এ স্থলে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,—

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥" ২।১৩

আরও উক্ত হইয়াছে যে—

"অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।"

এই দেহী ক্ষেত্রজ্ঞ। কিন্তু 'ইমে দেহাঃ' আমাদের স্থূল শরীর। ইহাই বিনাশী। মৃত্যুতে ইহার বিনাশ হয় এবং পরে ইহার আবার স্থূলদেহ গ্রহণ হয়; কিন্তু ক্ষেত্র এইরূপ বিনাশী নহে। ক্ষেত্রের যে উপাদান এই অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, মৃত্যুতে তাহার বিনাশ হয় না। মৃত্যুতে সূক্ষ্ম বা কারণ-শরীরের বিনাশ হয় না, কেবল স্থূল পাঞ্চভৌতিক শরীরেরই ধ্বংস হয়। পরে ১৫শ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥" ১৫।৭,৮

ইহা হইতে জানা যায় যে, মৃত্যুতে স্থূলশরীরেরই ধ্বংস হয়; কিন্তু শরীরের যে উপাদানের কথা এ স্থলে উক্ত হইয়াছে, তাহার ধ্বংস হয় না। তাহা আমোক্ষ-স্থায়ী। যতদিন ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ থাকে বা পুরুষ প্রকৃতিবন্ধ থাকে, ততদিন তাহার ধ্বংস হয় না। আর মৃত্যুতে স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহের ধ্বংস হইলেও, যাহা সূক্ষ্ম পাঞ্চভৌতিক দেহ, তাহার বিনাশ হয় না। এই সূক্ষ্ম পাঞ্চভৌতিক দেহের নাম আতিবাহিক দেহ। বেদান্ত-দর্শনে 'আতিবাহিকস্তল্লিঙ্গাৎ' এই সূত্রে ইহা বিবৃত হইয়াছে। মৃত্যুর পর এই আতিবাহিক বা সূক্ষ্ম ভৌতিক দেহ অবলম্বনে প্রেতাত্মার গতি হয়। সে তত্ত্ব এ স্থলে বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই।

আমরা বলিয়াছি যে, এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ গীতার এক বিশেষত্ব। এই বিভাগ পূর্ব্বে কোথাও বিশেষভাবে বিবৃত হয় নাই। কিন্তু ভগবান্ বলিয়াছেন যে, ক্ষেত্র যাহা, যে প্রকার, যে বিকারী এবং ক্ষেত্রজ্ঞ যে প্রকার ইত্যাদি তত্ত্ব পূর্ব্বে ঋষিগণ দ্বারা বিবৃত হইয়াছে—

"ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥" ১৩।৪

অথচ আমরা বেদ-সংহিতায় বা প্রচলিত ব্রহ্মসূত্র পদে কোথাও এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগের উল্লেখ দেখিতে পাই না। প্রামাণ্য উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে কেবল শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে দুইটি মন্ত্রে এ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ নাম পাওয়া যায়। সে দুইটি মন্ত্রে এই—

"একৈকং জালং বহুধা বিকুর্ব্বন্
যস্মিন্ ক্ষেত্রে সংহরত্যেষ দেবঃ" ।৫।৩

"প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতির্গুণেশঃ
সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ॥" ৬।১৬

ইহা ব্যতীত আর কোথাও ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগের উল্লেখ নাই। তবে ভগবান কেন বলিয়াছেন যে, পূর্বে ঋষিগণ দ্বারা বিবিধ ছন্দে এবং ব্রহ্মসূত্র পদে ইহার বিস্তারিত বিবরণ আছে। ইহার হেতু এই বোধ হয় যে, ক্ষেত্রজ্ঞ যিনি এবং ক্ষেত্র যাহা, সেই তত্ত্ব অন্য নামে শ্রুতিতে বিবৃত হইয়াছে। যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, তিনি আত্মা, তিনিই পুরুষ, তিনিই ব্রহ্ম। শ্রুতিতে নানাস্থলে নানাভাবে এই আত্মতত্ত্ব, পুরুষ-তত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।

'অয়ং আত্মা ব্রহ্ম,' 'অহং ব্রহ্মাস্মি,' 'সোঽহং', 'আত্মৈব ইদম আসীৎ পুরুষবিধঃ' ইত্যাদি মহাবাক্যে শ্রুতিতে এই ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। সেইরূপ ক্ষেত্র বা দেহের বিবরণও শ্রুতিতে পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে যে, আমাদের দেহে পাঁচটি কোষ আছে, যথা,—অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ। এই অন্নময় কোষই আমাদের পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীর। প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষই আমাদের সূক্ষ্মশরীর এবং আনন্দময় কোষই আমাদের কারণ-শরীর। কারণ-শরীরের উপাদান অব্যক্ত বা মূলপ্রকৃতি, ইহাই মায়া। সূক্ষ্মশরীরের উপাদান বেদান্তমতে প্রাণ, মন ও বিজ্ঞান, আর সাংখ্যমতে বুদ্ধি, অহঙ্কার মন এই তিন অন্তঃকরণ এবং দশ ইন্দ্রিয় বা বহিঃকরণ এই ত্রয়োদশ করণ, এবং এই ত্রয়োদশ করণের সামান্য বৃত্তি পঞ্চ প্রাণ এবং পঞ্চ তন্মাত্র বা বেদান্ত অনুসারে পঞ্চ মহাভূত। এইরূপে আমরা বেদান্ত ও সাংখ্য-শাস্ত্র হইতে এই দেহের বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পারি। যাহা হউক, গীতায় এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব এ স্থলে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইলেও এই তৃতীয় ষট্‌কে তাহার যে বিবরণ আছে, সেরূপ বিস্তৃত বিবরণ আর কোথাও পাওয়া যায় না বলিয়া মনে হয়।

এক্ষণে এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগের মূল তত্ত্ব আমাদের বুঝিতে

হইবে। যখন আমাদের বুদ্ধিতে বৃত্তিজ্ঞানের বিকাশ হয়, তখন 'আমি ইহা জানিতেছি' জ্ঞান এইরূপ আকার ধারণ করে অর্থাৎ জ্ঞান 'জ্ঞাতা অহং' এবং 'জ্ঞেয় ইদং' এই দুই ভাবে বিভক্ত হইয়া যায়। আমাদের বৃত্তিজ্ঞান এই 'জ্ঞাতা অহং' এবং 'জ্ঞেয় ইদং' সর্ব্ব অবস্থায় এই দুইয়ের সমষ্টিমাত্র। এক ভাবে দেখিলে এই অহং-ইদং জ্ঞান 'জ্ঞাতা অহং' 'জ্ঞেয়ং ইদং' 'কর্ত্তা অহং' 'কার্য্যং ইদং' এবং 'ভোক্তা অহং' 'ভোগ্যং ইদং' এই তিন ভাগে বিভাগ করা যায়। কিন্তু 'ভোক্তা অহং' ও 'কর্ত্তা অহং' ইহা এক অর্থে 'জ্ঞাতা অহং'এর অন্তর্ভূত, এবং 'ভোগ্যং ইদং' ও 'কার্য্যং ইদং' 'জ্ঞেয়ং ইদং'এর অন্তর্গত। এজন্য 'জ্ঞাতা অহং' ও 'জ্ঞেয়ং ইদং' সামান্যতঃ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দুই বিভাগই যথেষ্ট। শঙ্কর জ্ঞানের এই দুই বিভাগই গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কোথাও তিনি অহং বা ইদং বা ত্বং কোথাও বা আত্মা ও অনাত্মা এই বিভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। 'বেদান্ত-পরিভাষায়' প্রমাতৃ চৈতন্য ও প্রমেয় চৈতন্য এই বিভাগ গৃহীত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনে জ্ঞানের এইরূপ বিভাগ উক্ত হয় নাই বটে, কিন্তু পুরুষ-প্রকৃতি এই বিভাগই গৃহীত হইয়াছে এবং পুরুষকে চেতন জ্ঞ-স্বরূপে এবং প্রকৃতিকে অচেতন জড়রূপে গৃহীত হইয়াছে।

যাহা হউক, জ্ঞানের জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দুই বিভাগ সম্বন্ধে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, যাহা জ্ঞেয়, তাহা জ্ঞাতা হইতে পারে না এবং যাহা জ্ঞাতা, তাহা জ্ঞেয় হইতে পারে না। এই অধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন—"জ্ঞেয়ের ধর্ম্ম জ্ঞাতায় ও জ্ঞাতার ধর্ম্ম জ্ঞেয়ে আরোপিত করা অবিদ্যার কার্য্য।" * * "যাহা জ্ঞেয়, তাহা কখন আপনার দ্বারা জ্ঞেয় হইতে পারে না; তাহার নিজের প্রকাশের জন্য আত্মব্যতিরিক্ত প্রকাশের অপেক্ষা করিয়া থাকে। আর জ্ঞাতা স্বপ্রকাশ, নিজের প্রকাশের জন্য অন্য কাহারও বা কিছুরই অপেক্ষা রাখে না।"

যদি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর সহিত সম্বন্ধ জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া, আর এক জন জ্ঞাতার কল্পনা করিতে হয়। জ্ঞাতার সহিত জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ—জ্ঞানের বিষয় হইলে, তাহার আশ্রয় বলিয়া আর একটি জ্ঞাতার কল্পনা করিতে হয়। এইরূপ ভাবে জ্ঞাতৃত্ব-কল্পনার শেষ পাওয়া যায় না; সুতরাং অনবস্থা দোষ হয়। যদি অবিদ্যা কেবল জ্ঞেয়ই হয়, জ্ঞাতার সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকে, তবে জ্ঞাতা কেবল জ্ঞাতাই হইবে, জ্ঞেয় হইতে পারিবে না। সুতরাং অবিদ্যা ও তৎকার্য্য দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা কোন প্রকারে দূষিত হইতে পারে না।" বেদান্ত-দর্শনের ভাষ্যের উপক্রমণিকায় শঙ্কর যে অধ্যাসবাদ স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে এইরূপ 'অহং' ও 'ত্বং' বা 'ইদং' এই বিভাগ সম্বন্ধেও এইরূপ কথা বলিয়াছেন। "যুষ্মদ্ অর্থাৎ ইদম্; অস্মদ্ অর্থাৎ অহং। 'ইদং' বা 'এই' এতদ্রূপ জ্ঞানের আস্পদ বা আলম্বন অনেক; কিন্তু 'অহং' 'আমি' এতদ্রূপ জ্ঞানের আস্পদ বা গোচর এক। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও প্রত্যেক বাহ্যবস্তু,—সমস্তই ইদং প্রত্যয়-গোচর—'এই' বা 'ইহা'-বলিবার যোগ্য অথবা 'এই' এতদ্রূপ জ্ঞানের বিষয়। কিন্তু আত্মা অস্মদ্ শব্দের গোচর ও 'অহং' 'আমি' এতদ্রূপ জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ অহং জ্ঞানের আলম্বন বা আমি বলিবার যোগ্য। যাহা ইদং জ্ঞানের জ্ঞেয়, তাহা বিষয় এবং যাহা অহং জ্ঞানের জ্ঞেয় তাহা বিষয়ী। চিৎস্বভাব আত্মা বিষয়ী; তাঁহার দেহাদি বিষয় আছে বলিয়া তিনি বিষয়ী—তদ্ভিন্ন অন্য সমস্ত তাঁহার বিষয় অর্থাৎ জড় বা চিৎ প্রকাশ্য। অন্ধকার এবং আলোক যেমন পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব, অহং প্রত্যয়গম্য চিৎস্বভাব আত্মা ও ইদং-প্রত্যয়গম্য জড়স্বভাব অনাত্মা—ইহারাও তেমনি পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব। যাহা আলোক, তাহা অন্ধকার নহে; আর যাহা অন্ধকার, তাহা আলোক নহে। এইরূপ যাহা আত্মা, তাহা অনাত্মা নহে এবং যাহা অনাত্মা, তাহাও আত্মা নহে। সুতরাং অহং জ্ঞানে জ্ঞেয় আত্মার

সহিত ইদং-জ্ঞান-জ্ঞেয় অনাত্মার ইতরেতরত্ব অর্থাৎ পরস্পরাধ্যাস বা তাদাত্ম্য-বিভ্রম থাকা যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ বা উপপন্ন হয় না।" (পণ্ডিত-বর কালীবর বেদান্তবাগীশ কর্তৃক অনুদিত 'বেদান্ত-দর্শনম্,) শঙ্করাচার্য্য এইরূপে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের প্রভেদ স্থাপন করিয়াছেন। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় যেন জ্ঞানের দুইটি পক্ষ। ইহাদের সহায়ে জ্ঞান বিষয়মধ্যে বিচরণ করে, বিষয় আহরণ করে এবং তাহার দ্বারা আপনাকে পরিপুষ্ট করে। শঙ্কর বলেন যে, গীতায় এই যে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ উক্ত হইয়াছে, তাহাই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিভাগ মাত্র। ক্ষেত্রজ্ঞই জ্ঞাতা আর জ্ঞেয় তাহার ক্ষেত্র। অবিদ্যা বা অজ্ঞানবশে এই জ্ঞেয় ক্ষেত্রে জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞের অধ্যাস হয় এবং সে জন্য ক্ষেত্রজ্ঞ আপনাকে ক্ষেত্র হইতে পৃথগ্-ভাবে ভাবনা করিতে পারে না। অবিদ্যা বা অজ্ঞান দূর হইয়া যদি জ্ঞানের বিশেষ প্রকাশ হয়, তবেই এই প্রভেদের ধারণা হয়। ক্ষেত্রজ্ঞ আপনাকে ক্ষেত্র হইতে পৃথগ্রূপে জানিতে পারে। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—

"ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম॥" ১৩২

ক্ষেত্রজ্ঞকে ক্ষেত্র হইতে পৃথক্ করিয়া জানিবার একমাত্র উপায় এই যে, যাহা জ্ঞেয়, তাহা জ্ঞাতা হইতে পারে না এবং যিনি জ্ঞাতা, তিনি জ্ঞেয় হইতে পারেন না। এই ক্ষেত্র বা শরীরমধ্যে যে মহাভূত হইতে ধৃতি পর্য্যন্ত ৩১টি উপাদান ভগবান্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন্, সেগুলি সকলই জ্ঞেয়। এজন্য তাহার কোনটিই জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞ নহে। ক্ষেত্রজ্ঞ ইহ হইতে পৃথক্। যতদিন এই জ্ঞানলাভ না হয়, ততদিন আমাদের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞের অধ্যাস থাকে। প্রথমে আমাদের স্থূল দেহাধ্যাস বড় প্রবল থাকে। এই স্থূল দেহই যে আমি, তখন এই ধারণা থাকে। তখন 'অয়ং আত্মা অন্নরসময়ঃ'। এই অধ্যাস দূর হইলে তখন 'আমি প্রাণ' এইরূপ অধ্যাস থাকে,—তখন 'অয়ম্ আত্মা প্রাণময়ঃ।' সে অধ্যাস দূর হইলে তখন 'আমি মন' এই অধ্যাস্ থাকিয়া যায়। তখন 'অয়ম্

আত্মা মনোময়ঃ।' এ অধ্যাস দূর হইলে 'আমি বুদ্ধি' এই অধ্যাস থাকে। তখন 'অয়ম্ আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ।' এ অধ্যাসও যদি দূর হয়, তখন 'অয়ম্ আত্মা আনন্দময়ঃ' এই অধ্যাস থাকিয়া যায়। তাহাও অব্যক্তে বা মূল প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বা আনন্দময় কোষ অবলম্বন করিয়া আত্মা আপনাকে আনন্দময় মনে করে। এ অধ্যাসও দূর না হইলে, ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞাতা আপনার স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে না। এই যে অধ্যাস, ইহার মূল অজ্ঞান বা অবিদ্যা। পাতঞ্জল দর্শন অনুসারে অস্মিতা পঞ্চপর্ব্ব অবিদ্যার এক পর্ব মাত্র। এই অস্মিতা দূর না হইলে ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্র হইতে আপনাকে পৃথক্ জানিয়া স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে না। সাংখ্যকারিকায় আছে—

"এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাস্মি ন মে নাহমিত্যপরিশেষম্।
অবিপর্য্যয়াৎ বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্॥" ৬৪

সাংখ্যদর্শন অনুসারে পুরুষের অধিষ্ঠান হেতু প্রকৃতি হইতে প্রথম যে বুদ্ধিতত্ত্বের অভিব্যক্তি হয়, তাহা হইতেই অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। এই অহঙ্কারই 'অহং' 'মম' ও 'ইদম্' এই বিভাগের মূল। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন। রাজসিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়গণ ও তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র ও স্থূল বিষয়ের অভিব্যক্তি হয়। অতএব এই 'অহং' ও 'ইদং' বিভাগ বা 'জ্ঞাতা' ও 'জ্ঞেয়' বিভাগ প্রকৃতিজ অহঙ্কার হইতেই অভিব্যক্ত। পুরুষ অজ্ঞানবশে প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রকৃতিজ গুণ ভোগ করে বলিয়া এই অহংতা ও মমতা বুদ্ধিতে বা অহং ইদং জ্ঞানে বদ্ধ হয়। বাস্তবিক জ্ঞ-স্বরূপ পুরুষের জ্ঞান নির্ব্বিশেষ, নিরুপাধিক, অখণ্ড ও ভূমা। তাহাতে এই জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় বিভাগ নাই অথবা তাহা একীভূত। এই তত্ত্ব এ স্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই।

যাহা হউক, আমরা ইহা হইতে বুঝিতে পারি যে, সাংখ্যদর্শন অনুসারে যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ অহং, তিনি স্বরূপতঃ আত্মা নহেন; তিনি প্রকৃতিজ

বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত আত্মার রূপ (Phenomenal self) মাত্র। কিন্তু শঙ্কর এ কথা স্বীকার করেন না। এইরূপে সাংখ্যদর্শন অনুসারে শঙ্করের জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-বিভাগে যে আপত্তি হইতে পারে, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। ইহা ব্যতীত এই জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-বিভাগ সম্বন্ধে আরও এক আপত্তি হইতে পারে। শঙ্কর জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় মধ্যে যে ভেদ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা দূর করিয়া অভেদ বা অদ্বৈতজ্ঞান সহজে সম্ভব হয় না। আমরা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়কে একীভূত করিবার কোন মূল সূত্র পাই না। শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদ স্থাপনের জন্য এই জ্ঞেয়কে মায়িক, কাল্পনিক বা অবাস্তব বলিয়াছেন। কিন্তু উপনিষদে বা বেদান্তদর্শনে এবং গীতায় কোথাও জ্ঞেয় জগৎকে মায়িক বা মিথ্যা বলা হয় নাই। শ্রুতির মহাবাক্য যেমন 'অহং ব্রহ্মাস্মি', সেইরূপ 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' শ্রুতিতে এই অহং ও ইদং বা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই উভয়কে এক ব্রহ্ম-তত্ত্বের অন্তর্ভূত করা হইয়াছে। জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয় তত্ত্ব একীভূত। অহং ও ইদং উভয়েই সমন্বিত হইয়াছে। সুতরাং শঙ্করের জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভেদবাদ কেবল আমাদের বৃত্তিজ্ঞান সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে।

জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই বিভাগ আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে স্বীকৃত হইয়াছে। পাশ্চাত্য দর্শনের Subject ও Object বিভাগ এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিভাগের অনুরূপ। এ স্থলে তাহা বুঝিবার প্রয়োজন নাই। গীতায় কিন্তু এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিভাগ বা 'অহং' 'ইদং' বিভাগ গৃহীত হয় নাই। তাহার পরিবর্ত্তে ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র বিভাগ গৃহীত হইয়াছে। কেন গৃহীত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে বুঝিতে হইবে। গীতায় উক্ত হইয়াছে—

"যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥" ১৩।২৬

এ জগতে যাহা কিছু বস্তু বা সত্তা আমাদের জ্ঞানগোচর হয়, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় ;—স্থাবর ও জঙ্গম বা অচর ও চর। জঙ্গম সত্তা বিভিন্নজাতীয় প্রাণিবর্গ। আর স্থাবর কেবল উদ্ভিদ্ নহে। যাহাকে আমরা জড় বলি, তাহাও স্থাবরের অন্তর্ভূত। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন—'অহং স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ।' অতএব অতি ক্ষুদ্র জড় অণু বা জীবাণু হইতে অতি বৃহৎকায় জড় বা জীবসমুদায় এই স্থাবর বা জঙ্গমের অন্তর্ভূত। এ তত্ত্ব পরে ১৪শ অধ্যায়ের ২।৩য় শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত হইবে। গীতা অনুসারে ক্ষুদ্রতম জড় বা জীবাণু হইতে অতি বৃহৎ জড় বা জীব পর্য্যন্ত সমুদায় স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সত্ত্বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগে উদ্ভূত হয়। অতি ক্ষুদ্র জড়াণু বা জীবাণু-মধ্যে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়ই সংযুক্ত থাকে, এবং প্রত্যেকের—মধ্যে ক্ষেত্রের যে ৩১টি উপাদানের কথা এ স্থলে উক্ত হইয়াছে, তাহাও নিহিত থাকে। আমরা ক্ষুদ্র জড়াণুর মধ্যে অবশ্য এই ক্ষেত্রজ্ঞের ও ক্ষেত্রের অন্তর্গত বুদ্ধি, মন, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির প্রকাশ দেখিতে পাই না। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে এগুলি বীজভাবে থাকে, তাহা গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে। জড় ও উদ্ভিদ্ সমুদায় স্থাবর ও নিম্ন শ্রেণীস্থ প্রাণিবর্গ 'অন্তঃসংজ্ঞ।' কেবল উচ্চ শ্রেণীর জীব ও মনুষ্য বহিঃসংজ্ঞ। * মনুসংহিতায় ইহা উক্ত হইয়াছে, এবং বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি পুরাণেও ইহা বিবৃত হইয়াছে। অতিক্ষুদ্র জড় বা জীবাণু হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নজাতীয় জীব পর্য্যন্ত যাহা কিছু সত্ত্ব আছে, তাহারা অন্তঃসংজ্ঞ বলিয়া তাহাদের বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়গণ অপ্রকাশিত ও বীজভাবে নিহিত থাকে। এজন্য তাহাদের বাহ্য বিষয় সম্বন্ধে কোন জ্ঞান থাকে না। কেবল উচ্চজাতীয় জীবে ও মনুষ্যমধ্যে বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়-গণের বিকাশ হয় বলিয়া তাহারা বহিঃসংজ্ঞ হয় ও বাহ্য-বিষয় গ্রহণ

---

* জর্ম্মণ্ পণ্ডিত সপেনহর বলিয়াছেন, "consciousness sleeps in stones, dreams in animals and awakes in man."

করিতে পারে। মনুষ্যাদি উচ্চজাতীয় জীবজ্ঞানেই কেবল বাহ্য জ্ঞেয় বিষয় বা ইদংজ্ঞান অভিব্যক্ত হয়। নিম্নজাতীয় জীবে তাহা হয় না। সুতরাং সমুদায় স্থাবরজঙ্গমাত্মক সত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিভাগ সম্ভব হয় না; কেবল ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগই সঙ্গত হয়। নিম্নজাতীয় জীবে ক্ষেত্রজ্ঞের কেবল ক্ষেত্র-সম্বন্ধীয় অনুভূতি থাকে। অন্য কোনরূপ অনুভূতি থাকে না। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—

"ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥"

এ স্থলে 'বেত্তি' শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে। জ্ঞানার্থক বিদ্ ধাতু হইতে বেত্তি। বিদ্ ধাতু হইতে বেদনা। বেদনার অর্থ অনুভব করা। অতএব যাহা অপরোক্ষ ভাবে অনুভব করা যায়, তাহাই বেদনা। যে, এইরূপ অনুভব করে, সেই বেত্তা। অতএব এই শ্লোকের অর্থ এই যে, যিনি ক্ষেত্র বা দেহমধ্যে আপনাকে সেই দেহরূপে অনুভব করেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সকল সত্তাতে যিনি সেই সেই ক্ষেত্ররূপে আপনাকে বিশেষভাবে অনুভব করেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। তাঁহার বাহ্য বিষয়ের অনুভূতি থাকুক বা না থাকুক, সর্ব্বাবস্থায় তাঁহার এই আন্ত-রানুভূতি থাকে। ইহাই সর্ব্বজীব সম্বন্ধে বা সর্ব্ব-সত্তা-সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম। জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-বিভাগ কেবল উচ্চশ্রেণীর জীবে, বিশেষতঃ মনুষ্য সম্বন্ধেই সম্ভব। নিম্নশ্রেণীর সত্ত্বে তাহা সম্ভব নহে। এ জন্য গীতোক্ত ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগই বিশেষ সঙ্গত। সে যাহা হউক, মানুষের জ্ঞান যখন বিকাশিত হয়, শুদ্ধ সাত্ত্বিক হয়, তখন মানুষ আপনাকে জ্ঞাতৃরূপে এবং তাহার শরীরকে ও বাহ্য জগৎকে জ্ঞেয়রূপে জানিতে পারে। তখন সে জ্ঞাতৃরূপে আপনাকে আপনার জ্ঞেয় ক্ষেত্র হইতে ও জ্ঞেয় বাহ্য-জগৎ হইতে পৃথক্ করিয়া, ক্ষেত্রজ্ঞ- আপনার স্বরূপ জানিতে পারে, এবং সেই জ্ঞান প্রকৃতরূপে লাভ করিয়া, পরম অক্ষররূপে আপনাকে

প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। তখন ক্ষেত্রের সহিত তাহার আর কোন সম্বন্ধ থাকে না; তাহার কৈবল্য-মুক্তি হয়। কিন্তু এইজ্ঞান জ্ঞানের শেষ সীমা নহে এবং এই মুক্তিও চরম মুক্তি নহে। যখন ক্ষেত্রজ্ঞ সর্ব্বান্তর্ভূত আত্মা হইয়া সমুদায়কে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া সর্ব্বক্ষেত্রে আপনাকে একমাত্র ক্ষেত্রজ্ঞরূপে জানিতে পারে, যখন সে আপনার সর্ব্বাত্মা সর্ব্বেশ্বর স্বরূপ জানিতে পারে—সেই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই তাহার ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান পূর্ণরূপে লাভ হয়। তখন সে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের পূর্ণ-জ্ঞান লাভ করিতে পারে। সে ঈশ্বরভাবে ভাবিত হয়। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—

"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম॥" ১৩।২

জ্ঞান ও অজ্ঞান।—আমরা বলিয়াছি যে, এ অধ্যায়ে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিবেক-জ্ঞানই প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু ইহা ব্যতীত অন্য তত্ত্বও এ অধ্যায়ে উপদিষ্ট হইয়াছে। এ অধ্যায়ে প্রতিপাদ্য বিষয়,—ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ, পুরুষ প্রকৃতি বিভাগ, জ্ঞান এবং জ্ঞেয়। ইহার মধ্যে ক্ষেত্রতত্ত্ব সংক্ষেপে প্রথমে উক্ত হইয়াছে। তাহার পর কি, তাহা বিবৃত হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে, সাংখ্যদর্শন অনুসারে জ্ঞান সাত্ত্বিক বুদ্ধিরই এক রূপ। সত্ত্বগুণ নির্ম্মল, প্রকাশস্বভাব ও সুখস্বভাব বলিয়া (১৪।৬) এবং সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয় বলিয়া (১৪ ১৭) এবং প্রকৃতির এই সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞ-স্বরূপ পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতির পরিণাম আরম্ভকালে বুদ্ধিতত্ত্বের বিকাশ হয় বলিয়া, নির্ম্মল সাত্ত্বিক বুদ্ধির স্বরূপ এই জ্ঞান। আমরা পূর্ব্বে যথাস্থানে এই তত্ত্ব বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

বুদ্ধির এই জ্ঞানভাবকে বৃত্তিজ্ঞান বলে। ইহা ব্যতীত আত্মা বা ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ, নির্ব্বিশেষ জ্ঞানস্বরূপ বা নিত্যবোধস্বরূপ। সাংখ্যদর্শন

অনুসারেও পুরুষ 'জ্ঞ'-স্বরূপ। পুরুষ-প্রকৃতি-সংযোগ হেতু পুরুষ যখন অবিদ্যা বা অজ্ঞানবশে প্রকৃতি-বদ্ধ হয়, তখন পুরুষের এই নিত্য জ্ঞানরূপ প্রকৃতিজ বুদ্ধিতত্বে প্রতিবিম্বিত হয়। বুদ্ধি—রজঃ ও তমোগুণপ্রভাবে মলিন হইলে, সেই নিত্যজ্ঞান তাহাতে পূর্ণ প্রতিবিম্বিত হয় না—বুদ্ধির মলিনতা অনুসারে তাহা মলিন হয়। যখন বুদ্ধি নির্ম্মল সাত্ত্বিক হয়, তখন এই জ্ঞানের প্রতিবিম্ব স্পষ্ট হয়। যখন বুদ্ধি এইরূপ নির্ম্মল হয়, তখন তাহাতে সেই পরম জ্ঞান-সূর্য্য উদিত হয়—তাহাতে আত্মজ্ঞান স্পষ্ট প্রতিবিম্বিত হয়। অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নষ্ট হইয়া যায়। বুদ্ধিকে নির্ম্মল করিয়া এই পরম জ্ঞান লাভ করিবার উপদেশ ভগবান্ পূর্ব্বে চতুর্থ অধ্যায়ে ও পঞ্চম অধ্যায়ে দিয়াছেন। আমরাও পঞ্চম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে ইহা বিস্তারিতভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। বিশেষতঃ,—

"জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥" (৫।১৬)

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় এ তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান নাশিত হইলে, সেই পরম জ্ঞান আদিত্যবৎ প্রকাশিত হয়। এই পরমজ্ঞান আত্মস্বরূপ—ব্রহ্মস্বরূপ। এই শ্লোকে এইরূপে 'জ্ঞান' ও পরমজ্ঞান মধ্যে যে প্রভেদ, তাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। পরে ইহার পুনরুল্লেখ হইবে। যাহা হউক, এই অধ্যায়ে ৭ম হইতে ১১শ শ্লোকে, এই বৃত্তি'জ্ঞান'—এই সাত্ত্বিক নির্ম্মল বুদ্ধির স্বরূপ যে 'জ্ঞান'—তাহা বিবৃত হইয়াছে। এই জ্ঞানের তত্ত্ব জানা প্রথম প্রয়োজন এবং এই জ্ঞানতত্ত্ব জানিয়া, এই জ্ঞান সাধনাদ্বারা লাভ করা বিশেষ প্রয়োজন। এই জ্ঞান লাভ করিলে, সেই জ্ঞানের জ্ঞেয় ব্রহ্ম তত্ত্ব লাভ করা যায়। তখন জ্ঞানস্বরূপ পরমব্রহ্মে অবস্থিতি লাভ হয়,—প্রকৃত মুক্তি হয়।

আমরা বলিয়াছি যে, চিত্ত সম্পূর্ণ শুদ্ধ সাত্ত্বিক নির্ম্মল না হইলে, তাহা জ্ঞানস্বরূপ হয় না। বিশেষ সাধনা দ্বারা এই জ্ঞান লাভ করিতে হয়। কর্ম্মযোগসাধনা ইহার মধ্যে প্রধান। কর্ম্মযোগ দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে যে এই জ্ঞান লাভ হয়, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই কর্ম্মযোগ-সাধনাফলে 'অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব, অহিংসা, ক্ষান্তি, ঋজুতা, শৌচ, স্থৈর্য্য, যম ও ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, তত্ত্বজ্ঞানলাভার্থ শ্রদ্ধা পূর্ব্বক গুরুর সেবাতৎপরতা লাভ হয়। এইরূপ সাধনা দ্বারা বিষয়বৈরাগ্য অহঙ্কার জন্ম মৃত্যু জরা.ব্যাধি দুঃখানুদোষ-দর্শন সিদ্ধ হয়। বিষয়ে অনাসক্তি, অনভিষঙ্গ, ইষ্টানিষ্ট-প্রাপ্তিতে নিত্য সমচিত্তত্ব প্রভৃতি লাভ হয়। চিত্ত শুদ্ধ নির্ম্মল হইলে, বুদ্ধি এই সকল ভাবযুক্ত হয়,—বুদ্ধি এই সকল জ্ঞানের স্বরূপ হয়। ইহারা সাত্ত্বিক জ্ঞানের স্বরূপ বলিয়া ইহাদিগকে জ্ঞান বলা হইয়াছে।

ভগবান্ এ স্থলে যে বিংশতি প্রকার জ্ঞান উল্লেখ করিয়াছেন, উক্ত কয়েকটি ইহার অন্তর্গত। আর যে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানলাভ জন্য—ভক্তিযোগ-সাধন জন্য যে নির্জ্জনসেবিত্ব ও জনতায় অরতিবুদ্ধি, তাহাও এই জ্ঞানের অন্তর্গত। এ সকলই নির্ম্মল সাত্ত্বিক বুদ্ধির স্বরূপ। ইহা ব্যতীত ভগবান্ আরও তিন প্রকার জ্ঞানের রূপ বলিয়াছেন। তাহা ঈশ্বরে অনন্যযোগ অব্যভিচারিণী ভক্তি, অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শন। এই তিনটিই জ্ঞানের প্রধান রূপ। শুদ্ধ সাত্ত্বিক নির্ম্মল চিত্তে যেমন অমানিত্বাদি উক্ত ভাব অভিব্যক্ত হয়, সেইরূপ উক্ত ভাবের সহিত ঈশ্বরে অনন্যভক্তিও বিকাশিত হয়। ইহাও নির্ম্মল সাত্ত্বিকভাবস্বরূপ বুদ্ধির এক রূপ। তাই ইহাকেও জ্ঞান বলে। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন;—

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে (৭।১৯)।"

বুদ্ধি যখন উক্ত অমানিত্বাদি ভাবযুক্ত হয়, তখন জ্ঞানবান্ হওয়া যায়। জ্ঞানবান্ হইলে তবে ঈশ্বরে অনন্য অব্যভিচারিণী ভক্তিরূপ 'জ্ঞানে'

স্থিতিলাভ হয়। এই ভক্তিতত্ত্ব পূর্ব্বে দ্বিতীয় ষট্‌কে—প্রধানতঃ সপ্তম, নবম ও দ্বাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

এই ভক্তির ন্যায় অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন—এই জ্ঞানের চরম সীমা। যাহা অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব, তাহা প্রধানতঃ ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগে বিবৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে কোথাও তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শন বিবৃত হয় নাই। এজন্য এই তৃতীয় ষট্‌কে সেই তত্ত্বজ্ঞান বিবৃত হইয়াছে। বলিয়াছি ত, এই তত্ত্বজ্ঞান প্রধানতঃ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞজ্ঞান অথবা সাংখ্যদর্শনোক্ত পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক-জ্ঞান। প্রকৃতি যখন এই তত্ত্বজ্ঞানরূপ হয়, অর্থাৎ যখন প্রকৃতিজ সাত্ত্বিক নির্ম্মল বুদ্ধি এই তত্ত্বজ্ঞান-রূপ হয়, তখন সেই এক জ্ঞানরূপের দ্বারাই প্রকৃতি পুরুষকে বিমুক্ত করে। সাংখ্যকারিকায় আছে,—

"রূপৈঃ সপ্তভিরেব বধ্নাত্যাত্মানমাত্মনা প্রকৃতিঃ।
সৈব চ পুরুষার্থং প্রতি বিমোচয়ত্যেকরূপেণ॥" ৬৩

অর্থাৎ বুদ্ধির আট রূপ বা ভাব। তাহাদের মধ্যে অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এই সাত রূপ বা ভাব দ্বারা পুরুষের ভোগার্থ প্রকৃতি আপনাকে আপনিই বদ্ধ করে, আর সেই বুদ্ধি-রূপা প্রকৃতি এই একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানরূপ দ্বারা পুরুষের অপবর্গসাধন করিয়া আপনাকে মুক্ত করে।

অতএব জ্ঞান মুক্তি-হেতু। সাত্ত্বিক বুদ্ধির জ্ঞানরূপ এই বিংশতি প্রকার; ইহার মধ্যে এই তত্ত্বজ্ঞান রূপই শ্রেষ্ঠ। বলিয়াছি ত, ইহাই সাংখ্যদর্শন অনুসারে পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক-জ্ঞান বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিবেক-জ্ঞান। ভগবান্‌ও এই তত্ত্বজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব—সর্ব্বজ্ঞানের মধ্যে ইহার উত্তমত্ব উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং ইহা কেবল এই জ্ঞানের স্তাতবাদ মাত্র নহে।

এইরূপে আমরা নির্ম্মল শুদ্ধ সাত্ত্বিক বুদ্ধির এই জ্ঞানরূপ বুঝিতে

পারি। অমানিত্বাদি এই জ্ঞানরূপ নির্ম্মল বুদ্ধির দৈবী সম্পদ্ ইহাতে এই জ্ঞানের যে শ্রেষ্ঠরূপ—ঈশ্বরে অনন্য অব্যভিচারিণী ভক্তি, অধ্যাত্ম-জ্ঞানে নিত্যস্থিতি ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন, তাহা লাভ হয়। এ স্থলে এই তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনরূপ যে উক্ত সর্ব্বরূপ জ্ঞানের মধ্যে উৎকৃষ্ট মোক্ষদ জ্ঞান, তাহাই উক্ত হইয়াছে বলিয়াছি।

কিন্তু সাধনা দ্বারা যখন বুদ্ধি শুদ্ধ, সাত্ত্বিক ও নির্ম্মল হয় এবং তাহাতে 'জ্ঞ'-স্বরূপ আত্মার জ্ঞান প্রতিবিম্বিত হয় তখন বুদ্ধির যে জ্ঞানভাব, অজ্ঞানমুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়, তাহার রূপ এই বিংশতি প্রকার। ইহার কোনটিই বাদ থাকে না। জ্ঞানের অমানিত্বাদি প্রথমোক্ত ভাব সকল অভিব্যক্ত না হইলে, তাহার ঈশ্বরে অনন্যভক্তি, অধ্যাত্মজ্ঞানে স্থিতি ও তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন-ভাব লাভ হইতে পারে না।

একণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, পূর্ব্বে ভগবান্ বলিয়াছেন, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ এই উভয়ের জ্ঞানই জ্ঞান। তবে কেন আবার বলিয়াছেন যে, অমানিত্বাদি প্রভৃতি ২০টিই জ্ঞান। ইহাতে আপাততঃ বিরোধ মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ জ্ঞান লাভ হইলে, ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ আপনাকে ক্ষেত্র হইতে পৃথক্‌রূপে জানিতে পারে এবং সেই জ্ঞানে তাহার স্থিতিলাভ হয়। তখন সে ক্ষেত্রের ধর্ম্ম আপনাতে অধ্যারোপ করে না, তখন তাহার অধ্যাস দূর হয়। সুতরাং তখন ক্ষেত্রের—বিশেষতঃ ক্ষেত্রস্থ ত্রিগুণের যে ধর্ম্ম, তাহাতে সে বদ্ধ থাকে না। মানিত্ব, দম্ভিত্ব, হিংসা, অক্ষান্তি, ক্রূরতা, অশৌচ, অস্থিরতা, বিষয়ে আসক্তি, অভিমান, অহঙ্কার প্রভৃতি ক্ষেত্রস্থ বুদ্ধি অহঙ্কার মন প্রভৃতির ধর্ম্ম আর আপনাতে আরোপ করে না। তখন তাহার অজ্ঞান দূর হইয়া যায়। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, অমানিত্বাদি জ্ঞানের যাহা অন্যথা বা যাহা বিপরীত, তাহাই অজ্ঞান। অর্থাৎ মানিত্ব, দম্ভিত্ব প্রভৃতি অজ্ঞান। এইরূপে এই ৭ম হইতে ১১শ শ্লোকে জ্ঞান ও অজ্ঞানের বিভাগ করা

হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সাংখ্যদর্শন অনুসারে বুদ্ধিরই দুই রূপ ;—জ্ঞান ও অজ্ঞান। সাত্ত্বিক বুদ্ধির রূপ জ্ঞান, আর রাজসিক ও তামসিক বুদ্ধির রূপ অজ্ঞান। যখন বুদ্ধি সাত্ত্বিক, স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হয়, তখনই বুদ্ধি এই জ্ঞানরূপে বা জ্ঞানভাবে স্থিত হয়। যতক্ষণ বুদ্ধি রজঃ-প্রধান বা তমঃপ্রধান থাকে—রজস্তমোমলায় মলিন থাকে, ততক্ষণ বুদ্ধির এই জ্ঞানভাব অভিব্যক্ত হয় না। সুতরাং আমাদের চিত্ত যতক্ষণ রাজসিক ও তামসিক ভাবকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বপ্রধান বা বিশেষ-ভাবে সাত্ত্বিক-ভাবযুক্ত না হইতে পারে, ততক্ষণ চিত্তের এই জ্ঞানভাব বিকাশিত হয় না। চিত্ত শুদ্ধ নির্ম্মল হইলে, তাহাতে জ্ঞানস্বরূপ আত্মার বা ব্রহ্মের জ্ঞান স্পষ্ট প্রতিবিম্বিত হয়। এজন্য তখন বুদ্ধি এই জ্ঞান-স্বরূপ হয়। তখন ক্ষেত্রজ্ঞ আর মলিন চিত্তের যে অজ্ঞান, তাহার প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে না। এই জ্ঞান আমাদের দৈবী সম্পদ্। আর অজ্ঞান আসুরী সম্পদ্। দৈবী ও আসুরী সম্পদের কথা পরে ১৬শ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে,এ স্থলে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই। সে স্থলে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, দৈবী সম্পদ্ই মুক্তির হেতু আর আসুরী সম্পদ্ বন্ধনের হেতু। সুতরাং আমাদের এই দৈবী সম্পদ্রূপ জ্ঞানই মোক্ষের হেতু।

জ্ঞেয় ব্রহ্ম।—ভগবান্ এইরূপে জ্ঞান ও অজ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইয়া, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া, যাহা জানিলে অমৃতত্ব লাভ হয়, সেই জ্ঞেয় কি, তাহা বুঝাইয়াছেন। সেই জ্ঞেয় তদাখ্য পরম ব্রহ্ম। এ স্থলে অভিপ্রায় এই যে, যখন জ্ঞান অজ্ঞানযুক্ত হয়, তখন সেই জ্ঞানেই এই তদাখ্য পরম ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন। অজ্ঞান বা অবিদ্যাদূর না হইলে, ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন না—ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আদৌ উপস্থিত হয় না। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন—

> "জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
> তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥" ৫।১৬

ইহার অর্থ আমরা যথাস্থানে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। সংক্ষেপে ইহার অর্থ এই যে জ্ঞানের দ্বারা যাহাদের অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, তাহাদের অন্তরে সেই তাদাত্ম্য পরম জ্ঞান প্রকাশিত হয়। এই শ্লোকোক্ত অজ্ঞান কি এবং জ্ঞান কি, তাহা এই অধ্যায়ের ৭ম হইতে ১১শ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে, তাহা দেখিয়াছি। সুতরাং এ স্থলে উক্ত অমানিত্বাদি জ্ঞানের দ্বারা যখন তাহার বিপরীত মানিত্বাদি অজ্ঞান দূর হয় অর্থাৎ যখন অমানিত্বাদি সাধন দ্বারা চিত্তের মলিনতা ক্রমে দূর হইতে থাকে এবং সেইসঙ্গে মানিত্বাদি অজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়, তখন সেই নির্ম্মল স্বচ্ছ সাত্ত্বিকচিত্তে পরম জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অনেক ব্যাখ্যাকারের মতে উক্ত শ্লোকের অর্থ এই যে, যখন জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান নষ্ট হয়, তখন সেই জ্ঞান "তৎপরম্" অর্থাৎ তদাখ্য পরম ব্রহ্মকে প্রকাশ করে। আমরা এই অর্থ গ্রহণ করি নাই; কারণ, ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ। এ স্থলে এই প্রকাশের উপমা দেওয়া হইয়াছে—'আদিত্যবৎ।' সূর্য্য যেমন অন্ধকার দূর করিয়া উদয় হইলে, আপনাকে আপনি প্রকাশ করে, এবং সেই সঙ্গে অন্য সকলকে প্রকাশ করে, সেইরূপ নির্ম্মল জ্ঞানে ব্রহ্মরূপ জ্ঞান-সূর্য্য প্রকাশিত হইয়া আপনাকে প্রকাশ করে এবং অন্য সকলকে প্রকাশ করে। সুতরাং জ্ঞান 'তৎপরম্' ব্রহ্মকে আপনি প্রকাশ করিতে পারে না। সাংখ্যমতে বুদ্ধির যে জ্ঞানভাব, তাহা জড়। তাহার প্রকাশের সামর্থ্য নাই। এ জন্য আমরা বলিয়াছি যে, অজ্ঞানমুক্ত জ্ঞানে জ্ঞানস্বরূপ পরম ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। আমাদের জ্ঞান অজ্ঞানমুক্ত হইলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়। তখন ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন।

বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্র—'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'। এই সূত্রের 'অথ' এই শব্দের অর্থ—অনন্তর। যখন শমদমাদি সাধনার দ্বারা অধিকারী হওয়া যায়, তখনই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উদয় হয়। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,

"যাহার অব্যবহিত পরেই ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অবশ্য সম্ভ
হইতে পারে, তাহা কি? নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক। ঐহিক
আমুষ্মিক ভোগে বৈরাগ্য। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধা
শ্রদ্ধা, মুমুক্ষুত্ব এই সকল গুণ বা এই সকল সাধন থাকিলে, ধর্ম্মজিজ্ঞাস
পূর্ব্বে ও পরে উভয় কালেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিতে পারা যায়।" গীতো
অমানিত্বাদি জ্ঞান ও এই বৈরাগ্যাদি চতুর্ব্বর্গসাধন এক অর্থে একই
তাই বলিয়াছি যে, জ্ঞেয়কে জানিলে অমৃতত্বলাভ হয়; সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম
এই অজ্ঞানমুক্ত জ্ঞানে জ্ঞেয়। যখন ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ-জ্ঞান হ
ক্ষেত্রজ্ঞ আপনাকে ক্ষেত্র হইতে পৃথক্ জানিতে পারে এবং ক্ষেত্রে
মলিনতা আপনাতে আরোপ না করে ও অমানিত্বাদি জ্ঞান লাভ কর
যখন জন্ম-মৃত্যু-জরাব্যাধি-দুঃখ-দোষ অনুদর্শন করে ও মৃত্যু-সংসার
সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হয়, তখন
ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় ও ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন।

বুদ্ধি এইরূপ সাত্ত্বিক ও নির্ম্মল হইলে, যখন এই জ্ঞানস্বরূপ হয়, যখ
ইহা প্রধানতঃ এই তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনরূপে স্থিত হয়, তখন ইহা কিরূপে
পরমমুক্তির কারণ হয়, তাহা এই জ্ঞানতত্ত্ব বুঝাইয়া পরে ভগবা
বলিয়াছেন। সে জ্ঞান তখন আপনার প্রকৃত জ্ঞেয় কি, তাহা জানিতে
পারে। ভগবান্ বলিয়াছেন, সেই জ্ঞেয়ই ব্রহ্ম। তিনিই এই জ্ঞানে
একমাত্র জিজ্ঞাসার বিষয়। ব্রহ্ম—এই জ্ঞানে জ্ঞেয় বা জিজ্ঞাসার বিষ
হইলে, তাহার ফলে এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে
পুরুষ সেই ব্রহ্মস্বরূপত্ব লাভ করে। ("ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি"—ইতি
বৃহদারণ্যক ৪।৪।৬, ৪।৪।২৫)। তাহার পরমনির্ব্বাণরূপ পরমপুরুষার্থসিদ্ধি
হয়। তখন পুরুষ আপনার ব্রহ্মস্বরূপ নির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপ চিত্তদর্পণে দর্শ
করিয়া জানিতে পারে। নির্ম্মল স্বচ্ছ সাত্ত্বিক জ্ঞানস্বরূপ বুদ্ধিতে সে তা
স্বরূপ দেখিতে পায়। সেই জ্ঞানস্বরূপ বুদ্ধিতে জ্ঞেয় ব্রহ্মস্বর

প্রতিভাত হইলে বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে পুরুষ সেই প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মরূপ হয়। ইহাই চরম মুক্তি।

ভগবান্ এ স্থলে পরম ব্রহ্মকে জ্ঞেয় বলিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে জ্ঞানের জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিভাগ উল্লেখ করিয়াছি। শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা অনুসারে আমরা দেখিয়াছি যে, ক্ষেত্রজ্ঞ 'অহং'ই জ্ঞাতা আর ক্ষেত্র বা 'ইদং'ই জ্ঞেয়। এ স্থলে জ্ঞেয় সে অর্থে গৃহীত হয় নাই। এ স্থলে যাহা জ্ঞেয়, তাহা তদাখ্য পরম ব্রহ্ম। এই পরম ব্রহ্ম জ্ঞান-স্বরূপ। তিনি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই। তিনি জ্ঞাতৃরূপেই প্রধানতঃ জ্ঞেয়। যাহা জ্ঞানের বিষয়, তাহাই জ্ঞেয়। আত্মা বা ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় বলিয়া তিনি জ্ঞেয়। শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-দর্শনের অধ্যাস-ভাষ্যে বলিয়াছেন,—

"আত্মা যে নিতান্তই অবিষয়—কোনও প্রকারে বিষয় (জ্ঞানগোচর) নহেন, এমত নহে। এখন তাঁহাতে (এই জীবাবস্থায় তাঁহাতে) অস্মৎ-প্রত্যয়ের বিষয়তা আছে এবং অন্তরাত্মরূপে প্রসিদ্ধ বা প্রতীত হওয়ায় অপরোক্ষতাও আছে। আত্মা যখন 'অহং' 'আমি' এতদ্রূপ জ্ঞানের বিষয়, তখন আর তাঁহাকে একান্ত অবিষয় বলা যায় না, এবং পরোক্ষ (অপ্রত্যক্ষ) বলাও যায় না। অভিপ্রায় এই যে, চৈতন্যমাত্রস্বভাব পরমাত্মা বস্তুতঃ নিরুপাধিক ও অবিষয় হইলেও অবিদ্যাকল্পিত 'অহং' উপাধিদ্বারা বিষয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিবেককালে বা অনধ্যাস-কালে তিনি নিরুপাধিক ও নিরংশ; কিন্তু অবিবেককালে তিনি সোপাধিক ও সাংশ। অবিদ্যাকল্পিত অহং যতকাল থাকিবে, ততকালই তিনি অহং-বৃত্তির পরিচ্ছেদ্য বা বিষয়। সুতরাং অবিদ্যাকল্পিত 'অহং' উপাধির বিলোপ বা বিগম না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি একান্ত অবিষয় নহেন। অর্থাৎ আত্মা এখন অহং-বৃত্তির বিষয়।" (পণ্ডিতবর কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় অনুদিত শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের বেদান্তভাষ্য উপক্রমণিকা) অতএব ব্রহ্ম অপরোক্ষানুভব দ্বারা জ্ঞেয়। আত্মার আত্মা বা জ্ঞাতার জ্ঞাতৃরূপে

তাঁহাকে জানা যায় বলিয়া তিনি জ্ঞেয়। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, পরমব্রহ্ম জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্য অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা অধিগম্য পরম জ্ঞাতৃরূপে তিনি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। অতএব পরমব্রহ্ম যেমন জ্ঞেয়, সেইরূপ জ্ঞাতাও বটে এবং জ্ঞানস্বরূপও বটে। আমরা পূর্ব্বে দ্বাদশ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি; এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বেদান্ত-দর্শন অনুসারে শুদ্ধ জ্ঞানের তিন রূপ ;—জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান। ব্রহ্ম—শুদ্ধ চিৎরূপ। তিনিই মায়াশক্তি হেতু এই তিন রূপে অভিব্যক্ত হন। নির্ম্মল বুদ্ধিতেই এই তিন রূপের প্রতিবিম্ব পতিত হয়; সুতরাং বুদ্ধিও এই তিনরূপ হয়। যখন জ্ঞান উক্ত তিন রূপযুক্ত হয়, তখন ব্রহ্ম তাহার জ্ঞেয় হন। ব্রহ্ম জ্ঞেয় হইলে জ্ঞান সেই ব্রহ্মরূপ হয়, জ্ঞেয়ের সহিত জ্ঞান একীভূত হয়। তখন জ্ঞাতৃরূপ ও এই জ্ঞানের মধ্য দিয়া জ্ঞেয় ব্রহ্মরূপ হয়। তখন জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান একাকার হয়। ইহাই নিত্যবোধস্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্মের প্রকৃত তত্ত্ব। জ্ঞানের মধ্য দিয়া এই জ্ঞেয় ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্তিই জ্ঞানের পরা নিষ্ঠা (১৮।৫০)। এইরূপে ব্রহ্মস্বরূপে পুরুষের প্রতিষ্ঠাতেই পরমমুক্তি হয়। এই জন্য ভগবান্ জ্ঞানের স্বরূপ বুঝাইয়া এই জ্ঞানের জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন।

আমরা দেখিয়াছি যে, গীতায় এই ব্রহ্মতত্ত্বের বিবরণ সংক্ষেপ। ১২শ হইতে সপ্তদশ শ্লোক পর্য্যন্ত এই জ্ঞেয় পরম ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। এই ব্রহ্মতত্ত্ব বেদসংহিতার ব্রহ্মসূত্রপদে যেরূপ বিবৃত হইয়াছে, তাহাই গীতায় সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। উপনিষদ এই ব্রহ্মপ্রতিপাদক। ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষদেই বিবৃত হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যাই পরা বিদ্যা। এই জন্য আমরা পূর্ব্বে উক্ত ১২শ হইতে ১৭শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় উপনিষদ্ হইতে গীতোক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব বিস্তারিতভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং

আমরা সংক্ষেপে মাত্র এ স্থলে গীতোক্ত এই ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা করিব। গীতায় অনেক স্থলে ব্রহ্ম শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। ব্রহ্ম অর্থে শব্দব্রহ্ম বা বেদ; ব্রহ্ম অর্থে ভগবানের যোনিরূপা প্রকৃতি। কিন্তু এ স্থলে জ্ঞেয় 'পরম' ব্রহ্মতত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে। তাহার অর্থ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

আত্মার ন্যায় ব্রহ্ম নানা অর্থে ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু পরমাত্মা বা পরম ব্রহ্ম বলিলে সেই পারমার্থিক মূল তত্ত্বই নির্দ্দিষ্ট হয়। গীতায় এ স্থলে পরম ব্রহ্ম-তত্ত্বই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহা শ্রুতিপ্রতিপাদিত ব্রহ্ম-তত্ত্ব ও বেদান্তদর্শনে জিজ্ঞাসার বিষয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব—'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই তটস্থ লক্ষণ দ্বারা যিনি জ্ঞেয়, 'ওঁ তৎসৎ' যাঁহার নির্দ্দেশক, তিনিই গীতোক্ত পরম ব্রহ্ম। এ স্থলে সেই পরম ব্রহ্ম-তত্ত্বই সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। কোন কোন ব্যাখ্যাকারের মতে এ স্থলে ব্রহ্ম জীবাত্মা। কেহ বলেন, ব্রহ্মই মূল প্রকৃতি, তাহাই ভগবানের মহদ্‌যোনি। কেহ বলেন, এই ব্রহ্মই ভগবানের পরা ও অপরা প্রকৃতি বা ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র-তত্ত্ব। সে জন্য তাঁহারা এই শ্লোকের অর্থ করেন যে, ব্রহ্ম 'অনাদি' এবং 'মৎপর' অর্থাৎ ভগবানের অধীন। ভগবান্ এই ব্রহ্মের অতীত তত্ত্ব। তাই ভগবান্ বাসুদেব পরব্রহ্ম।

এ অর্থ যে আদৌ সঙ্গত হইতে পারে না, তাহা আমরা যথাস্থানে বিবৃত করিয়াছি। এ স্থলে গীতায় পরম ব্রহ্ম-তত্ত্ব বা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' তত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে।

ইহা 'তৎ ব্রহ্ম' 'তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ' (৭।২৯) 'কিং তৎ ব্রহ্ম' (৮।১), ইত্যাদি স্থলে এই 'তৎ'-পদবাচ্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আছে। ভগবান্ বলিয়াছেন, এই তদ্ব্রহ্ম 'অক্ষর ব্রহ্ম পরমম্।' (৮।৩)। এই অক্ষর পরম-ব্রহ্ম কি, তাহা উক্ত ৮।৩ শ্লোকের ব্যাখ্যায় সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে।

এ স্থলে যে ব্রহ্মকে উক্ত জ্ঞানের জ্ঞেয় বলা হইয়াছে, তাহা এই তদাখ্য অক্ষর পরম ব্রহ্ম—"অনাদিমৎ পরমব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে।"

(১৩।১২)।

এই পরমব্রহ্ম সম্বন্ধে ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন—

'পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যো ব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥" (৮।২০,২১)

এই পরমব্রহ্ম বা পরম পদ সম্বন্ধে ভগবান্ অন্যত্র বলিয়াছেন—

"যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥" (৮।১১)

ভগবান্ পরেও বলিয়াছেন,—

"পদং তৎ পরিমার্গিতব্যম্
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।" (১৫।৪)

ইহা "তৎপদমব্যয়ম" (১৫।৫)

ভগবান্ আবার বলিয়াছেন,—

"ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥" (১৫।৬)

এই জ্ঞেয় ব্রহ্ম অক্ষর পরমব্রহ্ম, ব্রহ্মই এই অব্যয় পদ, ইহাই ভগবানের পরম ধাম। এই অক্ষর অব্যক্তের উপাসনার কথা ১২শ অধ্যায়ে ৩.৪ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

অতএব এ স্থলে ভগবান্ নির্ম্মল অমানিত্বাদি রূপ ও তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনরূপ জ্ঞানের জ্ঞেয় যে ব্রহ্ম বলিয়াছেন,—তাহা যে গীতা অনুসারে এই অক্ষর

পরম ব্রহ্ম, এই ভগবানের পরম ধাম, পরম অব্যয় পদ ব্রহ্ম, সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না।' এই কয় শ্লোক হইতেও এই তত্ত্ব স্পষ্ট জানা যায়। ভগবান্ বলিয়াছেন, জ্ঞেয় ব্রহ্মকে জানিলে অমৃতত্ব লাভ হয়। (১৩।১২)।

এই জ্ঞেয়—অনাদিমৎ পরম ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম সৎ বা অসৎ-বাচ্য নহে। ইহার অর্থ আমরা দ্বাদশ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এই ব্রহ্ম সর্ব্বস্বরূপ অথচ সর্ব্বাতীত। এ বিশ্বে যত ভূত বা স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সত্তা আছে—সেই চরাচরের তিনি সমষ্টিরূপ। এজন্য তিনি সর্ব্বতঃ পাণিপাদ, সর্ব্বতঃ অক্ষিশিরোমুখ, সর্ব্বত্র শ্রুতিমৎ। তিনি লোক সমুদায় আবৃত করিয়া স্থিত—"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্" (ঈশ ১) তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত হইয়াও সর্ব্বেন্দ্রিয় আভাস অর্থাৎ কারণ বা বীজ স্বরূপ ও প্রকাশক। অতএব ব্রহ্ম সর্ব্বকারণ ও সর্ব্বরূপ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। তিনি এই বিশ্বের ভরণকর্ত্তা, সর্ব্বগুণভোক্তা। ব্রহ্ম সর্ব্বস্বরূপ হইয়াও সর্ব্বাতীত। তিনি অসক্ত ও নির্গুণ।

ব্রহ্ম চরাচর সর্ব্বভূতের বাহ্য ও অন্তর; তিনি দূরে, তিনিই নিকটে তিনি সূক্ষ্ম হেতু অবিজ্ঞেয়। তিনি অবিভক্ত হইয়াও সর্ব্বভূত সম্বন্ধে বিভক্তের ন্যায় স্থিত। তিনি ভূতভর্ত্তা ও সর্ব্বপালনকারী, সর্ব্বগ্রাসকারী ও সর্ব্বসৃজনকারী।

এই পরমব্রহ্মই স্বপ্রকাশ—সর্ব্বজ্যোতিষ্কের জ্যোতিঃ, তিনি তমঃ-পারে অবস্থিত, তিনিই জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্যরূপে সর্ব্বহৃদয়ে অবস্থিত।

এইরূপে সংক্ষেপে এই জ্ঞেয় পরম ব্রহ্মতত্ত্ব এই অধ্যায়ে ১২শ হইতে ১৭শ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম অনির্ব্বাচ্য—তাঁহাকে সৎ বা অসৎ বলা যায় না, তিনি সূক্ষ্ম হেতু অবিজ্ঞেয়—তিনি অপ্রমেয়। তিনি সগুণ (immanent manifest) রূপে সর্ব্ব—বিশ্বরূপ,

আর তিনি নির্গুণ (Transeendent)রূপে (unmaifestরূপে) সর্ব্বাতীত; তিনি সগুণরূপে বিভক্তের ন্যায় হইয়া স্থিত—সর্ব্বভূতরূপে, তাহাদের ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গুণরূপে স্থিত, সর্ব্বভূতের অন্তরে, বাহিরে, দূরে, নিকটে স্থিত। সমুদায়ই ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে অবস্থিত, ব্রহ্মসত্তাতে সত্তাযুক্ত, ব্রহ্মশক্তিতে সৎরূপে বিবর্ত্তিত ও বিধৃত। আবার ব্রহ্ম এ জগতের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা। ব্রহ্মই এ জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ—সর্ব্বকারণ।

ব্রহ্মতত্ত্বে সকল বিরোধের সমন্বয় হয়, সকল বিপরীত ভাব একীভূত হয়। তিনি নির্গুণ অথচ সগুণ, সর্ব্বেন্দ্রিয়যুক্ত অথচ সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত, তিনি অতি দূরে অথচ অতি নিকটে। law of contradiction অনুসারে জ্ঞানের বিকাশাবস্থায় যে কিছু বিপরীত ভাবের (thesis এবং antithesis এর অথবা antinomy র) বিকাশ হয়, ব্রহ্মে সে সমুদায়ের সমন্বয় (synthisis) হয়। law of identity দ্বারা সমুদয় বিরোধী ভাব তাঁহাতে একীভূত হয়।

ব্রহ্ম সূক্ষ্ম হেতু অবিজ্ঞেয় হইলেও—এই সর্ব্বভূতমধ্যে—এই অনন্ত বহুত্বপূর্ণ জগতের মধ্যে যে এই একত্বের অনুভূতি হয়—যে এই সকল বিভক্ত ভাবের মধ্যে এক অবিভক্ত ভাবের অনুভূতি হয়, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানা যায়। আরও তাঁহাকে এ জগতের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা বা জগতের মূল কারণরূপে তটস্থ লক্ষণ দ্বারাও জানা যায়। তাঁহাকে জ্যোতীরূপে—সর্ব্বপ্রকাশক তেজোরূপে এই শব্দাত্মক জগতের মূল একাক্ষর ব্রহ্ম—ওঙ্কাররূপে ধ্যান বা ভাবনা করিতে হয়। আর ব্রহ্মকে অধ্যাত্মজ্ঞানে নিজ আত্মাতে পরমাত্মস্বরূপে ধ্যান ও ধারণা করিতে হয়। ধ্যানপরিপাকে আত্মাতেই ব্রহ্মদর্শন হয়। ব্রহ্ম অবিজ্ঞেয় হইয়াও যে এইরূপে জ্ঞেয় হন, তাহার কারণ এই যে, ব্রহ্ম সর্ব্বভূতের জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞান-গম্যরূপে অর্থাৎ জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই ত্রিপুটীরূপে অবস্থিত। যখন এই জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় তত্ত্ব অনুধ্যান করিয়া তাহার

স্বরূপজ্ঞান লাভ করা যায়, যখন এই তিনের একত্ব ধারণা করা যায়, যখন এই তিন এক হইয়া নির্ব্বিশেষ জ্ঞানরূপে একীভূত হয়, তখন অন্তরে এই ব্রহ্মতত্ত্ব অনুভব করা যায়, তখন ব্রহ্মস্বরূপ লাভ হয়। এ সকল বিষয় আমরা পূর্ব্বে উক্ত কয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

যাহা হউক, আমরা ব্রহ্ম সম্বন্ধে উল্লিখিত তত্ত্বগুলি সংক্ষেপে গীতায় উক্ত শ্লোক হইতে জানিতে পারি। জ্ঞান যখন নির্ম্মল হয়, তখন সেই 'জ্ঞান' ব্রহ্মস্বরূপ হয়, তখন 'জ্ঞেয়' ব্রহ্মস্বরূপ হয়, আর তখন 'জ্ঞাতা'ও ব্রহ্মস্বরূপ হয়। অহং ইদং এক হয়। তখন 'অহং' থাকে না, সোঽহং জ্ঞান হয়। যখন জ্ঞাতা ব্রহ্মস্বরূপ হয়, তখন এই জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় একীভূত হইয়া অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান—ব্রহ্মভাব লাভ হয়—অমৃতত্বসিদ্ধি হয়।

এই ব্রহ্মতত্ত্বের সহিত ঈশ্বরতত্ত্বের এবং মায়া ও প্রকৃতি-তত্ত্বের সম্বন্ধ কি, তাহা পূর্ব্বে সপ্তম অধ্যায়ে ব্যাখ্যা-শেষে বিবৃত হইয়াছে। পরে অষ্টম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোক ও একবিংশ শ্লোকে এই ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। তাহার পর দ্বাদশ অধ্যায়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই ব্রহ্মতত্ত্ব ও তাহার সহিত ঈশ্বরতত্ত্বের সম্বন্ধ পুনরালোচিত হইয়াছে। এ অধ্যায়ের উক্ত ১২শ হইতে ১৭শ শ্লোক পর্য্যন্ত ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা উক্ত শ্লোক সকলের ব্যাখ্যায় বিস্তারিতভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা গিয়াছে।

এই ব্রহ্মতত্ত্বের এইরূপ বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন এই যে, ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই পরমমুক্তিলাভ হয়। আর এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা অতি কঠিন। ব্রহ্মতত্ত্ব গুহ্যতম, অতি দুর্ব্বোধ্য। ব্রহ্মবিদ্যাই পরা বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা 'অক্ষর অধিগম্য' হয়। ব্রহ্ম-তত্ত্ব দুর্ব্বোধ্য, তাহার পুনঃ পুনঃ আলোচনা ব্যতীত তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না। ইহা ব্যতীত আমরা দেখিয়াছি যে, এই গীতোক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে মতভেদ আছে। বিভিন্ন শ্রুতি-বচনই এই মতভেদের কারণ। বেদান্ত-দর্শনে এই সমুদায় বিভিন্ন শ্রুতি সমন্বয় করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। তথাপি তাহাতেও

এই বিভিন্ন বাদের স্থান আছে। অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধ দ্বৈতবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন বাদ অনুসারে যেমন এই বেদান্ত-দর্শন বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেইরূপ এই গীতা-শাস্ত্রও তদনুসারে বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উক্ত কয় শ্লোকে ব্রহ্মতত্ত্বের এই বিভিন্ন বাদ অনুসারে ব্যাখ্যা আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি।

যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের উপরের ভূমিতে যাইলে এই দ্বৈত (thesis) ও অদ্বৈত (antithesis) এই উভয়বাদ সমন্বয় (synthesis) করিলে, তবে এই ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যায়। ইহাই সর্ব্ব-সমন্বয়ের শেষ সমন্বয় (last synthesis) গীতায় যে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ উভয়েরই সমন্বয় হইয়া যে পরম অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা কোন বাদ অবলম্বন না করিয়া গীতায় সমগ্রভাবে—সর্ব্বসামঞ্জস্য করিয়া আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়।

আমরা পূর্ব্বে ব্যাখ্যা-ভূমিকায় বলিয়াছি যে, এই ব্রহ্মতত্ত্বই গীতার মূল সূত্র। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। আমরা সে স্থলে বলিয়াছি যে, ব্রহ্মকে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষভাবে বুঝিতে হয়। সবিশেষ ব্রহ্মের দুই ভাব;—সগুণ ভাব ও নির্গুণ ভাব। সগুণ ব্রহ্মই পরমেশ্বর, নির্গুণ ব্রহ্ম পরম অক্ষর, অব্যক্ত, অনির্দ্দেশ্য, কূটস্থ, অচল ও ধ্রুব; নির্গুণ ব্রহ্ম এইরূপ বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত আর ব্রহ্মের যে নির্ব্বিশেষ ভাব, তাহা অনির্বাচ্য, অজ্ঞেয়, নিরুপাধিক, কেবল 'নেতি নেতি' দ্বারাই নির্দ্দেশ্য। পরম ব্রহ্মের এই নির্ব্বিশেষ নির্গুণ ভাব 'তৎ'-শব্দবাচ্য আর তাঁহার সগুণ ভাব 'সঃ'-শব্দ-বাচ্য। বলিয়াছি ত, তিনি পরমেশ্বর। গীতায় এই সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব পূর্ব্বে দ্বিতীয় ষট্‌কে ব্যাখ্যাত হইয়াছে দেখিয়াছি। এই অধ্যায়ে এই কয় শ্লোকে প্রধানতঃ 'তৎ'-আখ্য নির্ব্বিশেষ ও নির্গুণ পরম ব্রহ্মতত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে।

গীতা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, যিনি পরম ব্রহ্ম, তিনি সৎ বা

অসৎবাচ্য নহেন। তিনি অনির্ব্বাচ্য নির্বিশেষ। তাঁহাকে নিষেধমুখে 'নেতি নেতি' দ্বারা নির্দেশ করিতে হয়। ইহা উপনিষদেই উক্ত হইয়াছে। এই ব্রহ্মতত্ত্ব সূক্ষ্ম অবিজ্ঞেয়। আমরা বলিয়াছি, আমরা ব্রহ্মকে দুই রূপে নির্দেশ করি,—এক সগুণরূপে আর এক নির্গুণরূপে। এক Immanent রূপে, আর এক Transcendent রূপে। স্বরূপতঃ ব্রহ্ম এই দুই ভাবের অতীত, এই উভয়ের সমন্বয় কারণে তাঁহার এই নির্ব্বিশেষ ভাব ধারণা করা যায়। পরমার্থতঃ ব্রহ্ম সগুণও নহেন, নির্গুণও নহেন; তিনি উভয়ের অতীত, অথচ উভয় ভাবে অভিব্যক্ত। নির্গুণ-রূপে তিনি অক্ষর, অব্যক্ত, অনির্দ্দেশ্য, সর্ব্বত্রগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচর, ধ্রুব (১২।৩) ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্টরূপে বাচ্য ও নির্দ্দেশিত হন, আর সগুণরূপে ঈশ্বরভাবে তিনি আমাদের সমগ্র জ্ঞেয় হন। তিনি এ জগতের স্রষ্টা, পাতা, নিয়ন্তা ও সংহর্ত্তা মায়াশক্তিযুক্ত ঈশ্বর। তিনিই অব্যক্ত প্রকৃতিরূপ। তিনি সগুণরূপেই দ্রষ্টা ও দৃশ্য হন; জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় হন। জ্ঞাতৃরূপে তিনি পুরুষ ও জ্ঞেয়রূপে তিনি প্রকৃতি। সর্ব্বজ্ঞাতৃরূপে, সর্ব্ব নিয়ন্তৃরূপে তিনি পরমেশ্বর পুরুষোত্তম, আর পরিচ্ছিন্ন জ্ঞাতৃরূপে তিনি প্রকৃতিবদ্ধভাবে জীব বা ভূত। পরমেশ্বরের নিয়ন্তৃত্বে প্রকৃতির পরিণাম হইয়া এই জগতের অভিব্যক্তি হয়; তাহা জীব-ভোগ্য হয়। প্রকৃতি হইতে জীবদেহ উৎপন্ন হয়। এইরূপে ব্রহ্মই সগুণরূপে নিয়ন্তা ঈশ্বর, ভোক্তা জীব ও ভোগ্য জগদ্রূপে অভিব্যক্ত হন। অতএব ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অজ্ঞেয় হইলেও তাঁহার নির্গুণ অক্ষরভাব, এবং সগুণ ঈশ্বর জীব ও জগদ্ভাব কতকটা ধারণা করিতে পারা যায়। গীতা হইতে পরম ব্রহ্মকে এই ভাবে বুঝিতে পারা যায়। উপনিষদের মধ্যে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ইহা উক্ত হইয়াছে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ হইতে আমরা ইহা সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রথমে আছে :—

"সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে
তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানং প্রেরয়িতারঞ্চ মত্বা
জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি॥" (১৷৬)

অর্থাৎ "হংস বা জীব আপনাকে ও প্রেরয়িতা ঈশ্বরকে পৃথক্ মনে করিয়া সেই সর্ব্বজীবাধার ও সর্ব্বলয়স্থান বৃহৎ ব্রহ্মচক্রে ভ্রাম্যমান হয়। পরে প্রেরয়িতা দ্বারা জুষ্ট বা উপকৃত হইয়া বা তাঁহার কৃপায় অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়।" কিরূপে এই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা পরবর্ত্তী মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যথা—

"উদ্গীতমেতদ্ পরমন্তু ব্রহ্ম
তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ।
অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা
লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তা।" (১৷৭)

অর্থাৎ "এই পরম ব্রহ্মই উদ্গীত। অর্থাৎ বেদান্তে উপদিষ্ট হইয়াছে। তাহাতে তিন এবং অক্ষর সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। ব্রহ্মবিদ্ এই সম্বন্ধে যে প্রভেদ, তাহা জানিয়া, যোনিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মে লীন হয়।" এইরূপে এই মন্ত্র হইতে ব্রহ্মের অক্ষর স্বরূপ ও অন্ত তিন রূপ জানা যায়। এই অন্ত তিন রূপ যাহা ব্রহ্মেই সুপ্রতিষ্ঠিত, তাহা কি, সে তত্ত্ব এ স্থলে বিবৃত হইয়াছে। এই তিন রূপ ক্ষর, অক্ষর ও ঈশ্বর।—

"সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ
ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশম্।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥" (১৷৮)

অর্থাৎ 'ঈশ্বর এই পরস্পর সংযুক্ত ক্ষর অর্থাৎ প্রধান বা প্রকৃতি এবং অক্ষর বা জীবাত্মা—এই উভয়কে (১৷১১) বা ব্যক্ত অব্যক্ত এই সমুদয়কে

(বিশ্বকে) ভরণ করেন—বা তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া তাহাদের নিয়ন্তা হন। এই জীবাত্মা অনীশ, এই ঈশিত্ব শক্তি বিহীন হইয়া ভোক্তৃ-ভাব হেতু (সুখদুঃখাদিতে) বদ্ধ হয়। সে দেবকে বা ঈশ্বরকে জানিয়া সর্ব্বরূপে সর্ব্ববন্ধন হইতে মুক্ত হয়। আরও উক্ত হইয়াছে—

"জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশা-
বজা হ্যেকহ ভোক্ত ভোগ্যার্থ যুক্তা।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপে হ্যকর্ত্তা
ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ॥" (১।৯)

অর্থাৎ এই 'জ্ঞ'স্বরূপ ঈশ্বর, ও অজ্ঞ জীব—এই দুই ভাব অনাদি (অজ)। ইহা ব্যতীত আরও এক অনাদি (অজা) ভাব আছে—তাহা ভোক্তা জীবের ভোগ্যার্থযুক্ত। জীব স্বরূপতঃ আত্মার্থ অনন্ত অকর্ত্তা—বিশ্বরূপ। যাহা হউক, জ্ঞানী যখন এই (ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতিরূপ) তিনকে ব্রহ্মরূপে জানিতে পারেন, ও ঈশ্বর অভিধ্যান দ্বারা তাঁহার সহিত একত্ব অনুভব করিতে পারেন, তখন তাঁহার বিশ্বমায়া নিবৃত্তি হয়। (১।১০)। যাহা হউক, ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, পরম ব্রহ্মে যে এই অক্ষর কূটস্থ ভাব ব্যতীত এই তিন ভাব সুপ্রতিষ্ঠিত—সেই তিন ভাব এই প্রেরয়িতা ঈশ্বর, ভোক্তা জীব ও ভোগ্যা প্রকৃতির এই তিনই ব্রহ্ম—

"ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরয়িতারঞ্চ মত্বা
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ।" (১।১২)

পরম ব্রহ্মের এই তিন ভাব ব্যতীত তাঁহার যে অক্ষর ভাব, তাহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পরে উক্ত হইয়াছে :—

"যদাতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রি-
র্নসৎ চাসচ্ছিব এব কেবলঃ।

তদক্ষরং তৎসবিতুর্বরেণ্যং
প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী॥"
(শ্বেতাশ্বতর, ৪।১৮)

অর্থাৎ যখন 'অতম' হয় অর্থাৎ সর্ব্বরূপ অজ্ঞান দূর হইয়া জ্ঞানের প্রকাশ হয়, তখন এই 'অক্ষর' ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। তখন দিবাও নহে, রাত্রিও নহে, সৎও নহে, অসৎও নহে, তখন কেবল শিবরূপ প্রকাশিত থাকেন। তিনিই অক্ষর, তিনিই সবিতৃমণ্ডলাধিষ্ঠিত দেবের ও সম্ভজনীয়। তাঁহা হইতেই পুরাণী প্রজ্ঞা প্রসৃত হইয়াছে।

"নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চ ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ॥"
(শ্বেতাশ্বতর, ৪।১৯)

অর্থাৎ ইঁহাকে উর্দ্ধে, অধোদেশে বা মধ্যে ধরিতে পারে না। যাঁহার নাম মহদ্‌যশঃ, তাঁহার প্রতিমা নাই।

"ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এন-
মেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥"
(শ্বেতাশ্বতর, ৪।২০)

অর্থাৎ দর্শনযোগ্য প্রদেশে (সন্দৃশে) ইঁহার রূপ নাই। কেহ তাঁহাকে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায় না। যাঁহারা হৃদয়ে ও মনন দ্বারা হৃদিস্থিত ইঁহাকে জানেন, অর্থাৎ হৃদয় সংশয়রহিত বুদ্ধি ও সম্যগ্ দর্শনরূপ গমন দ্বারা এ ভাবে ইঁহাকে দর্শন করেন (শ্বেতাশ্বতর, ৪।১৭), তিনি অমর হন।

ইহাই অক্ষর পরম ব্রহ্মের স্বরূপ। তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন, তাঁহা হইতে পুরাতনী প্রজ্ঞা প্রসৃত, তিনি উর্দ্ধে, মধ্যে ও

অধোদেশে নহেন বলিয়া প্রপঞ্চাতীত, তাঁহার কোন প্রতিমা (বা তুলনা) নাই। তিনি অবাঙ্মানসগোচর। এইরূপে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পরম ব্রহ্মের অক্ষয় ঈশ্বর জীব ও প্রধান বা প্রকৃতিরূপ ভাব উক্ত হইয়াছে।

মাণ্ডূক্য উপনিষদেও পরম ব্রহ্মের বা পরমাত্মার চারি পাদের কথা উক্ত হইয়াছে। অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে ওঁকারতত্ত্ববিবৃতিকালে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। পরম-ব্রহ্মের যে অমাত্র, অব্যবহার্য্য, প্রপঞ্চোপশম, শান্ত, শিব, অদ্বৈত, অদৃষ্ট, অগ্রাহ্য, অলক্ষণ, অচিন্ত্য, অব্যপদেশ্য একাত্মপ্রত্যয়সার চতুর্থ বা তুরীয় পদ উক্ত হইয়াছে, (মাণ্ডূক্য উপঃ ৭, ১২) তাহা এই 'অক্ষর অব্যক্ত' পরম ব্রহ্মের এই চতুর্থ ভাব।

গীতা হইতেও আমরা এই পরম ব্রহ্মতত্ত্ব—তাঁহার অক্ষয় অব্যক্ত পরম ভাব, পরমেশ্বরভাব, জীবাত্মভাব ও বিশ্বরূপভাব জানিতে পারি। এ স্থলে তাহা বিস্তারিতভাবে বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই। বলিয়াছি ত, পূর্ব্বে দ্বাদশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যায়, অষ্টম অধ্যায়ের একবিংশতি ও দ্বাবিংশতি শ্লোকের ব্যাখ্যায় ও সপ্তম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে এই অক্ষয় পরম ব্রহ্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব ও এই উভয় তত্ত্বমধ্যে সম্বন্ধ বিবৃত হইয়াছে। এ স্থলে তাহা দেখিতে হইবে।

১৮শ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, (পূর্ব্বে ১৭ শ্লোক পর্য্যন্ত) ক্ষেত্র জ্ঞান ও জ্ঞেয় সংক্ষেপে যেরূপে উক্ত হইয়াছে, ঈশ্বরভক্ত সেই তত্ত্ব জানিয়া ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানের স্বরূপ জানিয়া সেই জ্ঞানে স্থিতি হইলে, তাহার দুই ফল হয়। সেই জ্ঞানে ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রজ্ঞ যে পৃথক্, তাহা প্রতিভাত হয়, এবং জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিভাত হয়, এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে মুক্তি হয়। এইজন্য ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রথমে বিবৃত হইয়াছে, এবং পরে ১২শ হইতে ১৭শ শ্লোক পর্য্যন্ত অনির্বাচ্য 'তৎ'-

পদনির্দ্দিষ্ট পরম ব্রহ্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। এই 'তৎ'পদবাচ্য ব্রহ্ম জ্ঞেয় ব্রহ্ম হইলেও, সমগ্র ব্রহ্ম-তত্ত্ব নহে। এই 'তৎ'-পদবাচ্য পরম ব্রহ্ম এক অর্থে তাঁহার প্রপঞ্চাতীত ভাব মাত্র। আমরা জানি যে, উপনিষদে ব্রহ্মের দুই ভাব প্রধানতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে—সগুণ ও নির্গুণ অর্থাৎ অপর ও পর ব্রহ্ম। এই ভাবে উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্মতত্ত্বই সর্ব্বোপনিষদসার।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে—

"তৎ ব্রহ্মোপনিষদং পরং তৎ ব্রহ্মোপনিষদং পরম্।" (১।১৬)

এই ব্রহ্মতত্ত্বই—

"বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্॥"

(শ্বেতাশ্বতর, ৬।২২)

এই ব্রহ্মতত্ত্বই উদ্‌গীত। ব্রহ্মতত্ত্ব কিরূপে জানিতে হইবে, তাহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রথমেই আছে—

"উদ্‌গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম
তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ।
অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা
লীনা ব্রহ্মণি তৎপরং যোনিমুক্তাঃ॥" (১।৭)

ইহা হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম এই প্রপঞ্চ সম্বন্ধে অক্ষর ও উক্ত তিন রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে এইরূপেই জানেন এবং যিনি এইরূপে ব্রহ্মকে জানেন ও ব্রহ্মপরায়ণ হন, তিনি যোনিমুক্ত হন— তাঁহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। প্রকৃতি-পুরুষ-জ্ঞানও এই ব্রহ্ম-জ্ঞানের অন্তর্গত, ইহা পরে বিবৃত হইবে। ১২শ হইতে ১৭শ শ্লোক পর্য্যন্ত নির্ম্মল (৭ম হইতে ১১শ শ্লোকোক্ত) জ্ঞানে জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্বের মধ্যে তৎ-পদ-নির্দ্দিষ্ট অনির্ব্বচনীয় পরম ব্রহ্মতত্ত্ব প্রধানতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু উক্ত ত্রিবিধ ব্রহ্মস্বরূপ বিবৃত হয় নাই। আমরা দেখিয়াছি যে, বেদান্ত

অনুসারে ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ। কিন্তু সমগ্র সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব পূর্ব্বে বিবৃত হয় নাই। এই সগুণ ব্রহ্মই এই ত্রিবিধ। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ অনুসারে সগুণ ব্রহ্মের এই তিন রূপ—ভোক্তা জীবাত্মা, ভোগ্য জগৎ এবং প্রেরয়িতা ঈশ্বর। আমরা দেখিয়াছি যে, এই ত্রিবিধ ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

"ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ।" (১।১২)।

অতএব এই ঈশতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও জগত্তত্ত্ব স্বরূপতঃ ব্রহ্মতত্ত্বেরই অন্তর্গত। এই তিন তত্ত্বই ব্রহ্মে সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহাদের মধ্যে 'ভোগ্য'ই প্রধান বা প্রকৃতি,—ইহা ক্ষর, অজা, এক ও সর্ব্বভোগার্থযুক্ত (শ্বেতাশ্বতর ১।৮।১০)। এই ভোক্তা—জীবাত্মা। অজ, অক্ষর, অব্যক্ত, ইহা অনীশ আত্মস্বরূপ, ইহা অজ্ঞ হইলেও অনন্ত, অমৃত, বিশ্বরূপ, অকর্ত্তা। (শ্বেতাশ্বতর ১।৮-১০); ইহা গীতোক্ত সংসারী জীবাত্মা—ক্ষর পুরুষ। আর এই প্রেরয়িতা—পরমেশ্বর। তিনি এক, দেব, হর, ক্ষরাক্ষর ও ব্যক্তাব্যক্ত বিশ্বের বা অজ ক্ষর প্রধানের এবং অজ অক্ষর জীবাত্মা—সকলের নিয়ন্তা ও ভরণকর্ত্তা পরমেশ্বর (শ্বেতাশ্বতর ১।৮-১০)। এই পরমেশ্বরই পরমপুরুষ বা উত্তম পুরুষ। এইরূপে ব্রহ্মই এই প্রকৃতি এবং (দ্বিবিধ) পুরুষরূপ। এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানেই মুক্তি হয়। ভোক্তা জীবাত্মা যখন আপনাকে, এই জগৎকে ও ঈশ্বরকে—এই ত্রিবিধকে ব্রহ্মরূপে জানিতে পারে, তখন পরমেশ্বরের অভিধ্যান যোজনা (সংযোগ) এবং তত্ত্বভাব (ব্রহ্মৈকত্বভাব) হইতে অন্তে নিঃশেষে বিশ্বমায়া নিবৃত্তি হয় ও পরমেশ্বরকে জানিয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি হয়, সর্ব্বক্লেশ ক্ষীণ হয়, ও জন্মমৃত্যুর নিবৃত্তি হয়।

"তস্যাভিধ্যানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্
ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ।

জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহানিঃ॥
(শ্বেতাশ্বতর, ১।১০-১১)।

এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া যিনি পরমেশ্বরকে ধ্যান করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করেন, তিনি দেহভেদান্তে বিশ্বৈশ্বর্য্যযুক্ত তৃতীয় পদ প্রাপ্ত হন এবং তদনন্তর 'কেবল' বা সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত নিরুপাধিস্বরূপ হইয়া আপ্তকাম বা পূর্ণানন্দময় হন।

"তস্যাভিধ্যানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে
বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবলমাপ্তকামঃ॥"
(শ্বেতাশ্বতর,১।১১)।

এইরূপে পরমেশ্বর অনুধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলে যে ফল হয়, তাহা অষ্টম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে, এবং সেই অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে মুক্তিতত্ত্বে ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই মুক্তির জন্যই ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ ভাব ; বিশেষতঃ পরমেশ্বরভাব জ্ঞেয় হইলেও পরম অক্ষররূপে তাঁহাকে অন্তরাত্মাতেই জানিতে হইবে। তিনিই পরমতত্ত্ব।

"এতজ্‌জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।" (১।১২

এই পরম অক্ষর ব্রহ্ম আত্মসংস্থ। ইঁহাকে জানিতে হইলে অন্তরেই ইঁহাকে অনুসন্ধান করিতে হয়। তিলে যেমন তৈল থাকে, দধিতে যেমন ঘৃত থাকে, স্রোতে যেমন জল থাকে, কাষ্ঠে যেমন অগ্নি থাকে, এবং যেমন তিলকে শোধন দ্বারা তৈল নির্গত হয়, মন্থন দ্বারা দধি হইতে ঘৃত পাওয়া যায় ও অরণিকাষ্ঠ হইতে অগ্নির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ তপস্যা ও ধ্যান দ্বারা আমাদের অন্তরাত্মাকে মন্থন করিলে ব্রহ্মকে গ্রহণ করা যায়।

"তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পি-
রাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ।

এবমাত্মাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ
সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি ॥"
(শ্বেতাশ্বতর, ১।১৫)।

ধ্যান দ্বারা এইরূপে আত্মাতে পরব্রহ্মদর্শন হয়। সে ধ্যানের প্রণালী এই—

"স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম।
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ ॥"
(শ্বেতাশ্বতর, ১।১৪)।

অতএব মুক্তির জন্য এই পরম ব্রহ্ম জ্ঞেয়। তাঁহা ব্যতীত অন্য বেদিতব্য আর কিছুই নাই। পরম ব্রহ্ম যখন 'তৎ'পদানির্দ্দেশ্য, অনির্ব্বাচ্য-রূপে জ্ঞেয়, সেইরূপ ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এই ত্রিবিধভাবে সগুণরূপেও তিনি জ্ঞেয়। সগুণরূপে তাঁহাকে না জানিলে, তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন হয় না এবং পরম ব্রহ্মতত্ত্বও জ্ঞেয় হয় না। এজন্য এই পরম ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের পূর্ব্বে এই ত্রিবিধ ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে হইবে। এই কারণ এই অধ্যায়ে নির্গুণ পরম ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইবার পর ১৯শ শ্লোক্ হইতে শেষ পর্যান্ত এই ত্রিবিধ ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে এবং পরের দুই অধ্যায়ে তাহা বিস্তারিত হইয়াছে। প্রথমে ১৯শ শ্লোকে ব্রহ্মের পুরুষ ও প্রকৃতিরূপ বিবৃত হইয়াছে—এবং ইহাতেই পরম পুরুষ, অক্ষরপুরুষ ও ক্ষর প্রকৃতি এই ত্রিবিধ সগুণ ব্রহ্মতত্ত্বই সূচিত হইয়াছে।

প্রকৃতি ও পুরুষ—গীতায় এ স্থলে যে প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহার মূল যে শ্রুতি, তাহা আমরা পূর্ব্বে ১৯শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করিয়াছি। উপনিষদে যে পুরুষ অব্যক্ত ও বুদ্ধি প্রভৃতির সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি মূল তত্ত্বের আভাষ পাওয়া যায়, তাহা আমরা সে স্থলে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। কঠ উপনিষদুক্ত এই অব্যক্তই সাংখ্যদর্শনের মূল প্রকৃতি, তাহা সাংখ্যদর্শন হইতেই জানা যায়। এজন্য

আমরা বলিয়াছি যে, গীতায় যে প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহার মূল স্মৃতি, সাংখ্যদর্শন নহে। শ্রুতি হইতে এই 'প্রকৃতি-পুরুষবাদ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা পাওয়া যায়। এ স্থলে আমরা তাহার উল্লেখ করিব। তাহা হইলে এই প্রকৃতি-পুরুষবাদ কোন্ শ্রুতিমূলক, তাহা আমরা আরও বিশদভাবে বুঝিতে পারিব।

ঋগ্‌বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তে যে সৃষ্টিতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে আছে—

"আনীদবাতম্ স্বধয়া তদেকম্
তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস॥" ২

অর্থাৎ "তখন সেই এক স্বধার সহিত অবিভাগাপন্ন বায়ুহীন অথচ প্রাণ বা চৈতন্যযুক্ত ছিলেন। এই অবিভাগাপন্ন 'এক' ও 'স্বধা'র যে সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল উক্ত হইয়াছে, ইহারাই এক অর্থে পুরুষ ও মূল প্রকৃতি বা অব্যক্ত। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে—

"আত্মৈব ইদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ। সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনো-ঽপশ্যৎ।" (১।৪।১)

ইহা হইতে আমরা 'আত্মাই যে পুরুষ' তাহা জানিতে পারি। ঋগ্‌বেদীয় পুরুষসূক্তে যে এই পুরুষতত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। এই ব্রহ্ম বা পুরুষ যে আপনাকে পুং-স্ত্রীরূপে দ্বিধা বিভক্ত করেন, তাহাও বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ হইতে আমরা জানিতে পারি। ঐ উপনিষদে আছে যে,—

"স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ স হৈ তাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ স ইমমেবাত্মানং দ্বেধা পাতয়ৎ।" (১।৩।৩)

ইহার অর্থ—"তিনি আপনাকে একাকী বিবেচনা করিয়া ইষ্টার্থ সংযোগজনিত ক্রীড়ায় সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি আপনার দ্বিতীয়

অভিলাষ করিলেন। তিনি এতাবৎকাল মিলিত স্ত্রীপুরুষরূপে ভাবময় শরীরে অবস্থান করিতেছিলেন। অতএব আপনাকে স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন, অর্থাৎ তাঁহার উক্ত ভাবময় শরীরকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া উহার একভাগে পুরুষাকার এবং অপর ভাগে স্ত্রীর আকার প্রদান করিলেন। এইরূপে ব্রহ্ম স্বয়ংই প্রকাশ ভেদে পতি ও পত্নীর আকার ধারণ করিলেন।"

ইহা হইতে জানা যায় যে, একই আত্মা বা পুরুষ সৃষ্টির প্রারম্ভে আপনাকে পুং-স্ত্রীরূপে দ্বিধা বিভক্ত করেন। ইহাই প্রকৃতি-পুরুষ-বাদের মূল।

এই প্রকৃতি-পুরুষ যে অনাদি এবং প্রকৃতি যে ত্রিগুণাত্মিকা, তাহারও মূলতত্ত্ব আমরা উপনিষদ্ হইতে জানিতে পারি। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে—

"অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাম্।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥" ৪।৫।

অর্থাৎ লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণা (অর্থাৎ অগ্নি, জল ও অন্নবিশিষ্টা, বা সত্ত্ব রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয়যুক্তা), বহু প্রজার উৎপাদিকা, সমানাকারা এক অজাকে (অর্থাৎ প্রকৃতিকে) এক অজ (অর্থাৎ আত্মা) সেবকভাবে ভজনা করে; অন্য অজ ভুক্তভোগা ইহাকে পরিত্যাগ করে (অর্থাৎ প্রকৃতিকৃত ভোগ পরিসমাপ্ত হইলেই পরমার্থ-জ্ঞান লাভ করিয়া বিষয়াসক্তি ত্যাগ করে)।

এই অজাই জন্মরহিত বা অনাদি প্রকৃতি আর অজই অনাদি পুরুষ। ইহা হইতে আপাততঃ সাংখ্যদর্শনের বহু বদ্ধ ও মুক্ত পুরুষবাদ এবং তাহা হইতে স্বতন্ত্র এক প্রকৃতিবাদ সিদ্ধ হয় বটে; কিন্তু উক্ত বৃহদারণ্যক শ্রুতির

সহিত এই শ্রুতির সমন্বয় করিলে, আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, পুরুষ একই এবং তিনি রমণার্থ আপনাকে দ্বিধা করিয়া পুরুষ-প্রকৃতি-রূপ হন এবং প্রকৃতি উপভোগ করিবার জন্য বহুরূপ হন। প্রকৃতি স্বাধীনা নহে।

এই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, এই অজা প্রকৃতি লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ-রূপা, ইহাই সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণ। ত্রিগুণ এই ত্রিবর্ণাত্মিকা, সত্ত্ব যাহা নির্ম্মল প্রকাশ-স্বরূপ ও সুখস্বরূপ, তাহা শুক্ল; যাহা রজঃ বা রঞ্জন করে, তাহা লোহিত আর তমঃ বা যাহা মোহকর ও আবরণকারী, তাহা কৃষ্ণ। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে,—

"যদগ্নে রোহিতং রূপম তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য অপাগাদগ্নেরগ্নিত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্।" (৬।৪।১)।

শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য হইতে ইহার এইরূপ সংক্ষেপ ভাবার্থ পাওয়া যায়,—অগ্নি, জল ও অন্ন (বা পৃথিবী) এই তিন দেবতার মিশ্রণে বা ত্রিবৃৎকরণে যে সমুদায় ব্যক্ত পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাতে মূল অগ্নির লোহিতত্ব, জলের শুক্লত্ব এবং অন্নের বা পৃথিবীর কৃষ্ণত্ব নিহিত আছে। যেমন এই পরিদৃশ্যমান অগ্নির লোহিতত্ব তাহার মূলতেজোরূপ শুক্লত্ব, তাহার মূল অপ্‌রূপ এবং কৃষ্ণত্ব, তাহার মূল অন্নরূপ ইহা জানা যায়, এইরূপে জানা যায় যে, সকল পদার্থই ত্রিবর্ণাত্মক, বা তেজ, অপ ও অন্নাত্মক তাহারাই সকল ব্যাপ্ত পদার্থের মূলরূপ। তাহাই এই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি।

অতএব সকল পদার্থই লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণবর্ণাত্মক বা ত্রিগুণাত্মক। পূর্ব্বে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেই উক্ত মন্ত্রে এই লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ-বর্ণাত্মিকা 'অজা'র উল্লেখ আছে, তাহাই অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতি। ইহা ব্যতীত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পুরুষ ও তাহার পরাশক্তি প্রকৃতিও উল্লিখিত

হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদুক্ত প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব আমরা পূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই।

এইরূপে আমরা শ্রুতি হইতে এই প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্বের মূল সূত্র পাই। শ্রুতি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, একই ব্রহ্ম বা পরমাত্মা এই সৃষ্টি সম্বন্ধে পুরুষ-প্রকৃতিরূপে দ্বিধা বিভক্ত হন। উভয়ই অনাদি। পুরুষ এক হইয়াও ভোক্তৃরূপে এই প্রকৃতিতে ভোগার্থ বহুরূপ হন। আর এই প্রকৃতি সেই পুরুষের ভোগ্য হয়। প্রকৃতি লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ এই ত্রিবর্ণাত্মিকা। এই ত্রিবর্ণাত্মিকা প্রকৃতিতেই বদ্ধ হইয়া পুরুষ ভোক্তা হয় এবং সেই বন্ধন ছেদন করিতে পারিলে সে মুক্ত হয়। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, গীতায় এই শ্রুত্যুক্ত অর্থে পুরুষ-প্রকৃতি-বাদ বিবৃত হইয়াছে। যাহা হউক, এই প্রকৃতি-পুরুষবাদ সাংখ্যদর্শনেরই বিশেষত্ব। সাংখ্যদর্শনেই ইহা বিশেষভাবে গৃহীত। এজন্য গীতোক্ত প্রকৃতি-পুরুষ-বাদ বুঝিতে হইলে, সাংখ্যদর্শনেরও প্রকৃতি-পুরুষবাদ বুঝিতে হয়। এইহেতু আমরা এ স্থলে এই সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতিপুরুষবাদ অতি সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

সাংখ্যদর্শনের কোন মূল গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। অনেকের মতে 'সাংখ্য তত্ত্বসমাস'ই সাংখ্যদর্শনের মূল গ্রন্থ। কিন্তু সে গ্রন্থ অতি সংক্ষেপ। তাহাতে প্রকৃতি-পুরুষবাদের কোন তত্ত্বই পাওয়া যায় না। যে সাংখ্যসূত্র এক্ষণে প্রচলিত আছে, তাহা অনেকের মতে বিজ্ঞান ভিক্ষুর রচিত। রচিত না হইলেও পূর্ব্বলুপ্ত সাংখ্যসূত্র যে বিজ্ঞান ভিক্ষু উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহা তিনি তাঁহার ভাষ্যের প্রথমে স্বীকার করিয়াছেন। এজন্য অনেকের মতে সাংখ্যকারিকাই সাংখ্য-শাস্ত্রের একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ। তাহাও বিশেষ প্রাচীন নহে। যাহা হউক, সাংখ্যকারিকা হইতে প্রধানতঃ আমরা এ স্থলে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিপুরুষবাদ বুঝিতে চেষ্টা করিব। সাংখ্যদর্শনে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব সম্বন্ধে কারিকায় উক্ত হইয়াছে যে,—

"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥" ৩॥

অর্থাৎ মূল প্রকৃতি অবিকৃতি; মহান্ (বুদ্ধিতত্ত্ব), অহঙ্কার ও রূপ-রসাদি পঞ্চ তন্মাত্র এই সাতটি প্রকৃতি-বিকৃতি; এবং মন, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত এই ষোলটি বিকৃতি। পুরুষ প্রকৃতিও নহে, বিকৃতিও নহে। এই পঁচিশটি মূল তত্ত্ব। সাংখ্যমতে পুরুষ ও মূল প্রকৃতি এই উভয়ই অনাদি আর সমুদয়ই অনিত্য। সাংখ্যসূত্রে আছে,—"প্রকৃতিপুরুষয়োঃ অন্যৎ সর্ব্বমনিত্যম্।" মূল প্রকৃতি হইতে যে সাতটি প্রকৃতি-বিকৃতি ও ষোলটি বিকৃতি অভিব্যক্ত হয়, তাহারা অনিত্য। কারণ, তাহারা মূল প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হয় এবং তাহাতেই লয় হয়।

সাংখ্যমতে মূল প্রকৃতি অব্যক্ত বা প্রধান, তাহা হইতে অভিব্যক্ত লিঙ্গশরীর তদ্বিপরীত। সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতি, মন ও দশ ইন্দ্রিয় এই আঠারটি তত্ত্বের দ্বারা এই লিঙ্গ বা লিঙ্গশরীর গঠিত হয়। আর পুরুষ অব্যক্ত এবং অব্যক্ত হইতে অভিব্যক্ত প্রকৃতি-বিকৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বা বিপরীতধর্ম্মী।

মূল প্রকৃতি যে এই লিঙ্গের বিপরীতধর্ম্মী এবং পুরুষ যে উভয়ের বিপরীতধর্ম্মী, সে সম্বন্ধে কারিকায় উক্ত হইয়াছে :—

"ত্রিগুণমবিবেকী বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মী। ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীতস্তথা চ পুমান্॥" ১১।

যে কারণে পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হয়, তাহার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে।

সংঘাত পরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদি বিপর্য্যয়াদধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ॥ ১৭

এইরূপে সংক্ষেপে সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতিপুরুষ বাদ স্থাপিত হইয়াছে। এই পুরুষ ও প্রকৃতি মূলতত্ত্ব। বহু পুরুষ বাদ সম্বন্ধে সাংখ্যকারিকায় আছে।

জননমরণ-করণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্য্যয়াচ্চৈব ॥ ১৮

অর্থাৎ জন্ম, মরণ, করণ সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ নিয়ম হেতু, অযুগপৎ প্রবৃত্তিহেতু, আর ত্রৈগুণ্যের বিপর্য্যয় হেতু, পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ।

পুরুষ যে অকর্ত্তা এবং কেবল দ্রষ্টা ও সাক্ষিমাত্র, সে সম্বন্ধে কারিকায় উক্ত হইয়াছে।

তস্মাচ্চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য।
কৈবল্যং মাধ্যস্থং দ্রষ্টৃত্বমকর্তৃভাবাশ্চ ॥ ১৯

অর্থাৎ "সেই বিপর্য্যয় হইতেই পুরুষের সাক্ষিত্ব, কৈবল্য, মাধ্যস্থ, দ্রষ্টৃত্ব ও অকর্তৃত্ব সিদ্ধ।"

পুরুষ যে অকর্ত্তা হইয়াও কর্ত্তার ন্যায় বোধ হয়, তাহার হেতু এই যে—

তস্মাত্তৎ সংযোগাদচেতনং চেতনবদিব লিঙ্গবৎ।
গুণকর্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবতীত্যুদাসীনঃ ॥ ২০

"পুরুষের সংযোগ হেতু অচেতন লিঙ্গ চেতন বিশিষ্টের ন্যায়, আর গুণেরই কর্তৃত্ব আছে বলিয়া উদাসীনকে কর্ত্তার ন্যায় বোধ হয়।"

পুরুষ যে প্রকৃতিস্থ হইয়া ভোক্তা হয় বা প্রকৃতিজ গুণ ভোগ করে ও সেই হেতু দুঃখ পায় এবং সংসারবদ্ধ হয়, সে সম্বন্ধে কারিকায় উক্ত হইয়াছে।

তত্র জরামরণকৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ।
লিঙ্গাখ্যা বিনিবৃত্তেস্তস্মাদ্দুঃখং স্বভাবেন ॥ ৫৫

অর্থাৎ "চৈতন্যবিশিষ্ট পুরুষ তাহাতে (লিঙ্গ শরীরে) জরা-মরণ-জনিত দুঃখ ভোগ করেন; লিঙ্গ শরীরের যে পর্য্যন্ত নিবৃত্তি না হয়, সেই হেতু দুঃখ স্বাভাবিক।"

আরও উক্ত হইয়াছে যে,

তস্মান্ন বধ্যতে নাপি মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ।
সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ॥ ৬২

অর্থাৎ "সেইহেতু পুরুষ বদ্ধ হয়েন না, মুক্তও হয়েন না, এবং সংসরণ করেন না; নানা আশ্রয়ভূত প্রকৃতিই সংসরণ করেন, বদ্ধ হয়েন ও মুক্ত হয়েন।"

সাংখ্যকারিকা হইতে এইরূপে পুরুষ-প্রকৃতি-তত্ত্ব জানা যায়। আমরা পূর্ব্বে সাংখ্যতত্ত্বসমাসের উল্লেখ রাখিয়াছি। তাহার যে এক ভাষ্য প্রচলিত আছে, তাহাতে এই পুরুষ প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে তাঁহা পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে উদ্ধৃত হইলেও এস্থলে পুনরুদ্ধৃত হইল।

অষ্ট প্রকৃতি।—অব্যক্ত বা (মূল প্রকৃতি), বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র। এই আট প্রকৃতি।

অব্যক্ত।—লোকে যেমন ঘট, পট, কূট ও শয্যা প্রত্যক্ষ করে, মূল প্রকৃতিকে সেরূপে জানা যায় না—এইজন্য ইহাকে অব্যক্ত বলে। অর্থাৎ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইহা গ্রাহ্য নহে। ইহার অবয়ব নাই; কারণ ইহার আদি, মধ্য, অন্ত নাই। ইহাই অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ ও অব্যয়; অথচ নিত্য রস-গন্ধাদি-বর্জ্জিত। সুধীগণ বলেন, ইহার আদি নাই, মধ্য নাই. ইহা মহৎ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং ধ্রুব। ইহা সূক্ষ্ম, অলিঙ্গ, ইহার আদি নাই, বিনাশ নাই। ইহা প্রসবধর্ম্মী, নিরবয়ব, এক এবং সাধারণ (বা সকলের মূল) ইহাই অব্যক্ত।

অব্যক্তের পর্য্যায় শব্দ এই:—অব্যক্ত, প্রধান, ব্রহ্ম, পুর, ধ্রুব, প্রধানক, অক্ষর, ক্ষেত্র, তমঃ প্রসূত।"

পুরুষ।—পুরুষ অনাদি, সূক্ষ্ম, সর্ব্বগত, চেতন, অগুণ, নিত্য, দ্রষ্টা, ভোক্তা, অকর্ত্তা, ক্ষেত্রবিদ্, অমল ও অপ্রসব-ধর্ম্মী।

পুরাণ বলিয়া, পুরিতে শয়ন করে বলিয়া, অথবা পুরোহিত বা সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী, এজন্য ইহাকে পুরুষ বলে। ইহার আদি, অন্ত বা মধ্য নাই

বলিয়া ইহা অনাদি, নিরবয়ব বা অতীন্দ্রিয় বলিয়া ইহা সূক্ষ্ম। সর্ব্বস্থানে বিরাজমান এবং গগনবৎ অনন্ত ব্যাপ্ত বলিয়া 'সর্ব্বগত'।

সুখ, দুঃখ ও মোহ উপলব্ধি করে বলিয়া 'চেতন'।

ইহাতে সত্ত্ব, রজঃ বা তমঃ গুণ নাই বলিয়া ইহা নির্গুণ।

ইহা সৃষ্ট বা উৎপাদ্য নহে বলিয়া নিত্য। প্রকৃতির বিকার উপলব্ধি করে বলিয়া ইহা 'দ্রষ্টা'।

চেতন জন্য সুখ, দুঃখ পরিজ্ঞাত হয় বলিয়া ইহা 'ভোক্তা'।

উদাসীন ও অগুণ বলিয়া ইহা 'অকর্ত্তা'।

ক্ষেত্র বা গুণদিগকে বুঝিতে পারে বলিয়া ইহা 'ক্ষেত্রবিদ্'।

ইহাতে শুভাশুভ কর্ম্ম নাই বলিয়া ইহা 'অমল'।

নির্বীজ বলিয়া ইহা অপ্রসবধর্ম্মী অর্থাৎ ইহা কিছুই উৎপন্ন করে না। এই সাংখ্য পুরুষের ব্যাখ্যা হইল।

এই পুরুষের নামান্তর যথা :—পুরুষ, আত্মা, পুমান্, পুংগুণজন্তুজীব, ক্ষেত্রজ্ঞ, নর, কবি, ব্রহ্ম, অক্ষর, প্রাণ, যে, কে, সেই, এই।"

এইরূপে সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতি-পুরুষবাদ আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, তত্ত্ব সমাস ব্যাখ্যা হইতে পুরুষ এক কি বহু তাহা জানা যায় না। কারিকায় ও সাংখ্য-সূত্রে প্রকৃতিবদ্ধ পুরুষ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে পুরুষ বহু। কিন্তু প্রকৃতিমুক্ত পুরুষ এক কি বহু এবং পুরুষ স্বরূপতঃ এক কি বহু তাহা উক্ত হয় নাই। এজন্য এ সম্বন্ধে সাংখ্য ও বেদান্তে পুরুষবাদের বৈষম্য দৃষ্ট হয় না। আমরা আরও বলিতে পারি যে, তত্ত্ব সমাসে আট প্রকৃতির কথা উক্ত হইয়াছে; ইহাই এক অর্থে গীতার অষ্টধা অপরা প্রকৃতি। এই আট প্রকৃতির মধ্যে 'অব্যক্ত' স্বতন্ত্র ভাবে উক্ত হইয়াছে। কারিকায় তাহাকে মূল প্রকৃতি বা প্রধান বলা হইয়াছে। এ স্থলে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি-পুরুষবাদ সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

এক্ষণে আমরা গীতার এ অধ্যায়ে উক্ত এই পুরুষ-প্রকৃতি-বাদ সংক্ষেপে বুঝিব।

পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক-জ্ঞান।—গীতায় ১৩শ অধ্যায়ে ১৯শ ও ২০শ শ্লোকে প্রকৃতি-পুরুষ বিবেক-জ্ঞান যাহা সংক্ষেপে সূচিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে। এই প্রকৃতিপুরুষ বিবেক জ্ঞানই সাংখ্যশাস্ত্রানুসারে প্রকৃত জ্ঞান, কেন না ইহা হইতে মোক্ষ বা অপবর্গ সিদ্ধ হয়। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, প্রকৃতিপুরুষ বিবেকজ্ঞানই এক অর্থে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান। পৃথক্‌ভাবে দেখিলে, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান হইতেই প্রকৃতিপুরুষ বিবেকজ্ঞান হয়। ক্ষেত্রের মূল কারণ প্রকৃতি। প্রকৃতি কারণরূপ ক্ষেত্র কার্য্যরূপ আর ক্ষেত্রজ্ঞ মূলতঃ পুরুষ। পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ বা সম্বন্ধ হইলে প্রকৃতি পরিণত হইয়া ক্ষেত্র ও জ্ঞেয় জগৎরূপে কার্য্যভাবে ব্যাপ্ত হন, আর পুরুষ তাহার জ্ঞাতা হইয়া ক্ষেত্রজ্ঞ হন। ক্ষেত্র যখন তাহার জ্ঞেয় হয়—তখন এই ক্ষেত্রের জ্ঞাতৃরূপে পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ হন। ব্যষ্টি ক্ষেত্রের জ্ঞাতা বা ক্ষেত্রজ্ঞ জীব, আর সমষ্টি ক্ষেত্রের জ্ঞাতা—ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর। ব্যষ্টি ক্ষেত্রের জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ—সেই ক্ষেত্রে বদ্ধ হইয়া, সেই ক্ষেত্রে আত্মজ্ঞান হেতু বদ্ধ পুরুষ বা ক্ষর পুরুষ হন। সমষ্টিক্ষেত্রের জ্ঞাতা—ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর। কোন ক্ষেত্রে বদ্ধ নহেন, সর্ব্বক্ষেত্র সম্বন্ধে তাঁহার 'আমার' ভাব নাই। তিনি নির্লিপ্ত—অসঙ্গ,—নিষ্ক্রিয় অথচ তিনি সর্ব্বক্ষেত্রে অধিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ও নিয়ন্তা। এই সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব এই ঈশ্বরতত্ত্ব পূর্ব্বে দ্বিতীয় ষট্‌কে বিবৃত হইয়াছে, তাহা বলিয়াছি। পরে পঞ্চদশ অধ্যায়েও ইহা উল্লিখিত হইবে। ঈশ্বরতত্ত্ব গীতায় বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে, তাহা দেখিয়াছি। এই ঈশ্বরতত্ত্বই গীতায় বিশেষভাবে বিবৃত। সাংখ্য-দর্শন অনুসারে প্রকৃতিবদ্ধ পুরুষই ক্ষেত্রজ্ঞ। ব্যষ্টি ক্ষেত্র সম্বন্ধে তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। মুক্ত পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ নহে, শুদ্ধমুক্ত কূটস্থ তিনিই অক্ষর স্বরূপ।

সাংখ্যদর্শনে সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর বা উত্তম পুরুষ স্বীকৃত হন নাই। যাহা হউক এই ক্ষেত্রজ্ঞের যে স্বরূপ 'পুরুষ' ও ক্ষেত্রের যে কারণরূপ প্রকৃতি, সেই পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব গীতায় ১৯শ শ্লোক হইতে বিবৃত হইয়াছে। গীতায় এই পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব—সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব হইতে যে ভিন্ন, তাহা আমরা যথাস্থানে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। গীতোক্ত পুরুষতত্ত্ব পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইবে; প্রকৃতির স্বরূপ কি, তাহা সপ্তম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে বিবৃত হইয়াছে। প্রকৃতিপুরুষ-বিবেকজ্ঞান এই অধ্যায়ে ১৯শ ও ২০শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

প্রকৃতি-তত্ত্ব।—এই ১৯শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই অনাদি। কেন না ইহা সৃষ্টি সম্বন্ধে ব্রহ্মেরই দুই অভিব্যক্ত রূপ। মায়াশক্তি হেতু পরমব্রহ্মই পরম জ্ঞাতা পুরুষরূপে ও পরম জ্ঞেয় অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতিরূপে প্রথম অভিব্যক্ত হন। মূল প্রকৃতির পরিণাম হইতে যে পরা ও অপরা প্রকৃতির অভিব্যক্তি হয়, ভগবান্ তাহাতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক তাহাকে নিয়মিত করিয়া জগতের বিকাশ করেন, এবং সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীররূপ প্রকৃতিকে যোনি কল্পনা করিয়া তাহাতে স্বীয় বীজ-নিষেক দ্বারা সর্ব্বভূতের অভিব্যক্তি করেন। এইজন্য ব্রহ্মের এই প্রকৃতি-পুরুষরূপ অনাদি। ইহার মধ্যে পরম পুরুষের ঈক্ষণ বা কল্পনা হেতু প্রকৃতির পরিণাম হয়, ইহা হইতে বিকার (ত্রয়োবিংশতি সাংখ্যোক্ত তত্ত্ব) এবং গুণের (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের) উৎপত্তি হয়। এই প্রকৃতিই কার্য্যকারণ-কর্তৃত্বের হেতু। প্রকৃতির কর্তৃত্বেই সর্ব্ব-কার্য্যকারণপ্রবাহ চলিতে থাকে। প্রকৃতির কর্তৃত্বেই কার্য্যকারণ-সংঘাত শরীরের বা ক্ষেত্রের উৎপত্তি হয়। এইরূপে সংক্ষেপে এ স্থলে প্রকৃতিতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে। প্রকৃতির যাহা বিকার—প্রকৃতি হইতে যেরূপে শরীর বা ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়, তাহা

গীতায় কোথাও বিশেষভাবে উক্ত হয় নাই। পূর্ব্বে ক্ষেত্র সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা ব্যতীত এ সম্বন্ধে গীতায় কোথাও ইহার উল্লেখ নাই। আমরা বলিতে পারি যে তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শন জন্য তাহা জানিবারও তত আবশ্যক নাই। গীতায় পরে প্রকৃতিজ ত্রিগুণতত্ত্ব বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। কেন না, মুমুর্ষুর পক্ষে এ তত্ত্বজ্ঞান বিশেষ প্রয়োজনীয়; এই অধ্যায়ে প্রকৃতি সম্বন্ধে আর কোন তত্ত্ব উক্ত হয় নাই। তবে পরে ২৯শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, প্রকৃতি দ্বারাই সর্ব্বকর্ম্ম সর্ব্বরূপে কৃত হয়।

পুরুষ-তত্ত্ব।—এ অধ্যায়ের ২১শ শ্লোক হইতে অবশিষ্ট অংশে ক্ষেত্রজ্ঞ বা পুরুষতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। পুরুষ অনাদি, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। পুরুষ সুখ-দুঃখ-ভোক্তৃত্বের হেতু তাহাও ২০শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। এই সুখ দুঃখ ক্ষেত্রের ধর্ম্ম। পুরুষ-সান্নিধ্যে ক্ষেত্র বা ক্ষেত্রের প্রধান উপকরণ অন্তঃকরণ চেতনবৎ হয়, এবং তাহাতে এই সুখ দুঃখ ভাব হয়। সুখ সাত্ত্বিকভাব আর দুঃখ রাজসভাব। অন্তঃকরণ সাত্ত্বিক হইলে, তাহাতে সুখভাব হয়; অন্তঃকরণ রাজসিক হইলে তাহাতে দুঃখভাব হয়। আমরা বলিয়াছি যে অনাদি-স্বরূপ পুরুষের বা পরমাত্মার সান্নিধ্যে তাঁহার পরিচ্ছিন্ন প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া অন্তঃকরণ ত্রিগুণজভাব হেতু সুখদুঃখ মোহভাব-যুক্ত হয়। বিষয় গ্রহণ কালেই এই সুখ দুঃখ বা মোহ তাহার বিকাশ হয়। অন্তঃকরণে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য হইলে, তাহাতে সুখভাবের বিকাশ হয়, রজোগুণের প্রাধান্য হইলে, তাহাতে দুঃখভাবের বিকাশ হয় এবং তমোগুণের প্রাধান্য হইলে মোহভাবযুক্ত হয়। অন্তঃকরণ যে ভাবযুক্ত হয়, ক্ষেত্রবদ্ধ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ তাহা গ্রহণ করিয়া সেই ভাবের ভোক্তা হন—আপনাতে সেই ভাবের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া আপনাকে সুখী বা দুঃখী জ্ঞান করেন।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—পুরুষ যে এইরূপ সুখ দুঃখের ভোক্তা হয়, তাহার কারণ পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজ গুণ ভোগ করেন। বিভিন্ন গুণের যে বিভিন্ন ভাব পুরুষ এইরূপে তাহা ভোগ করেন। যখন সাত্ত্বিক-ভাবের বিবৃদ্ধিহেতু চিত্ত সুখভাবযুক্ত হয়, তখন পুরুষ সেই সুখভোগ করেন। চিত্ত রাজস ভাব যুক্ত হইলে,—পুরুষ সেই দুঃখ ভোগ করেন। এইরূপে প্রকৃতিতে বদ্ধ হইয়া পুরুষ আপনার আনন্দ স্বরূপ ভুলিয়া সুখ-দুঃখরূপ প্রকৃতিজ গুণের বিভিন্ন ভাব উপভোগ করেন। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ এইরূপ প্রকৃতিবদ্ধ হইয়া ক্ষেত্রস্থ সুখ দুঃখ রাগ দ্বেষাদি উপভোগ করিয়া সেই সুখে অনুরক্ত হন এবং দুঃখে দ্বেষযুক্ত হন। ইহাতেই এই সুখ দুঃখের যে মূল—এই ত্রিগুণ তাহাতে আসক্তি হয় এবং এই গুণে আসক্তি হেতু, তাহাকে জন্ম মৃত্যু প্রবাহের মধ্য দিয়া সংসার ভোগ করিতে হয়, সদসৎ যোনিতে বারবার জন্ম গ্রহণ করিতে হয়।

কিন্তু এই আসক্তি ও আসক্তিজ ভোগ ভ্রম মাত্র। ইহা ক্ষেত্রে বা দেহে আত্মাধ্যাস হেতু জাত। দেহে 'আমি বা আমার' এইরূপ অজ্ঞান বা অবিদ্যা যুক্ত হইয়া, পুরুষ এই ক্ষেত্র বা দেহ-ধর্ম্ম সুখ দুঃখাদি আপনাতে আরোপিত করে। বাস্তবিক এই পুরুষ দেহ-ব্যতিরিক্ত,—দেহ হইতে পর বা উৎকৃষ্ট এবং দেহাতীত। বস্তুতঃ পুরুষ পরমাত্মা মহেশ্বর, উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা বা অনুগ্রাহক, ভর্ত্তা, ভোক্তা। পুরুষ স্বরূপতঃ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ও প্রকৃতির নিয়ন্তা। তিনি প্রকৃতিতে স্থিত হইলেও পরমাত্মার স্বরূপ। তিনি প্রকৃতির নিয়ন্তৃরূপে মহেশ্বর। তিনি প্রকৃতির উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা ভর্ত্তা ও ভোক্তা। ইহাই পুরুষের পরমরূপ পরম অক্ষর রূপ। এই পরম রূপ বুঝিতে হইলে, পঞ্চদশ অধ্যায়ে উল্লিখিত তত্ত্ব বুঝিতে হইবে। পুরুষের পরমাত্মা মহেশ্বর স্বরূপ দর্শনের উপায় প্রকৃতি ও পুরুষকে এই ভাবে বুঝিতে হইবে—এইভাবে জানিতে হইবে। তাহা হইলে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না। প্রকৃতি-বিবিক্ত পুরুষের স্বরূপ জানিতে হইলে,

তাহার পরমাত্মা স্বরূপ দর্শন করিতে হইবে এই পুরুষের স্বরূপ পরমাত্মা দর্শনের উপায় বা সাধন তিনরূপ। ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগ। ধ্যানযোগে চিত্তের দ্বারা চিত্তে আত্মদর্শন করিতে হয়। তাহাতে পুরুষের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। ধ্যানযোগ সাধনা যেরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়া ধ্যান সিদ্ধ হইলে, চিত্তের অপ্রবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে—এই আত্মদর্শন সিদ্ধ হয়। সাংখ্যযোগ বা জ্ঞানযোগ সাধনা যেরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা দ্বারাও এই আত্মদর্শন সিদ্ধ হয়। সাংখ্যযোগ যেরূপে আত্মদর্শন সিদ্ধ হয়, তাহা সাংখ্যশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। গীতায়ও পূর্ব্বে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। কর্ম্মযোগে যেরূপে আত্মদর্শন বা পুরুষের স্বরূপ দর্শন সিদ্ধ হয়, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এইরূপে উক্ত উপায়ে আত্মদর্শন সিদ্ধ হইলে, পুরুষের স্বরূপ দর্শন হয়, পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক জ্ঞান লাভ হয়, তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন সিদ্ধ হয়। আত্মদর্শন না হইলেও যাঁহারা আত্মার স্বরূপতত্ত্ব কেবল শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিয়া পরমাত্মার উপাসনা করেন, তাঁহাদের উক্তরূপ উপায়ে আত্মদর্শন সিদ্ধ না হইলেও, তাঁহারাও ক্রমে মুক্ত হইতে পারেন। ভগবান্ ইহা ২৫শ শ্লোকে বলিয়াছেন।

ত্রিবিধ পুরুষ— এইরূপে এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে। পুরুষ ক্ষেত্রবদ্ধ হইয়া প্রকৃতির গুণসঙ্গ হেতু প্রকৃতিজ গুণের ভোক্তা হইয়া সদসদ্‌যোনি ভ্রমণ করিলেও স্বরূপতঃ এই পুরুষ ক্ষেত্রের বা প্রকৃতির অতিরিক্ত তত্ত্ব প্রকৃতিজ দেহ হইতে ভিন্ন। পুরুষ স্বরূপতঃ উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর পরমাত্মা। সুতরাং স্বরূপতঃ এই পুরুষ পরমপুরুষ। পুরুষ পরিচ্ছিন্নভাবে দেহবদ্ধ হইয়া সেই পরম পুরুষের অংশভূত হয়। আর ক্ষর পুরুষরূপ হয়। আর দেহে কূটস্থ ভাবে থাকিয়া তিনি অক্ষর পুরুষ হন—"ইহা পরে পঞ্চদশ অধ্যায়ে

বিবৃত হইয়াছে। এই ত্রিবিধ পুরুষ-তত্ত্ব পরে পঞ্চদশ অধ্যায়ে যথা স্থানে বিবৃত হইবে।

এই প্রকৃতি-সংযোগ হেতু পুরুষ এক অবিভক্ত হইলেও বহু বিভক্ত ভাবে প্রকৃতিতে বদ্ধ হন। প্রকৃতিবদ্ধ হইয়া পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ হন এবং প্রকৃতি তাঁহার ক্ষেত্ররূপে পরিণত হয়, তাহা বলিয়াছি। এইরূপে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ ভাবে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ হয়। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ হইতে সমুদায় স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সত্তার উৎপত্তি হয়। এই তত্ত্ব সংক্ষেপে ২৬শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। ইহার বিবরণ—এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ হইতে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি-তত্ত্ব পরে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের প্রথমে (৩য়, ৪র্থ) শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। সেই স্থলের ব্যাখ্যায় এ তত্ত্ব বুঝিতে হইবে।

পুরুষ এইরূপে ক্ষেত্রজ্ঞ হইয়া, ক্ষেত্রের সহিত যুক্ত হইয়া, সমুদায় স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্ব্বসত্তার উৎপাদন করেন সত্য, কিন্তু পুরুষ এক অবিভক্ত, উত্তম পুরুষ রূপে সর্ব্বক্ষেত্রে সমষ্টিভাবে ক্ষেত্রজ্ঞ পরমেশ্বর হইয়া সর্ব্বভূত বা সর্ব্বসত্তা মধ্যে সমভাবে অবস্থান করেন। এই সর্ব্বভূতভাব বিনাশী, এই ভূতভাবে প্রত্যেক ভূতস্থ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষভাবও বিনাশী বা ক্ষর। কিন্তু উত্তম পুরুষ-ভাবে পরমেশ্বর যে সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠান করেন, সেই উত্তম পুরুষ ভাব অবিনাশী। তিনি পরমাত্মা। এ তত্ত্ব ২৭শ ও ২৮শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

এই জীব ও ঈশ্বর ভাব বা ক্ষর পুরুষ ও উত্তম পুরুষ ভাব, এই নিয়মিত ও নিয়ন্তৃভাব—এই প্রতিক্ষেত্রে বদ্ধ পরিচ্ছিন্ন অংশরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ ভাব ও সর্ব্ব ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ পরিচ্ছিন্ন অংশ ঈশ্বর-ভাব—পুরুষের এই দুইভাব ব্যতীত, তাঁহার আরও এক ভাব আছে,—তাহা সর্ব্বক্ষেত্র মুক্ত অক্ষর কূটস্থ ভাব। ইহা সর্ব্বদ্রষ্টা সর্ব্বতত্ত্বসাক্ষীর ভাব। গীতায় পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষের এই কূটস্থ ভাবকে 'অক্ষর'

পুরুষ বলা হইয়াছে। এ স্থলে তাহা ২৯শ শ্লোক হইতে ৩৩শ শ্লোক পর্য্যন্ত বিবৃত হইয়াছে। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যখন পুরুষ, আপনাকে অকর্ত্তৃরূপে দর্শন করিতে পারেন, এবং প্রকৃতি দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্ম সর্ব্বরূপে কৃত হইতেছে, ইহা দর্শন করিতে পারেন, তখন তিনি প্রকৃত দ্রষ্টা হন। যখন তিনি দেখিতে পান যে, এই যে অসংখ্য ভূত-পৃথকভূত ভাব—এ সমুদায় সেই একের মধ্যে সেই এক পরমাত্মার অবস্থিত এবং এই দর্শন হেতু আপনাকেও সেই সর্ব্বভূতস্থ এক পরমাত্মরূপে আপনাকে দর্শন করেন—তখন তাঁহার সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বাধার অক্ষর ব্রহ্ম ভাব লাভ হয়—তিনি অক্ষরকূটস্থ পুরুষ হন। তখন তিনি এই পরমাত্মা অব্যয় অনাদি নির্গুণ হন এবং সর্ব্বশরীরস্থ বা সর্ব্বভূতস্থ হইয়াও কিছুই করেন না, —কিছুতে লিপ্ত হন না। যেমন আকাশ সর্ব্বগত সর্ব্বব্যাপ্ত হইয়াও সূক্ষ্ম হেতু কিছুতে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ এই পরমাত্মা সর্ব্বত্র সর্ব্ব দেহে অবস্থিত হইয়াও কিছুতেই লিপ্ত হন না, অথচ ইনি প্রকাশ-স্বভাব—নিজ প্রকাশ স্বভাবের দ্বারা সর্ব্বক্ষেত্রে একমাত্র ক্ষেত্রী এই ক্ষেত্রজ্ঞ হইয়া সমুদায় ক্ষেত্রকে প্রকাশ করেন। সূর্য্য যেমন স্বীয় জ্যোতি দ্বারা আপনাকে ও সমুদায় লোককে প্রকাশ করে, সেইরূপ সেই এক সর্ব্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ স্বীয় জ্যোতি দ্বারা সমুদায় ক্ষেত্রকে প্রকাশ করেন। পরমাত্মরূপে ইনি সর্ব্বক্ষেত্রের প্রকাশক, সর্ব্বক্ষেত্রের দ্রষ্টা। প্রকৃতিজ বুদ্ধিতত্ত্ব ইঁহারই প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া, দ্রষ্টা সাক্ষী ও জ্ঞাতা হয়। পরমাত্মরূপে ইনি সেই দ্রষ্টার দ্রষ্টা সেই জ্ঞাতার জ্ঞাতা। এজন্য বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত দ্রষ্টার দ্বারা তিনি দৃষ্ট হন না—বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত জ্ঞাতাদ্বারা তিনি জ্ঞাত হন না,—বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত জ্ঞানের দ্বারা তিনি প্রকাশিত হন না। বুদ্ধিতে জ্ঞাতৃভাব, ভোক্তৃভাব ও কর্ত্তৃভাবের যে বিকাশ হয় (যাহাকে ইংরাজী দর্শনে phenomenal self or ego বলে) ইনি তাহার দ্রষ্টা (absolute self)। ইনি সর্ব্বক্ষেত্রে বুদ্ধিতে এইরূপ যে আত্মভাবের অধ্যাস হেতু দ্রষ্টা বা

জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তার ভাব হয়,সে সমুদায় ভাবের তিনি দ্রষ্টা। এইরূপে তিনি সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞ। আর তিনি সর্ব্বক্ষেত্রে কেবল জ্ঞাতা বা উপদ্রষ্টা নহেন, তিনি অনুমন্তা ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বর। এইরূপে পুরুষ স্বরূপে তিনি সর্ব্বক্ষেত্রের প্রভু, সর্ব্বক্ষেত্রের দ্রষ্টা, অধিষ্ঠাতা ও নিয়ন্তা। আবার তিনিই প্রকৃতি বদ্ধ হইয়া প্রতিক্ষেত্রে ব্যষ্টিভাবে সেই ক্ষেত্রের গুণ বা ত্রিবিধ গুণময় ভাবের সহিত সঙ্গযুক্ত হইয়া তাহার দ্বারা বদ্ধ হন ও প্রকৃতিতে অভিব্যক্ত জীবভাব গ্রহণ করেন। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকে আমাদের এই তিনরূপে—জীবরূপে। অক্ষর ও ঈশ্বররূপে তাঁহাকে জানিতে হয়।' এই অধ্যায়ে ক্ষেত্রজ্ঞের এই তিনভাব সূচিত হইয়াছে। ক্ষেত্রজ্ঞপুরুষের এই তিন ভিন্নভাব অনুসারে পুরুষ যে ত্রিবিধ হন বলিয়াছি, তাহা পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এইরূপে ক্ষেত্রজ্ঞভাবে পুরুষকে আমাদের জানিতে হইবে এবং ক্ষেত্রভাবে প্রকৃতিকে জানিতে হইবে। এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান হইতে প্রকৃতি-পুরুষের স্বরূপ জ্ঞান হয়, এবং ইহা হইতে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে যে পার্থক্য, যে ধর্ম্ম, যে বিপরীতত্ব, তাহা জানা যায়—ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যিনি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ ও তাহাদের পার্থক্য জানিতে পারেন, আর ভূত-প্রকৃতিমোক্ষতত্ব জানিতে পারেন, তিনিই পরমপদ লাভের অধিকারী হন। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিবেক জ্ঞান হইলে ক্ষেত্রজ্ঞ বদ্ধ পুরুষ সেই ক্ষেত্রের বন্ধন হইতে মুক্তির উপায় বা ভূত-প্রকৃতি হইতে মোক্ষের উপায় জানিয়া সেই উপায় অবলম্বনে ভূত-প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া স্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন- এবং পরমপদ লাভ করিতে পারেন। ভূতভাব হইতে ও প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার উপায় এ অধ্যায়ে বিবৃত হয় নাই। ক্ষেত্রের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ বদ্ধ হইয়া ভূতভাব-যুক্ত হয়, তাহা এ অধ্যায়ে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে বদ্ধ হওয়ায় যে ভূতভাব হয়, তাহা হইতে মুক্তির উপায় এস্থলে

উক্ত হয় নাই। প্রকৃতি যে ত্রিগুণের দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকে বদ্ধ করে, তাহাকে স্বীয়ভাবযুক্ত করে, সেই ত্রিগুণ দ্বারা কিরূপে বদ্ধ হইতে হয়, তাহার তত্ত্ব এবং সেই ত্রিগুণ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ত্রিগুণাতীত ভাবে অবস্থান করিবার তত্ত্ব—এক কথায় ভূতপ্রকৃতিমোক্ষতত্ত্ব পরে চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। যাহা হউক, এই ত্রয়োদশ অধ্যায়েই যে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান সূচিত হইয়াছে, তাহা আমরা এ স্থলে সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিলাম।

গীতার এই ত্রয়োদশ অধ্যায় সম্বন্ধে আমাদের আর একটি কথা বিশেষভাবে বুঝিতে হইবে। যাহা প্রকৃত 'গীতাজ্ঞান'—যাহা গীতোক্ত ধর্ম্মের মূল সূত্র—তাহা এই অধ্যায় হইতেই আমরা জানিতে পারি। এই অধ্যায় হইতেই আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহার উপদেশ পাই। ক্ষেত্রজ্ঞ আমরা যে আমাদের ক্ষেত্র বা শরীর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ তাহা জানিতে পারি। পুরুষ আমরা যে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন হইয়াও প্রকৃতিতে স্থিত হই এবং প্রকৃতিজ গুণ ভোগ করিয়া তাহাতে বদ্ধ হই, কিন্তু আমাদের প্রকৃত স্বরূপ যে দেহাতীত ও দেহ হইতে শ্রেষ্ঠ তাহাই যে পরমাত্মা মহেশ্বররূপে এই প্রকৃতির নিয়ন্তা, তাহা জানিতে পারি। শুধু তাহাই নয়, আমার ন্যায় তুমি, তিনি, এই সর্ব্বভূত, সর্ব্বজীব, বা সর্ব্বসত্তার প্রকৃত স্বরূপ যে একই, আমরা সকলেই যে পরমার্থতঃ ক্ষেত্রজ্ঞ বা পুরুষ, তাহা জানিতে পারি। ইহা হইতে আমরা সর্ব্বত্র 'সমদর্শনের' মূল সূত্র পাই।

গীতায় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—

'বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ (৫।১৮)

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, যখন ধ্যানযোগে আত্মদর্শন হয়, তখন সর্ব্বভূতমধ্যে সেই আত্মা বা ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া, সর্ব্বত্র সমদর্শী হওয়া যায়। ভগবান্ বলিয়াছেন—

'সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ (৬।২৯)

এইরূপে সর্ব্বত্র সমদর্শনের কথা—সর্ব্বভূত মধ্যে আত্মদর্শনের কথা—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহাও যথেষ্ট নহে। এই অধ্যায়ে সর্ব্বত্র একত্ব দর্শনের উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে। এ অধ্যায়ে পরমব্রহ্মের তত্ত্ব বুঝাইয়া সর্ব্বভূতমধ্যে তাহার সমভাবে অবস্থান উপদিষ্ট হইয়াছে। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, পরমব্রহ্ম 'অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্'। আর তিনি 'জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্'। ইহা ব্যতীত পরমেশ্বর যে সর্ব্বক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ ও সর্ব্বভূতে সমভাবে স্থিত, তাহাও এ অধ্যায় হইতে আমরা জানিতে পারি। ভগবান্ বলিয়াছেন,

'ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।'

তিনি বলিয়াছেন,—

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥
সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥

(১৩শ অঃ ২৭।২৮)

এইরূপে গীতা হইতে এই অনন্ত বৈষম্যপূর্ণ জগতের মধ্যে কেবল 'সম' দর্শন করিবারই উপদেশ যে পাই তাহা নহে। এই অনন্ত বৈচিত্র্যময় বহুত্বপূর্ণ অসংখ্য ভেদবিশিষ্ট চরাচর বিশ্বে অভেদ বা একত্ব দর্শন করিবারও উপদেশ এই অধ্যায় হইতে পাইয়া থাকি। ইহা এই গীতার সার উপদেশ। ইহাই বেদান্তের 'সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'সোঽহং' বিশেষতঃ 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যের প্রকৃত অর্থ।

যখন আমাদের জ্ঞান অজ্ঞান-মুক্ত হয়, যখন আমরা ক্ষেত্র হইতে পৃথক্ আমাদের ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ জানিতে পারি, প্রকৃতিযুক্ত পুরুষস্বরূপ

জানিতে পারি, যখন আমাদেরমধ্যে সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিতে শিক্ষা করি এব আমাদের সকলের মধ্যে সমবস্থিত পরমেশ্বরকে দেখিতে পাই,—সর্ব্বত্র পরমাত্ম দর্শন ব্রহ্ম-দর্শন ও ঈশ্বর-দর্শন সিদ্ধ হয়, তখন, বলিয়াছি ত সর্ব্বভেদ মধ্যে অভেদ দর্শন হয়, সর্ব্ব বহুত্ব মধ্যে একত্ব দর্শন হয়, সব বৈষম্য মধ্যে সাম্য দর্শন হয়। ইহাই নির্ম্মল শুদ্ধ সাত্ত্বিক জ্ঞানের লক্ষণ ভগবান্ পরে বলিয়াছেন—

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥ ১৮।২০

এই জ্ঞান লাভ হইলে তুমি আমি ভেদ থাকে না। দেহ-ভেদ হেতু পুং-স্ত্রী ভেদ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল-ভেদ, মনুষ্য-পশু-পক্ষি প্রভৃতি ভেদ, স্থাবর-জঙ্গম ভেদ প্রভৃতি অনন্ত ভেদমধ্যে সর্ব্বত্র এক অভেদ আত্মাকেই দর্শন করা হয় সকলের মধ্যে আপনাকে ও আপনার মধ্যে সকলকে দর্শন করা হয়। তখ আমার মধ্যে তোমার মধ্যে সর্ব্বভূত মধ্যে পরমেশ্বরের দর্শন পাওয়া যা ও পরম ক্ষেত্রজ্ঞ পরমেশ্বরের দর্শন সিদ্ধ হয়। তখন তোমার মধ্যে, ঐ নী চণ্ডালের মধ্যে, গো হস্তী, এমন কি, অতি ক্ষুদ্র কীটমধ্যে যে নারায়ণ অব স্থিত আছেন, সে জ্ঞান লাভ হয়। তখন পর বলিয়া আর কেহ থাকে না তখন পরমার্থসিদ্ধি হয়। স্বার্থ ও পরার্থ এক হইয়া যায়। ইহাই গীতোক্ত ধর্ম্ম। ইহাই নিষ্কামধর্ম্মের মূলসূত্র। যখন পর আর পর থাকে না, আমিই তুমি এই জ্ঞান সিদ্ধ হয়, তখন পরের প্রতি রাগ, দ্বেষ, ক্রোধ কিছুই আ থাকিতে পারে না। তখন আমার স্বার্থ সুবিধা লাভালাভ বিচার থাকিতে পারে না। যাঁহার এই জ্ঞান হয়, তিনি নিষ্কামভাবে সর্ব্বভূতার্থকর্ম্ম আচর করেন। তখন তিনি সুখ দুঃখ সর্ব্বাবস্থায় আত্মোপমায় সর্ব্বত্র সমদর্শ করিয়া পরমেশ্বরেই অবস্থান করেন। ভগবান্ বলিয়াছেন—

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥

৬অঃ ৩১।৩২॥

এই জ্ঞান—এই দর্শনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ, আচার ব্যবহারের শ্রেষ্ঠ, নীতির মূল ভিত্তি। আমরা এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিব না। প্রসিদ্ধ জর্ম্মন দার্শনিক পল ডুসেন (Paul Deussen) এর কথা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

But the fact is nevertheless, that the highest and purest morality is the immediate consequence of the Vedanta. The gospels fix quite correctly, "love your neighbours as yourselves." But why should I do so, since by the order of nature I feel pain and pleasure only in myself, not in my neighbour? The answer is not in the Bible (this venerable book being not yet quite free from semitic realism), but it is in the veda, is in the grave formula "tatvamasi" (তত্ত্বমসি), which gives in three words metaphysics and morals altogether. You shall love your neighbour as yourselves,—because you are your neighbour and mere illusion makes you believe, that your neighbour is something different from yourselves. Or in the words of the Bagabadgita : he, who knows himself in everything and everything in himself, will not injure himself by himself, 'na hinasti atmana atmanam' (ন হিনস্ত্যাত্মনা আত্মানম্). This is the sum and tenor of all morality, and this is the stand-

point of a man knowing himself as Brahman. He fee
himself as everything—so he will not injure anythin
for nobody injures himself. He lives in the world;
surrounded by its illusions but not deceived by them
like the man suffering from timira (তিমির) who se
two moons but knows that there is one only, so t
Jivanmukta sees the manifold world and cannot g
rid of seeing it, but he knows, that there is only o
being, Brahman, the Atman, his own self, and he va
fies it by his deeds of pure disinterested morality.